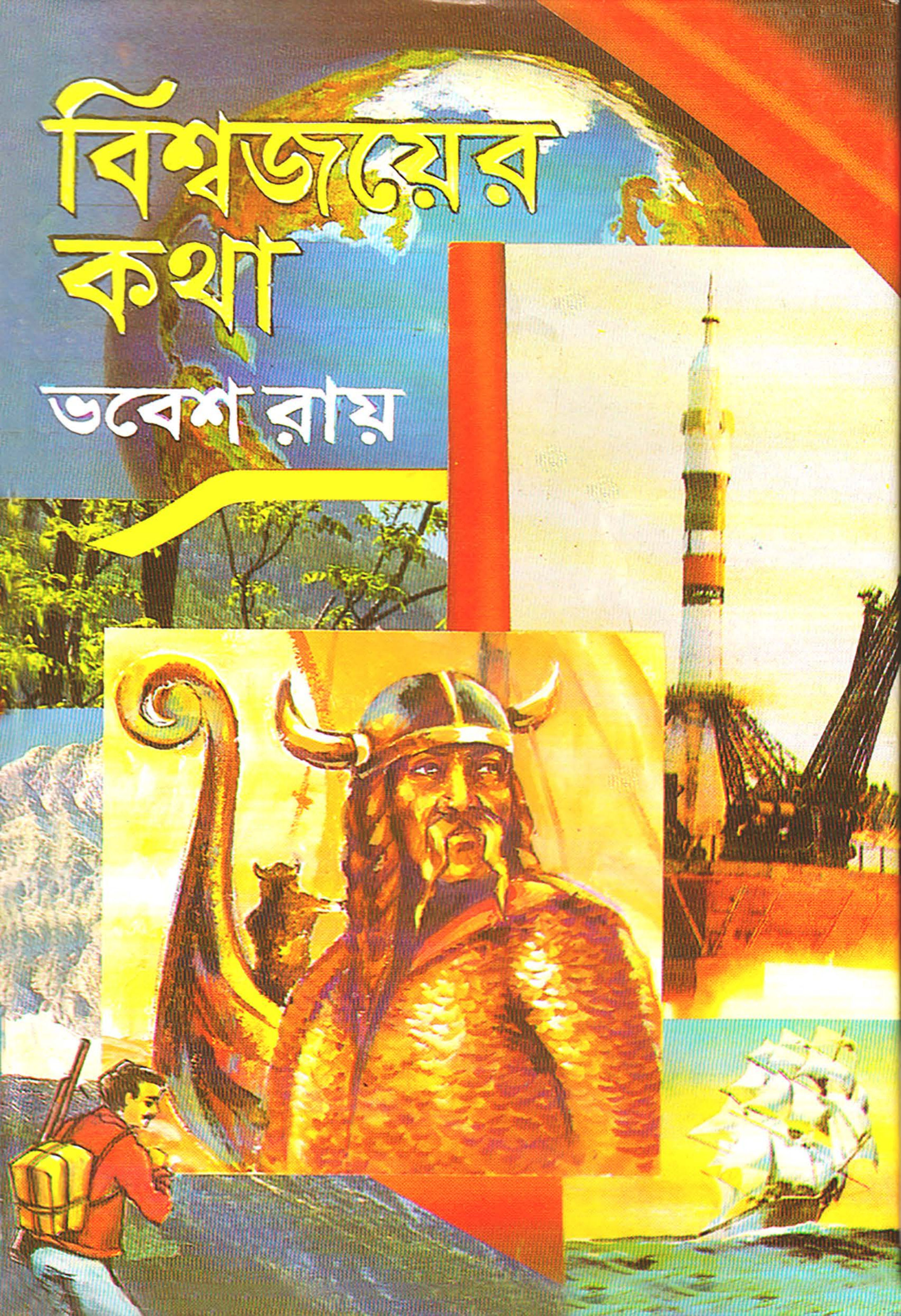
বিশ্বজয়ের
কথা
ভবেশ রায়

# বিশ্বজয়ের কথা

## ভবেশ রায়

কাকলী প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

©
শ্রীমতি আরতি রায়

পঞ্চম মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১৮
চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ১৯৯২
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সুখেন দাস

কম্পোজ
কাকলী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এক্সেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-93103-7-2

---

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
অথবা লগ অন করুন : http:/rokomari.com/kakali

---

আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইটস্, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
জার্মান পরিবেশক ॥ স্টেভেনজার গাটান, ৬৩ ব্রুল, জার্মান
সুইডেন পরিবেশক ॥ ভাস্‌বে, স্টকহোম, সুইডেন

www.nagorikpathagar.org

আমার আত্মজা
সবিতা রায় ও কবিতা রায়
যারা এ পিতৃহৃদয়কে অধিকার করে আছে সর্বক্ষণ।

www.nagorikpathagar.org

## আমার কথা

সভ্যতার আদিতে পৃথিবী ছিলো ছোট্টো। পৃথিবীটা আকৃতিতে ছোটো ছিলো - একথাটা ঠিক নয় - সংকীর্ণ ছিলো মানুষের জ্ঞানের পরিধি। তখন সবাই যে যার আওতায় একটি করে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে শান্তিতে বসবাস করতো।

তারপরই একদিন মানুষকে পেয়ে বসলো অজানাকে জানবার নেশায়। তখন সে ঘর থেকে পা বাড়ালো বাইরে। আবিষ্কার করলো বাইরের এক অজানা পৃথিবীকে। এমনি করেই শুরু। অজানাকে জানার সেই নেশাতেই মানুষ ছুটে গেলো দূর থেকে বহু দূরে। তারা দুর্বার সাহসে পাড়ি দিলো দূরন্ত সাগর, পায়ে হেটে পার হলো দুস্তর মরু আর দুর্গম তুষার প্রান্তর।

সেইসব অভিযানের কী যে ভয়ংকর নেশা, কী দুর্জয় সাহস তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তারাই মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এনে দিয়েছিলো ভিন্ন জগতের খবর। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা জানতে পেরেছি আজকের সারা বিশ্বকে।

'বিশ্বজয়ের কথা' মূলত তাদেরই বিচিত্র কাহিনী। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত দুঃসাহসিক ভৌগোলিক অভিযান হয়েছে বইটিতে তাদেরই কথা তুলে ধরা হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে।

বইটির কিছু কিছু অংশ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, তবে বর্তমান গ্রন্থে সংকলনের সময় তার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে।

বইটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে প্রকাশ করার জন্য কাকলী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব এ, কে, নাছির আহমেদ সেলিম যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার জন্য জানাই কৃতজ্ঞতা। সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেলো। আগামী সংস্করণে শুধরে নেবার চেষ্টা করবো।

ভবেশ রায়

২১শে ফেব্রুয়ারী

১৯৯০

www.nagorikpathagar.org

# কি কি আছে


দেখবো এবার জগৎটাকে

১. অজানার অভিযান/১০
২. ফিনিশিয়ানদের কথা/১০
৩. গ্রীকদের কথা/১১
৫. আফ্রিকা অভিযান/১৩
৬. আফ্রিকা অভিযানের প্রথম চেষ্টা/১৪
৭. জেমস ব্রুসের অভিযান/১৫
৮. নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে মাঙ্গো পার্ক/১৭
৯. দুঃসাহসী রবার্ট মোফাট/২৭
১০. ডেভিড লিভিংষ্টোনের অভিযান/২৯
১১. লিভিংষ্টোনের উদ্ধার অভিযান/৩৫
১২. লিভিংষ্টোনের শেষ পরিণতি/৩৮
১৩ এমিন পাশা উদ্ধারে ষ্ট্যানলীর আবার যাত্রা /৪০
১৪. নীল নদের উৎস সন্ধানে হ্যানিং স্পেক/৪২

ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রযাত্রা

১. সমুদ্র যাত্রার উপলক্ষ/৪৭
২. ক্যাপ্টেন কুকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা/৪৯
৩. প্রথম সমুদ্রযাত্রার দ্বিতীয় পর্ব/৫১
৪. ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা/৫৫
৫. কুকের শেষ সমুদ্রযাত্রা/৫৭

এভারেষ্ট অভিযান

১. অভিযান শুরু/৫৯
২. জেনারেল ব্রুসের অভিযান/৬২
৩. ১৯২৪ সালের অভিযান/৬৩
৪. এভারেষ্ট বিজয় অভিযান/৬৫

আমেরিকা আবিষ্কার

১. আমেরিকার সত্যিকার আবিষ্কারক কে/৭০
২. চীনাদের আমেরিকা গমন/৭১
৩. ইহুদীদের আমেরিকা গমন/৭৩


www.nagorikpathagar.org

৪. মিশরীয়দের আমেরিকা গমন/৭৩
৫. ভাইকিংদের আমেরিকা আবিষ্কার /৭৪
৬. ভাইকিংদের আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার /৭৫
৭. ভাইকিংদের গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার /৮০
৮. বিজার্নীর প্রথম আমেরিকা গমন /৮৫
৯. লীফ ইরিকসনের আমেরিকা আবিষ্কার/৮৮
১০. কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার /৯৫
১১. কলম্বাসের প্রথম সমুদ্র যাত্রা /৯৬
১২. কলম্বাসের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা/১০৫
১৩. কলম্বাসের তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা/১০৮
১৪. কলম্বসের শেষ সমুদ্রযাত্রা /১১৫
১৫. আমেরিগো ভেসপুচি/১১৭
১৬. ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার/১২১
১৭. মিশরীয়দের সমুদ্রযাত্রা /১২২
১৮. কার্থেজিয়ানদের সমুদ্রযাত্রা/১২৫
১৯. পাইথাসের সমুদ্রযাত্রা/১২৬
২০. প্রিন্স হেনরীর অভিযান/১২৭
২১. ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার/১৩৩
২২. প্রথম সমুদ্রযাত্রা/১৩৫
২৩. দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা/১৪১
২৪. তৃতীয় ও শেষ সমুদ্র যাত্রা/১৪৪
২৫. ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ/১৪৫
২৬. প্রস্তুতি পর্বের কথা/১৪৫
২৭. ম্যাগেলানের সমুদ্রযাত্রা/১৪৮
২৮. হেনরী হাডসনের অভিযান/১৫৬
২৯. জন ক্যাবটের অভিযান/১৬৪
৩০. স্যার হোগের অভিযান/১৬৪
৩১. মার্টিন ফ্রবিশার /১৬৫
৩২. উইলিয়াম ক্যাবেন্টের অভিযান/১৬৭
৩৩. ভাইটাস বেরিং এর অভিযান/১৬৯
৩৪. স্যার জন ফ্রাংকলিন/১৭৩
৩৫. এরিক নরডেনশিল্ড/১৭৫

www.nagorikpathagar.org

৩৬. চূড়ান্ত বিজয়/১৭৬
৩৭. অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার-১৮০

মেরু অভিযান-

১. উত্তর মেরু/১৮৯
২. জন ফাংকেলিন/১৮৯
৩. ডঃ এলিস কেন্টক্যান/১৯৯
৪. চার্লস ফ্রান্সিস হল/২০০
৫. জার্মানদের অভিযান/২০১
৬. জুলিয়াস পেয়ার /২০২
৭. বেঞ্জামিন লেঘ স্মিথ/২০৫
৮. জর্জ নেয়ারস /২০৬
৯. জর্জ ওয়াশিংটন দ্যালং/২০৮
১০. ন্যানসেন/২০৯
১১. রবার্ট এডউইন পিয়েরী/২১৫
১২. দক্ষিণ মেরু/২১৯
১৩. ক্যাপ্টেন বেলিং হাউসেন/২২০
১৪. জেমস ওয়েডেল ও জন বিসকো/২২২
১৫. জেমস ক্লার্ক রস/২২৩
১৬. দ্যা গ্যারলাচি/২২৭
১৭. কর্সেটন বর্চ গ্রেভিংক২৩১
১৮. রবার্ট ফকন স্কট/২৩২
১৯. এবার ফেরার পালা/২৪৭
২০. হেনরী শ্যকলটন/২৫৫
২১. আমুণ্ডসেনের কুমেরু বিজয়/২৫৬
২২. ডগলাস ম্যাসন/২৫৮
২৩. ভূ-তাত্ত্বিক পরীক্ষা অভিযান/২৬০
২৪. এক নজরে ভৌগোলিক অভিযান/২৬৮

মহাকাশ অভিযান-

১. পাখির মতো উড়াল দিতে/২৭৪
২. মহাকাশ যাত্রার সমস্যা/২৭৪
৩. রকেট আবিষ্কার/২৭৫

www.nagorikpathagar.org

৪. রকেট হলো মহাকাশযান/২৭৭

৫. স্পুটনিক সিরিজ/২৮১

৬. ভস্টক সিরিজঃ মহাকাশে প্রথম মানুষ/২৮৪

৭. ভস্খদ্ সিরিজ/২৮৫

৮. মহাকাশ অভিযান ও যুক্তরাষ্ট্রঃ এক্সপ্লোরার/২৮৪

৯ মার্কারী সিরিজ/২৮৭

১০. জেমিনি সিরিজ/২৮৯

১১. চন্দ্রাভিযানঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন/২৯০

১২. লুনা সিরিজ/২৯০

১৩. চন্দ্রাভিযানঃ যুক্তরাষ্ট্রঃ এ্যাপোলো সিরিজ/২৯২

১৪. এ্যাপোলো-১০/২৯৫

১৫. এ্যাপোলো-১১ঃ প্রশিক্ষণ/২৯৭

১৬. এ্যাপোলো-১১ এর পরিচয়/২৯৭

১৭. এ্যাপোলো -১১ এর অভিযাত্রীগন /২৯৮

১৮. এ্যাপোলো-১১ এর যাত্রার মুহূর্ত/৩০০

১৯. চাঁদ থেকে ফেরা/৩০৩

২০. এ্যাপোলো-১২/৩০৮

২১. সোভিয়েট ইউনিয়নের মঙ্গলগ্রহ অভিযান /৩১১

২২. মারস সিরিজ/৩১২

২৩. সোভিয়েট ইউনিয়নের শুক্রগ্রহ অভিযান/৩১২

২৪. ভেনাস সিরিজ/৩১২

২৫. সোভিয়েট সয়ুট-স্যালুট সিরিজ/৩১৩

২৬. সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য সিরিজ/৩১৮

২৭. সয়ুজ-এ্যাপোলো সংযোগ/৩১৯

২৮. যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল, বুধ ও শুক্র গ্রহ অভিযান/৩২১

২৯. ভাইকিং সিরিজ/৩২২

৩০. মঙ্গলের ভবিষ্যৎ অভিযান/৩২৫

৩১. পাইওনিয়ার অভিযান/৩২৫

৩২. ভয়েজার সিরিজ/৩২৬

৩৩. মহাকাশ ষ্টেশন-'স্কাইল্যাব'/৩২৮

৩৪. স্পেস শ্যাটল (নভোখেয়াযান)/৩৩২


www.nagorikpathagar.org

# দেখাবো এবার জগৎটাকে

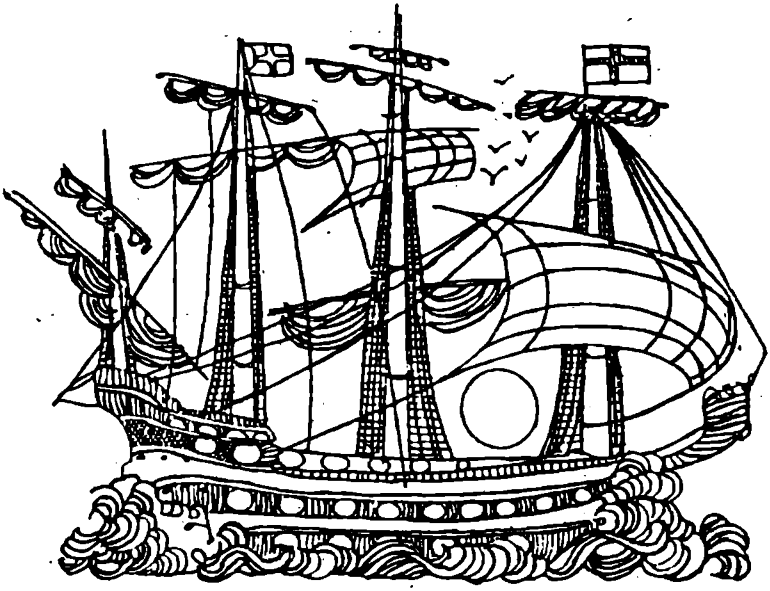



বিশ্ব—১

www.nagorikpathagar.org

# অজানাকে জানতে

জানার তো শেষ নেই। তবু মানুষ জানতে চায়। জানতে চায় অজানাকে। সে জানতে চায় তার চারপাশকে।

এই যে আমাদের মস্তবড় পৃথিবী। কত কূলহীন, কিনারাহীন সাগর, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় পর্বত, ধু-ধু বালুময় মরুভূমি, ঘন অরণ্য আর তুষারে ঢাকা ভয়ংকর কতো দেশ-এই নিয়েই তো পৃথিবী।

এর মাঝে লুকিয়ে আছে কতো বিচিত্র রহস্য, কতো অজানা কথা। এদের সকলের কথাই মানুষের জানতে ইচ্ছে করে। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করছে পৃথিবীর বিচিত্র রহস্যকে জানবার।

মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার কথাই কবি নজরুল বলেছেন এভাবে-

থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে
কেমন করে করছে তারা
বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।

পৃথিবীকে এই জানার চেষ্টা তো ঘরে বসে হয়নি। তার জন্য সাহসে ভর করে মানুষকে যেতে হয়েছে দুর্গম পথ পেরিয়ে। কেউ গিয়েছেন-তুষারঘেরা মেরু প্রান্তরের রহস্য সন্ধানে। কেউ পাড়ি দিয়েছেন কূলহীন কিনারাহীন সাগর মহাসাগর। কেউ ডুব দিয়েছেন আবার সেই সীমাহীন সাগরের অতল তলেই।

কিন্তু সে পথ তো সহজ নয়, সুগম নয়। সে পথ যেমন দুস্তর, তেমনি ভয়ংকর। প্রতি পদক্ষেপে মরণ সেখানে ওৎ পেতে বসে আছে। তবু সেই মৃত্যুর ফাঁদেই পা দিয়েছেন কতো জানা অজানা সাহসী বীর।

তবু মানুষ সেই মৃত্যুর কাছে পরাজয় মানেনি। মৃত্যুকে দু'হাতে বরণ করেই তারা হাত ভরে তুলে এনেছেন মুক্তো মানিক আর বিচিত্র সব রহস্যময় কথা। এই সব মরণজয়ী দুঃসাহসী বীরেরাই তো পৃথিবীর অনেক হাজারো অজানা কাহিনীকে পৌঁছে দিয়েছেন সভ্য জগতের কাছে। তাই তাঁদের নাম আজো ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে।

## ফিনিশিয়ানদের কথা

ভূ-মধ্য সাগরের পূর্ব তীরই বলতে গেলে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি জন্মস্থান। যীশু খৃষ্টের জন্মেরও কয়েক হাজার বছর আগেই এখানে ঘটে ছিলো সভ্যতার উন্মেষ।

সেদিন এখানে যারা বাস করতো তাদের বলা হতো ফিনিশিয়নস্ (Phoenicians)। তাদের ছিলো ছোটো ছোটো পালতোলা জাহাজ। এই পালতোলা আর দাঁড়টানা জাহাজগুলো নিয়েই তারা ভূ-মধ্যসাগরের পূর্বতীরের জনপদগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো।

তারাই প্রথম তৈরি করেছিলো ছোটো ছোটো জনবসতি, শহর আর বাণিজ্য কেন্দ্র। তারা এক পণ্যের বিনিময়ে কিনে আনতো অন্য সামগ্রী কাপড়ের বদলে চিনি, খাবারের পরিবর্তে গবাদি পশু ইত্যাদি।



www.nagorikpathagar.org

এই ফিনিশিয়রাই প্রথম ঘর থেকে বাইরে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেছিলো। জানতে চেষ্টা করছিলো তাদের এই ক্ষুদ্র জনপদের বাইরে আর কে আছে ? তাদের কি পরিচয় ?

## গ্রীকদের কথা

তারপর এলো গ্রীকরা। একদিন গ্রীক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো এবং তারাই সারা ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চলে হয়ে উঠলো সর্বময় শক্তির অধিকারী।

একদা যেখানে ফিনিশিয়ানদের জাহাজ চলতো, সেখানে এখন সাগরের বিশাল বুকে সগর্বে ভেসে বেড়ায় গ্রীকদের সাদা পালতোলা জাহাজ। তাদের বণিকরা পণ্যের ডালা সাজিয়ে পাড়ি দেয় বন্দর থেকে বন্দরে।

শুধু বণিকরা নয়, এই সময় অনেক পর্যটক ও অভিযাত্রীও দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেন বহু দূর দেশে।

গ্রীক ঐতিহাসিক-দার্শনিক হেরোডোটাস শুধু দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যেই ভূ-মধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে মিশরে এসেছিলেন। তিনি মিশরের নীল নদের উৎস জানার জন্যেও চেষ্টা করেছিলেন এবং নীলনদ নিয়ে করেছিলেন গবেষণা।

এছাড়াও অনেক গ্রীক পর্যটক উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ ভ্রমণ করে সংগ্রহ

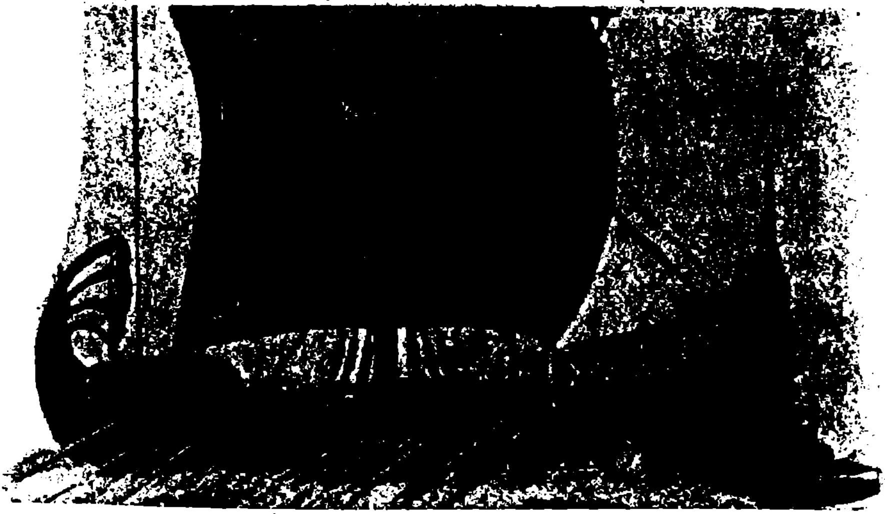

২। প্রাচীন গ্রীক জাহাজ।

করেছিলেন অনেক ঐতিহাসিক তথ্য।

গ্রীক নাবিকরা শুধু ভূ-মধ্যসাগর নয় জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে গ্রেট বৃটেন পর্যন্ত চলে এসেছিলেন বলে জানা যায়। আবিষ্কার করেছিলেন অনেক অজানা দেশ ও অঞ্চল।

এরপর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদেরও শক্তি কমে আসে। বিশেষ করে মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরই শক্তিশালী গ্রীক সম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।



www.nagorikpathagar.org

আবার উত্থান ঘটে রোমান সাম্রাজ্যের। আবার ইটালীর রোম নগরী হয়ে ওঠে ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু।

## রোমানদের কথা

রোমানরা শক্তিশালী হবার পর আবার তাদের পালতোলা জাহাজগুলো ভাসতে থাকে ভূ-মধ্য সাগরের বুকে। তাদের অভিযাত্রী দল পাড়ি জমায় দেশ থেকে দেশান্তরে। সেনাপতিরা দেশ জয়ের নেশায় ছুটতে থাকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত। রোমানরা ইউরোপের বহু দেশকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর কালের প্রভাবে এই রোমান সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। ভেঙে পড়ে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য।

এই সময় ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চলে কিছুটা রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দেয়। চারিদিকে অবিশ্বাস, রাজনৈতিক হানাহানি চলতে থাকে।

তবু এর মধ্যে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এক নতুন পরিবেশ, একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। মানুষ তখন যেনো বাঁচতে চায় পরস্পরের সহযোগিতায়। একজন জানতে চায় আরেক জনকে।

এক দেশের পণ্যের বিনিময়ে তারা সংগ্রহ করে আনে অন্য দেশের অন্য কিছু। গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এক দেশের বণিক তাদের দেশের মালামাল নিয়ে চলে আসে বহু দূরের দেশে, অন্য রাজার দেশে। সেখানেই তারা অবাধে করে ব্যবসা-বাণিজ্য।

ক্রমে ক্রমে ভূ-মধ্য সাগরীয় দেশের মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছে দূর প্রাচ্যের দেশের কথা। তারা শুনতে পায় অনেক পূর্বে আছে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। তার নাম ক্যাথে (Cathey)। যার আধুনিক নাম চীন।

ভূ-মধ্য সাগরীয় বাণিজ্য শহর ভেনিসের বণিকেরা চীনের গল্প শোনে। এদেশটি নাকি সম্পদে একেবারে ভরপুর। এদেশে আছে অনেক বড় বড় বণিক আর আছে ধনী রাজপুতেরা। তারা পরিধান করে ঝলমলে সব সিল্কের পোশাক। তাদের নাকি অনেক বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজও আছে। জাহাজগুলোর নাম জাংক (Junk)। তারাও আশেপাশের দেশের বণিকদের সাথে বাণিজ্য করে, পণ্য বিনিময় করে।

এই ক্যাথে দেশের পাশেই নাকি আছে আরো একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। তার নাম ইন্ডিয়া। সেখানে নাকি পাওয়া যায় প্রচুর মশলা। তারা গল্পে শোনে ভারতের হাজারো মশলার কথা।

তাই এই ক্যাথে দেশটি সম্পর্কে আরো বেশী কিছু জানার জন্যে ভেনিস শহরের বণিকেরা অভিযাত্রী পাঠাতে লাগলো এদিকে। ভেনিস থেকে অভিযাত্রী এলো। মাফিয়া পোলো, নিকালো পোলো এবং মার্কোপোলো। মার্কোপোলো সুদূর ভেনিস থেকে চলে এলেন চীনের সম্রাট কুবলাই খানের রাজদরবারে। কাটিয়ে গেলেন ২৩ বছর।

ভেনিসের বণিকেরা দেখলো পায় হাঁটা পথে ইউরোপ থেকে চীনে যাওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার। তাই তারা চেষ্টা করতে লাগলো ভূ-মধ্য সাগর থেকে যাত্রা করে সমুদ্র পথে সেখানে পৌঁছানো যায় কিনা।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে তাদের সে উদ্দেশ্যও সফল হলো। বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার পশ্চিম দক্ষিণ উপকূল ঘুরে অবশেষে সত্যি সত্যি এসে পৌঁছোলেন ভারতের পশ্চিম তীরের কালিকট বন্দরে। ভেনিস থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার হলো এমনি করে।



www.nagorikpathagar.org

স্পেনের দুঃসাহসিক নাবিক কলম্বাস একদিন পাড়ি দিলেন আটলান্টিক মহাসাগর। আবিষ্কৃত হলো নতুন আরেক পৃথিবী। আমেরিকা মহাদেশ।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে অভিযান চালালেন মাঙ্গোপার্ক, লিভিংস্টোন, ষ্ট্যানলী আর হ্যানিং স্পেকের মতো অভিযাত্রীরা।

এমনি করে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হলো পৃথিবীর অনেক অজানা দেশ, অজানা পথ আর মানুষ। কিন্তু সেতো এক দিনের কথা নয়। শত শত বছরে শত সহস্র দুঃসাহসী মানুষের জীবনপাতের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এ সব।

## আফ্রিকা অভিযান

এককালে আজকের আফ্রিকাকে বলা হতো–অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ (Dark Continent)। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই দেশে আগে কখনো সূর্যই উঠতো না, রাতের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো।

সে বলা হতো ভিন্ন কারণে। অনেক বছর আগে–তখনো এই মহাদেশে আধুনিক সভ্যতার প্রসার ঘটেনি। ছিলো শুধু বন আর বন। কোনো কোনো বন আবার এমন ঘন ছিলো যে, বড় বড় গাছের পাতা ভেদ করে সূর্যের আলো পর্যন্ত মাটি স্পর্শ করতে পারতো না। সত্যি সে ভয়ানক দৃশ্য। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

সেই গভীর জঙ্গলে বাস করতো ইয়াসব বড় বড় ভয়ঙ্কর সাপ–যার এক একটা আস্ত মানুষ পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে। এছাড়াও ছিলো বাঘ, ভাল্লুক, গন্ডার, সিংহ সহ কতো হিংস্র সব জন্তু–জানোয়ার।

অবশ্য মানুষও ছিলো। আফ্রিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসী। দেখতে কালো, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। ঠোঁট দুটো বড়।

সেকালে এরা চাষবাস করতো না। পশু শিকার এবং বন–জঙ্গলে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানোই ছিলো এদের কাজ। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া তখনো পায়নি তারা।

এরা ছিলো বিভিন্ন গোত্র বা দলে বিভক্ত। গোত্রের সর্দারকে বলা হতো রাজা। সবাই গোত্র– প্রধানের নির্দেশ মেনে চলতো। এদেরকে বলা হয়–গেরিলা, বুশম্যান। এরাই হলো আজকের কাফ্রি বা নিগ্রোদের পূর্বপুরুষ।

প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশের এই ঘন অরণ্য, তার মধ্যকার হিংস্র জন্তু–জানোয়ার এমনকি এদেশের মানুষ সম্পর্কেও বাইরের সভ্য জগতের মানুষের এক আজগুবি ভ্রান্ত ধারণা ছিলো। তাই কারো সাহস হতো না, একবার ভিতরে উঁকি মেরে দেখবার। বলতে গেলে আফ্রিকা সম্পর্কে মানুষের এই আজগুবি ধারণা আর ভয় থেকেই এর নাম দেয়া হয়েছিলো 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ'।

অথচ এই আফ্রিকা মহাদেশেরই একটি উপকূলীয় দেশ মিসরের সভ্যতা অতি প্রাচীন। মিসরের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন পিরামিড আর মমিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

এই আশ্চর্য পিরামিড আর মমিগুলো যাঁরা তৈরি করেছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরাও সভ্যতায় জ্ঞান–বিজ্ঞানে উন্নত ছিলেন।

অথচ কি অবাক কান্ড, তখনকার এই সভ্য মানুষেরাও সাহসে ভর করে নিজের দেশ পেরিয়ে আর একটু ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করেনি। একবার খুঁজে দেখতেও চাননি–ওখানে কি আছে, কারা আছে।

মিসরের জগৎ বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেট্রা এবং রোমান, গ্রীক সম্রাটেরাও কখনো এই



www.nagorikpathagar.org

মহাদেশটার ভিতরের খবর জানার চেষ্টা করেননি।

কিন্তু মানুষের মনের অদম্য কৌতূহল আর অসীম সাহস এই অসম্ভবকেও ধীরে ধীরে একদিন সম্ভব করে তুললো। সভ্য জগতের মানুষ মনের অনেক কৌতূহল আর সাহসকে সম্বল করে ঢুকে পড়লো এই অন্ধকারের ভিতর। কুড়িয়ে আনলো সভ্য সমাজের জন্যে অনেক বিচিত্র বিস্ময়, আর অজানা তথ্য। নিয়ে এলো অঢেল সম্পদ। তখন সভ্য জগতের মানুষ তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলো।

## আফ্রিকা অভিযানের প্রথম প্রচেষ্টা

আফ্রিকা অভিযানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা চালান সম্ভবতঃ ফিনিশার নাবিকগণ। সে প্রায় ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কথা। তাঁরাই মিসরের রাজা নেকোর আদেশে আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। জনশ্রুতি আছে অনুসন্ধান চালিয়ে এরাই নাকি প্রথম রাজা সলোমনের রত্নখনির সন্ধান লাভ করেন।

বলতে গেলে, এই থেকেই শুরু। এর পরই একজনের পর একজন সাহস করে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। আবিষ্কৃত হতে লাগলো নতুন তথ্য, নতুন দেশ, নতুন পথ। সভ্য সমাজের মানুষেরা পেলো রাশি রাশি সম্পদ।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে যাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁদেরকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এদের এক দলে ছিলো পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড ও আরব দেশীয় দাস-ব্যবসায়ীরা। তারা ভেতরে ঢুকে ছলে-বলে-কৌশলে আফ্রিকার আদিম মানুষগুলোকে ধরে আনতো জাহাজ ভর্তি করে, তারপর চড়া দামে বিক্রি করে দিতো পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশের তথাকথিত সভ্য মানুষের কাছে। সেখানেই সেই হতভাগ্য কৃষ্ণকায় নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলো সারা জীবন ধরে গরু ভেড়া ছাগলের সাথে সমান কাতারে খেটে মরতো। তারপর একদিন মরে পড়ে থাকতো ভাগাড়ে। এরা ছিলো ক্রীতদাস।

প্রথম দিকে নব আবিষ্কৃত আমেরিকাই ছিলো এই সমস্ত নিগ্রো বিক্রির বড় বাজার। তখন ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকাতে চালান দেয়া হতো হাজার হাজার নিগ্রো।

আফ্রিকা আবিষ্কারের প্রথমদিকে এই দাস ব্যবসাটা একেবারে জম-জমাট ছিলো। প্রথমদিকে বেশির ভাগ অভিযাত্রীরা এই নিগ্রো শিকারের নেশাতেই এদেশে প্রবেশ করতেন। আর এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো এর অনেক অজানা পথ আর নতুন দেশ।

এঁরা যে শুধু আদিবাসীদের ধরে আনতেই সেখানে যেতেন তা নয়, মূল্যবান সব জিনিসও লুট করে নিয়ে আসতেন তাদের কাছ থেকে। ভেতরে ঢোকার আগে ঠিক মাছ শিকারে যাবার মতোই নানা রকম টোপ নিয়ে যেতেন। এই টোপগুলো ছিলো নানা রকম আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিসপত্র। যেমন-আয়না, পুঁতির মালা, খাবার চিনি, লবণ ইত্যাদি। এসব পেয়ে আদিবাসীরা ভারী খুশি হতো। এসব দেখে ওরা অবাক হয়ে যেতো। কারণ, এগুলো ছিলো তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস।

শিকারীরা এসব জিনিস দিয়েই ওদের কাছ থেকে লুটে নিতেন সোনাদানা, হীরে-জহরত পর্যন্ত। হয়তো এক সের চিনি দিয়েই আস্ত একটা হীরের টুকরো চেয়ে নিয়ে আসতেন তারা। যার মূল্য অমন দুশো মণ চিনির চেয়েও বেশি। ব্যবসাটা কি চমৎকারই না ছিলো।



www.nagorikpathagar.org

আফ্রিকার আদি অধিবাসী নিগ্রো। এরাই ছিলো কৃতদাস ব্যবসায়ীদের শিকার।

## জেমস ব্রুসের অভিযান

কিন্তু এই সব খারাপ স্বভাবের ব্যবসায়ী ছাড়া আরো এক জাতের অভিযাত্রী ছিলেন। এরা অবশ্য অমন খারাপ লোক ছিলেন না। তাঁরা লাভের আশায় যেতেন না। তাঁদের নেশা ছিল নতুন দেশ আবিষ্কার, নতুন মানুষের সন্ধান লাভ করা। তাঁরাই ছিলেন সত্যিকার অভিযাত্রী।

এঁদের উদ্দেশ্য ছিলো এইসব অজানা-অচেনা দেশের লোকদেরকে ধর্মে বিশ্বাসী করে তোলা। তাদের মাঝে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দেয়া। এঁরা ছিলেন খৃষ্টান ধর্মযাজক। আফ্রিকা আবিষ্কারে এঁদের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য।

এমনি এক ধর্মযাজক ছিলেন জেমস ব্রুস (১৭৩০-১৭৯৪)। তিনি যেমন ছিলেন অসীম সাহসী তেমনি ছিলেন একজন মস্তবড় পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি একদিন কয়েকজন সংগী সাথী আর কিছু রসদ সাথে নিয়ে ঢুকে পড়লেন আফ্রিকার গভীর

দিনের পর দিন পাহাড়-পর্বত আর দুর্গম পথ ভেঙে চলে এলেন অনেক দূরে। একেবারে আবিসিনিয়ায়। তিনি এখানে এসে আদিবাসীদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। তাদের আদর করে কাছে ডাকলেন। শোনাতে লাগলেন ধর্মের কথা। কাফ্রিরা তো এই সুন্দর মানুষটির আরো সুন্দর সুন্দর কথা শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে



www.nagorikpathagar.org

৫। দাস ব্যবসায়ীরা নিগ্রোদের ধরে এনে বিক্রি করতো।

গেলো। সরল মনে বিশ্বাসও করলো ক্রুসের কথা।

এছাড়া কাফ্রিরা জেমস ক্রুসের অনেকগুলো কাজ দেখে একেবারে অবাক হয়ে যেতো। ওর সংগে ছিলো একটা বন্দুক। বন্দুক কাকে বলে আদিবাসীরা তো কিছুই জানে না। ক্রুসের বন্দুক চালনায় হাতের নিশানাও ছিলো আবার একেবারে অব্যর্থ।

তিনি অনেক দূরে গাছের মগডালে বসে থাকা পাখিটাকে পর্যন্ত টুপ করে গুলী করে মেরে ফেলতে পারতেন। তাই দেখে ওরা তো অবাক। লোকটা হাতের ওই অদ্ভুত জিনিসটা একটু উচুঁ করে ধরলো একটা বিকট আওয়াজ হলো আর অমনি কিনা অতো দূরের পাখিটা পড়ে মরে গেলো ?

ওরা ভাবতো লোকটা নিশ্চয়ই যাদু জানে। নইলে এমন কান্ড করে কেমন করে?



www.nagorikpathagar.org

এমনি করেই তিনি তাদের শ্রদ্ধা আদায় করলেন। কাফ্রিরা তাঁকে দারুণ শ্রদ্ধা করতে লাগলো। এমনকি আবিসিনিয়ার লোকেরা তাঁকে রাজা বলেও সম্মান করতে লাগলো।

কিন্তু তিনি যখন নীল নদের উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে যাত্রা করলেন, তখন কি কারণে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো।

তবু তিনি দমলেন না, এগিয়ে যেতেই লাগলেন। এমনি করেই আবিষ্কার করলেন অনেক নতুন স্থান, অর্জন করলেন অভিজ্ঞতা। তিনি এই অভিযানে আফ্রিকার ভিতরে প্রায় চার বছর ছিলেন।

চার বছর পরে মি. জেমস ব্রুস স্বদেশে ফিরে এসে তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে সুন্দর একখানা বইও লিখলেন। অনেক আজব কথা, আর অভিজ্ঞতায় ভরা ছিল তাঁর এই বই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, লোকেরা সেই সব কথা বিশ্বাসই করতে চাইতো না। সবাই ভাবলো, জেমস ব্রুস নিশ্চয়ই এসব আজগুবি কথাগুলো বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন। সবাইকে বোকা বানাবার ফন্দি হয়তো।

অথচ জেমস ব্রুসের অভিযানের কথাগুলো একটুকুও বানানো ছিল না। তিনি যা দেখেছিলেন, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তিনি তাই লিখেছিলেন।

## নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে মাঙ্গোপার্ক

মি. জেমস ব্রুসের এই অভিযানের আজগুবি কথাগুলো অনেকে বিশ্বাস না করলেও কারো কারো মনে কৌতূহল দোলা দিতে লাগলো। অনেকে ভাবলেন, আচ্ছা তাহলে একবার দেখাই যাক না, ব্যাপারখানা কি? জেমস ব্রুসের মতো লোক কি মিথ্যে কথা বলতে পারেন?

জেমস ব্রুসের কথা যাঁদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল তাঁদের মধ্যে একজন

মাঙ্গো পার্ক



www.nagorikpathagar.org

ছিলেন মাঙ্গোপার্ক (১৭৭১-১৮০৬)। মাঙ্গোপার্কের বাড়ী ছিল স্কটল্যান্ডে। জেমস ব্রুসের কাহিনী পড়ে তাঁর মনেও সাধ জাগলো আফ্রিকা অভিযানের।

মঙ্গোপার্কের বাবা ছিলেন এক দরিদ্র কৃষক। পার্কেরা ছিলেন তেরো ভাই-বোন। বাবার ইচ্ছে ছিলো পার্ক বড় হয়ে পাদ্রী হবে। কিন্তু পার্কের পাদ্রী হওয়াটা ভালো লাগলো না। তিনি পড়লেন ডাক্তারী পড়া।

এই সময় ইংল্যান্ডে আফ্রিকান এসোসিয়েশন (African Association) নামে একটি সমিতি ছিলো। এদের কাজ ছিলো আফ্রিকা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান এবং এর নানা অঞ্চল আবিষ্কার।

এই সময় তাঁরা আফ্রিকার নাইজার নদীর উৎস অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করছিলেন। কারণ এই সাহারা মরুভূমির নিকটস্থ নাইজার নদীর উৎস, প্রবাহ এবং এর তীরবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবরই তারা জানতেন না।

অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে এই নদীটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকলের নজর পড়লো নদীটির বিবরণ জানার জন্য। কেউ কেউ এক-আধ বার চেষ্টাও করলেন কিন্তু সফলকাম হলেন না কেউ। তাই এই সময় তাঁরা একজন অভিজ্ঞ ও সাহসী লোকের সন্ধান করছিলেন।

এই সময়েই যুবক মাঙ্গোপার্কের সাথে যোগাযোগ হলো সমিতির কর্মকর্তাদের। তাঁরা মাঙ্গোপার্ককে পছন্দ করলেন, আর মাঙ্গোপার্কের এমনি একটি দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়ার ইচ্ছে ছিলো।

মাঙ্গোপার্ক যেমন ছিলেন সাহসী তেমনি জেদী। যা একবার ভাবতেন, তা তাঁর করা চাই-ই।

সমিতির মনোনয়ন পাবার পরই তিনি যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

প্রথম প্রস্তুতি হলো-আফ্রিকার আদিবাসীদের ভাষা শিক্ষা করা। তারপর কাজ হলো তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে জেনে নেয়া। পরিশেষে জানতে হবে পথঘাটের খবরাখবর। অতঃপর তিনি শুরু করলেন পড়াশুনা। আর তথ্য অনুসন্ধানের কাজ।

তারপর তিনি ১৭৯৫ সালে একদিন সমিতির পক্ষে নাইজার নদীর উৎস অনুসন্ধানের জন্য বের হয়ে পড়লেন অভিযানে।

তিনি প্রথম এসে নামলেন জিলিফ্রি নামক স্থানে। সেখান থেকেই তিনি গাম্বিয়া নদীর স্রোত ধরে এগুতে লাগলেন উজান দিকে। তিনি এসে পৌছোলেন পিসানিয়া নামে একটি জায়গায়।

আসার পথেই তিনি খবর পেয়েছিলেন এই পিসানিয়াতেই নাকি একজন ইংরেজ পাদ্রী থাকেন। তিনি বহুদিন ধরে এখানে আছেন। ধর্ম প্রচার করছেন।

মাঙ্গোপার্ক এসে পরিচিত হলেন পাদ্রী সাহেবের সাথে। পাদ্রী সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এই নবীন অভিযাত্রীকে।

তারপর মাঙ্গোপার্কের সকল কথা জেনে তিনিও তাঁকে খুব উৎসাহ দিলেন। এবং তার সাধ্যমতো সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন।

মাঙ্গোপার্ক প্রায় দু'মাস ছিলেন এই প্রাদ্রীর এখানে। এখান থেকেই তাঁর অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। খোঁজ-খবর নিলেন আরো অনেক কিছু সম্পর্কে। জোগাড় করলেন লোকজন এবং খাদ্য-সামগ্রী। তারপর বারো জন স্থানীয় কৃষ্ণকায় নিয়ে শুরু করলেন অভিযান। যাত্রা শুরু হলো তাঁর নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে।



www.nagorikpathagar.org

১২। মাঙ্গো পার্ককে আক্রমণ করে বসলো উপজাতিয়রা

এ ছিলো বড় দুঃসাহসিক অভিযান। পথে চলার কষ্ট তো ছিলোই। তদুপরি ছিলো হাজারো বিপদ। কতোবার যে তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি পড়েও অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন, হিংস্র সিংহের সামনে পড়েও আত্মরক্ষা করেছিলেন, তার ঠিক নেই।

তবু এই হাজারো বিপদ–আপদের মধ্যেও আবার মজার ঘটনাও ঘটতো কখনো কখনো। এমনি এক মজার ঘটনা ঘটেছিলো আফ্রিকার বন্ডো (Bandu) রাজ্যে এসে।

তিনি এখানে এসে সাক্ষাৎ করতে গেলেন রাজার সাথে। রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁর জন্য নিয়ে যেতে হবে উপঢৌকন। কিন্তু কি উপহার নেয়া যায় রাজার



www.nagorikpathagar.org

১৭। নিগ্রো সাথীদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে পথ চলছে মাঙ্গো পার্ক।

জন্য?

তিনি সংগে নিলেন তামাক। কারণ তিনি এখানে আসার আগেই খবর নিয়ে জেনেছিলেন এখানকার রাজা এবং অন্যান্য লোকেরা তামাক খুব ভালোবাসেন। তারা সকলেই তামাক খেয়ে খুব মজা পায়।

আসলে তাই হলো—মাঙ্গোপার্কের তামাক পেয়ে উপজাতীয় রাজা তো মহাখুশি। তাই তিনি সাদা চামড়ার অতিথিকে খুব সমাদর করে ঠাঁই দিলেন তার দরবারে।

আসলে কিন্তু আফ্রিকার কৃষ্ণকায় লোকেরা সাদা চামড়ার বহিরাগত লোকদের খুব



www.nagorikpathagar.org

একটা সুনজরে দেখতো না। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে বসতো।

কিন্তু তামাক পেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ রাজা সেই বিদ্বেষের কথা ভুলে গেলেন। অবশ্য মাঙ্গোপার্কও নিয়ম মোতাবেক রাজাকে রাজার মতোই সম্মান দেখাতে লাগলেন।

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই ঘটলো আরেক মজার ঘটনা। মাঙ্গোপার্কের সাথে ছিলো একটি নতুন ছাতা।

ছাতা কি জিনিস রাজা এর আগে আর কোনোদিন দেখেননি। এমন মজার জিনিস তাই তাঁর ভারী মনে ধরে গেলো।

তাই একবার যখন রাজার মনে ধরে গেছে তখন কি আর রক্ষে আছে। রাজা চেয়ে বসলেন মাঙ্গোপার্কের ছাতা।

তখন আর কি করেন। ছাতাখানাও দিতে হলো মাঙ্গোপার্ককে। যদিও মরুভূমিতে চলার জন্য ছাতাখানা তাঁর খুবই প্রয়োজন ছিলো। ছাতার অভাবে তাঁর খুবই কষ্ট হবে।

কিন্তু রাজার আবদার উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। কে জানে যদি রাজা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাহলে বিপদও হতে পারে। অতএব সামান্য একটি ছাতার মায়া পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তাঁর অসুবিধা হলেও তিনি নিজের ছাতাখানা দিয়ে দিলেন বণ্ডোর রাজাকে।

কিন্তু রেহাই পেলেন না তিনি তাতেও। ছাতা পেয়ে রাজা দারুণ খুশি হলেন বটে। কিন্তু পরক্ষণেই ধরলেন আরেক আবদার।

রাজার নজর পড়লো মাঙ্গোপার্কের কালো কোটটির উপর। ওটাও চেয়ে বসলেন তিনি। অতঃপর গায়ের কোটও খুলে দিতে হলো তাঁকে।

অবশেষে তিনি কোনোমতে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। আর বেশিক্ষণ অবস্থান করলে আরো কি চেয়ে বসতেন কে জানে। রাজদরবার থেকে ছুটে পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মাঙ্গোপার্ক।

অবশ্য আরো একটা ব্যাপার– রাজাও তাঁকে খালি হাতে বিদায় করেননি। তিনি যেমন মাঙ্গোপার্কের তামাক, ছাতা আর গায়ের কোট পেয়ে খুশি হয়েছিলেন, তেমনি রাজাও তাঁকে দিয়েছিলেন প্রচুর ইনাম।

রাজা খুশি হয়ে মাঙ্গোপার্ককে দিয়ে দিলেন একতাল সোনা। যা তামাক, ছাতা আর কোটের মূল্যের চেয়েও হাজার গুণ বেশী।

এমনি করে আরো একবার এক মজার রাজার পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো মাঙ্গোপার্ককে। সেখানেও তাঁকে প্রায় হতে হয়েছিলো সর্বস্বান্ত।

সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন এক কাফ্রী রাজ্যে। এদেশের মানুষের গায়ের রঙ তো কুচকুচে কালো। তারা কখনো সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি। মানুষের গায়ের রঙ অমন ধবধবে সাদা হয় কেমন করে, তা তারা ভাবতেই পারেনি।

তাই মাঙ্গোপার্ক যখন সে রাজ্যে গিয়ে পৌঁছোলেন তখন এই আজব রঙের মানুষটিকে দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগলো কাফ্রিরা দলে দলে।

শুধু সাধারণ মানুষ নয়। এই আজব রঙের মানুষটিকে দেখার জন্য ছুটে এলেন রাজা এবং তাঁর রাণীরা পর্যন্ত।

তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মাঙ্গোপার্কের দিকে। কেউ কেউ তাঁর গা ঘষেও দেখতে লগলো। এগুলো সত্যি সত্যি গায়ের রঙ কিনা। নাকি গায়ে সাদা রঙ মাখানো হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বারবার ঘষে ঘষেও যখন রঙ ওঠে না, তখন তাদের বিশ্বাস হলো সত্যি এটা গায়েরই রঙ।

তখন তারা বলতে লাগলো–নিশ্চয়ই জন্মের পর মা তাকে দুধে চুবিয়ে রাখতেন।

কিন্তু সবখানেই যে এমন মজার মজার ঘটনা ঘটতো তা নয়। মাঙ্গোপার্কের ভাগ্য এতো সুপ্রসন্ন ছিলো না।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই তিনি পড়লেন এক দুর্দান্ত আদিবাসী সর্দারের সামনে।

এই সর্দার জানতে পেরেছিল এইসব সাদা চামড়ার লোকগুলো নাকি ভীষণ চালাক আর দুষ্টু হয়। এরা নাকি আদিমবাসীদের সুযোগ পেলেই ধরে নিয়ে যায়। এ ব্যাটাও নিশ্চয়ই এই মতলবেই ঘুরঘুর করছে। নিশ্চয়ই তাদের ধরতে এসেছে।

আর কি? অমনি সবাই রৈ-রৈ করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাঙ্গোপার্কের অভিযাত্রীদের উপর। নিয়ে গেলো সব লুটপাট করে।

শুধু তাই নয়, দলের কয়েকজনসহ মাঙ্গোপার্ককেও ওরা ধরে নিয়ে গেলো হাত-পা বেঁধে।

আদিম সর্দার ঠিক করলেন এই ভয়ংকর সাদা চামড়ার লোকটাকে আগামীকালই মেরে ফেলা হবে। এরা ছাড়া পেলেই আবার লোক ধরে নিয়ে যাবে।

আদিবাসীদের এই হত্যার দৃশ্য যেমন ছিলো নিষ্ঠুর, তেমনি ভয়াবহ। নিয়ম ছিলো কোনো ব্যক্তি সর্দারের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে নির্জন স্থানের একটি বড় পাথর খন্ডের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখা হবে। আর একটু দূরে দাঁড়ানো কয়েকজন তাগড়া জোয়ান লোক পাথরের খন্ড হাতে তৈরি থাকবে। সর্দারের হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সংগেই ওরা সেই পাথরের উপর শুয়ে থাকা লোকটার উপর ছুঁড়তে থাকবে পাথর। এভাবে পাথর ছুঁড়ে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে।

সর্দারের বিচারে মাঙ্গোপার্কেরও একই শাস্তি হলো। তবু তিনি ঘাবড়ালেন না। ভাবতে লাগলেন কি করে এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাঁকে যে বাঁচতেই হবে। মুক্তি পেতে হবে। এখনো যে কিছু দেখাই হলো না এদেশের। অভিযানের তো এখনো অনেক পথ বাকী।

তিনি আকারে, ইঙ্গিতে, ভাষায় যতো দূর পারলেন বোঝাতে চেষ্টা করলেন সর্দারকে। তারা কোনো কুমতলবে এখানে আসেননি। তিনি শুধু তাদের দেশ দেখতে এসেছেন। তাদের কথা জানতে এসেছেন। তিনি তাদের এই অজানা কথা পৌঁছে দেবেন সভ্যজগতের মানুষের কাছে। তিনি তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না।

কিন্তু কিছুই হলো না। মাঙ্গোপার্কের মুক্তির সকল চেষ্টাই বিফলে গেলো। সর্দার কিছুতেই ওঁর কথা বুঝলো না, বা যেটুকু বুঝলো তাও বিশ্বাস করলো না।

তবু হতাশ হলেন না মাঙ্গোপার্ক। ফন্দী আটতে লাগলেন কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তির জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

অবশেষে এক বুদ্ধি খেলে গেলো মাথায়। তিনি তাঁর দু'জন সাথীকে বললেন– 'এসো আমরা মরার ভাণ করে পড়ে থাকি। দেখা যাক তাতে ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কিনা।'

যেই কথা সেই কাজ। ওঁরা তিনজনেই মরার মতো পড়ে রইলেন। নড়েও না, চড়েও না। ওরা এসে হাত ধরে টানে। ওদের ভাষায় চেঁচামেচি করে ডাকে। কিন্তু কোনো সাড়া নেই।



www.nagorikpathagar.org

সর্দার এসে দেখলেন, তাইতো যে লোকগুলোকে কাল খুব মজা করে মারবে বলে ঠিক করে রেখেছিলো আজ তারা কিনা নিজেরাই মরে গেলো? এতো বড় সখের খেলাটা এমনি করে মাটি হলো? কিন্তু কি আর করা যাবে। সর্দার হুকুম দিলেন তাহলে ব্যাটাদেরকে দুই ঠ্যাং ধরে টেনে ওই নদীর ধারে ফেলে দিয়ে আয়। এক্ষুনি বাঘ বা সিংহ এসে খেয়ে যাবে মজা করে। বাঘ-সিংহের পেটেই যাক।

তখন কয়েকজন তাগড়া জোয়ান লোক এসে ওদের ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো নদীর তীরে। তারপর ওদের গায়ে রাগে, আফশোসে বার কয়েক ওয়াক-থু দিয়ে ওঁরা চলে গেলো নিজের ঘরে।

এদিকে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই ওঁরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে হাত-পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এমনি সময় ঘটলো আরেক অঘটন।

ঘোর জংগলে ঘেরা রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথা থেকে একটা হিংস্র জানোয়ার এসে টুক করে তাঁর ডান পাশ থেকে একজনকে ধরে নিয়েই পালিয়ে গেলো। বেচারী একটু চিৎকার দেবারও ফুরসত পেলো না।

মাঙ্গোপার্ক নিজেও অন্ধকারে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ভারী ভয় ঢুকে গেলো তাঁর মনে। ভ্যাগ্যিস জন্তুটা তাঁকেই ধরে নিয়ে যায়নি। এতো করেও হয়তো শেষ রক্ষা হলো না।

তিনি তখন প্রায় মরিয়া হয়ে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে হাতের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠলেন। কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ রইলো না তাঁর। অন্ধকারেই হাতে ঠেকলো এক মস্তবড় গাছ। তিনি তরতর করে উঠে পড়লেন সেই গাছের উপরে।

সারারাত গাছের ডালেই কেটে গেলো। তারপর ভোর রাতে যখন চারদিকে একটু ফর্সা হয়ে এলো, তখন সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর শেষ সাথীরও প্রায় অধিকাংশই উধাও। অর্থাৎ তাঁর শরীরের অধিকাংশই কে যেনো খেয়ে নিয়েছে, পড়ে আছে শুধু ক'খানা শক্ত হাড়, ছেঁড়া কাপড়- চোপড় আর ঘাসের উপর চাপ চাপ রক্ত।

গাছ থেকে নেমে এলেন মাঙ্গোপার্ক। শেষ সাথীটির জন্য তাঁর বুক চিরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিন্তু বসে বসে দুঃখ করার সময় হাতে নেই। তাঁকে বাঁচতে হবে, বাঁচতে হলে পালাতে হবে। নইলে আবার কোন্ বিপদ হয় কে জানে?

এদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁর নিজের শরীরও ভীষণ দুর্বল।

তবে কি তিনি ফিরে যাবেন? তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে? কিন্তু তাও তো হতে পারে না। এতো দূর এসে তিনি কিছুতেই ফিরে যেতে পারেন না।

তাঁকে এগোতেই হবে। নাইজার নদীর উৎস তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। ফিরে গেলে চলবে না। সামনে ঘন জংগল, গভীর অরণ্য, অচেনা পথ, সঙ্গী সাথীরা মৃত। সাথের রসদও নিঃশেষ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সাহসী আর জেদী লোকটি দমলেন না।

পথের দু'পাশের কাঁটা জংগল আর হিংস্র জন্তুদের সাথে একাই লড়াই করতে করতে তিনি নাইজার নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

এই দুঃসাহসী অভিযানে মাঙ্গোপার্ক এমনি আরো কতোবার কতো বিপদে যে পড়েছিলেন তার হিসেব নেই। এসব কথা তিনি তাঁর বুক পকেটে লুকানো সর্বক্ষণের সংগী ডায়রির পাতায় লিখে রেখেছিলেন।

তাঁর পূর্বের অভিযাত্রী জেমস ব্রুসের যে বিচিত্র কথা তাঁর কাছেও আজগুবি বলে মনে হয়েছিলো, এখন দেখা যাচ্ছে-তাঁর নিজের কাহিনী তাঁকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।



www.nagorikpathagar.org

সর্বস্ব হারিয়েও গভীর জঙ্গলে এগিয়ে যাচ্ছে মাঙ্গো পার্ক।

এই একাকী দুর্বার যাত্রায় ঘন অরণ্যের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর গায়ের জামা, পায়ের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিলো, মুখে অনেক দিনের না কামানো দাড়ি, গায়ের ছেঁড়াফাটা কোট সব মিলিয়ে তাঁকে প্রায় পাগলের মতো দেখাচ্ছিলো।

কিন্তু তবু তিনি দমেননি। এভাবেই তিনি পাগলের বেশে হাঁটতে হাঁটতে মাইলের পর মাইল চলে এসেছিলেন। অবশেষে তাঁর অভিযান সার্থক হয়েছিলো। তিনি নাইজার নদীর উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন।

তিনি আবিষ্কার করলেন–নাইজার নদী পশ্চিমে না গিয়ে ঘুরে পূর্ব- মুখো হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

তাঁর এই নদী দেখার কথা শুনে আদিম অধিবাসীরা একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। বিস্ময়ে তারা একেবারে থ' হয়ে গিয়েছিলো। লোকটা বলে কি? শুধু নদী দেখতে এতোদূর থেকে, এতো বিপদ মাথায় নিয়ে কেউ আসে?

সবাই তাঁকে ঘিরে বলতে লাগলো–কিগো ধলা মানুষ? তোমাদের দেশে কি নদী নেই? শুধু নদী দেখতে এতোদূর এসেছো? নিশ্চয়ই তুমি আস্ত একটা পাগল।

এই অভিযান থেকে ফেরার পথেই তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিনের অনাহার, পথ হাঁটার ক্লান্তি–আর অনিদ্রায় মাঙ্গোপার্কের মতো দুর্দান্ত লোকও কাবু হয়ে পড়লেন।

তিনি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তবু তাঁর ভাগ্য ভালো। সেই সময় একদল ব্যবসায়ী ইউরোপীয়-দাস নিগ্রো শিকারের আশায় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। পথে যেতে যেতেই তারা থমকে দাঁড়ালো।

দেখলো, ঘন জংগলের মধ্যে একটা লোক শুয়ে আছে। দেখতে একেবারে বদ্ধ পাগলের চেহারা।

গায়ের কোট ছেঁড়া ময়লা। ডান পায়ের জুতো তো দূরের কথা, মোজাটারও অর্ধেকটা উধাও। বাঁ পায়ে জুতোর খানিকটা অংশ তখনো লেগে আছে।

লোকটা কে?

নিশ্চয়ই তাদেরই মতো অভিযাত্রী। হয়তো সঙ্গী সাথীরা ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু লোকটা যে এখনো বেঁচে আছে।

ওরা মাঙ্গোপার্ককে নিয়ে এলো ওদের জাহাজে। অনেক চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষায় প্রায় একমাস পর ভালো হলেন মাঙ্গোপার্ক।

তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। সকল কথা খুলে বললেন। এই জাহাজে করেই তিনি আবার স্কটল্যান্ডে ফিরে এলেন। এই অভিযানে গিয়ে মাঙ্গোপার্ক প্রায় দু'বছর কাটিয়ে এসেছিলেন গভীর অরণ্যে।

স্বদেশে ফিরে এসে সভ্য সমাজের কাছে তিনি তুলে ধরলেন সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

এরপর তিনি কয়েক বছর দেশেই কাটালেন। বিয়ে করে সংসারীও হতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু সংসারে তাঁর মন টিকলো না।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যের সেই ভয়াবহ বৈচিত্র, সেই অচেনা পথ, পথের বাঁকে ভয়ংকর জন্তুদের হিংস্র থাবা, আদিম মানুষগুলোর কথাবার্তা, সবই যেনো তাঁকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো।

শত চেষ্টা করেও তিনি আফ্রিকাকে ভুলতে পারলেন না। ঘরে তাঁর মন টিকলো না।

অবশেষে সত্যি সত্যি আবার একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। পা বাড়ালেন আফ্রিকার ঘন অরণ্যের দুর্গম পথে।

দ্বিতীয়বারের এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলো মোট ৪৫ জন। আরো ছিলো খ বার ও রসদ বহনকারী কয়েকটি ঘোড়া আর গোটা দশেক বাঘা কুকুর.

এই নিয়ে আবার তিনি সাহসে ভর করে ঢুকে পড়লেন আফ্রিকার গভীর বনে।

এবার তিনি টিমবাবটুর নামক স্থানের প্রায় ২০০ মাইলের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন আরো কয়েকটি জনপদ।



www.nagorikpathagar.org

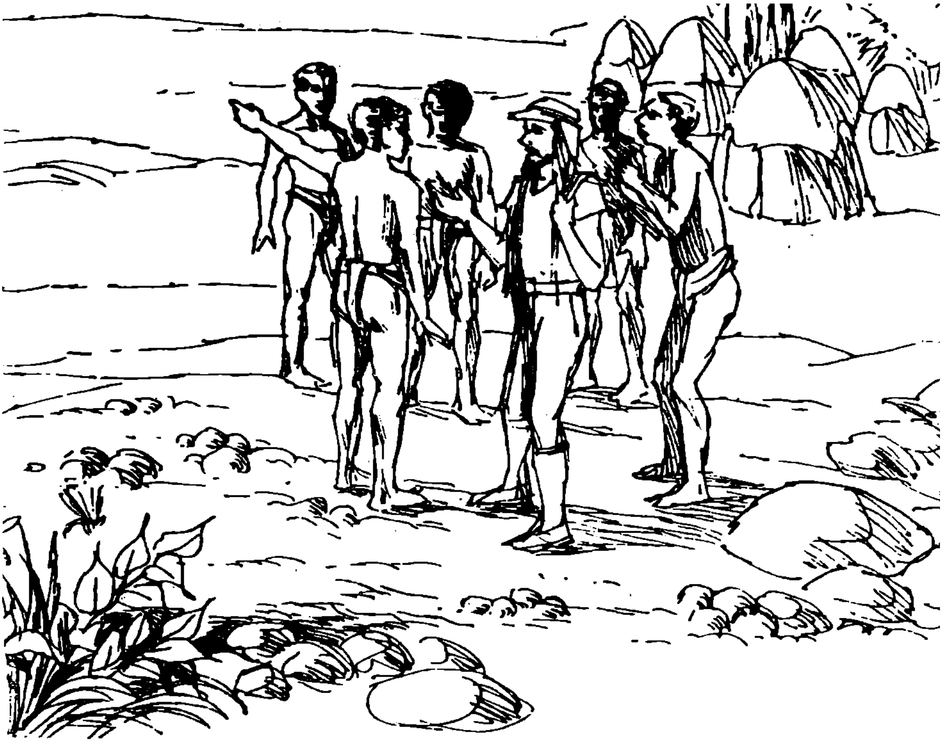

নাইজার নদীর উৎস মুখে মাঙ্গো পার্ক। সাথে রয়েছে স্থানীয় নিগ্রোরা।

এবারও তিনি প্রথমবারের মতো পড়েছিলেন ভয়ানক ভয়ানক সব বিপদের সামনে। অভাব দেখা দিয়েছিলো খাদ্যের। তবু তিনি দমেননি। সাহসে ভর করে এগিয়েই গেছেন।

এই অভিযানে তাঁর ৪৫ জন সাথীর মধ্যে মাত্র ৭ জন প্রাণ নিয়ে স্বদেশ ফিরতে পেরেছিলো।

কিন্তু স্বয়ং মাঙ্গোপার্ক আর ফিরে আসেননি। তাঁর সংগী সাথীরা তাঁকে ফেলেই চলে এসেছিলো।

স্যানসান্ডিক থেকে তাঁর ডায়রি আর অন্যান্য নকশা জাতীয় কাগজপত্র ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

তাঁর মৃত্যু কোথায় কবে আর কিভাবে হয়েছিলো, তা কেউ বলতে পারে না। এ নিয়ে নানা মত। কেউ বলেন তিনি একাই নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করে কোথাও বেঘোরে পড়ে মারা গেছেন।

কেউ বলেন বসা নামক স্থানে নাইজার নদীর তীরে স্থানীয় জংলীদের হাতে পড়ে মারা গেছেন।

সত্যি সত্যি কেমন করে এই অসীম সাহসী বীর অভিযাত্রী মাঙ্গোপার্ক মারা গেছেন তা আজো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।



www.nagorikpathagar.org

এরপরও অভিযান চলতেই থাকলো একের পর এক। যতোই লোকজন যেতে লাগলো ততই নতুন নতুন কথা, নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হতে লাগলো।

আর মানুষেরও কৌতূহল বাড়তে লাগলো দিন দিন। আফ্রিকাকে জানার নেশায় মানুষ উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমেই।

মাঙ্গোপার্কের দুঃসাহসিক অভিযানের পরই যার নাম করতে হয় তিনি হলেন মি. রবার্ট মোফাট ( ১৭৯৫-১৮৮৩)। তিনিও ছিলেন একজন ধর্মযাজক।

রবার্ট মোফাটের উদ্দেশ্য নতুন দেশ বা নতুন পথ আবিষ্কার নয়, বরং সেই অচেনা-অজানা দেশের আদিম আর অশিক্ষিত লোকগুলোকে মানুষ করে তোলা। তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো আর ধর্মের বাণী পৌঁছে দেওয়া।

তিনি তাঁর অভিযান শুরু করেন আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে।

একদিন কয়েকজন সংগী সাথী আর কিছু রসদ নিয়ে এই ধর্মপ্রাণ লোকটি রওনা হলেন কেপটাউন থেকে।

যাত্রা শুরু হলো দক্ষিণ উপকূল থেকে উত্তর দিকে। দেশের অভ্যন্তরে গভীর বনের পথে।

কেপটাউন থেকে যাত্রার ঠিক দিন কয়েক পরেই তাঁর সাথে দেখা হলো অন্য এক যুবকের-তিনি ছিলেন বুয়র। বলাবাহুল্য, ওলন্দাজ জাতীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীকে বলা হতো বুয়র।

প্রকৃতপক্ষে এরাও ছিলো দাস ব্যবসায়ী। এরা দেশের সরকারী সাহায্য নিয়ে এইসব দূর দেশে ঘুরে ঘুরে নতুন দেশ বা স্থান তাদের দেশের সরকারের নামে দখল করতো। তারপর সৃষ্টি করতো উপনিবেশ।

আর সুযোগ পেলেই আফ্রিকার নিগ্রোদের ধরে ধরে জাহাজ ভর্তি করে বিদেশে মোটা টাকার বিনিময়ে চালান দিতো।

এই বুয়রের খামার বাড়ীতেও ছিলো অনেকগুলো নিগ্রো ক্রীতদাস। তিনি এদেরকে ধরে এনেছেন গভীর অরণ্যের দূর অঞ্চল থেকে। তিনি তাদেরকে অসম্ভব খাটুনি খাটাচ্ছেন। এবং মওকা পেলেই বিদেশে চালান দেবার চেষ্টায় আছেন।

দু'বেলা পেটপুরে খেতে পর্যন্ত দিচ্ছেন না তিনি লোকগুলোকে।

এসব দেখে ধর্মপ্রাণ রবার্ট মোফাট -এর প্রাণ কেঁদে উঠলো।

এই মানবতার অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন-এখান থেকেই শুরু করবেন তাঁর অভিযান। যেই ভাবা সেই কাজ।

তিনি বুয়রের ঘরের সব নির্যাতিত নিগ্রোদের ডাকলেন। ব্যবস্থা করলেন প্রার্থনা অনুষ্ঠানের। আর শোনাতে লাগলেন খৃষ্ট ধর্মের বাণী। ধর্মের কথা, যীশুর কথা, ঈশ্বরের কথা, আর পাপ পুণ্যের কথা। সেই সাথে বুয়রের অন্যায়-অত্যাচারের কথাও তিনি বোঝালেন তাদেরকে।

এই ভাবেই শুরু হলো তাঁর ধর্ম প্রচার অভিযান। এবং এভাবেই তিনি ক্রমাগত পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। আর ক্রমাগত বাড়তে লাগলো তাঁর শিষ্যের সংখ্যা। এই অভিযানে অগ্রসর হতে হতে তিনি প্রায় গ্রেট নামাকোল্যান্ডের উপর মরুভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন অনেক অজানা পথ আর নিগ্রো



www.nagorikpathagar.org

আদি অধিবাসীদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন রবার্ট মোফাট।

বসতি।

অবশেষে তিনি বোটসাওয়ানার কুরমান নামক স্থানে এসে তাঁর অগণিত নিগ্রো ভক্তদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসে গেলেন। ধীরে ধীরে তিনি সেখানকার জংলী মানুষদেরকে ধর্মের কথা শুনিয়ে সভ্য করে তুলতে লাগলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই বিপুল সাফল্যের কথা সারা পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়লো।



www.nagorikpathagar.org

# ডেভিড লিভিংস্টোনের অভিযান

ধর্মযাজক রবার্ট মোফাটের এই বিরাট সাফল্য ও আদর্শ স্কটল্যান্ডের অনেকের মনেই শ্রদ্ধা আর উৎসাহ জাগতে সক্ষম হলো। তখন অনেকেরই সাধ হলো রবার্ট মোফাটকে অনুসরণ করার। এমনি একটি মহান আদর্শ স্থাপন করার। অতঃপর অনেকেই তাঁর পথ অনুসরণে এগিয়ে এলেন।

এদের মধ্যে যাঁর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন মি. ডেভিড লিভিংস্টোন (১৮১৩-১৮৭৩)।

সত্যিকথা বলতে কি, আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যাঁরা পৃথিবী জোড়া নাম, যশ অর্জন করেছিলেন মি. ডেভিড লিভিংস্টোন হলেন তার মধ্যে প্রথম সারির ব্যক্তি।

অথচ প্রথম জীবনে তিনি খুবই সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। স্কটল্যান্ডের এক কাপড়ের কলে নিম্ন বেতনভোগী শ্রমিক ছিলেন তিনি।

কাপড়ের কলে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি। কিন্তু লিভিংস্টোনের মনোবল ছিলো অসীম। সারাদিনের অমানুষিক খাটুনির পরও ঘরে বসে রাত জেগে পড়াশুনা করতেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিলো অসীম।

বিশেষ করে তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। ধর্মের প্রতি ছিলো তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস।

তাই তিনি যখন রবার্ট মোফাটের বিরাট সাফল্যের কথা শুনলেন, তখন তাঁর মনও দোলা দিয়ে উঠলো।

তাঁর মনে হলো তিনিও যদি রবার্ট মোফাটের মতো অমন পুণ্যের কাজ করতে পারতেন! যদি পথভোলা আদিবাসীদের ধর্মের অমিয় বাণী শুনিয়ে স্বপথে আনতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই যীশু তাঁর প্রতি খুশি হতেন। আর তিনিও মনে শান্তি পেতেন।

এই চিন্তা ক্রমে তাঁর মনে দানা বাঁধতে শুরু করলো। অবশেষে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন। আর এমনি করেই তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেল।

তবে প্রথমে তিনি ধর্মপ্রচার করার জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে না গিয়ে চীন যাবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো তিনি চীনে গিয়েই ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করবেন।

কিন্তু লিভিংস্টোনের চীনে গিয়ে ধর্মপ্রচার করা হয়নি। কারণ এই সময়েই চীনে এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়।

অতঃপর চীন যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো তাঁকে।

শেষে তিনি রবার্ট মোফাটের জায়গা অর্থাৎ আফ্রিকার দিকেই রওনা দিলেন। আফ্রিকা অভিযানে যাত্রা শুরু করেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি সংগে নিলেন দশটি ষাঁড় এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র।

আফ্রিকায় উপস্থিত হয়ে ভিতরে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই তিনি বাধা পেলেন ওলন্দাজ বুয়রের কাছে।

আসলে এই ওলন্দাজ বুয়রগুলো ছিলো শয়তানের এক একটা চেলা। এদের আসল কাজই হলো এদেশের আদিবাসীদের ঠকিয়ে দেশ দখল করা। ধন-সম্পদ লুটপাট করা, নিগ্রো শিকার করা।



www.nagorikpathagar.org

সিংহের সাথে লড়াই করছেন লিভিংষ্টোন।

বুয়ররা দেখলো এইসব ধর্ম যাজকেরা এসে স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে মিশে তাদেরকে ধর্মের কথা শুনিয়ে, জ্ঞানের কথা শুনিয়ে, শুনিয়ে চালাক বানিয়ে ফেলেছে।

এটা তো মুশকিলের কথা। লোকগুলো যদি চালাক হয়ে যায়; তাহলে ওদের ঠকিয়ে মাত্র এক সের চিনি দিয়ে আস্ত একটা হীরে আদায় করা যাবে না। তবে তো ব্যবসায়ে একেবারে ভরাডুবি।

এই পাদ্রী লোকগুলো তাদের সর্বনাশ করছে। তাদের এমন জমজমাট ব্যবসাটা মাটি করে দিচ্ছে।



www.nagorikpathagar.org

এর আগে রবার্ট মোফাট-এর নেতৃত্বে এতোগুলো আদিবাসী আজ চাষাবাদ করা শিখছে, ওরা আজ ধর্মের কথা বলে চালাকও হয়ে গেছে রীতিমতো। তাতেই ওদের ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়েছে। আবার যদি এ লোকটাও তেমনি শুরু করেন, তবে তো সব ফেলে পাততাড়ি গুটাতে হবে। তাই কি কখনো হয়? এতোবড় ক্ষতি সহ্য করা যায়?

তাহলে এই লোকগুলোই যাতে এখানে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু লিভিংস্টোন বাধা পেয়েও দমলেন না। তিনি এসব শয়তান লোকগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে আরো উত্তরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তার আশা ছিল আফ্রিকায় তিনি যখন এসেই পড়েছেন, তখন রবার্ট মোফাট সাহেবের সাথেও একবার দেখা করতে যাবেন। তিনি তো এখনো কাজ করছেন। তাঁর নাম তিনি শুনেছেন। তাঁর বইও পড়েছেন। শুনেছেন তাঁর আফ্রিকা অভিযানের চাঞ্চল্যকর কাহিনী। কিন্তু চোখে তখনো দেখেননি।

এমন মহাপুরুষকে দেখতেই হবে একবার। শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই অচেনা-অজানা ভয়ংকর দেশে চলাফেরার বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশও পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরে রবার্ট মোফাটের বাড়ীতে যাওয়ার পথেই তিনি আবিষ্কার করেন এখামি নামে এক হ্রদ। যার কথা লোকে জানতো না আগে কখনো।

রবার্ট মোফাটের সাথে দেখা সাক্ষাতের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আফ্রিকার পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে মাঝ বরাবর অভিযান চালাবেন।

এতোদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সাহস তখনো কারো হয়নি। কিনার ধরে হয়তো নদীর উৎসমুখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক দূর ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। কিন্তু এই বনজঙ্গল আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা ভয়ংকর দেশটার মাঝ বরাবর যাবার দুঃসাহস তখনো কারো হয়নি।

কিন্তু ডেভিড লিভিংস্টোন এমনি একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যাবার জন্যই মনস্থির করে ফেললেন।

কারো বাধা তিনি মানলেন না। কারণ অজানাকে জানবার একটা প্রবল নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। তাঁর মনোবলও ছিলো অসীম।

অজানা পথ ধরে রাতের পর রাত দিনের পর দিন তিনি চলতে লাগলেন।

চারপাশে ভয়, নিবিড় অরণ্য। তারই মাঝে জংলীদের বাস। এছাড়াও আছে রোগ বালাই। অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তেই তিনি এক ভয়ংকর বিপদের মাঝে পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু এসব জেনেও তিনি সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন দুর্বার গতিতে।

তিনি শুধু যে ধর্মযাজক ছিলেন তাই নয়। চিকিৎসা বিদ্যাও জানা ছিলো তাঁর।

পথে আদিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলেই তিনি তাঁর মধুর ব্যবহারে আর সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতেন।

সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের কাউকে ডেকে কাছে বসাতেন। ভালো ভালো কথা শোনাতেন। অসুখ-বিসুখ করলে আষুধ দিয়ে ভালো করে দিতেন। এমনি করেই তিনি অনেকটা রবার্ট মোফাটের আদর্শ অনুসরণ করে এগোতে লাগলেন। এমনি করেই ঘটলো সেই বিখ্যাত ঘটনাটি।

তিনি জাম্বেজী নদীর তীর ধরে অগ্রসর হতে হতেই সহসা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে শুনতে পেলেন বিকট গর্জন। তিনি থমকে দাড়ালেন।



www.nagorikpathagar.org

লিভিংস্টোনের আবিষ্কৃত ভিক্টোরিয়া জল প্রপাত

তাঁর সাথে কয়েকজন আদিবাসী ছিলো; ওরা সাহেবকে ওই শব্দ সম্পর্কে আকারে ইংগিতে কি বোঝাতে লাগলো। কিন্তু লিভিংস্টোন কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে কৌতূহল বেড়ে গেলো। এ কিসের শব্দ?

তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করে পথ চলতে লাগলেন। তারপই তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন এক পরম আশ্চর্য বস্তু।

একটা অনেক উঁচু আর প্রকান্ড পাহাড়ের গভীর খাদ থেকে বিপুল বেগে রাশি রাশি জল গড়িয়ে নামছে কয়েকশ' ফুট নিচে। এ হলো তারই বিকট আওয়াজ। ৪৩০ ফুট উঁচু থেকে জল গড়িয়ে নামছে নিচে।

–তাহলে এটা জলপ্রপাত? আনন্দে লিভিংস্টোন যেনো আত্মহারা হয়ে গেলেন।

ডেভিড লিভিংস্টোন এই যে জলপ্রপাতটা আবিষ্কার করলেন এটাই পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত এবং এটারই নাম হলো আফ্রিকার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।



www.nagorikpathagar.org

ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম অনুসারে এই জলপ্রপাতটির নামকরণ করা হয়েছে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

ডেভিড লিভিংস্টোন আফ্রিকা অভিযানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারই হলো এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার।

তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যই আজো তিনি ভুবনবিখ্যাত হয়ে আছেন। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কাছে ডেভিড লিভিংস্টোনের একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপই এটা করা হয়েছে। এখনো সে প্রস্তর মূর্তি আছে। তাঁর প্রথমবারের অভিযানে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কারের পরই ১৮৫৮ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

সারা দেশে তখন তাঁর নাম আর বিখ্যাত আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর কয়েক বছর তিনি দেশেই বাস করলেন। কিন্তু আফ্রিকার মানুষ, সেই জংলী সহজ সরল মানুষগুলোর কথা সহজে ভুলতে পারলেন না।

হয়তো এই স্নেহের মায়াতেই তিনি সভ্য জগৎ ছেড়ে আবার চলে এলেন আফ্রিকার জংগলে। আবার তিনি মিশে গেলেন এই সরল লোকগুলোর সাথে। জংলীগুলো আবার এসে ভিড় করে দাঁড়ালো তাঁর পাশে।

কিন্তু শরীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এই দ্বিতীয় অভিযানে তেমন সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। ১৮৬৬ সালে আবার ফিরে এলেন দেশে।

আফ্রিকার আবহাওয়া তাঁর শরীরকে ক্রমশঃ খারাপ করে তুললো। তদুপরি দিনরাত পরিশ্রম, পথহাঁটার ক্লান্তি-সব মিলিয়ে তাঁকে কাহিল করে তুললো।

তবু তিনি তাঁর এই অভিযানে সভ্য সমাজকে যে কথা জানাতে সক্ষম হলেন; তাহলো এই যে, আফ্রিকার গভীর বনে শুধু ক্রীতদাসই কিনতে পাওয়া যায় না, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

এছাড়াও এই দ্বিতীয় অভিযানে তিনি আরো দুটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এগুলো হলো শিওরা এবং নারাশা নামের দুটি হ্রদ।

দ্বিতীয়বারের অভিযানে তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায় আট বছর ছিলেন।

তিনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ছাড়িয়েও কাজেম্বী নদীর তীর ধরে আরো অগ্রসর হয়েছিলেন।

এরপর তিনি একটি জাহাজে করে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের বোম্বাই শহরে চলে আসেন।

বোম্বাইয়ে কিছুদিন অবস্থানের পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

স্বদেশে বছরখানেক অবস্থান করার পর, পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আফ্রিকায় ফিরে আসেন।

দ্বিতীয়বারের অভিযানে শারীরিক অসুস্থতার জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও তিনি আফ্রিকার মধ্যদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেননি।

এবার তাই তিনি তৃতীয়বারের অভিযানে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি লন্ডন থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করে আফ্রিকার জাঞ্জিবার শহরে পৌছোলেন ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে।

এখান থেকে একটানা তিন মাস পায়ে হাঁটার পর তিনি এপ্রিল মাস নাগাদ গিয়ে আফ্রিকার মধ্যভাগে পৌছান।

তাঁর এই অভিযান যেমন ছিলো কষ্টসাধ্য, তেমনি ছিলো দুঃসাহসিক। এই



www.nagorikpathagar.org

অসুস্থ লিভিংস্টোনকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় নিগ্রোরা

ক'মাসের দীর্ঘ ভ্রমণে কতবার যে তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে–তার হিসেব নেই।

তাই এতো কষ্ট তাঁর শরীর সহ্য করতে পারলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই লিভিংস্টোন অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এই সময়েই ঘটলো আরেক বিপদ। একদল দাস ব্যবসায়ী তাঁর সাথে শত্রুতা করতে শুরু করে দিলো।



www.nagorikpathagar.org

অবশ্য ঘটনাটা একান্তই স্বাভাবিক। তিনি আফ্রিকার আদিবাসীদের মাঝে যেভাবে ধর্মের বাণী শোনাচ্ছিলেন, তাদেরকে ভালোবেসে কাছে ডেকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন, তাতে দাস ব্যবসায়ীরা তাঁকে কোনোমতেই সুনজরে দেখতে পারে না।

এই দাস ব্যবসায়ীরা প্রথমে লিভিংস্টোনকে তাঁর কাজে বাধা দিতে লাগলো। এসব ধর্মের কথা শুনিয়ে ওদের চালাক বানিয়ে দিয়ে তাদের ব্যবসার ক্ষতি করতে মানা করলেন।

কিন্তু তিনি তাতেও যখন দমলেন না, তখন দাস ব্যবসায়ীরা রেগে গিয়ে এই বেয়াড়া পাদ্রীটাকেই শেষ করে দেবার ফন্দি আঁটতে লাগলো।

অসীম সাহসী আর প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডেভিড লিভিংস্টোন এসব ব্যবসায়ীদের হুমকিতে ভীত হলেন না। তিনি নির্ভয়ে তাঁর কাফ্রি অনুচরদের নিয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এভাবেই তিনি জীবনের ভয়ানক ঝুঁকি নিয়েও দুই দু'টি বছর ধরে অভিযান চালিয়ে গেলেন। অনেক বনজঙ্গল আর পাহাড় পর্বত ভেঙে আবিষ্কার করলেন মেরোরু এবং ব্যাঙেউলু নামে দুটি হ্রদ।

তিনি মধ্য আফ্রিকার এমন সব দুর্গম স্থান আবিষ্কার করলেন সে স্থানগুলো তখনো মানচিত্রে স্থান লাভ করেনি।

এই অভিযানে ডেভিড লিভিংস্টোন কংগো নদীর অববাহিকাও আবিষ্কার করেন। অবশ্য তিনি বুঝতে পারেননি যে এটা কোন নদী। তিনি ভেবেছিলেন এটা হয়তো নীলনদ। কিন্তু পরে দেখা গেলো ওটা নীলনদ নয়, ওটা কংগো নদী।

দীর্ঘদিনের একটানা পথ চলার পরিশ্রম আর খারাপ আবহাওয়া তাঁর শরীরকে আবারো ভেঙে দিলো। তদুপরি খাদ্যের অভাব, ওষুধপত্র যা সংগে এনেছিলেন, তাও শেষ হয়ে গেছে।

শেষে তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে চলা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেই পারছেন না। উজিজ নামক স্থানে এসে তিনি জ্বরে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

সঙ্গী সাথীরা ডেভিড লিভিংস্টোনের এই দুরবস্থার কথা স্বদেশে জানাবার ব্যবস্থা করলেন।

## লিভিংস্টোন উদ্ধার অভিযান

খবর পেয়ে দেশ থেকে লিভিংস্টোনকে উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করা হলো মি. হেনরী মর্টন স্ট্যানলী (১৮৪১-১৯০৪) নামে এক দুঃসাহসিক যুবককে।

তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ। বাড়ী আমেরিকায়। সেখানকার এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক তিনি। যেমন সাহসী, তেমনি উৎসাহিও।

তদুপরি তিনি স্বদেশ থেকে ডেভিড লিভিংস্টোনের নাম বহুবার শুনেছেন। শুনেছেন তাঁর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কারের কথা। দুর্গম অভিযানের কথা।

তাই লিভিংস্টোনের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর ছিলো। না জানি লোকটা কেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

এমন লোককে সাহায্য করতে যাওয়ার সুযোগ তিনি তাই হাতছাড়া করতে চাইলেন না। এছাড়া যে আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলের নানা আজগুবি সব কাহিনী প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হয়, সে দেশটাকেও একবার নিজ চোখে দেখবার তাঁর সাধ ছিলো।



www.nagorikpathagar.org

অতঃপর লিভিংস্টোনের খোঁজে রওনা হলেন হেনরী মর্টন স্ট্যানলী। তিনি ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে এসে আফ্রিকার জাঞ্জিবার বন্দরে পৌছালেন।

এখানে এসেই তিনি আদিবাসীদের কাছে খোঁজ নিতে লাগলেন, লিভিংস্টোন এখন কোথায় আছেন।

সংবাদ পেতে খুব কষ্ট হলো না এইজন্য যে, ডেভিড লিভিংস্টোনের নাম তখন আদিম আদিবাসীদেরও মুখে মুখে। ওদের মধ্যে তাঁর দারুণ জনপ্রিয়তা, যাকে শুধায় সে-ই বলতে পারে।

এখান থেকেই তিনি সংবাদ পেলেন এখান থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে উর্জিজি নামক স্থানে লিভিংস্টোন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন।

অনেক দুর্গম পথ ভেঙে অনেক বাধা ভয় বিপদ কাটিয়ে দুঃসাহসী স্ট্যানলী অবশেষে উর্জিজিতে পৌছালেন। স্ট্যানলী যখন উর্জিজিতে পৌছে লিভিংস্টোনের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন জ্বরে লিভিংস্টোনের অবস্থা দারুণ খারাপ।

লিভিংস্টোনের সাক্ষাৎ পেয়ে এই অসুস্থ অথচ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে স্ট্যানলী একেবারে কেঁদে ফেললেন।

সামনে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে মাথার টুপি খুলে স্ট্যানলী আবেগ জড়িত কণ্ঠে লিভিংস্টোনকে সম্বোধন করে যে কথাটা প্রথমে উচ্চারণ করেছিলেন, সেই কথা আজো ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছে।

স্ট্যানলী সাক্ষাৎ করতে এসে লিভিংস্টোনকে প্রথম যে কথা বলেছিলেন, তার বাংলা মানে হচ্ছে-"মনে হচ্ছে আপনিই ডাক্তার লিভিংস্টোন"?

আবেগে, আনন্দে লিভিংস্টোনও এই সাহসী যুবককে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

স্ট্যানলী সাথে এনেছিলেন প্রচুর খাবার, আর দামী দামী ওষুধপত্র। তিনি জোর চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন লিভিংস্টোনের।

ভালো ওষুধ আর খাবার পেয়ে অল্প কয়েকদিনেই আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি।

লিভিংস্টোন সেরে উঠলেই তাঁকে নিয়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করার কথা ভাবছিলেন স্ট্যানলী। অন্ততঃ এমনি একটি কথা নিয়েই তিনি তাঁকে উদ্ধার করতেও এসেছিলেন। তাছাড়া দেশ থেকেও তাঁকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাঁকে।

কিন্তু তা হলো না, অর্থাৎ লিভিংস্টোন নিজেই দেশে ফিরতে রাজী হলেন না।

আসলে বলতে গেলে, দুর্গম পথযাত্রার একটা গভীর নেশায় তখন পেয়ে বসেছিলো লিভিংস্টোনকে।

লিভিংস্টোন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠার পরই স্ট্যানলী বললেন, এবার তা হলে ফেরা যাক।

-কোথায়? লিভিংস্টোন অবাক হয়ে শুধালেন।

-দেশে। আপনার বন্ধুরা সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কথা শুনে লিভিংস্টোন হাসলেন। পরে বললেন-তাহলে ওদেরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

-কেনো?

-কারণ, আমার অভিযান শেষ না করে আমি কিছুতেই এখন দেশে ফিরতে পারবো না। হাতে যে আমার এখনো অনেক কাজ বাকি। আমার আরো অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দুর্গম পথ ভাঙতে হবে; অনেক কিছু দেখতে হবে। এতো কাজ ফেলে তো আমি কিছুতেই এখন যেতে পারিনে।



www.nagorikpathagar.org

লিভিং ষ্টোনকে খুঁজে পেলেন ষ্ট্যানলি।

–তাহলে? ষ্ট্যানলী অবাক হয়ে গেলেন লিভিংস্টোনের কথা শুনে। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন এই প্রৌঢ় সাহসী লোকটার মুখের পানে। তাঁর চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

লিভিংস্টোন আবার হাসলেন। তারপর সস্নেহে ষ্ট্যানলীর কাঁধে হাত রেখে বললেন–তাহলে তুমি দুটোর যে-কোনো একটা কাজ করতে পারো।

–কি কাজ?

–প্রথম কাজ, তুমি দেশে ফিরে যেতে পারো এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদেরকে আমার কুশল জানাতে পারো, আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারো। আর দ্বিতীয় কাজ হলো–এই দুর্গম পথযাত্রায় মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে আমার সাথী হতে পারো।

ষ্ট্যানলী কোনো দ্বিধা না করে বললেন–হে মহান ডাক্তার লিভিংস্টোন, আমি দ্বিতীয় কাজটাই করতে চাই। আমি আপনার সাথে যেতে রাজী। আমি আপনার সাথী হতে চাই।

–আমি জানতাম, তুমি এ কথাই বলবে। আমিও যে তোমার মতো সাহসী লোকদেরই সাথী হিসাবে পেতে চাই।

খুশী হয়ে আবার তিনি ষ্ট্যানলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

লিভিংস্টোন তাঁর আরোগ্য লাভের মাত্র দিন কয়েক পরেই ষ্ট্যানলীকে সাথী করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

শুরু হলো পথ চলা। বিরামহীন, বিশ্রামহীন। যে পথের শেষ নেই, যে পথের দিশা নেই, সেই পথ ধরেই দুই সাহসী অভিযাত্রী মাত্র জনাকয়েক স্থানীয় কাফ্রিকে সাথী করে এগোতে লাগলেন। এগোতে লাগলেন মাইলের পর মাইল।

এমনি করে তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তর সীমায় পৌঁছে গেলেন।

এখানে এসে তাঁরা একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন–এই ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের সাথে নীলনদের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এর আগেও সবাই ধারণা করেছিলেন যে,



www.nagorikpathagar.org

হয়তো ট্যাঙ্গানিকার মতো এমনি একটি বৃহৎ হ্রদ থেকেই নীলনদের জন্ম হয়ে থাকবে। কিন্তু লিভিংস্টোনের এই আবিষ্কার সে ধারণা বদলে দিলো।

এর পরেই লিভিংস্টোন একদিন স্ট্যানলীকে কাছে ডেকে তাঁর স্বভাব-সুলভ মিষ্টি হাসি হেসে বললেন-এবার যে তোমাকে বিদায় জানাতে হয় মাইডিয়ার ইয়ং ফ্রেন্ড।

-কেনো? কথাটায় রীতিমতো বিস্মিত হলেন স্ট্যানলী।

-এখানেও দুটি কারণ। লিভিংস্টোন হাসলেন।

-কি কি?

-প্রথম কারণ, আমরা যে পথে যাচ্ছিলাম, এখান থেকে আমি পথের গতি পরিবর্তন করতে চাই। আর দ্বিতীয়ত, আমার যে বন্ধুরা আমার অসুখের সংবাদ শুনে তোমাকে এতোদূর পর্যন্ত পাঠিয়েছেন, তাঁরা এখনো জানে না আমি তাঁদেরই সাহায্যে ভালো হয়ে গেছি। সেই খবরটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার। তাই আমার আদেশ, তুমি ফিরে যাও। আমার ভালো হয়ে যাবার সংবাদটা তাঁদেরকে পৌঁছে দাও। তাঁরাও নিশ্চয়ই খুব উতলা হয়ে আছেন।

অতঃপর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বদেশে ফিরে এলেন স্ট্যানলী। লিভিংস্টোনকে ফেলেই চলে আসতে হলো তাঁকে।

## লিভিংস্টোনের শেষ পরিণতি

এদিকে লিভিংস্টোন স্ট্যানলীকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন এবং বহু দুর্গম পথ বহু বাধা-বিপত্তি আর মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে ইলালা নামক এক স্থানে এসে পৌঁছালেন।

কিন্তু তারপরই আবারও ঘনিয়ে এলো তাঁর বিপদ।

কে জানতো যে, এটাই সত্য হবে। যে লিভিংস্টোনকে নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেছিলো, সেই লিভিংস্টোন আর কখনো দেশে ফিরে যাবে না। ইলালা পৌঁছানোর দিন কয়েক পর আবার শুরু হলো তাঁর জ্বর। হয়তো আগের অসুখটাই তখনো তাঁর বুকের ভিতর লুকিয়ে ছিলো। আবার তা সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসলো।

এবারের অভিযান তাঁর আরো অভিনব ছিলো। এর আগে দু'একজন হলেও শ্বেতাংগ থাকতো তাঁর সাথে।

এইতো দিন কয়েক আগেও স্ট্যানলী ছিলেন। কিন্তু এখন জনাকয়েক কাফ্রি ছাড়া আর কেউ নেই। এরাই তাঁকে সাধ্যমতো কাজে সাহায্য করছে। সাথে আছে তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত সংগী কাফ্রি সুসী।

এবার অসুখে পড়তেই দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন লিভিংস্টোন। বুঝলেন যে বিপদ আসছে। হয়তো একে কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে এবার সম্ভব নাও হতে পারে। হয়তো আর স্বদেশে ফেরা হবেই না। তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে।

তিনি তাঁর কাফ্রি সঙ্গীদের ডেকে বললেন-তোমরা সবাই মিলে একটা কাজ করো।

-কি করবো স্যার? ওদের চোখেও ব্যাকুল চাহনি।

-তোমরা এই লতাপাতা আর ঘাস দিয়ে আমার জন্য একখানা কুঁড়েঘর তৈরি করে দাও। মেঝেতে পুরো করে ঘাস বিছিয়ে দাও। আমার দারুণ শীত করছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে কাফ্রিরা তাদের দেশী কায়দায় বনের লতাপাতা আর গাছের ডাল সংগ্রহ করে একখানা কুঁড়েঘর তৈরি করে ফেললো।

সাহেবের এমন অবস্থা দেখে ওদেরও মুখ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা আর কি করতে পারে?



www.nagorikpathagar.org

উপজাতিয়রা এসে দেখলো লিভিংস্টোন মরে পড়ে আছে কুঁড়ে ঘরে



www.nagorikpathagar.org

লিভিংস্টোন ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–তোমরা এখন যাও। আমি এখন ঘুমোবো।

এর পরই লিভিংস্টোন সেই একগাদা খড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কে জানতো যে, এই ঘুমই তাঁর শেষ ঘুম।

ঘন্টা কয়েক পরে কাফ্রিরা গাছের ছায়ায় বসে রান্নাবান্না করে খেয়ে-দেয়ে, সাহেবের খোঁজ নিতে এসে দেখে, সাহেব ঘরের একগাদা শুকনো খড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

কাছে এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখলো যে, তাদের সাহেব মারা গেছে।

মারা যাবার আগে হয়তো লিভিংস্টোন প্রার্থনা করছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সেই প্রার্থনারত অবস্থাতেই উপুড় হয়ে পড়ে মরে আছেন।

যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন সাহেবের মৃতদেহ দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দেশে পাঠাতে হলে আগে পাঠাতে হবে সমুদ্র বন্দর জাঞ্জিবারে। সেখানে থেকে জাহাজে করে স্কটল্যান্ডে।

কিন্তু এখান থেকে জাঞ্জিবার কয়েকশ' মাইল দূরে। কিন্তু তবু নিয়ে যেতে হবে। মৃতদেহ স্বদেশে পাঠাতেই হবে।

শেষে তাঁর ভৃত্যরা খাটিয়ায় করে তাঁর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চললো।

কিন্তু সেখানেও ঘটলো আর এক বিপদ। আফ্রিকার আদি অধিবাসীদের মনে বিদেশীদের মৃতদেহ সম্পর্কে এক ধরনের অদ্ভুত কুসংস্কার ছিলো। তারা মনে করতো এই মৃতদেহ তাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে গেলে তাদের দেশের অমংগল হবে।

তাই তারা কিছুতেই দেশের উপর দিয়ে লাশ নিয়ে যেতে দেবে না। অনেক বুঝিয়েও তাদের রাজী করানো গেলো না।

তারা প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো।

কি করা যায় তাহলে?

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে এক ফন্দি বের করা হলো। দুটি বড় বড় পুটলি তৈরি করা হলো। দুটি পুটলিই অবিকল একই রকমের। একটি পুটলি খুব গোপনে তৈরি করা হলো।

তারপর স্থানীয় লোকদের দেখিয়ে বলা হলো– এই দ্যাখো, এই পুটলিতে মৃতদেহ আছে। একে এখানেই কবর দেয়া হচ্ছে।

ওরা বিশ্বাস করলো।

কিন্তু ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অবিকল অন্য পুটলিটি কবরে নামিয়ে দেয়া হলো। ওরা দেখলো পুটলিটা মাটির নিচে কবর দেয়া হলো। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সত্যিকার লাশের পুটলিটি বয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো।

কৌশলে লিভিংস্টোনের মৃতদেহ সেখান থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে জাঞ্জিবারের সাহেবদের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো।

সেখান থেকে মৃতদেহ পাঠানো হলো ইংল্যান্ড। ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সমাহিত করা হয়।

ইংল্যান্ডে এই সম্মান পাওয়া মস্তবড় কথা। মস্তবড় গণ্যমান্য লোক না হলে এমন সম্মান কাউকে দেয়া হয় না।

## এমিন পাশা উদ্ধারে আবার স্ট্যানলীর যাত্রা

মি. হেনরী মর্টন স্ট্যানলী প্রথমবার আফ্রিকার জংগলে প্রবেশ করেছিলেন ডেভিড



www.nagorikpathagar.org

লিভিংস্টোনকে উদ্ধার করার জন্য। তাঁর দ্বিতীয় অভিযানও এমনি আরেক ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্যই। এই ব্যক্তির নাম হলো মি. এডওয়ার্ড শ্নিৎসার বা এমিন পাশ।

এই ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ধর্মে ইহুদী এবং সাইলিসার অধিবাসী। কিন্তু তিনি পরে তুর্কীদের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তুর্কীদের আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে শুরু করেন। তাঁর নামও এডওয়ার্ড শ্নিৎসার থেকে করা হয় এমিন পাশা।

তিনি যেমন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী, তেমনি ছিলেন অমায়িক।

অবশেষে তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে মিসরে চলে আসেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ডাক পড়ে মিসরের বাদশাহর দরবারে।

তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটা মস্তবড় চাকরি প্রদান করেন। তাঁকে ইকোয়েটেরিয়েল প্রদেশের শাসনকর্তা করে পাঠানো হয়।

এই প্রদেশের অধিবাসী ছিলো সবই নিগ্রো আর কাফ্রি। আর তাছাড়া ঘোর বন-জংগলে ঘেরা ছিল এই দেশ।

নতুন চাকরিস্থলেই এমিন পাশা তাঁর দেশের এইসব সহজ সরল মানুষগুলো ভালোবাসতে শুরু করলেন। তিনি তাদের আদর করে কাছে ডাকলেন।

সভ্য সমাজ হতে বহু দূরে আফ্রিকার এই গহন অরণ্যের মধ্যে এমনি করে এমিন পাশার কেটে গেলো দীর্ঘ এগারোটা বছর।

এই এগারো বছরে তিনি আফ্রিকার ঘন অরণ্যের অনেক অজানা পথ অচেনা দেশ আবিষ্কার করলেন। সভ্য সমাজের কাছে পৌঁছে দিলেন অনেক অজানা তথ্য।

শুধু তাই নয়-তিনি তাঁর শাসনকালে তাঁর প্রদেশে কোনো দাস ব্যবসায়ীকে প্রবেশ করতে দেননি। তিনি ছিলেন এইসব ঘৃণ্য ব্যবসার একান্ত বিরোধী। তাই লোভী দাস ব্যবসায়ীরাও তাঁর প্রতি দারুণ না-খোশ ছিলো। অবশেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে, দাস ব্যবসায়ীদের হাতে এমিন পাশার প্রাণ সংশয় হয়ে দাঁড়ালো।



www.nagorikpathagar.org

এই সময়েই স্ট্যানলী এলেন এমিন পাশাকে উদ্ধার করতে। এসব দুষ্টু শত্রুদের হাত থেকে এমিন পাশাকে উদ্ধার করতে স্ট্যানলীকে বিপুল বেগ পেতে হয়েছিলো। এই উদ্ধারকার্যে স্ট্যানলীর দলের বহু লোক মারাও পড়েছিলো।

অবশেষে অনেক রক্তপাতের পর স্ট্যানলী এমিন পাশাকে উদ্ধার করে আনলেন। কিন্তু এর তিন বছর পরই এক অজ্ঞাতনামা ঘাতকের হাতে এই মহান বীর এমিন পাশা নির্মমভাবে নিহত হন। এমনি করে একটি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হলো।

এই অভিযানে স্ট্যানলীর এমিন পাশাকে উদ্ধারই বড় কাজ হলেও তিনি অন্য কাজও কিছু কিছু করেছিলেন। এই অভিযানে এসেই তিনি অনেক সাহসে ভর করে আফ্রিকার গভীর বন পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

তিনি ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের চারপাশটা ভালো করে ঘুরে দেখলেন। তিনি কঙ্গো নদীর উৎসেও সন্ধান করলেন। এর জন্য তাঁকে বিপদ, অনেক দুর্গম পথও ভাঙতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়েও তিনি তাঁর অভিযান চালিয়ে গেছেন।

## নীল নদের উৎস সন্ধানে হ্যানিং স্পেক

১৮৫৬ সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি (Royal Geographical Society) সঠিকভাবে নীল নদের উৎস জানার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই উদ্দেশ্যে আফ্রিকায় পাঠানোর জন্য দু'জন অভিযাত্রীকেও মনোনীত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (১৮২১-১৮৯০) এবং অপর জন হলেন বৃটিশ সামরিক অফিসার জন হ্যানিং স্পেক (১৮২৭-১৮৬৪)।

নীল নদের উৎস নিয়ে তখনো নানা জনের ছিলো নানা মত। সঠিক তথ্য তখনো কারো জানা নেই বলেই মতপার্থক্য। অতপর বিতর্ক অবসানের জন্যই জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি গ্রহণ করলেন এই উদ্যোগ।

স্পেক এবং বার্টন নীল নদের উৎস সন্ধানে যাত্রা করেন ১৮৫৫ সালে। দুর্গম দুস্তর পথ ভেঙে দু'বন্ধু নীল নদের কিনার ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে।

প্রতি মুহূর্তে নেমে আসে বিপদ, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের ভয় তো আছেই, তদুপরি বেশি হলো আদি অধিবাসীদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়।

শুধু ভয় নয়, সত্যি সত্যি একদিন তাঁরা পড়েও গেলেন একদল হিংস্র জংলীর সামনে। জংলীরা ওঁদের দেখেই আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তখন স্পেক আর বার্টন সাথের সাথী লোকজন আর উটগুলোকে আড়ালে লুকিয়ে রেখে দু'জন দাঁড়ালেন ওদের মুখোমুখি। তাঁরাও ওদের তীরের আঘাতের পরিবর্তে গুলী চালাতে লাগলেন। দু'পক্ষে চললো তীব্র লড়াই।

জংলীরা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে তাঁদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছে, অপরদিকে স্পেক আর বার্টন মাটির ঢেলার আড়ালে শুয়ে গুলী ছুঁড়ছেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক যুদ্ধ চলার পর জংলীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলো। এরই মধ্যে ওদের তিন চারজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন।

কিন্তু রেহাই পেলেন না অভিযাত্রীরাও। জংলীদের তীরের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন স্পেক নিজেই। তাঁর ডানকাঁধে এসে বিদ্ধ হয়েছে একটি তীর। এছাড়াও জংলীদের আঘাতে তাঁদের একটি উট মারা গেলো।



www.nagorikpathagar.org

এই বিধ্বস্ত অবস্থায় তাই আর অভিযান চালানো সম্ভব হলো না তাঁদের পক্ষে। অতঃপর তাঁরা পিছু হয়ে ফিরে এলেন পূর্ববর্তী ঘাটিতে। এই মুহূর্তে স্পেকের ভালো চিকিৎসা দরকার। বিষ মাখানো তীরের আঘাতে তাঁর অবস্থা তখন খুবই গুরুতর।

দ্রুত স্পেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। তবু এই আঘাত সেরে উঠতে প্রায় চার-পাঁচ মাস কেটে গেলো। স্পেক যেনো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন।

অভিযান বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে আপাততঃ স্থগিত হলেও একেবারে বন্ধ হলো না। স্পেক আর তাঁর বন্ধু রবার্ট বার্টন দু'জনেই ছিলেন দুর্জয় মনোবলের অধিকারী।

অতো বড় বিপদ আসার পরেও তাঁরা মনোবল হারালেন না। ফিরে গেলেন না দেশে। সেখান থেকেই আবার আয়োজন চলতে লাগলো অভিযানের। জোগাড় হলো লোকজন আর দ্রব্য সামগ্রী।

তারপর পরের বছর ১৮৫৭ সালে আবার তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন পথে। এবার তাঁদের যাত্রার লক্ষ্য ছিলো আফ্রিকার একটি হ্রদের সন্ধান করা।

অনেকের ধারণা ছিলো-এই হ্রদটি থেকেই নীল নদের উৎপত্তি হয়েছে। এই হ্রদটির নাম ছিলো টাংগানিকা হ্রদ।

বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ১৮৫৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এসে পৌছালেন টাংগানিকা হ্রদের তীরে। স্পেক আর রবার্ট বার্টনই হলো ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিদ্বয় যাঁরা টাংগানিকা হ্রদ দর্শন করলেন।

কিন্তু এই টাংগানিকা হ্রদের তীরে এসেই ভুল ভেঙে গেলো। তাঁরা দেখলেন টাংগানিকা হ্রদের সাথে নীল নদের কোনো সংযোগই নেই। হ্রদটি নীল নদের কোনো অংশই নয়। অতঃপর নীল নদের উৎস নিয়ে যে মতপার্থক্য ছিলো তার আংশিক সমাধান হলো। এবার তাঁদের অগ্রসর হতে হবে আরো দূরে। নীল নদের সত্যিকার উৎসে।

কিন্তু এই সময় ঘনিয়ে এলো আরেক বিপদ। এই দুর্গম পথ চলার কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না বার্টন। তিনি সহসা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন আগের অতোবড়ো একটি দুর্ঘটনা কাটিয়ে উঠেও কিন্তু স্পেক ছিলেন শক্ত। তখনো অদম্য ছিলো তাঁর মনোবল। যে অভিযানে তিনি যাত্রা করেছেন এর শেষ সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না।

মুশকিল বাধালো বার্টন। অসুস্থ বার্টনকে নিয়ে তো আর চলা যাচ্ছে না। কিন্তু পিছু হটতেও তিনি রাজী নন। এতোদূরে এসে ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

অতঃপর তিনি বার্টনকে সেই জঙ্গলের মধ্যেই তাবু খাটিয়ে দিলেন। সাথে একজন নিগ্রো চাকর আর প্রয়োজনীয় কিছু খাবার দিয়ে তিনি একাই এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। কথা হলো-বার্টন যদি ভালো হয়, তখন যেনো দেশে ফিরে যান। স্পেক নীলনদের উৎসের সন্ধান না করে আর ফিরবেন না।

অবশ্য এখানে কেউ কেউ ভিন্ন কথাও বলেন। কেউ কেউ বলেন- বার্টনের নাকি সত্যি সত্যি কোনো অসুখ হয়নি।

টাংগানিকা হ্রদ ছেড়ে আসার পর থেকেই তাদের চলার গতি পথ নিয়ে স্পেকের সাথে বার্টনের মত পার্থক্য শুরু হয়। শুরু হয় দু'বন্ধুর মধ্যে তর্কাতর্কি। শেষে দু'জনই হয়ে যান আলাদা।

ঝগড়া-ঝাটি করে বার্টন ফিরে আসেন লন্ডনে। স্পেক একাই চলতে থাকেন নীল নদের উৎস সন্ধানে।

দুর্দান্ত মনোবলের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে থাকেন স্পেক। সাথে খাবার নেই, সাথী নেই। সাথে একটি উট ছিলো, কতো দূর চলার পর সেটিও মারা পড়ে।



www.nagorikpathagar.org

হ্যানিং স্পেক নীল নদের উৎসমুখে

কিন্তু তবু দমলেন না স্পেক। তিনি পায়ে হেঁটেই চলতে লাগলেন নীলনদের তীর ধরে। বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, আহার নেই, তবু স্পেক চলছেনই। গায়ের জামা, পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনি চিবিয়ে খেয়েছেন গাছের পাতা। কিন্তু তবু পিছু হাঁটেননি।

অবশেষে দীর্ঘদিন পথ চলার পর তাঁর সামনে এসে দেখা দিলো সেই সাফল্য। যার জন্য তিনি জীবনপাত করে এতোদূর ছুটে এসেছেন। যে সমস্যা এতোদিনও অমীমাংসিত ছিলো তারই সুষ্ঠু সমাধান এইতো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে।

তিনি দেখলেন সামনেই এক বিশাল হ্রদ। আর এই হ্রদ থেকেই বেরিয়ে এসেছে নীলনদ। তাহলে নীলনদের এটাই হলো মূল উৎস? এই হ্রদের জলই প্রবাহিত হচ্ছে নীলনদ দিয়ে ?

তিনি হ্রদটির একটি নাম দিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে হ্রদের নাম হলো ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

দীর্ঘ তিন বছরের দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে অবশেষে সাফল্য লাভ করলেন স্পেক। তারপর এই বিজয়বার্তা নিয়ে ফিরে এলেন দেশে। লন্ডনে।

কিন্তু তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো না। তিনি যখন লন্ডনে এসে নীলনদের উৎস সম্পর্কে তাঁর বিজয়ের কথা বললেন, তখন কেউ বিশ্বাসই করলো না। বরং তাঁর কথা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলো।

যেখানে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর এই বিজয়বার্তায়, সাফল্যে সবাই খুশি হবে, তাঁকে অভিনন্দিত করবে, সেখানে তাঁর কথা নিয়ে সবাই তাকেই উপহাস করছে।

তিনি যতোই যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন ততই ব্যর্থ হচ্ছিলেন। রয়্যাল সোসাইটির কর্তারা বললেন—আমরা তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করিনে স্পেক।



www.nagorikpathagar.org

–তাহলে ?

– প্রমাণ চাই । তুমি যে সত্যি সত্যি নীলনদের উৎস জেনে এসেছো, তোমার ওই কথিত 'ভিক্টোরিয়া হ্রদ' যে নীলনদের উৎস তার প্রমাণ দেখাও।

হ্যানিং স্পেক তখন রেগে গিয়ে বললেন–কিন্তু আমি তো আর ভিক্টোরিয়া হ্রদকে আস্ত মাথায় করে নিয়ে আসিনি যে, তোমাদেরকে এই লন্ডন শহরে বসে নীলনদের উৎসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাবো। আমি সেখানে গিয়েছি, স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এই তার প্রমাণ।

–না, ওরা বললেন–আমাদের বিশ্বাস করার জন্য এই মুখের কথা যথেষ্ট নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।

–বেশ, তাহলে চলো আমার সাথে, স্পেক দৃঢ়তার সাথে বললেন–আমি নিজে নিয়ে গিয়ে তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসবো নীলনদের উৎস কোথায় ?

–বেশ, তাহলে তাই করতে হবে। অতঃপর তাই হলো–লন্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি সাক্ষী হিসেবে জেমস গ্র্যান্ট (James- glant) নামে একজন লোককে দিলেন। এই গ্র্যান্টই যাবে স্পেকের সাথে। তিনি সোসাইটির প্রতিনিধি হয়ে দেখে আসবেন নিজের চোখে।

স্পেকের কপালে ছিলো দুর্ভোগ। এতো কষ্ট করে এসেও বিজয় মাল্য তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। বরং সবার কাছে অবিশ্বাসী হতে হলো। সত্য প্রমাণের জন্য আবার তাঁকে পাড়ি দিতে হবে সেই দুর্গম পথ।

হোক তবু তিনি তাঁর সত্য প্রমাণ করে ছাড়বেন। তিনি যে মিথ্যে বলেননি এটা দেখিয়েদেবেন।

তারপর সত্যি সত্যি ১৮৬০ সালে একদিন সাক্ষীকে সাথে করে আবার আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন হ্যানিং স্পেক। তবে এবার তাঁরা রওনা হবার আগে গোটা অভিযানের এবং চলার পথের একটি আগাম নকশা তৈরি করে নিলেন। যাতে পথ ভুল নাহয়।

কিন্তু হ্যানিং স্পেক লোকটি বুঝি সত্যি হতভাগ্য ছিলেন। এতো সাহস, এতো প্রচন্ড ইচ্ছেশক্তি আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবারই ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

এবারও তিনি আটঘাট বেঁধেই রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু ব্যর্থ হলেন। তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতেই পারলেন না।

অবশ্য তাঁর একটি ভুল হয়েছিলো। তিনি আগাম নকশা তৈরি করে রওনা হলেও নীলনদের তীর ধরে না চলার জন্য দিক হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি গভীর অরণ্যের পথে চলতে চলতে চলে গেলেন ভুল পথে।

তাই তাঁরা আর খুঁজেই পেলেন না ভিক্টোরিয়া হ্রদ। এমনকি নীলনদের দ্বিতীয় উৎস এলবার্ট হ্রদেরও সন্ধান করতে পারলেন না।

অবশেষে তাঁরা তিন তিনটি বছর পথে বিপথে ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন ইংল্যান্ডে ১৮৬৩ সালে।

হ্যানিং স্পেক তাঁর সত্য প্রমাণে এমনি করে ব্যর্থ হলেন। সব উদ্যোগ আয়োজন তাঁর বিফলে গেলো।

এদিকে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিও পড়লো বিপদে। তাঁরাও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না।



www.nagorikpathagar.org

তাঁরা যে হ্যানিং স্পেকের কথা অবিশ্বাস করছেন তা ঠিক নয়। কিন্তু তথ্য প্রমাণ না থাকায় তা স্বীকারও করে নিতে পারছেন না।

অবশেষে এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা এক বিচিত্র ব্যবস্থার আয়োজন করলেন। তাঁরা একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন।

এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে হ্যানিং স্পেককে তার কথিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি স্পেক তা করতে পারেন তবেই তাঁকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে।

এই বিতর্কের দিন তারিখ ঠিক করা হয় ১৮৬৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। আর স্থান নির্ধারিত হয় ইংল্যান্ডের উইল্ট শায়ারে (Wiltshire)

বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে তাঁরই পুরনো সঙ্গী বার্টনের সাথে। স্পেক বার্টনের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

কিন্তু ওই যে বললাম, স্পেক লোকটি ছিলেন এক হতভাগা। তাই ভাগ্য এবারও সুপ্রসন্ন হলো না তাঁর প্রতি। তিনি এই বিতর্কে অংশ নিতেই পারলেন না।

যে দিন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে ঠিক সেদিনই এক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হলেন। ঘটনাটা একেবারেই অদ্ভুতভাবে ঘটে গেলো।

তিনি গিয়েছিলেন শিকার করতে। শিকারের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে একটি বেড়া ডিঙাচ্ছিলেন তিনি লাফ দিয়ে। তিনি বন্দুক হাতে নিয়েই লাফ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওপারে পড়তেই ঝাঁকি লেগে গেলো সহসা আর তাতেই হাতের আংগুল লেগে যায় বন্দুকের ট্রিগারে। বেরিয়ে যায় গুলী। আর সেই গুলী এসে লাগে তারই বুকে। ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

তাঁর আর বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া হলো না।

হ্যানিং স্পেকের সত্য অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিলো তাঁর মৃত্যুর একবছর পরে ১৮৮৫ সালে। প্রমাণ করেছিলেন বিখ্যাত অভিযাত্রী স্যার স্ট্যানলী।

তিনিই প্রমাণ করেন যে নীলনদের উৎসে দু'টি প্রধান হ্রদ আছে। এর একটি হলো হ্যানিং স্পেকের আবিষ্কৃত ভিক্টোরিয়া হ্রদ এবং অপরটি হলো এলবার্ট হ্রদ।

অবশ্য এর মূল উৎসে আছে আরো একটি পর্বত। এর নাম হলো রুয়েন জোরি পবর্ত। এই রুয়েন-জোরি পবর্তের বরফগলা জলই সেমলিকি নদী বেয়ে এসে পড়ে এই দুটি হ্রদে। আর এই হ্রদ দুটিই জলসরবরাহ করে নীল নদের।

অথচ হ্যানিং স্পেক জীবিত থাকতে তাঁর এই বিজয় দেখে যেতে পারলেন না। তিনি বিজয়ী হলেন মৃত্যুর পর।



www.nagorikpathagar.org

# ক্যাপ্টেন জেমস কুকের সমুদ্রযাত্রা

## সমুদ্র যাত্রার উপলক্ষ্য

১৭৬৮ সালে সহসা এক কান্ড ঘটে গেলো। সারা ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়ে গেলো সাড়া।

-ব্যাপার কি ?

সব জ্যোতিবিজ্ঞানীরা হিসেব করে বললেন-সামনের বছরই নাকি শুক্রগ্রহ সূর্যের উপর দিয়ে যাবে আর। এই অলৌকিক দৃশ্যটি পৃথিবীর বুক থেকেই দেখা যাবে।

জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটি ছিলো সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এমন ঘটনা তো আর যখন তখন ঘটেনা। তাই এই দুর্লভ মুহূর্তটির জন্য সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই দিন হয়তো গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান আর গতিবিধি সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু একটা মুশকিল হলো এই চমৎকার দৃশ্যটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই

www.nagorikpathagar.org

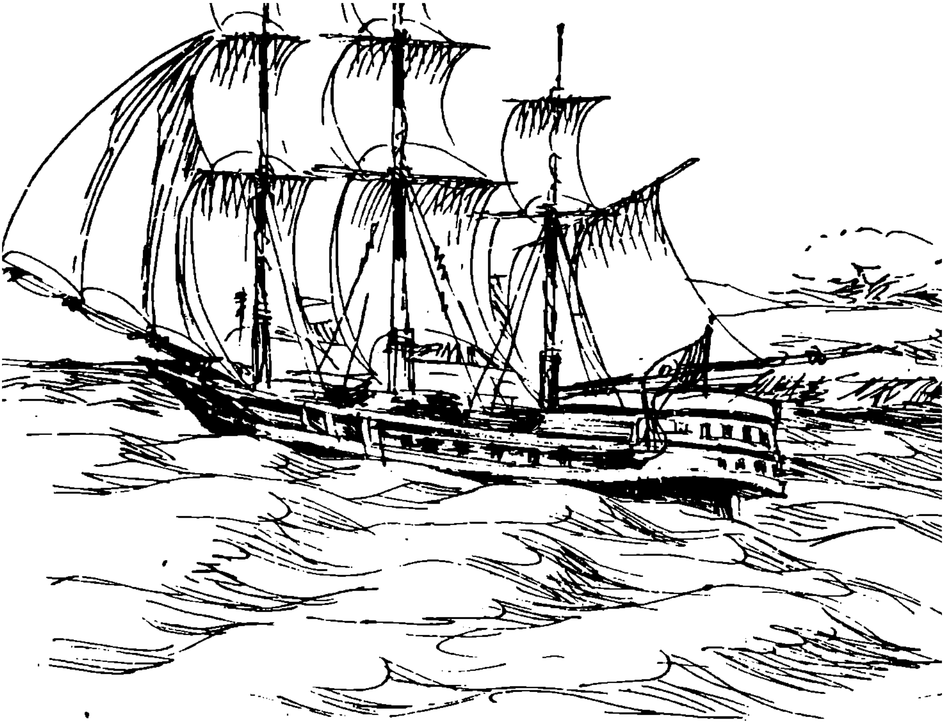

জেমস কুকের জাহাজ

দেখা যাবে না। পৃথিবীর নির্দিষ্ট দু'একটি জায়গা থেকে মাত্র দেখা যাবে। এবং এই দু'একটি জায়গার মধ্যে একটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তের একটি বিশেষ দ্বীপ বা দেশ। এখান থেকেই দৃশ্যটি সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে।

ব্যাপার শুনে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জ নিজেও খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তিনি নির্দেশ দিলেন রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অবশ্য এই সোসাইটির কর্মকর্তারা নিজেরাও ছিলেন উৎসাহী।

ঠিক হলো একটি জাহাজে করে যেতে হবে সেখানে। যেখান থেকে দেখা যাবে এই দৃশ্যটি। জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে জ্যোতিবিজ্ঞানীদেরকে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো সেই জাহাজ যাবে কার নেতৃত্বে? ভালো দক্ষ একজন ক্যাপ্টেন চাই। পালতোলা জাহাজ নিয়ে এই ভয়ংকর অকূল সাগর পাড়ি দেয়া যার তার কাজ নয়। এর জন্য অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন চাই।

তাহলে কাকে দেয়া যায় এই গুরুদায়িত্ব? চিন্তা করতে করতেই অবশেষে সবার মনে এলো একটি নাম। ক্যাপ্টেন জেমস কুকের নাম।

এই সময় জেমস কুকেরও নাবিক হিসেবে ছিলো খুব নাম-ডাক। খুব একজন দক্ষ নাবিক তিনি তখন।

জেমস কুকের জন্ম হয়েছিলো ১৭২৮ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ইংল্যাণ্ডের ইয়র্ক শায়ার (Yorkshire) ক্লেভেল্যাণ্ডের মার্টন (Marton) নামে একটি গাঁয়ে।

এদের আদি বাস অবশ্য ছিলো স্কটল্যাণ্ডে। সেখান থেকেই কুকের বাবা ভাগ্যের



www.nagorikpathagar.org

অন্বেষণে চলে এসেছিলেন মার্টন গাঁয়ে। তিনি ছিলেন একটি কারখানার ফোরম্যান, বাপের এই কর্মস্থলেই বাল্যকাল কেটে যায় কুকের। শিক্ষা জীবনও এখান থেকেই শুরু।

এই লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি পার্শ্ববর্তী হোয়াইট বাই গাঁয়ে একটি জেনারেল স্টোরে কাজও করতেন। এই দোকানটি ছিলো সাগরের খুব কাছে। এখানে এসে ভিড়তো ছোটো বড় কতো সামুদ্রিক জাহাজ। আর তখন থেকেই তিনি জাহাজ আর সমুদ্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তখন থেকেই তাঁর মনে মনে সাধ ছিলো জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার। অথই সাগরের বুকে যখন পালতোলা সামুদ্রিক জাহাজগুলো রাজহাঁসের মতন ভেসে যেতো, তখন সে তাকিয়ে থাকতো অবাক বিস্ময়ে।

অবশেষে সেই সাধ তাঁর পূরণ হয়েও গেলো একদিন। তখন তাঁর মাত্র ১৮ বছর বয়স। এই সময়েই হোয়াইট বাই গাঁয়ের জন ওয়াকার (John walker) নামে এক জাহাজ মালিকের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই ওয়াকার সাহেবই তাঁকে প্রথম জাহাজে কাজ দেন। কুক ছিলো খুব সাহসী এবং উৎসাহী যুবক। তাই ওয়াকার তাকে পছন্দ করেছিলেন। আর এমনি করেই কুকের শুরু হয়েছিলো নাবিক জীবন।

এই ওয়াকারের জাহাজেই আট বছর চাকরি করেন। তারপর তিনি ১৭৫২ সালে যোগদান করে রয়্যাল নেভীতে। এখানেও তিনি দক্ষতা আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ কৃতিত্ব দেখান। ফলে তাঁর হয় দ্রুত উন্নতি।

মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি রয়্যাল নেভী পেমব্রোক (Pembroke) নামে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন মনোনীত হন।

তারপর বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে সাত বছরব্যাপী (১৭৫৬-৬৩) তীব্র নৌ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ক্যাপ্টেন কুক খুব কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন এবং তাঁর চাকরিতে উন্নতি হয়।

কিন্তু রয়্যাল সোসাইটির মনোনয়ন পাবার পেছনে তাঁর আরো একটি কারণ ছিলো।

ক্যাপ্টেন কুক যেমন ছিলো একজন ভালো নৌযোদ্ধা, দক্ষ নাবিক, তেমনি ছিলেন একজন সৌখিন জ্যোতিজ্ঞানীও। গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিও তাঁর ছিলো প্রচুর আগ্রহ।

১৭৬৬ সালে একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। তখন ক্যাপ্টেন কুক জাহাজ নিয়েছিলেন গভীর সমুদ্রে। এই সমুদ্র থেকেই তিনি সূর্য গ্রহণের বিভিন্ন তালিকা এবং গণনার ফলাফল রেকর্ড করেছিলেন। পরে তিনি সেগুলো পেশ করেছিলেন রয়্যাল সোসাইটির কাছে।

আর সেই থেকেই লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সাথে তাঁর পরিচয়। এখানে তিনি শুধু নাবিক নন, বরং একজন সৌখিন জ্যোতিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

তাই এ ধরনের একটি অভিযানে যখন অভিজ্ঞ লোকের সন্ধান চলছিলো তখন রয়্যাল সোসাইটির কর্মকর্তারা তার নামটাই মনে করেছিলেন। কারণ ক্যাপ্টেন কুক একদিকে দক্ষ নাবিক, সমুদ্রে চলাচল সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা এবং তদুপরি আছে জ্যোতিবিজ্ঞানের উপর বাড়তি অভিজ্ঞতা। তাই তাঁর চেয়ে এমন সর্বগুণের আধার আর কে আছেন ?

অতঃপর ডাক পড়লো ক্যাপ্টেন কুকেরই। তিনিও এমন একটি চমৎকার কাজের অফার পেয়ে সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলেন।

## ক্যাপ্টেন কুকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা

ক্যাপ্টেন কুকের এই সমুদ্রযাত্রা শুরু হয় ১৭৬৮ সালে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ



www.nagorikpathagar.org

বছর। তিনিই ছিলেন এই অভিযাত্রী দলের নেতা; জাহাজের ক্যাপ্টেন।

তাঁর সাথে অবশ্য আরো কয়েকজন বিজ্ঞানীও ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির জ্যোতিবিজ্ঞানী জোসেফ ব্যাংক (Joseph Bank) এবং অপর জন ছিলেন সুইডেনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মিঃ ডানিয়েল সোলান্ডার (Daniel solander)

ক্যাপ্টেন কুক তাঁর যে জাহাজটি নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় বের হয়েছিলেন এটি ছিলো ৯৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৬৮ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পালতোলা জাহাজ। নাম ছিলো এন্ডেভোয়ার (Endeavour)।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতি (Tahiti) নামে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, তাঁদের গন্তব্যস্থলে আপাততঃ ওটাই। ওখানেই তারা চালাবেন গবেষণা।

কিন্তু বৃটেন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে তাহিতি দ্বীপ তো অনেক দূরের পথ। দীর্ঘদিনের সমুদ্র যাত্রা। এই সমুদ্র পথ পাড়ি দিতে তাঁদের সময় লেগেছিলো প্রায় দীর্ঘ আটমাস।

দীর্ঘ সমুদ্রপথ একটানা পাড়ি দিতে তাঁদের যে কত বার কতো বিপদে পড়তে হয়েছিলো, বহুবার পড়েছিলেন সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে। তাঁর হিসেব নেই। শুধু ক্যাপ্টেন কুকের মতো দুঃসাহসিক নাবিক ছিলেন বলেই বেঁচে গেছে জাহাজ।

হাজারো ঝড় ঝঞ্ঝা ঠেলে অবশেষে তাঁরা তাহিতি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন আটমাস পরে ১৭৬৯ সলের এপ্রিল মাসে।

এই যে তাহিতি দ্বীপ এই দ্বীপেও কিন্তু জনবসতি ছিলো। তবে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া তখনো তাঁরা পায়নি। সভ্যজগতের মানুষের সাথে তাঁদের পরিচয়ও ছিলোনা।

যদিও ক্যাপ্টেন কুক এর আগে আর কখনো এ দ্বীপে আসেননি। তবু তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন এসব। এ সব আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিলো প্রচুর।

তিনি জানতেন–এরা বড় হিংস্র। আর সভ্য পৃথিবীর মানুষের প্রতি এরা সব সময় ভুল ধারণা পোষণ করে। সেই সাথে তিনি এটাও জানতেন কেমন করে, কোন্ কৌশলে এদের বশ মানাতে হয়। এরা স্বভাবে হিংস্র হলেও আসলে খুব সহজ সরল।

তাই ছেলে ভোলানোর মতোই তাদেরকেও সহজে ভুলানো যায়। তিনি যাবার সময়েই এসব ব্যাপারে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। সংগে নিয়েছিলেন নানা রঙের উপহার। ছেলে ভুলানো উপহার সামগ্রী।

ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ যেই তাহিতি দ্বীপে নোঙর করলো অমনি ছুটে এলো একদল স্থানীয় আদিবাসী।

প্রথমটা ওরা ভেবেছিলো হয়তো এরা তাঁদের ঘরবাড়ী লুটপাট করতে এসেছে। তাই ছুটে এসেছিলো মারমুখো হয়ে। কিন্তু পরে সেই মারমুখো লোকগুলোকে ক্যাপ্টেন কুক বোঝাতে সক্ষম হলেন। তিনি বোঝাতে পারলেন যে, তাঁরা শত্রুতা করতে আসেননি। এসেছে তাঁদের দেশ দেখতে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তাঁদের কোনো ক্ষতি করার মতলব নেই।

তখন তাঁদেরও ভয় কেটে গেলো। ক্যাপ্টেন কুকও তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাঁদের এটা ওটা উপহার দিয়ে হাত করে ফেললেন। হিংস্র লোকগুলো শান্ত হয়ে গেলো।

এই নবাগত সাদা মানুষগুলো তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এসেছে খবর শুনে ছুটে এলেন স্বয়ং দ্বীপের রাণী নিজেও।

ক্যাপ্টেন কুকও রাণীকে খুবই সম্মান আর আন্তরিকতার সাথে জানালেন অভ্যর্থনা।



www.nagorikpathagar.org

রাণী আগেই খবর নিয়ে জেনেছেন তাঁদের দ্বীপে যে সাদা চামড়ার লোকগুলো এসেছে ওরা খুব ভালো লোক। তাই তিনি যখন ওদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন খালি হাতে আসেননি। ক্যাপ্টেন কুকের জন্য উপহার নিয়ে এসেছেন এককাঁদি কলা এবং আস্ত একটি শূয়োর।

এদিকে কুকও তাঁকে বঞ্চিত করলেন না। তিনিও তাঁকে দিলেন প্রায় মানুষ সাইজের সুন্দর একটি ডল পুতুল। এমন চমৎকার পুতুল উপহার পেয়ে তো রাণী মহাখুশি ।

কিন্তু তখনি ঘটলো আরেক ফ্যাসাদ। এসেছিলেন পার্শ্ববর্তী গোত্রের আর এক সর্দার। তিনিও একই সময়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন কুকের সাথে সাক্ষাৎ করতে ।

ক্যাপ্টেন কুক যেই অমন সুন্দর পুতুলটা রাণীর হাতে তুলে দিলেন তখন সর্দারও এলেন এগিয়ে। পুতুলটি তাঁরও ভারী পছন্দ। তাই ওটা তাঁরই চাই।

কিন্তু রাণীও পুতুলটি হাতছাড়া করতে রাজী নন। কারণ পুতুলটি তাঁর ভারী পছন্দ। কিন্তু সর্দারও ওটা নেবেনই।

এই নিয়ে রাণীর সাথে সর্দারের শুরু হলো ঝগড়া। কথা কাটাকাটি। দু'জনেই তাঁদের নিজের বিচিত্র ভাষায় শুরু করলেন তর্কাতর্কি।

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে দু'জনেই মারমুখো হয়ে এলেন। রাণীর সাথের লোকজন তৈরি হয়ে গেলো তাঁর বল্লম নিয়ে। তাঁর দেখাদেখি সর্দারের লোকেরাও এলো রুখে। যুদ্ধ বেধে যায় আর কি।

এমনি বিপদ দেখে ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন কুক। তিনি বিবাদমান দু' পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের শান্ত হতে অনুরোধ জানালেন।

তাঁর কাছে ভাগ্যিস এমন সুন্দর ডল পুতুল আরো একটি ছিলো। তিনি তৎক্ষণাৎ এনে দিলেন পুতুলটি। আর একটি পুতুল পেয়ে সর্দার এবার শান্ত হলেন। থেমে গেলো যুদ্ধ। শেষে তাঁরা দু'জনেই খুশি হয়ে ফিরে গেলেন যে যার ঘরে।

এই দ্বীপেরই একটি উঁচু পাহাড়ের উপর স্থাপন করা হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। বিজ্ঞানীরা তাঁদের লোকজন আর যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে গেলেন পাহাড়ে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন কুকের মনে তখন চেপে বসেছে নতুন নেশা। তিনি উপজাতি সর্দারদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নতুন দেশ, নতুন মানুষদেরকে দেখার জন্য। তাঁর ভাল লাগলো নতুন দেশ দেখতে।

## প্রথম সমুদ্র যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব

গবেষণা শেষে আবার যখন দেশে ফেরার সময় হলো তখন তিনি নিয়ে ফেললেন নতুন সিদ্ধান্ত।

তিনি এখনি ঘরে ফিরবেন না। এতদূর যখন এসেছেন এখন আরো কিছু নতুন দেশ না দেখে তিনি ঘরে ফিরবেন না। তিনি আরো ঘুরবেন জাহাজ নিয়ে।

তিনি শুনেছিলেন এদিকে আরো অনেক দেশ আছে যার কথা সভ্য জগতের মানুষেরা আজো জানতে পারেননি। তিনি যাবেন সেই সব বিচিত্র দেশে।

আবিষ্কার করবেন নতুন দেশ। জরীপ চালাবেন সে অঞ্চল সম্পর্কে। জানবেন সে দেশের মানুষকে। কি আছে তাঁদের সভ্যতা আর সম্পদ।

অবশ্য এর বিপদও আছে তিনি জানতেন। তিনি শুনেছিলেন এখানে এমনো কোনো কোনো অঞ্চল আছে, যেখানে বাস করে নরখাদক মানুষ। তাঁদের সামনে পড়লে আর



www.nagorikpathagar.org

রক্কে নেই।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও দমলেন না তিনি। নতুন দেশ দেখার নেশায় এখন তাঁকে পেয়ে বসেছে।

যেহেতু তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কারো কথা বলার ছিলো না। তাঁর মতই মত।

অতঃপর তিনি দেশে না ফিরে তাহিতি দ্বীপ ছেড়ে আবার জাহাজ চালালেন দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। আবার তাঁর পালতোলা জাহাজ ভেসে চললো সীমাহীন সাগরের বুক চিরে । কূল নেই, কিনার নেই এমন বিশাল সাগরের বুকে জাহাজ ভেসে চলছে তো চলছেই।

কেটে গেলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এমনি করে দীর্ঘ একটানা সমুদ্রযাত্রা করে তাঁরা আবার এসে পৌছালেন অন্য এক নতুন দেশে।

এই দেশটিরই নাম হলো নিউজিল্যান্ড।

অবশ্য এই নিউজিল্যান্ড ক্যাপ্টেন কুকের নতুন আবিষ্কার নয়। এর আগেই এই দ্বীপটি ১৬৪৬ সালে হল্যান্ডের ত্যাসম্যান নামে এক নাবিক আবিষ্কার করে গেছেন। এই ত্যাসম্যানের বাড়ি ছিলো হল্যান্ডের জিল্যান্ড প্রদেশে। তিনি নিজের দেশের নামানুসারেই দেশটির নাম রেখেছেন নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ নতুন জিল্যান্ড।

ত্যাসম্যান অবশ্য এই দেশটির শুধু অনুসন্ধান দিয়েছিলেন মাত্র। তিনি এর সম্পর্কে আর কোনো তথ্য দিতে পারেননি। কোনো রকম ভৌগোলিক জরীপ তিনি চালাননি।

কিন্তু এই জরীপ কাজটি করলেন ক্যাপ্টেন কুক। তিনি এই নিউজিল্যান্ডের লোকবসতি, মৃত্তিকার গঠন এবং অঞ্চলটি সম্পর্কে আরো অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করলেন। সংগ্রহ করলেন দ্বীপটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ভৌগোলিক তথ্য।

এরপর আবারও তিনি জাহাজ ভাসালেন সাগরের বুকে। নিউজিল্যান্ড থেকে এবার তিনি পাড়ি ধরলেন সোজা পশ্চিম দিকে।

পাড়ি দিলেন ত্যাসম্যান সাগর (Tasman sea)। এই ত্যাসম্যন সাগরের নামটিও নাবিক ত্যাসম্যানের নামানুসারেই রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ কয়েক মাস জাহাজ চালিয়ে তিনি ১৭৭০ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে এসে পৌছালেন অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে। তিনি জাহাজ ভিড়ালে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব তীরে। অস্ট্রেলিয়াতেও যে তিনিই প্রথম এলেন তাও নয়। এর আগেও কয়েকজন নাবিক এসে নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে। তবে তাঁদের আসার মধ্যে ছিলো বিপুল পার্থক্য।

ক্যাপ্টেন কুকের আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে।

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল হলো রুক্ষ এবং মরুময় অঞ্চল। যাঁরা এসে এখানে নেমেছিলেন তাঁদের ধারণা হয়েছিলো দেশটার এটাই বুঝি সত্যিকার চেহারা। এখানে না আছে কোনো গাছপালা, না আছে কোনো সম্পদ রাজি, না কোনো প্রাণী পর্যন্ত।

তাঁরা দেশে ফিরে গিয়েও এই রুক্ষতার কথাই বলেছিলেন। আর তাঁর কারণেই দেশটি সম্পর্কে সভ্য জগতের মানুষের কোনো আগ্রহ জাগেনি। এমন একটি বালুময় দেশ নিয়ে কি হবে? অমন দেশে কে যাবে?

কিন্তু ক্যাপ্টেন কুক এসে যে অস্ট্রেলিয়া দেখলেন সে ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। কোথায় এর রুক্ষ মূর্তি ? এ যে সুজলা সুফলা এক অপূর্ব সুন্দর দেশ।

কি সুন্দর এর বৃক্ষরাজি, সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত অঞ্চল। যেদিকে চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। আর সেই সবুজ শ্যামলিমাময় বিস্তৃর্ণ প্রান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে কতো বিচিত্র



www.nagorikpathagar.org

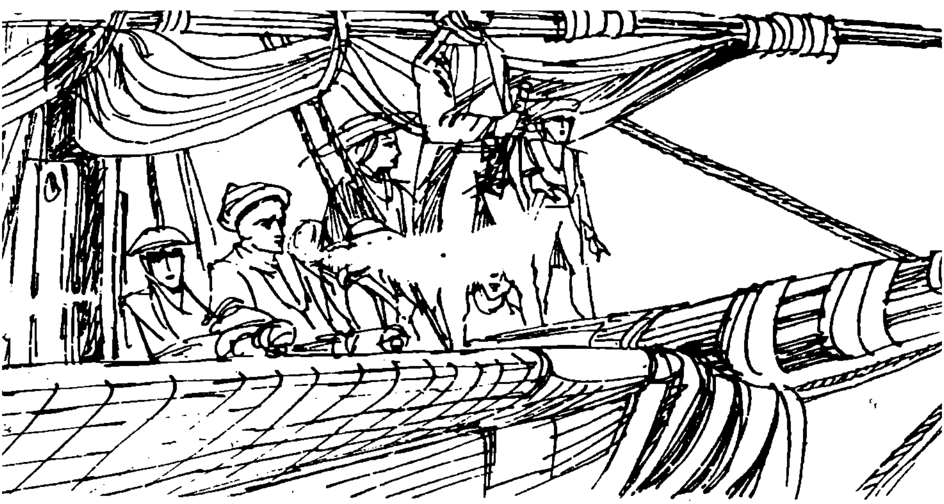

ক্যাপ্টেন জেমস কুক জাহাজ থেকে তাকিয়ে দেখছেন অষ্ট্রেলিয়ার সবুজ উপকূল।

ধরনের জীবজন্তু। কতো পাখি বসে আছে গাছে গাছে।

বনে আছে ক্যাঙ্গারু কোয়েলা, জেব্রা, জিরাফ এবং আরো কতো বিচিত্র জাতের প্রাণী।

যেদিকে তাকানো যায় সৌন্দর্য্য যেনো দু' চোখ ভরে যায়। তিনি কূলে জাহাজ ভিড়িয়ে তাঁর সংগী সাথীদের নিয়ে নেমে পড়লেন। এর কূলে। হেঁটে বেড়ালেন সবুজ প্রান্তরে। জরীপ চালালেন এর নানা অঞ্চল নিয়ে।

তিনি বুঝতে পারলেন অষ্ট্রেলিয়ার সবটাই মরুময় রুক্ষ অঞ্চল নয়। হয়তো এই সৌন্দর্য্যময় রূপটাই এর আসল চেহারা। যে চেহারাটা এর আগের কোনো অভিযাত্রী দেখতে পাননি।

উল্লেখ্য যে, ক্যাপ্টেন জেমস কুক নাবিক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় যে অমর হয়ে আছেন সে অষ্ট্রেলিয়ার এই রূপটি দেখার জন্যই।

জেমস কুকের কাছে অষ্ট্রেলিয়ার এই রূপময় রূপের ঘটনা শুনেই বৃটিশ সরকারের নজর পড়েছিলো এদেশটির দিকে। শুরু হয়েছিলো এদেশ দখলের পালা। শুরু হয়েছিলো লোকবসতি।

অষ্ট্রেলিয়ায় যে মানব বসতি শুরু হয় তার সবটুকু অবদানই প্রায় জেমস কুকের। তিনি যদি অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে অমন খবর না দিতেন, তাহলে এখানে মনুষ্যবসতি গড়ে উঠতে হয়তো আরো অনেক বিলম্ব ঘটতো।

জেমস কুক অষ্ট্রেলিয়ার এই শ্যামলিমাময় রূপ দেখেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি এর পরও জরীপ চালাতে লাগলেন। তিনি তাঁর জাহাজ নিয়ে উপকূল ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন উত্তর দিকে। তিনি যতোই উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন সবুজ শ্যামল প্রকৃতির রূপ শেষ হলো না। তিনিও এর শেষ না দেখে ছাড়লেন না।

চলতেই লাগলেন। চলতে চলতে কেটে গেলো আরো মাসের পর মাস। তাঁর জাহাজ চলছেই উপকূল ধরে। এমনি করে তিনি চলে এলেন দু'হাজার মাইল (তিন হাজার দুশো কিলোমিটার) পথ পর্যন্ত। তবু এর শেষ নেই।

তখন তিনি বুঝলেন অষ্ট্রেলিয়া নামের এই বিশাল ভূ-খন্ডটির গোটা পূর্ব উপকূল



www.nagorikpathagar.org

ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে জরীপ কাজ চালাচ্ছেন

ভাগই সবুজ শ্যামলিমাময় রূপে ঘেরা। উর্বর এর ভূমি। অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ আর প্রাণী সম্পদে পরিপূর্ণ।

তিনি চলতে চলতে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল ধরে একেবারে উত্তর সীমায় এসে পৌছোলেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগের কুইন্সল্যান্ডের গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ (Great Barrier Reef) পর্যন্ত চলে এলেন।

কোরাল সাগর (Coral Sea) থেকে টোরেশ প্রণালীর (Torres Strait) মধ্য দিয়ে যেতে এই গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ নৌ চলাচলের জন্য সবচেয়ে বিপদ সংকুল এলাকা। যে কোনো মুহূর্তে একটু অসাবধান হলেই সাগর তলে ডুবন্ত পাথর খন্ডে আঘাত লেগে জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তখন সাক্ষাৎ ধ্বংস।

এই গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের কথাও আগে থেকেই জানতেন ক্যাপ্টেন কুক। তাই তিনি খুব সাবধানে এবং দক্ষতার সাথে জাহাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এতো সাবধানে পথ পাড়ি দিলেও সম্পূর্ণ রক্ষা পেলেন না কুক।

একটি ডুবন্ত পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তাঁর জাহাজ এন্ডেভেয়ার সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অতঃপর তিনি কুইন্সল্যান্ডের তীরে জাহাজ থামাতে বাধ্য হলেন। তারপর জাহাজের প্রয়োজনীয় মেরামত করে আবার শুরু করলেন যাত্রা।

না, আর কোনো দিকে নয়। তাঁর যা দেখবার সাধ ছিলো তার অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে। এবার দেশে ফিরতে হবে। অনেক দিন পার হয়ে গেছে। দলের লোকেরাও ঘরে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন।

বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার যে বিষয়টি তিনি আবিষ্কার করে গেলেন-এই কথা এখন পৌছে দিতে হবে দেশে। তবেই তো তাঁর আবিষ্কার সার্থক।



www.nagorikpathagar.org

এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় তাঁর নাবিকদের অবশ্য খুব একটা ক্ষতি হয়নি। তবু নানা সময়ে জ্বরে ভুগে এর মধ্যেই মারা পড়েছে ৩০ জনের মতো।

দেশে ফিরে আসার পর এই সব বিচিত্র আবিষ্কারের কথা শুনে সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। সারা ইংল্যান্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর নাম ডাক।

স্বয়ং রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁকে বিশেষভাবে ডেকে নিয়ে করলেন সম্মানে ভূষিত। প্রচুর দিলেন উপঢৌকন।

## ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা

ঘটনার কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। তাঁর এই বিরাট সাফল্যের খবরে রাজা তৃতীয় জর্জ এবং রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির কর্মকর্তারা আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

তাঁরা আরো উৎসাহ দিতে লাগলেন ক্যাপ্টেন কুককে। এমন সাফল্য তাঁকে আবারও অর্জন করতে হবে। আরো আবিষ্কার করতে হবে নতুন দেশ, নতুন পথ।

সবার উৎসাহে ক্যাপ্টেন কুক নিজেও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আবার তাঁর বাসনা জাগলো অভিযানে যাবার।

এবার রাজা তৃতীয় জর্জ নিজেই সব জোগাড়যন্ত্র করে দিলেন। জোগাড় হলো লোকজন। দ্রব্যসামগ্রী। তৈরি হলো দু'দুটো জাহাজ।

ক্যাপ্টেন কুক দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রায় যে জাহাজ দুটো নিয়ে গিয়েছিলেন সে দুটোর নাম ছিলো 'রেজুলিউশন' (Resolution) এবং 'এডভেঞ্চার' (Adventure)।

দু'দুটো পালতোলা জাহাজে তিন চার বছরের জন্য প্রচুর খাবার-দাবার এবং অনেক গরু, ভেড়া, ছাগল নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি। সাথে গরু, ভেড়া, ছাগল নিয়ে যাওয়ার কারণ ছিলো। এদের বংশকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। যেদেশে গরু, ভেড়া, ছাগল নেই সেখানেও এদের বংশ বিস্তার করা। এটা ছিলো আসলে কুকের সমুদ্র যাত্রার একটি বাড়তি বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

দ্বিতীয় দফায় ক্যাপ্টেন কুক সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন ১৭৭২ সালের জুলাইতে। এই যাত্রাও তাঁর স্থায়ী হয় তিন বছর। তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন ১৭৭৫ সালের জুলাই মাসে।

এই দ্বিতীয়বারেও তিনি আবিষ্কার করেন অনেকগুলো দ্বীপ এবং অঞ্চল।

তিনি এবার ৭০° ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ ধরেই দক্ষিণ দিকে এন্টারক্টিকা মহাদেশের দিকে যাত্রা করেছিলেন। এতে হিসেব মতো তাঁর সামনে পড়ার কথা টেরা অস্ট্রেলিশ (Terra Australis)। কিন্তু তিনি এর কোনো হদিসই পেলেন না। অথচ তিনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পূর্ব পশ্চিমে একবারে গোটাটাই চক্কর দিয়ে এসেছেন। পরে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে, টেরা অস্ট্রেলিশ নামে যে দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, সেটি আসলে পৃথক কোনো দ্বীপ নয়। এটির অবস্থান হলো অস্ট্রেলিয়ার উপকূল ভাগেরই দ্বীপ সমূহের মধ্যে।

এই দ্বিতীয় যাত্রায় ক্যাপ্টেন কুক যে সব দ্বীপ আবিষ্কার করেন সেগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের টোংগা (Tonga), ইস্টার দ্বীপ (Easter Island), নিউ ক্যালেডোনিয়া (New caledonia) দ্বীপ। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ স্যান্ডুইস দ্বীপপুঞ্জ (South Sandwich Island) এবং দক্ষিণ জর্জিয়া (South Georgia) দ্বীপ।



www.nagorikpathagar.org

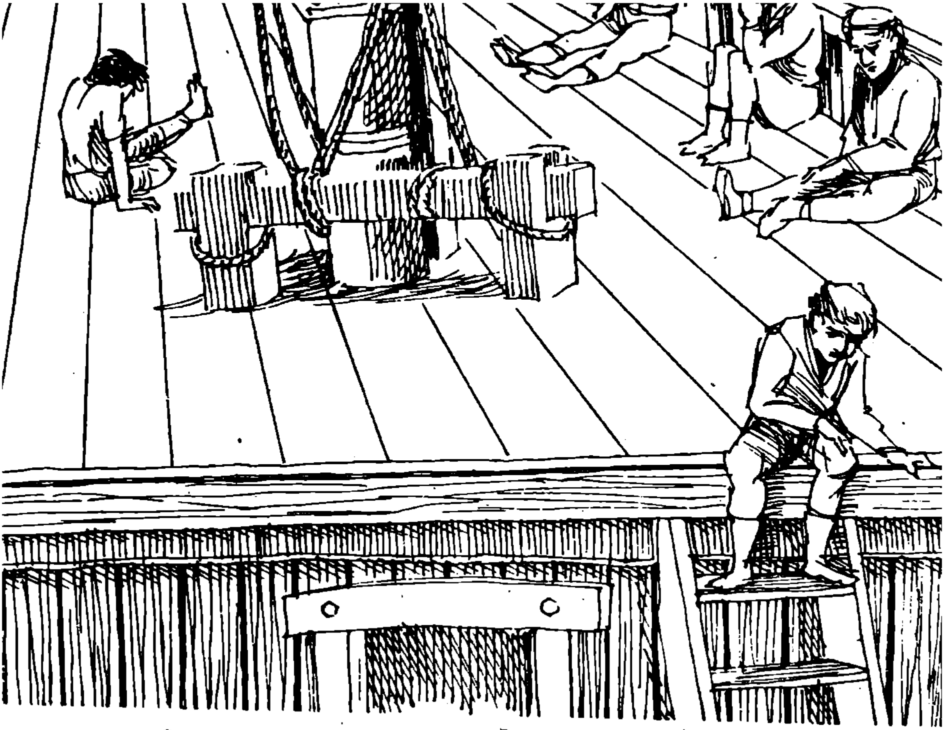

স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে ক্যাপ্টেন কুকের লোকেরা।

এই যাত্রায় তিনি এন্টারকটিকা মহাদেশেরও প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এন্টারকটিকা পর্যন্ত যাননি।

এই যাত্রা শেষ করে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন ১৭৭৫ সালে। এবারও দেশের মানুষ তাঁকে দেখালেন প্রচুর সম্মান। সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে লাভ করেন প্রাণঢালা অভিনন্দন।

রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে দান করেন ফেলোশীপ এবং এছাড়াও তাকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক কপ্লে মেডেল (Copley Medal)।

এই পদ পাবার পেছনে তাঁর আর একটি কারণ ছিলো। এই দু' দু'বার সমুদ্র যাত্রায় ক্যাপ্টেন কুক লাভ করেন প্রচুর অভিজ্ঞতা।

দেখা গেছে এর আগে যাঁরাই দীর্ঘদিনের সমুদ্র যাত্রায় গেছে তারাই স্কার্ভি (Scurvy) নামে এক বিচিত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এই রোগে সহসা রোগীর গলা ফুলে ওঠে এবং কয়েকদিন থাকার পরই দুর্বল হয়ে রোগী অবশেষে মারা যায়। কিন্তু কি কারণে স্কার্ভি রোগ হয় এবং এই রোগের ওষুধ কি তাও কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি এ পর্যন্ত।

ক্যাপ্টেন কুক এই বিষয়ের উপরই গবেষণা চালান এবং সফল হন। এই গবেষণার জন্যই তাঁকে সর্বোচ্চ পদকে ভূষিত করা হয়।

তিনি দেখান যে যারা দীর্ঘদিনের সমুদ্র যাত্রায় যায় তাঁদেরই শুধু এই রোগ হয়। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে ভেসে থাকে, টিনজাত শুকনো খাবার খায়। তাঁরা টাটকা শাকসবজি খেতে পায় না। তাই তাঁদের শরীরে 'সি' ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় আর



www.nagorikpathagar.org

এই ভিটামিনের অভাবেই তাঁরা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়।

যদি তাঁদেরকে নিয়মিত টাটকা শাকসবজি, অন্ততপক্ষে কলা ও কমলালেবু খেতে দেয়া হয় তাহলে তাঁরা এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। কারণ কলা ও কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে 'সি' ভিটামিন থাকে।

শুধু মুখের কথা নয়, তিনি তাঁর এই পরীক্ষা নিজের জাহাজের নাবিকদের উপরেও চালিয়ে দেখলেন এবং তাতে ভালো ফলও পেয়েছেন। তাঁর জাহাজের লোকেরা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়েছে খুব কম।

## কুকের শেষ সমুদ্রযাত্রা

ক্যাপ্টেন কুক তাঁর পরপর দুটো সমুদ্র যাত্রায় অনেকগুলো দ্বীপ আবিষ্কার করেছেন; সংগ্রহ করেছেন বিচিত্র সব ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য। সারা বিশ্বজুড়ে এখন তাঁর খ্যাতি।

কিন্তু রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির কর্মকর্তারা ভেবে দেখলেন এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। সেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর সীমানা দিয়ে আলাস্কা ও কানাডার পশ্চিম কূল ঘেঁষে আরো উত্তর দিকে যাওয়া যায় কিনা, এবং যাওয়া গেলে সেই পথ দিয়ে পূর্বে এসে কানাডার উত্তর দিক দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করা যায় কিনা।

অথবা একই স্থান দিয়ে ঢুকে পূর্ব দিক দিয়ে সাইবেরিয়ার উত্তর কূল ঘুরে আটলান্টিকে প্রবেশ করা যায় কিনা দেখা। এই পথটি খুঁজে বের করতে হবে।

এই পথটির অনুসন্ধান অদ্যাবধি কেউ করেননি। এটি অত্যন্ত একটি কঠিন এবং দুঃসাহসিক কাজ। যেমন তেমন নাবিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

কারণ এই পথটার পুরোটাই প্রায় বরফে ঢাকা। সাগরের যেখানে জল জমাট বেঁধে আছে৷ ভেসে বেড়াচ্ছে দানবাকৃতির এক একটি হিম শৈল। তাঁর একটার সাথে জাহাজের ধাক্কা লাগলে আর রক্ষে নেই। জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অথবা যেকোনো মুহূর্তে জাহাজ আটকে যেতে পারে বরফে। তখন আর ঘরে ফিরতে হবে না। সেখানেই মরতে হবে না খেয়ে আর শীতে জমে। এই ভয়ে কেউ যায় না ওদিকে।

কিন্তু এই দুর্গম পথেই অবশেষে পা বড়ালেন ক্যাপ্টেন কুক। তিনি তাঁর এই তৃতীয় এবং শেষ সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন ১৭৭৬ সালের জুলাই মাসে।

এই যাত্রাতেও তাঁর দুটো জাহাজ ছিলো। একটি ছিলো আগের পুরনো জাহাজ রেজুলেশন এবং নতুন জাহাজ ডিসকভারি (Discovery)।

তিনি লন্ডন থেকে যাত্রা করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সোজা চলে এলেন তাঁর প্রধান ঘাটি নিউজিল্যান্ডে। সেখান থেকে শুরু হলো তাঁর উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে যাত্রা।

নিউজিল্যান্ড থেকে তিনি এলেন টোংগা দ্বীপে, সেখানে থেকে এলেন তাহিতিতে। তাঁর পর সোজা একটানা উত্তর দিকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে বাঁয়ে ফেলে চলে এলেন একবারে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে।

তারপর পূর্বদিকে মুখ ঘুরে চলে এলেন উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে।

এবার যাত্রা সোজা উত্তর দিকে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে। (কানাডা অংশের)। কানাডা অংশ ছাড়িয়ে আলস্কার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে তিনি ঢুকে পড়লেন তাঁর বিপদ সংকুল বেরিং প্রণালীতে।





www.nagorikpathagar.org

বেরিং প্রণালী পার হয়ে তিনি প্রথমে চেষ্টা করলেন আলস্কার উত্তর কূল ঘেঁষে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা।

কিন্তু সম্ভব হলো না। বরফে আচ্ছাদিত জলরাশি চারদিক। পথ এতোই সংকীর্ণ যে এই পালতোলা ধীরগতি সম্পন্ন কোনো জলযান নিয়ে এই সংকটময় পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। এবং একটা কিছু বিপদ হলে আর সামলে নেবার কোনো কায়দা নেই।

তাই তিনি এতো বড় বিপদের ঝুঁকি নিতে পারলেন না। অথচ তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন এখান দিয়ে বরফের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে বাঁকাচোরা পথে অবশ্যই কানাডা ঘুরে আটলান্টিক সাগরে পৌঁছানো যাবে।

তিনি পূর্বদিক দিয়ে যেতে পারলেন না। এবার চেষ্টা করলেন পশ্চিমদিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। একই রকম মৃত্যুর ঝুঁকি। অথচ এদিকেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যদি বরফ কাটিয়ে যাওয়া যেতো তাহলে অবশ্যই আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর যাওয়া হলো না।

তাঁকে ব্যর্থ হয়ে আবার বেরিং প্রণালী দিয়ে চলে আসতে হলো প্রশান্ত মহাসাগরে।

এবার তাঁর ফিরতি যাত্রা। মূল উদ্দেশ্য যখন সাধন হলো না তখন আর বিলম্ব করে লাভ কি? দেশে ফেরা যাক। তিনি ফেরার পথে দক্ষিণদিকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছোলেন ১৭৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

কিন্তু কে জানতো এখানেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো এমন একটি মর্মান্তিক পরিণতি।

তাদের জাহাজ দুটো তখন নোঙর করে আছে হাওয়াই দ্বীপের কীলাকেকোয়া (Kealakekua) নামক স্থানে। এর আশেপাশে ছিলো অনেক জংলী আর অসভ্য পলেনেশিয়ানদের (Polynesian) বাস।

এই পলেনেশিয়ান উপজাতিরা একদিন তাদের জাহাজের একটি ডিঙি নৌকা চুরি করে নিতে আসে। কিন্তু ধরা পড়ে যায় নাবিকদের হাতে। নাবিকরা নৌকা চুরিতে বাধা দিতে গেলে স্থানীয়দের সাথে কুকের নাবিকদের বেঁধে যায় লড়াই।

এই গোলমাল থামাবার জন্য এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন কুক। তিনি এসে দাঁড়ালেন দু'দলের মাঝখানে।

তিনি স্থানীয়দের সাথে একটা মিমাংসার কথা বলার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমনি সময়েই ঘটলো ঘটনা। উপজাতীয়দের অর্তকিতে ছুঁড়ে মারা একটা বর্শা এসে বিদ্ধ হলো ক্যাপ্টেন কুকের বুকে।

ক্যাপ্টেন কুক উপজাতীয়দের হাতে নিহত হন ১৭৭৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫০ বছর।

তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সহকারী নাবিকরা নিজেরাই আবারও চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের স্বনামধন্য ক্যাপ্টেনের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করা যায় কিনা। তাঁরা আবার ফিরেও এসেছিলেন বেরিং প্রণালীতে। কিন্তু সফল হননি।

তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে কাজ ক্যাপ্টেন জেমস কুকের মতো নাবিক করতে পারেননি। তেমন কাজ তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতঃপর ব্যর্থ হয়ে তাঁরা মনিবকে হারিয়ে ফিরে এলেনা ইংল্যান্ডে ১৭৮০ সালে।



www.nagorikpathagar.org

# এভারেস্ট অভিযান

এভারেস্ট সারা বিশ্বের এক বড় বিস্ময়। পৃথিবীর বুকে পা রেখে আপন গর্বিত মস্তক তুলে মহাশূন্যের বুকে দাঁড়িয়ে আছে সে আপন মহিমায়।

সাগর পৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৮ ফুট) উঁচু যার সর্বোচ্চ শৃংগ। ১৮৫২ সালে তরুণ বাঙালী সার্ভেয়ার রাধানাথ শিকদার সর্বপ্রথম এই উচ্চতা, অংকে কষে নির্ণয় করেন। পরে তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট (Sir George Everest) এর নামানুসারে এক সর্বোচ্চ শৃংগের নাম রাখা হয় এভারেস্ট।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই নাম দেয়ার আগেও এভারেস্ট শৃংগের একটি স্থানীয় নাম ছিলো। তিব্বতীয়রা এই এভারেস্ট শৃংগকে ডাকতো চুমুলুঙমা (Chomolungma) বলে।

এই যে বিশাল বিস্ময়কর পর্বতমালা। এই ভয়ংকর বিশালকেও কিন্তু মানুষ ভয় করেনি। শুধু ভয় না করা নয়। একদিন মানুষ একেও জয় করেছে।



www.nagorikpathagar.org

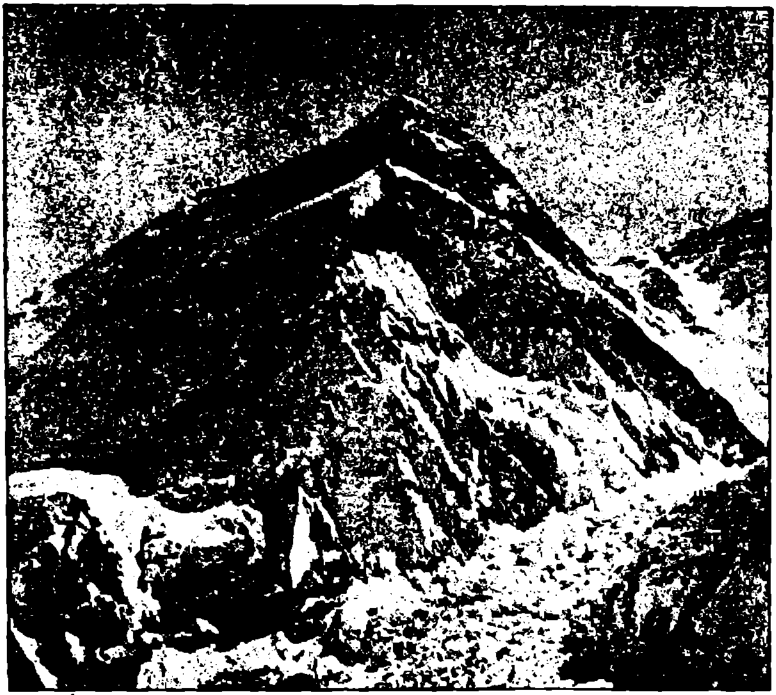

হিমালয় পর্বত শৃংগ

হিমালয়ের গর্বিত মস্তকে মানুষ একদিন প্রচন্ড অহংকারে তুলে দিয়েছে নিজের পা। হিমালয় সেই দিন নতমস্তক হয়েছে বিশ্বের মানুষের কাছে।

তবু তাঁর আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। মৃত্যু ভয়ংকর আর দুর্জয় প্রতিজ্ঞার ইতিহাস। কেমন দুর্বার সাহস নিয়ে মানুষ ধীরে অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে এক বিশাল ভয়ংকরের সুউচ্চ মস্তক লক্ষ্য করে। তা বিস্ময়কর বৈ কি! অবশেষে জয় করেছে তার শিরোদেশ।

বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুঃসাহসিক অভিযান সম্ভবতঃ পর্বতারোহণ। এর রয়েছে পদে পদে বিপদ। পদে পদে রয়েছে অংকের মতো হিসেব। হিসেব করে পা না ফেললে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য।

ঝড়, বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় প্রতি মুহূর্তে। তুষারপাতে চোখ যেতে পারে অন্ধ হয়ে। তারপর রয়েছে তুষার ধ্বস। পর্বতের গায়ে জমে থাকে চাকা চাকা বিশাল বিশাল বরফ। মাঝে মাঝে সেই বিরাট অংশ ধ্বসে পড়ে। যখন তা খসে গিয়ে নিচে নেমে আসতে থাকে তখন সামনে যা পায় সব দলে মুচড়ে একাকার করে দিয়ে যায়। তার সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই।

তারপর আছে আরো হাজারো রকমের রোগব্যাধি। পর্বতারোহণ করতে গেলেই অনেকের মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল হয়, গা বমি বমি করতে থাকে। ফলে অনেকে মারাও যায়।

তাই এর জন্য অভিযাত্রীকে হতে হয় প্রচন্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী।



www.nagorikpathagar.org

চাই তার অসীম ধৈর্য।

তারপর এই বিশাল পর্বত হিমালয়ের চূড়ায় অভিযানের ব্যাপারটি ছিলো আরো দুরুহ এবং ভয়ংকর ও দুঃসাহসিক।

কিন্তু মানুষতো তবু দমে থাকেনি। অজয়কে জয় করাই তো মানুষের নেশা। আর সেখানেই তো তার কৃতিত্ব ও বীরত্ব।

হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃংগ এভারেস্ট অভিযান শুরু হয় এই শতকের গোড়ার দিকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর। এই প্রথম প্রচেষ্টা চালান লন্ডনের আলপাইন ক্লাব (Alpain Club) এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি (Royal Geographical socicty) ১৯২০সালে।

এভারেস্টে অভিযান চালানোর আবার কতগুলো সরকারী নিয়মনীতি রয়েছে। এভারেস্ট চূড়াটির যেখানে অবস্থান এ অংশটি হলো নেপাল আর তিব্বতের অধিকারে। তাই এই এভারেস্টে অভিযান চালাতে গেলে আগে নেপাল ও তিব্বত সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। তাই রয়্যাল সোসাইটির কর্মকর্তারা নেপালের রাজা এবং তিব্বতের দালাইলামার কাছে অনুমোদন চেয়ে আবেদন জানালেন। অনুমোদন পেতে অবশ্য অসুবিধা হলোনা।

অনুমোদন পাওয়ার পরই কর্নেল সি. কে. হাওয়ার্ড বেরীর (Coloncl C.K. Howard Bury) নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণ দল এলেন নেপালে। তাঁরা ১৯২১ সালের ১৮ই মে তারিখে দার্জিলিং থেকে ৫৬০ কিলোমিটার (৩৫০ মাইল) দূরে এভারেস্টের দিকে যাত্রা করলেন।

বেরী সাহেব ছাড়াও এই দলে আরো চারজন ইংরেজ পর্বতারোহী ছিলেন। এছাড়া ছিলেন পথঘাট জরীপ করার জন্য দু'জন লোক, একজন ভূতত্ত্ববিদ, একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। আর ছিলো মালামাল বয়ে নেয়ার জন্য একশো ঘোড়া এবং পথ দেখানো ও পর্বত অভিযানের সময় মালবহন করার জন্য ২২ জন তিব্বতী নেপালী কুলি বা মুটে।

এই বিরাট অভিযাত্রী দল বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বহু দুর্গম পথ পার হয়ে অবশেষে তাঁরা এসে পৌছোলেন হিমালয়ের পাদদেশে।

এই পথটুকু আসতেই তাঁদেরকে পড়তে হলো হাজারো বিপদে। দলের কয়েকজন পড়লো অসুস্থ হয়ে, একজনতো সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারাই গেলেন।

তাঁরা হিমালয়ের পাদদেশে এসে এই প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করলেন এর বিশাল মূর্তি। আকাশ ছোঁয়া বিশাল মূর্তি। পার্শ্বদেশ প্রচন্ড খাড়া। আর গোটা শৃংগটাই বরফে ঢাকা। পাউডারের মতো গুঁড়ো তুষারে ঢাকা। চলতে গেলে পা থেমে যায়। আর তারপর যদি কখনো অসাবধানে কখনো পা ফসকে যায় তখন আর রক্ষে নেই, কোথায় যে হারিয়ে যাবে সে তাঁর আর কোনো হদিসই পাওয়া যাবে না।

এই দলের নেতা বেরী সাহেব হলেও দলের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন ম্যালোরী (Malory) সাহেব। এই ম্যালোরী সাহেবের নাম এভারেস্ট অভিযানের সাথে একান্ত হয়ে জড়িয়ে আছে। এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসেও তিনি সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তির একজন।

কোন্‌দিক দিয়ে এই পর্বতে আরোহণ করা যাবে তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মূল দলকে পেছনে ফেলে ম্যালোরী সাহেব নিজেই একজনমাত্র সংগী নিয়ে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই তাঁর সামনে পড়লো একটি তিব্বতীয়দের বৌদ্ধ মঠ। রংবাক বৌদ্ধ মঠ।

তিনি বহু অনুসন্ধান করে দেখলেন, উত্তর পূর্বদিকে একটি সরু পথ আছে। তাঁর



www.nagorikpathagar.org

অনুমান হলো হয়তো এই সরু পথটা ধরেই উপরে ওঠা যেতে পারে।

তিনি পথটার একটা নামও দিলেন। নাম দিলেন নর্থকোল বা উত্তরের পথ। এই পথটি ছিলো ৭০১০৪ মিটার উচুঁতে; কিন্তু পথ আবিষ্কারের পরই তাঁদের ফিরতে হলো। আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ায়-এই মুহূর্তেই আর অভিযান চালানো সম্ভব হলো না।

## জেনারেল ব্রুসের অভিযান

প্রথমবারের অভিজ্ঞতার আলোকেই শুরু হলো পরের বছরের অভিযান। দ্বিতীয় অভিযানে দলের নেতা হলেন জেনারেল ব্রুস (General Bruce)। এছাড়াও এই দলে ছিলো তেরোজন ইংরেজ এবং ষাটজন শেরপা।

এই তেরোজন ইংরেজের মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান পর্বতারোহী। এঁরা হলেন ম্যালোরী, নর্টন (Nartin), সমারভেল (Somarvile) এবং ফিঞ্চ (Finch)।

তবে এই চারজনের মধ্যেও আবার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ম্যালোরী সাহেব। প্রথম অভিযানেও তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। এবারও মূলতঃ তাই।

১৯২২ সালের ২রা মে তারিখে তাঁরা ১৮ হাজার ফুট উপরে স্থাপন করলেন প্রথম তাঁবু (Base Camp)। আসলে এই তাঁবু থেকেই চালানো হবে মূল অভিযান।

দিন পাঁচেক তারা অবস্থান করলেন এই তাঁবুতেই । তারপর ৭ই মে তারিখে আরো প্রায় ১২০০ ফুট উপরে অর্থাৎ ১৯,৩৬০ ফুট উপরে স্থাপন করা হলো দ্বিতীয় তাঁবু।

পরের দিন ৮ই মে তারিখে ২১ হাজার ফুট উঁচুতে স্থাপন করা হলো তিন নম্বর তাঁবু।

এই তিন নম্বর তাঁবুতেই কেটে গেলো আরো প্রায় দশ-এগারো দিন। তারপর ১৭ই মে ২৩ হাজার ফুট উপরে স্থাপন করা হলো চতুর্থ তাঁবু।

এতোটুকু উপরে এসেই অনেকের অসুবিধা হতে লাগলো। কারো কারো শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। সংগে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন না থাকায় দলের অনেককে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলো। তাঁরা নেমে এলো নিচে।

বাকী যাঁরা রইলেন শুরু করলেন অভিযান। তাঁরা আরো উপরে উঠতে লাগলো। ২৩শে মে তারিখে ২৫ হাজার ফুট উপরে স্থাপন করা হলো পঞ্চম তাঁবু।

কিন্তু এর পরই আবহাওয়া মারাত্মক খারাপ হয়ে উঠতে লাগলো। শুরু হলো বৃষ্টি আর তুষারপাত।

সারাদিন তারা অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু তুষার বৃষ্টি থামলো না। সকলে পেছনে রইলো। শুধু ওঁরা চারজন প্রধান অভিযাত্রী ম্যালরী, ব্রুস, সমারভেল আর ফিঞ্চ উঠতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুদূর ওঠার পর দলনায়ক জেনারেল ব্রুস এবং ফিঞ্চ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আর এগুনো সম্ভব হলো না তাদের পক্ষে। অতঃপর তিনি ফিরতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু ম্যালোরীর ছিলো দুর্দান্ত মনোবল আর শক্তি সাহস। তিনি এতো সহজে হার মানতে রাজী হলেন না। তিনি পিছু হটতে রাজী নন।

অতঃপর তিনি (ম্যালোরী) সমারভেলকে সাথে নিয়ে আরো উপরে উঠতে লাগলেন। এমনি দুঃসাহসে ভর করে তাঁরা দু'জন প্রায় ২৭ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন।

কিন্তু তারপরই ঘটলো দুর্ঘটনা। তাদের সাহায্যকারী ৭ জন শেরপা সহসা পা পিছলে পড়ে গেলো তুষারের মধ্যে।

তখন ম্যালোরী আর সমারভেল দ্রুত এগিয়ে এলেন ওঁদের উদ্ধার করার জন্য।



www.nagorikpathagar.org

১৯২২ সালের অভিযাত্রীরা সি, জি, ক্রফোর্ড, কর্ণেল ই, এফ, নর্টন,
জি, এল, ম্যালরি, ডঃ টি, হাওয়ার্ড সমারভেল, মেজর
এইচ, টি, মর্শেদ, ডঃ ওয়েকফিল্ড, কর্ণেল ই, এল, ষ্ট্রাট,
জে, সি, জি, ব্রুস, জি, আই ফিঞ্চ

প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তিনজনকে অবশ্য বাঁচাতে সক্ষমও হলেন কিন্তু বাকী চারজনের আর কোনো সন্ধানই করতে পারলেন না। এই তুষার সাগরে কোথায় যে ওঁরা হারিয়ে গেলো তার আর হদিসই করতে পারলেন না তাঁরা।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর আর অভিযান চালানো সম্ভব হলো না। সুতরাং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হলো ম্যালোরীকে।

## ১৯২৪ সালের অভিযান

দু'বছর পর ১৯২৪ সালে শুরু হলো আবার অভিযান। এবার যে দল এলেন এ দলেও ম্যালোরী ছিলেন। অভিযানের নায়ক ছিলেন নর্টন। এছাড়াও এ্যাড্রো আরভিন বলে আরো এক লোক ছিলেন। তাছাড়া দলের সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন ব্রুস।

নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁরা উঠতে লাগলেন উপরের দিকে। প্রায় ২৮,২০০ ফুট পর্যন্ত তাঁরা উঠে এলেন।

এর পর এখানেই স্থাপন করা হলো তাঁবু। এবার আর দল বেঁধে নয়। শুধু ব্রুস আর ম্যালোরী বের হলেন তাঁবু থেকে।

কিন্তু তখনি শুরু হলো প্রচন্ড দুর্যোগ। বইতে লাগলো তীব্রবেগে তুষার ঝড়। এই প্রচন্ড দুর্যোগ ঠেলে আর তাঁরা অগ্রসর হতে পারলেন না মোটেও। ম্যালোরীর মতো দুঃসাহসিক ব্যাক্তিও মুড়ে পড়লেন ঝরের তীব্রতার মুখে।



www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তাঁরা আবার নেমে এলেন নিচের তাঁবুতে। এদিকে দুর্ঘটনা আরো ঘটে গেছে। ঝড়ের তীব্রতায় আর বিরূপ আবহাওয়ায় নর্টন গেছে অন্ধ হয়ে। আর সমার ভেল তাঁর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু এই যে দুর্যোগ আর বিপদ এর মধ্যেও কিন্তু ম্যানরী ছিলেন অটল। আসলেই লোকটা ছিলেন মৃত্যু ভয়হীন। কোনো কিছুতেই তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। সবাই ফিরে যেতে চাইলেন গুখার বসলেন ম্যানরী।

–না, এতোদূর এসে আমি নিচে নেমে যেতে পারবো না। ম্যানরী বললেন।

– তাহলে কি করবেন ? আরাভিন বিচ্ছেদ করবেন ।

–অভিযান চলবে। ব্যর্থতা আমার ভালো লাগেনা।

– এই দুর্যোগের মধ্যেও অভিযান চালাবেন ?

এখানে এসে সমতল ভূমির মতো সুন্দর আবহাওয়া আশাকরা পাগলামো। এখানে এটাই স্বাভাবিক। তারজন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকার লোক আমি নই।

– বেশ, তুমি যেতে পারো তবে আমিও আছি তোমার সাথে। আরাভিন বললেন,– তুমি মরনে আমিও মরতে পারবো।

অতঃপর তাই স্থির হলো। গোটা দল ফিরে গেলেও ম্যানরী আর আরাভিন তাঁদের অভিযান অব্যাহত রাখবেন।

এই দলে ওডেল নামে এক লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন ভূ-তত্ত্ববিদ। ম্যানরী আর আরাভিনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ওডেল বললেন,–বেশ তাহলে আমিও আছি তোমাদের সাথে।

অতঃপর ওরা তিনজনেই রওনা দিলেন অভিযানের পথে। উঠতে লাগলেন উপর দিকে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন দু'হাতে ঠেলেই তারা এগুতে লাগলেন।

কিন্তু ওডেল আর বেশী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বসে পড়লেন। অতঃপর তার সেখানেই একটি তাঁবু খাটানো হলো।

ওডেল বললেন,–বেশ, তোমারা এগিয়ে যাও আমি এখানেই রইলাম।

অতঃপর ম্যানরী আর আরাভিন দুজনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ওডেল চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগলেন ওদের পর্বতারোহন।

ওডেল দেখছেন দূরে বহু দূরে দু'জন লোক–ঠিক দেখতে দূর থেকে পুতুলের মতোই মনে হয়। এগিয়ে যাচ্ছে পর্বতের সাদা ধবধবে গা বেয়ে। আর মাত্র ৮০০ ফুট বাকী।

হঠাৎ-ই ওডেল দেখলেন যেখান দিয়ে ম্যানরী আর আরাভিন পর্বতের গা বেয়ে উঠছে ঠিক ওপর থেকে প্রকান্ড একটি বরফের চাঁই প্রচন্ড বেগে নিচের দিকে নেমে আসছে। একে বলে তুষার স্তুপ ।

ওদের কাছে আসতেই ওডেল দেখতে পেলেন ওরা যেনো দু'জনেই চাঁইটাকে পাশ কাটিয়ে দেখার জন্য সরে দাঁড়ালেন। ওডেল আর সেই মুহূর্তে বরফের চাঁইয়ের আড়ালে ওদের দেখতে পেলেন না।

তারপর চাঁইটা যখন আপন গতিতে নিচে নেমে এলো, তখন আর ওদের দেখা গেলোনা।

তারপর আর সত্যি সত্যি কোনো দিনই তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনি করে দুটো দুঃসাহসিক চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন তুষার স্তুপের অন্তরালে।

অতঃপর এ অভিযানও ব্যার্থ হলো এভারেষ্টের গর্বিত মস্তক এতো সহজে পদানত হলো না ক্ষুদ্র মানবের কাছে।



www.nagorikpathagar.org

ক্ষুদ্র আরাতিন আর ম্যানরী নয়, এই অভিযানে তারা হারিয়ে ছিলেন আরো বিরাট অমূল্য প্রাণ। রংবোক চূড়ায় আজো তাঁদের স্মৃতি স্তম্ভ আছে।

কিন্তু তাঁরা দমলেন না। ব্যর্থতা যতোই আসতে লাগলো তাঁদের জেদ ও যেনো ততটাই বাড়তে লাগলো। মৃত্যুভয়কে তাঁরা তুচ্ছকরে আবারো তাঁরা এগিয়ে গেলেন দৃঢ় পদক্ষেপে।

কিন্তু তবু ব্যর্থতা এলো। ১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সালের অভিযানও ব্যর্থ হলো। তারপর আবার অভিযান শুরু হলো ১৯৫১ সালে। এই বছর শিপটর নামে এক অভিযাত্রী এভারেষ্টে আরোহনের একটি নতুন পথ আবিষ্কার করলেন।

## এভারেস্টের বিজয় অভিযান

তারপর এলো সেই ১৯৫৩ সাল। এবার এলেন একটি নতুন অভিযাত্রী দল। এই দলেই ছিলেন-নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী এডমন্ড পি হিলারী। (Admund P.Hillary) এবং নেপালের অধিবাসী শেরপা তেনজিং নোরকে।

এছাড়াও এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রী দলে উল্লেখযোগ্য আর যারা ছিলেন তারা হলেন-কর্নেল জন হান্ট (John Aunt), টমাস স্টোবার্ট (Thomas stohart), জর্জ সি বান্ড (Geroge C Band), আলফ্রেড গ্রেগরী (Alfred Gregory), উইল ফ্রেইড নইx (Wilfried Noyci), চার্লস জি ও কে উইলি (Charle Geoffrey Wylie), টমাস বুর্দিলন (Thomas Baurdillon) আর সি ইভান্স (R.c Evans) জর্জ লাওই (George Louce) এবং এল. জি. পুগ (L.G.Pugh), প্রমুখ।

এডমন্ড হিলারীর নেতৃত্বে এই দলটিই শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভে সক্ষম হয় এবং বহু কালের অজেয় হিমালয় মাথানত করে মানুষের প্রচেষ্টার কাছে।

১৯৫৩ সালের ২৮ শে মে তাঁরা অনেক উঁচুতে ৮নং তাঁবু ফেললেন। ২৭,৮০০ফুট উঁচুতে। কিন্তু আবহাওয়া এরই মধ্যে ভয়ানক খারাপ হয়ে উঠলো। শুরু হলো প্রচন্ড বাতাস। আর অসহ্য শীত। গোটা এলাকা কুচি কুচি বরফে ভর্তি। পা ফেললে হাটু পর্যন্ত ডুবে কুচি বরফে। এই প্রচন্ড শীতে তাঁরা ঘুমতে পারলেন না সারা রাত।

তবু তাঁরা অভিযান বন্ধ করলেন না। এই প্রকিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই তাঁরা পরস্পরের কোমরে দড়ি বেধেঁ চলতে লাগলেন সাবধানে।

ভয়ানক বিপদ সংকুল পথ। সামান্য পা পিলিয় গেলে আর রক্ষে নেই। অবধারিত মৃত্যু। গড়িয়ে পড়তে হবে শত শত ফুট নীচে। হয়তো বিশাল বরফের স্তুপে কোথায় হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

অবশেষে তাঁরা পৌছলেন শেষ ঘাটিতে। ৯ নং তাঁবু ফেলা হলো এখানেই। এটাই হবে অভিযানের শেষ ঘাঁটি। এখান থেকে এভারেস্ট চূড়া আর মাত্র ৮৮০ ফুট উঁচু। এই পথটুকু এগুতে পারলেই চূড়ান্ত বিজয়।

এবার থেকে চললো শেষ এবং চূড়ান্ত বিজয় অভিযান।

এই চূড়ান্ত অভিযানে যাত্রী হলেন দুজন। এডমন্ড হিলারী এবং শেরপা তেনজিং। অন্য সবাই তাঁবুতে অপেক্ষা করবেন।

দু'জনেরই পিঠে বাঁধা আছে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং মুখে গ্যাস মুখোস। এতো উচুতে বাতাস এতো হালকা যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশাস গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এদিকে অক্সিজেনের মজুত শেষ হয়ে আসছে। অক্সিজেন শেষ হয়ে গেরে আর একমুহূর্তও এখানে থাকা যাবেনা। নেমে যেতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

হিমালয়ের বরফ ঘেরা কোলে পর্বত আরোহীদের ক্যাম্প

তাই অক্সিজেন শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই অভিযান শেষ করতে হবে।

অতঃপর দুঃসাহসী দুবীর এগিয়ে চললেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। খুব সাবধানে আর দৃঢ়তার সাথে পা ফেলে ফেলে তাঁরা ক্রমাগত উঠতে লাগলেন চূড়ার দিকে। মনে ওদের দুরন্ত সাহস। যেমন করেই হোক অজেয় শৃংগকে পদানত করতেই হবে।



www.nagorikpathagar.org

তারপর সত্যি সত্যি এলো সেই চরম মুহূর্ত। মানুষের বিজয় অভিযানের একটি চিরস্মরণীয় ক্ষণ। ২৯ শে মে তারিখের বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রথম পৃথিবীর মানুষ পদচিহ্ন এঁকে দিলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃংগ এভারেষ্টের চূড়ায়। এর যিনি এই ঐতিহাসিক বিজয় লাভের গৌরব অর্জন করলেন তিনি হলেন শেরপা তনজিং।

আসলে ঘটনাটি হয়েছিল এরকম। ওরা যখন সর্বশেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন, আর মাত্র কয়েক ফুট বাকী। এখান থেকে খাড়া উচুতে উঠেগেছে চূড়াটি।

হিলারী ছিলেন বয়স্ক ও ভারী মানুষ। তাই তারপক্ষে সামনের এই খাড়া গা বেয়ে উপরে ওঠা ছিলো ঝুকিপূর্ণ। আর এদিকে তেনজিং ছিলেন হালকা পাতলা গড়নের শক্তিসমর্থ ও চটপটে যুবক। তাই হিলারী নিজেই আদেশ দিলেন তাঁকে আগে উপরে উঠে খুটি পুঁততে তারপর রশি টেনে ধরবে যাতে হিলারী সহজে উঠতে পারেন।

হিলারীর কথা মতোই তেনজিং তর তর করে উঠে গেলেন বাকী পথটুকু– আর এমনি করে একজন সামান্য মানুষ হয়েও তেনজিং উতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে

এডমণ্ড হিলারী

শেরপা তেনজিং

লিখে নিলেন নিজের নাম। প্রতিযোগিতায় টিকে গেলেন তেনজিং।

তেনজিং উপরে উঠে তারপর টেনে তুললেন হিলারীকে।

এই জন্যই এভারেষ্ট বিজয়ের ইতিহাসে আগে লেখা হয় শেরপা তেনজিং এর নাম পরে স্যার এডমন্ড হিলারীর নাম।

শেরপা তেনজিং ও হিলারীর অভিযানের পরও আশে হিমালয় অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

১৯৫৬ সালের ২৩ শে ও ২৪শে মে তারিখের সুইজারল্যান্ডের একদল অভিযাত্রী দুদলে দু'বার এভারেষ্ট চূড়ায় আরোহন করেছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

১৯৬৫ সালে সর্ব প্রথম একটি ভারতীয়দল এভারেস্ট অভিযান করেন। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন লেঃকঃএম, এস, কোহলী। এই দলেরই মিঃএ,এস চীমা ও নাওয়াং গেম্বু ২০শে তারিখে এভারেস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন।

১৯৭৫ সালে একদল জাপানী মহিলাদলও এভারেস্ট অভিযান করেন। এই দলেরই মিসেস জুনকো তাবেই (Mrs Junko Tabei) তার সঙ্গী শেরপা আং সেয়িং কে নিয়ে এভারেস্ট বিজয় করেন।

এই জুনকো তাবেই প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলাও এভারেস্ট চূড়ায় ভারতীয় মহিলাও এভারেস্ট চূড়ায় আরোহন করতে সক্ষম হন। তিনি হলেন বাচেন্দ্রী পাল। তিনি নিজেও ছিলেন পাহাড়ী মেয়ে। বাড়ী ছিলো গাঙ্গোত্রীর নিকট একটি গাঁয়ে।

এই এভারেস্ট অভিযান আজো অব্যাহত রয়েছে। এখন এভারেস্ট অভিযান একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো বাপার।



www.nagorikpathagar.org

# আমেরিকা আবিষ্কার

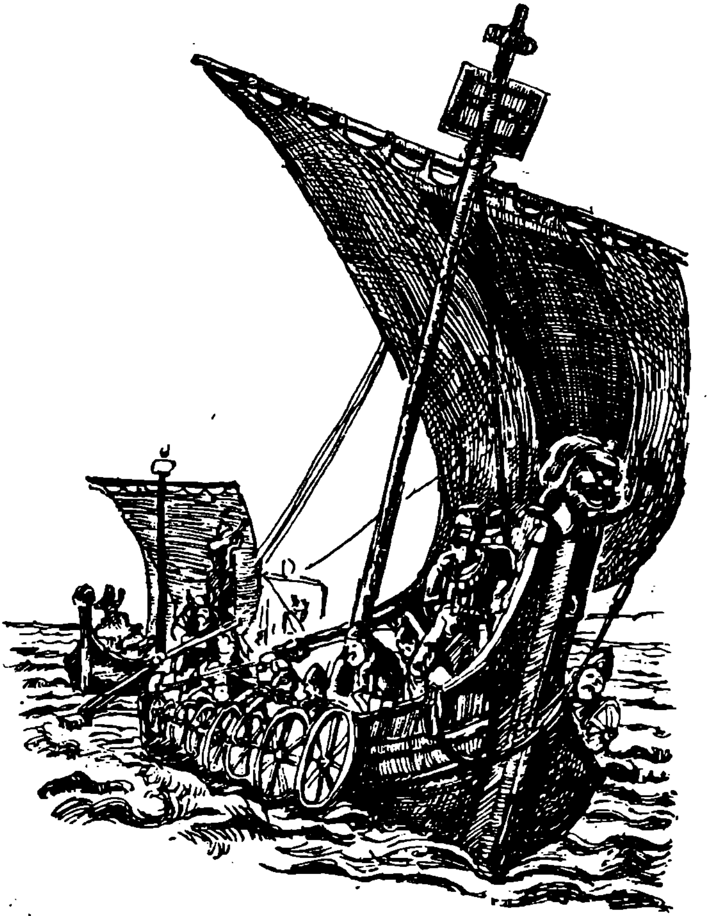



www.nagorikpathagar.org

# আমেরিকার সত্যিকার আবিষ্কারক কে ?

বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ যা প্রমাণিত সত্য, আগামীকাল আরো উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা আবিকৃত হতে পারে আরেক সত্য। তখন বাতিল হয়ে যায় গতকালকের কথা।

তেমনি ইতিহাসেরও চিরসত্য বলে হয়তো কিছু থাকতে নেই। ইতিহাস কখনো উল্টে যাবেনা, এমনও কোনো কথা নেই।

আজকের ইতিহাসে যাকে সত্য বলে জানি, কাল আরো সূক্ষ্ম গবেষণায় তা বাতিল হতে পারে, সেখানে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে আরেক সত্য। আরেক নতুন কথা। নতুন রূপে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তেমনি পুরনো সত্যকে আঁকড়ে ধরে নতুনকে বরণ না করারও কোনো যুক্তি নেই।

এমনি করে পরিবর্তিত হতে হতেই এক সময় আমরা পৌছে যাবো শেষ সত্যে। তাই সে পথে পা বাড়াতে ভয় করার কিছু নেই। দ্বিধা থাকারও কথা নয়।

ইতিহাসে কতোকাল ধরেই তো লেখা ছিলো আমেরিকা আবিষ্কারের কথা। আমেরিকা আবিষ্কারের কথা উঠলেই সবার আগে যাঁর নামটি মনে পড়ে তিনি হলেন দুঃসাহসিক নাবিক কলম্বাস।

আমরা জেনে এসেছি এই নাবিক কলম্বাসই আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তিনিই প্রথম সভ্য সমাজের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একটি অজ্ঞাত ভূখন্ডকে, একটি বিশাল মহাদেশকে।

তাই আমেরিকা আবিষ্কারের মূল কৃতিত্ব তারই। তবু অতি সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফল ভিন্ন রকম দাঁড়াতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলছেন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন বটে। হয়তো কলম্বাসের পর থেকেই আমেরিকার অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে সভ্য জগতের কাছে প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু তিনি হয়তো ইউরোপ, এশিয়ার প্রথম মানুষ নন যিনি অজ্ঞাত দেশ আমেরিকাতে প্রথম পা রেখেছিলেন।

তাঁরা বলতে চাইছেন কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা গিয়ে পৌছান। কিন্তু সেটাই ইউরোপীয়দের সবপ্রথম আমেরিকা পদার্পণ নয়, এর আগেও কেউ না কেউ ইউরোপ বা এশিয়া থেকে এখানে এসেছিলেন। হয়তো তাদের আগমন ততোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। এতোটা ব্যাপক প্রচারলাভও করেনি। হয়তো তারা আবিষ্কার অর্থেও সেখানে যাননি। কেউ গিয়েছিলেন একান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহলে, কেউ গিয়েছিলেন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে।

তাই সেকথা লেখা হয়নি ইতিহাসের পাতায়। গুরুত্ব পায়নি আবিষ্কার বলে।

তবু সেই অতীতের নিভু নিভু প্রদীপের শিখা আবার জ্বলতে শুরু করেছে। অতীতের অনেক পুরানো ধূসর দিগন্তের আলো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আধুনিককালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের। ইতিহাসের পাতায় আবার নতুন করে লেখা হচ্ছে সেইসব বিস্মৃতকালের কিছু কিছু অজ্ঞাত অখ্যাতদের নাম। সেই সাথে সৃষ্টি করেছে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিতর্কেরও।

বিতর্ক হলো-যদি আমেরিকায় কলম্বাস ইউরোপ, এশিয়ার প্রথম মানুষ না হন-



www.nagorikpathagar.org

তাহলে কে সেই প্রথম মানুষ? সে কোন্ ব্যক্তি বা কোন দেশ প্রথম আমেরিকায় পৌঁছানোর গৌরবের অধিকারী। অবশ্য এর কোনো সঠিক মিমাংসা আজো হয়নি। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও আছে নানা মতপার্থক্য। নানা যুক্তিতর্ক, এ তর্কের শেষ নেই।

## চীনাদের আমেরিকা গমন

কেউ বলেন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার প্রায় তিন হাজার বছর আগেই চীনারা প্রথম আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিলো। ইহুদীরা বলছে-তাদের পূর্ব-পুরুষেরা কলম্বাসেরও পনেরো শত বছর আগে গেছে আমেরিকাতে।

তবে তথ্য প্রমাণাদিসহ যাদের যাদের দাবী সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ তারা হলো খৃষ্টীয় অষ্টম দশম শতকের স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলদস্যু ভাইকিংরা। তাদের দাবী হলো-তারাই সর্বপ্রথম আমেরিকা গেছেন। কলম্বাসেরও পাঁচ শত বছর আগেই তারা আমেরিকার মূল ভূখন্ডে অবতরণ করে। এদিক থেকে তারাই আমেরিকার সত্যিকার আবিষ্কারক। ইরিকসন নামে তাদের এক পূর্ব-পুরুষ অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে প্রথম আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছে। চীনে আমেরিকা আবিষ্কার নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে। তারাও হাজির করছে নানা তথ্য প্রমাণাদি।

চীনের অন্যতম বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ ফং জং সু দাবী করেছেন-এশিয়া ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি অজানা দেশ এই আমেরিকাতে (তখন এর কোন নাম ছিলো না) এসে পৌছেন তিনি হলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু,

এই বৌদ্ধ ভিক্ষুই গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য ৪৫০ খৃষ্ট, পূর্বাব্দে সমুদ্র যাত্রায় বের হন। তিনি দীর্ঘ সাত হাজার মাইল সমুদ্র ভ্রমণের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ৪৯৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

ডঃ ফং জুং সু তাঁর যুক্তির পেছনে অবশ্য কিছু তথ্য প্রমাণাদিও সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এই প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে, তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে সেখানে একটি প্রাচীন চীনা নোঙ্গর আবিষ্কার করেছেন। এই প্রাচীন চীনা নোঙ্গর এখানে কেমন করে এলো তাঁর উপর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ নিশ্চয়ই সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর জাহাজের নোঙ্গর।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই ভ্রমণ কাহিনী অবশ্য চীনে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই রোমাঞ্চকর ও দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনীর উপর ৬০০ খৃষ্টাব্দে চীনের রাজা লিয়াং এর রাজত্বকালে মোট পঞ্চাশ খন্ডে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিলো।

এই বিশাল ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থটিতেই বর্ণিত আছে লুইসেন নামে এই চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর সেকালের পালতোলা জাহাজ নিয়ে অজানা এক দেশের 'ফুসাং' নামে একটি প্রদেশে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

ইতিহাসবিদ ফুং জুং সু বলেন, এই ফুসাং প্রদেশটি আসলে হলো আমেরিকার বর্তমান মেক্সিকো অঞ্চল। এই মেক্সিকোতেই প্রথম লুইসেন গিয়েছিলেন।

লুইসেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নিজের দেখার এবং অভিজ্ঞতার অনেক বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি অজানা দেশের যেখানে গিয়ে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন সে দেশের মানুষের কথা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিয়ে, সুখ-দুঃখের অনেক বর্ণনাই দিয়েছেন।

লুইসেনের এই বর্ণনার সাথে মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক মিল আছে। যেমন-ফুসাং শব্দটি এসেছে মেক্সিকোতে জন্মায় এক বিশেষ জাতের ক্যাকটাসের নাম থেকে। এই গাছের নামেই সেকালে দেশটির নাম রাখা হয়েছিলো। এই জাতীয় ক্যাকটাস এখনো মেক্সিকোতে প্রচুর পাওয়া যায়। সেকালের লোকেরা এই ফুসাং



www.nagorikpathagar.org

ক্যাকটাসের ছাল বা বাকল দিয়ে পোশাক তৈরিও করতো। ডঃ ফুং দু'জন আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদের সহায়তায় ১১টি বড় ধরনের পাথরের নোঙ্গর আবিষ্কার করেছেন। এগুলো হলো প্রাচীন চীনা নোঙ্গর। প্রফেসর হ্যামেস আর মরিয়ারিটি এবং ল্যারী পিয়ারসন নামের এই দু'জন মার্কিন পন্ডিতও মনে করেন-এই নোঙ্গরগুলো অবশ্যই চীনা জাহাজের। প্রাচীনকালে চীনের কোনো জাহাজ হয়তো এখানে বিধ্বস্ত হয়েছিলো।

এসব তথ্য প্রমাণাদি থেকেই তারা অনুমান করেন-হয়তো কলম্বাসের অনেক আগেই চীনারা এখানে এসেছিলো।

এই প্রমাণের পরেও আবার প্রশ্ন আছে। অনেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন রকম প্রশ্নও তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন- শুধু গোটা কয়েক প্রমাণ পেলেই হবে না, এতো বড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে ভেবে দেখতে হবে-অতো আগে চীনারা সত্যি সত্যি বিশাল মহাসাগর পাড়ি দেবার মতো শক্তি অর্জন করেছিলো কিনা। ঐ অতো আগে চীনাদের সমুদ্রযাত্রার অগ্রগতি অতো উন্নত ছিলো কিনা।

এই বিরোধী মন্তব্য খন্ডন করতে গিয়ে ডঃ ফুং বলেছেন-প্রাচীন ইতিহাস পড়ে দেখা গেছে, সেই আদিকাল থেকেই চীনারা সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ছিলো।

তিনি বলেন-খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই চীনারা সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী ছিলো। তখনই তাদের জাহাজগুলো সমুদ্রে যাতায়াত করতো। তারপর খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তারা জাহাজে বড় বড় মাস্তুলের ব্যবহার শিখেছিলো এবং এসব মাস্তুলে বড় বড় পাল খাটিয়ে তারা সঠিক পথে সমুদ্রের দূর-দূরান্তরে যাত্রা করতো।

এরপর তাদের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তৃতীয় শতকে তারা জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ, দূরত্ব মাপা এবং দিক নির্ণয়ের কৌশলও আয়ত্ব করে ফেলেছিলো।

পঞ্চম শতাব্দিতে চীনারা বহু দূর দেশের সাথে বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো। পঞ্চম শতাব্দি থেকেই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়ার মতো ক্ষমতা চীনাদের ছিলো।

আর তাছাড়া সেই প্রাচীনকাল থেকে চীন অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বেশ সমৃদ্ধশালী ছিলো।

তৃতীয় শতাব্দিতে 'উ' রাজ্যের এক রাজার প্রায় তিন হাজার জাহাজের এক বিশাল নৌবহর ছিলো। সেদিক থেকেও বলা যায় সেই প্রাচীনকালে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহু দূরে যাবার মতো চীনাদের আর্থিক সংগতিও ছিলো।

ডঃ ফুং প্রাচীনকালে চীনাদের আমেরিকায় উপস্থিতির আরেকটি নৃতাত্বিক প্রমাণও হাজির করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন-আদি আমেরিকানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়। তিনি দাবী করেন-এরা আদি মার্কিনী নয়। এরাই হলো সেই আদি চীনাদের পূর্ব-পুরুষ। যারা চীন থেকে কলম্বাসেরও বহু পূর্বে এখানে এসেছিলো। তাদেরই কেউ কেউ হয়তো এখানে এসে আর স্বদেশে ফিরে যায়নি। এখানেই গড়ে তুলেছিলো স্থায়ী বসত। এখনকার মঙ্গোলীয় চেহারার আদি আমেরিকানরা হয়তো সেই এশীয়দেরই বংশধর।



www.nagorikpathagar.org

## ইহুদীদের আমেরিকা গমন

কলম্বাসের পূর্বে ইহুদীদের আমেরিকা গমনের পক্ষে যিনি দাবী উত্থাপন করেছেন তিনি হলেন-ব্রান্ডেলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সাইরাস গর্ডন। তিনি নিজেও একজন ইহুদী এবং সাগর বিষয়ক বিদ্যার বিশারদ বলে খ্যাত।

ডঃ গর্ডন তাঁর দাবীর প্রেক্ষিতে একটি প্রাচীন প্রস্তরলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রাচীন প্রস্তরলিপিটি তিনি আবিষ্কার করেছেন-আমেরিকার টেনেসির একটি গোরস্তান থেকে ১৮৮৫ সালে।

প্রাচীন লিপিটি ছিলো কবরে অবস্থিত একটি কংকালের নিচে। এই প্রস্তরলিপিটি এখনো ওয়াশিংটনের স্মিথসন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তরলিপিটির পাঁচটি বর্ণ লেখা হয়েছে কেনান পদ্ধতিতে। যা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও জর্ডন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লিপির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই এলাকাটি বর্তমানে ইসরাইলী প্রোমিসল্যান্ড (Promiscland) বলে পরিচিত।

গর্ডন বলেছেন-খোদিত এই লিপিটির গড়ন অনেকটা রোমক আমলের হিব্রু বর্ণের মতো।

গর্ডন সাহেবের যুক্তি হলো-অতো প্রাচীনকালে আমেরিকাতে হিব্রুবর্ণ গেলো কেমন করে ? তাহলে নিশ্চয়ই হিব্রু ভাষাভাষীরাই তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা কলম্বাসের আগেই গিয়েছিলো।

চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ ফুং এর মতো তিনিও কিছু নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন-শুধু প্রাচীন হিব্রুলিপি নয়। সেখানে এখনো জর্ডন অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা বসবাসও করছে। পশ্চিম টেনেসিতে এখনো কিছু কিছু ইহুদীর উত্তর-পুরুষ বাস করছে।

এরা অবশ্য এখানে ইহুদী বলে পরিচিত নয়। এখানে এদের নাম হলো মিলাঞ্জিয়নস। কিন্তু এরা রেড ইন্ডিয়ান নয়, কিংবা নিগ্রোও নয়। তারা ককেশীয়; কিন্তু এ্যাংলোস্যাক্সন নয়।

এরাই হলো বহু পূর্বে কলম্বাসেরও আগে এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া হিব্রু ভাষাভাষী ইহুদী।

টেনেসিতে হিব্রুলিপি আবিষ্কার এবং নৃতাত্ত্বিক প্রমাণই বহু পূর্বে ইহুদীদের আমেরিকায় গমনের দাবী জোরদার করে তুলেছে।

## মিশরীয়দের আমেরিকা গমন

কলম্বাসের আগেই আমেরিকায় পৌছোনোর আরেক দাবীদার হলো মিশর।

চীনা এবং ইহুদীদের মতোই মিশরীয়রাও তাঁদের দাবীর পেছনে হাজির করেছেন নানা রকম যুক্তি প্রমাণ।

১৯৭০ সালে নরওয়ের জাতিগত বিদ্যা বিষয়ক পন্ডিত থোর হেইয়ারডাল বলেছেন যে, তিনি আমেরিকার সেন্টপিয়েরীতে খনন কাজ চালিয়ে একটি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। পরে এই মুদ্রাটিকে প্যারি ইনস্টিটিউট মিশরের দ্বিতীয় ফারাওদের আমলের মুদ্রা বলে সনাক্ত করেছেন। হেইয়ারডাল নিজের হাতেও একটি মজার ধরনের প্রমাণ করেছেন।

আমরা জানি, প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাস নামে এক ধরনের গাছের পাতা দিয়ে কাগজ তৈরিও করতো। এই প্যাপিরাস শব্দ থেকেই পরে পেপার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।





www.nagorikpathagar.org

মিশরীয়রা এই প্যাপিরাস গাছের পাতা দিয়ে শুধু কাগজ নয়, বড় বড় নৌকা এবং জাহাজও তৈরি করতো। এই জাহাজে পাল খাটিয়ে তারা পাড়ি দিতো বিশাল সমুদ্র। বাণিজ্য বেসাতি নিয়ে পৌঁছে যেতো একদেশ থেকে আরেক দেশে।

এই প্যাপিরাস গাছ এখনো মিশরে আছে। এই যে ডঃ হেইয়ারডালের কথা বললাম–তিনি গত ১৯৭০ সালে এমনি একটি প্যাপিরাসের জাহাজ তৈরি করে নিজেই পাড়ি দিয়েছিলেন আটলান্টিক মহাসাগর। তিনি নিজে প্যাপিরাসের জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে এসে বলেছেন–হয়তো মিশরীয়রাও এমনিভাবে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলো চার হাজার বছর আগেই। কারণ এ ধরনের জাহাজে করে সাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব। তিনি নিজের হাতেই তার প্রমাণ করেছেন।

কলম্বাসের আগে আমেরিকায় পৌঁছোনোর অন্যান্য দাবীদারদের মধ্যে রয়েছে–তিব্বতীয়রা এবং ফিনিশীয়রাও। এদের দাবীর পেছনেও রয়েছে নানা যুক্তি এবং সেই সাথে কিছু তথ্য প্রমাণও।

## ভাইকিংদের আমেরিকা আবিষ্কার

তবে কলম্বাসের আগে আমেরিকায় পৌঁছোনোর সবচেয়ে বড় দাবীদার হলো–নরওয়ের ভাইকিং জলদস্যুরা।

তাদের দাবীর পেছনে যুক্তি হলো– প্রত্নতত্ত্ববিদরা উত্তর আমেরিকায় নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে খনন কাজ চালিয়ে প্রাচীনকালে মেয়েদের সূতা কাটার টাকু আবিষ্কার করেছেন এবং এই টাকুটি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ভাইকিংদের প্রাচীনকালের ব্যবহৃত টাকু।

নরওয়ের বিখ্যাত সৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিক হেলেগ ইনগস্টাগের স্ত্রী দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপের সম্ভাব্য বহু স্থানে খনন কাজ চালিয়ে এই প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন। এ টাকু যে ভাইকিংদেরই পূর্ব-পুরুষদের এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এটাই বলতে গেলে প্রথম গৃহস্থালী প্রমাণাদি আবিষ্কার হলো এবং সবচেয়ে যুক্তিসংগত প্রমাণ।

দাবী করা হয়, এই ভাইকিং জলদস্যুরাই কলম্বাসেরও পাঁচশো বছর আগে আমেরিকায় পৌঁছে। লীয়র ইরিকসন নামে ভাইকিংদের এক পূর্ব–পুরুষ তার পালতোলা জাহাজ নিয়ে প্রথমে আমেরিকার নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর তিনি মূল ভূ-খন্ডেও গিয়েছিলেন।

এখনো উত্তর গোলার্ধের কিছু কিছু দেশ বা দ্বীপের নাম আছে–যে গুলো রীতিমতো রহস্যময়। এদের এমন নাম কেন হলো–তা নিয়ে অনেকের মনে খটকা লাগতে পারে।

যেমন–উত্তরের একটি দেশের নাম গ্রীনল্যান্ড। এর অর্থ সবুজের দেশ। নামের অর্থ অনুসারে এ দেশটি হওয়া উচিত সবুজ শ্যামলীমাময়। ফুলে ফসলে পরিপূর্ণ একটি দেশ।

কিন্তু আসলে ঘটিনাটি একেবারে উল্টো। এখানে সবুজের কোনো নামগন্ধও নেই। বলতে গেলে গোটা দেশটাই প্রায় চাপা পড়ে আছে জমাট বাধা বরফের নিচে। যেদিকে চোখ যায়–শুধু সাদা বরফ আর বরফ। অথচ দেশটির নাম সবুজের দেশ–গ্রীনল্যান্ড।

এই গ্রীনল্যান্ডেরই কিছু পূর্বে আরো একটি ছোট দ্বীপ দেশ আছে–তার নাম আইসল্যান্ড অর্থাৎ বরফের দেশ। নাম অনুসারে এদেশটি বরফে ঢাকা থাকার কথা। কিন্তু তা নেই। এর চারদিকে বরফের মাঝেও আছে সবুজের মেলা।

অবশ্য আইসল্যান্ডের অনেক স্থানই বরফে ঢাকা আছে। শীতের সময় নেমে আসে



www.nagorikpathagar.org

প্রচন্ড শীতলতা। বরফ পড়তে থাকে দিনের পর দিন ধরে। এখানকার আবহাওয়া অনেকটা ইংল্যান্ডের মতো।

তাই দুটো দেশের নামকরণ এবং আবহাওয়া দেখে মনে হয়–গ্রীনল্যান্ডের নাম হওয়া উচিত ছিলো আইসল্যান্ড আর আইসল্যান্ডের নাম হতে পারতো গ্রীনল্যান্ড।

এছাড়া এ অঞ্চলের আরো কিছু কিছু জায়গার নাম এমন বিসদৃশ্য আছে।

কিন্তু এমনটা কেমন করে হলো তার ইতিহাস কিন্তু অনেকেই জানেন না। তাই অনেক ইতিহাসবিদ বলেন–এই অদ্ভুত নামের পেছনেই লুকিয়ে আছে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ভাইকিং জলদস্যুদের নতুন দেশ আবিষ্কারের অনেক অজানা কাহিনী।

## ভাইকিংদের আইসল্যান্ড আবিষ্কার

এই যে আইসল্যান্ড দ্বীপটির কথা বললাম, এই দ্বীপটি প্রথম আবিষ্কার করেনএকজন সুইডিস ভাইকিং জলদস্যু।

লোকটির নাম ছিলো নাড্ডোড (Naddod)।

অবশ্য তিনি যে একেবারে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এটি আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়। এরা তো এমনিতেই সাগরে সাগরে তাদের হিংস্র জন্তুর মুখওয়ালা বিচিত্রদর্শন পালতোলা জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। আর ডাকাতি করতো। এটাই ছিলো ওদের পেশা।

এই সাগরে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই নাড্ডোড একবার পড়েছিলেন প্রচন্ড ঝড়ের কবলে। তারপর সেই ঝড়ের দাবড়ানী খেতে খেতে তার জাহাজ গিয়ে ঠেকেছিলো একটি বরফাচ্ছাদিত অজানা দেশের তীরে।

এটাই ছিলো আজকের আইসল্যান্ড।

তখন এর নাম আইসল্যান্ড ছিলো না। কোনো নামই ছিলো না। তবু তিনি নতুন এক অজানা আজব দেশে এসেছেন, তার তো একটা নাম পরিচয় থাকা চাই। কোন্ দেশে তিনি এসেছিলেন ফিরে গিয়ে তার কথাতো বলতে হবে সবাইকে। কিন্তু নাম না থাকলে কার কথা বলবেন? তাই তিনি নিজের মনে থেকেই একটা নাম দিয়ে ফেললেন দেশটার।

যেহেতু জায়গাটার চারদিকে শুধু বরফ, আর বরফ, তাই তিনি দেশটারও নাম দিলেন বরফের দেশ (Snow land)।

নাড্ডোড অবশ্য এখানে বসতি স্থাপনের কিংবা দেশটা নিজের নামে দখল করার কোনো পরিকল্পনা করেননি। তিনি দিনকয়েক সেখানে থেকে ঘুরে–ফিরে চারদিক দেখেই আবার ফিরে এসেছিলেন নিজের দেশে।

নাড্ডোডের নাম আইসল্যান্ডের ইতিহাসের সাথে জড়িয়েও গেছে এ কারণেই। সম্ভবত মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসেব তিনিই পূর্বে আইসল্যান্ডের মাটিতে পা রেখেছিলেন।

তবে আইসল্যান্ডকে নিজের নামে দখল করার এবং স্থায়ী বসতি স্থাপনের চিন্তা যার মাথায় আসে প্রথম, তিনি হলেন ফ্লকী (Floki)। এই ফ্লকীই প্রথম মতলব আঁটলেন–এই জনশূন্য ও দাবীদারবিহীন দেশটিকে দখল করার।

অতপর যেই ভাবনা সেই কাজ। একদিন সত্যি সত্যি তিনি একটি পালতোলা জাহাজে নিজের পরিবার–পরিজন এবং আরো কিছু জীবজন্তু ও কাজের লোকজন তুলে



www.nagorikpathagar.org

নিয়ে রওনা দিলেন আইসল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। তিনিই হবেন দেশটির একচ্ছত্র মালিক এবং রাজা। তাকে বসতে হবে সুখের রাজত্ব পেতে।

কিন্তু সেই রাজা হওয়া আর হলো না ফ্লকীর। লোকটার ছিলো সত্যি কপালমন্দ।

ফ্লকী যখন গিয়ে আইসল্যান্ডে পৌছালেন তখন ছিলো শীতকাল। একে তো শীতকাল–তারপর সেবার এমন দারুণ শীত পড়তে শুরু করলো যে একেবারে অসহ্য অবস্থা। চারদিকে অন্ধকার করে শুধু বরফ ঝরছে আর ঝরছে। এতো শীত ঠেলে মাটিতে নেমে ঘর তৈরি করারই সুযোগ পেলো না ওরা।

সমস্ত মাটিই ঢেকে গেলো সাদা ধবধবে বরফে। এই প্রচন্ড শীতে সাথে করে আনা পশুগুলো মরতে লাগলো একের পর এক। একে তো খাবার নেই, তার ওপর প্রচন্ড শীত। ক'দিন আর টিকতে পারে?

আগে মরলো সাথে করে আনা গরু ভেড়াগুলো, তারপর শুরু হলো মানুষের মরা। প্রতিদিনই প্রায় একজন দু'জন করে লোক মরতে লাগলো ফ্লকির।

কিন্তু শীত কমে যাবার কিংবা বরফ ঝরা বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলেন ফ্লকি।

দেশ দখল করে রাজা হওয়ার চিন্তা তখন মাথায় উঠলো তার। রাজা হতে এসে শেষে কিনা সবসুদ্ধ জানে মারা যাবার অবস্থা। রাজা হয়ে আর কাজ নেই। এবার প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই রক্ষে। এমন দেশে মানুষ বাস করতে পারে? অতঃপর পরের দিনই সব গুটিয়ে দেশের পথে রওনা হলেন ফ্লকি। রাজা হওয়ার স্বপ্ন তার এখানেই শেষ হয়ে গেলো।

ফ্লকি রাজা হতে না পারলেও আইসল্যান্ডের ইতিহাসের সাথে তার নামটা ঠিকই জড়িয়ে গেলো।

এই যে দেশটাকে আজ আমরা আইসল্যান্ড বলে ডাকছি, এই নামটা কিন্তু ফ্লকিরই দেয়া। আগে এর নাম দেয়া হয়েছিলো–স্নোল্যান্ড। ফ্লকি নাম দিলেন 'আইসল্যান্ড'। ইতিহাসের পাতায় ফ্লকিরই জয় হলো। তার নামটাই টিকে গেলো।

আইসল্যান্ডের ইতিহাস কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কেমন করে ভাইকিং জলদস্যুরা প্রথমে আইসল্যান্ড তারপর গ্রীনল্যান্ড হয়ে শেষে ধাপে ধাপে আমেরিকায় গিয়ে পৌছেছিলো–তার কথা বলতে হলে এই আইসল্যান্ডের আরো অভিযানের কথা বলতে হবে।

ফ্লকির পরেও আরো অনেক দুঃসাহসী অভিযাত্রী এসেছিলেন আইসল্যান্ডে। আইসল্যান্ডের বরফে ঘেরা মাটিতে ভিড়েছিলো তাঁদের পালতোলা জাহাজ। এদের অধিকাংশই ছিলো নরওয়ের ভাইকিং জলদস্যুদের পূর্ব পুরুষেরা।

যে সময়ের কথা বলছি–এই সময়টা ছিলো নরওয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। ৮৭০ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল আগে থেকে কিছুকাল পর পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে ছিলো প্রচন্ড রাজনৈতিক গোলযোগ।

দেশে কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিলোনা। দেশ জুড়ে ছিলো অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দার বা রাজা। এরাই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে সাধ্যমতো শাসন করতো নিজের নিজের অঞ্চল।

এক সর্দারের সাথে আরেক সর্দারের যুদ্ধবিগ্রহ আর মারামারি লেগেই থাকতো। কে কাকে মেরে বড় হবে, ধনী হবে, এই ছিলো সবার চিন্তা।

এই যে নরওয়ের লোকেরা সেকালে বিশ্বত্রাস ভাইকিং জলদস্যুর জাতে পরিণত



www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলো-তার মূল উৎস হয়তো ছিলো এখানেই। দেশে দস্যুবৃত্তি করতে করতেই এরা বেরিয়ে পড়তো সাগরের বুকে। দস্যুবৃত্তিই ছিলো তাদের পেশা।

এ সময় নরওয়েতে হ্যারাল্ড (Harald) বলে এক ডাকসাইটে সর্দার বা রাজা ছিলেন। এই হ্যারাল্ড যেমন ছিলেন দুর্দান্ত প্রকৃতির তেমনি প্রচুর ছিলো তার লোকবল আর ধনবল।

তাঁর মাথায় সহসা চেপে বসলো এক কুমতলব। সে মতলব করলো গায়ের জোরে গোটা দেশটা দখল করে সারা দেশের সম্রাট হবেন। শুরু হলো তার অভিযান আর হিংস্রতা। হ্যারাল্ডকে নিয়ে আরো একটি কিংবদন্তী আছে। নরওয়েতে ছিলো এক পরমা সুন্দরী রাণী। তার মতো অমন সুন্দরী কন্যা আর কেউ ছিলোনা দেশে।

হ্যারাল্ড এই রাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রাণীর ছিলো এক শর্ত।

-কি শর্ত ?

-হ্যারাল্ড যদি সমগ্র দেশ দখল করে সম্রাট হতে পারেন, তবেই রাণী তাকে বরণ

রাজা হেরাল্ড।



www.nagorikpathagar.org

করেনেবেন।

-বেশ, তাই হবে, আমি সারা নরওয়েকেই আনবো নিজের বশে। কে আছে দাঁড়ায় আমার সম্মুখে ? এই বলে হ্যারাল্ডের শুরু হলো রাজ্য দখলের অভিযান।

হ্যারাল্ড আরো প্রতিজ্ঞা করলেন-যতদিন পর্যন্ত তিনি সারা নরওয়েকে নিজের আয়ত্বে আনতে না পারবেন, ততদিন নিজের চুল আর দাড়ি কামাবেন না।

দু'দিনেই তো আর সারা দেশ দখলে আনা যায় না। এদিকে দিনে দিনে হ্যারাল্ডের মাথার চুল আর মুখের দাড়ি বড় হতে লাগলো।

এজন্যই নরওয়ের ইতিহাসে এই অত্যাচারী হ্যারাল্ডকে 'লম্বা চুলঅলা হ্যারাল্ড' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশ দখলের নেশায় মেতে ওঠা হ্যারাল্ডের অত্যাচার শেষে এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিলো যে-সারা দেশের মানুষ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন দলীয় সর্দারেরা হ্যারাল্ডের ভয়ে একেবারে অস্থির থাকতেন। কখন বলা নেই, কওয়া নেই দস্যুটা এসে চড়াও হয়।

হ্যারাল্ডের অত্যাচারেই নরওয়ের মানুষেরা একে একে হতে লাগলো দেশান্তরী। দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো সমুদ্রে। হয়তো কোনো নতুন দেশের সন্ধানে। যেখানে খাবার আর সুখশান্তি থাক বা না থাক হ্যারাল্ডের অত্যাচার থেকে তো বাঁচা যাবে। ওটাই সুখ।

এমনি একটি দেশত্যাগী দল পালতোলা জাহাজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো ফকির আইসল্যান্ডে। অবশ্য এই বরফ ঘেরা দেশটার নাম তারা আগে থেকেই জানতো।

হ্যারাল্ডের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা আপাততঃ ওখানে গিয়েই উঠবে। তারপর যা হয় একটা ভেবেচিন্তে কিছু করা যাবে।

৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হ্যারাল্ডের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নরওয়ের যে দলটি আইসল্যান্ডে এসেছিলো এদের দলনেতা ছিলেন দু'জন। এরা ছিলেন দুই ভাই। 'এদের একজনের নাম ছিলো ইনগফ (Ingolf) এবং অপর জনের নাম ছিলো লীফ (Leif).

এই যে দু' ভাই দেশ ছেড়ে এসেছিলেন-তাঁরা সব শেষ করে দিয়েই এসেছিলেন। তাঁরা দেশের সমস্ত ঘরবাড়ি সম্পত্তি বেচে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন দাস-দাসী গৃহপালিত প্রাণীদেরও নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁদের আশা ছিলো-এই নতুন দেশ আইসল্যান্ডে এসে আবার নতুন করে ঘর বাঁধবেন, সংসার সাজাবেন। এটাই হবে এখন থেকে তাদের নিজের দেশ।

অবশ্য হলোও তাই। তাঁরা এই বরফ-ঘেরা দেশের যেখানে মাটি ছিলো, গাছপালা ছিলো, তেমনি একটি জায়গা দেখে পেতে নিলেন নিজেদের সংসার।

কিন্তু এরই মধ্যে ঘটলো এক দুর্ঘটনা। ছোটো ভাই লীফ ছিলেন হতভাগ্য। একদিন তাঁর এক আইরিশ ক্রীতদাসের হাতে নিহত হলো।

ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ইনগফ দুঃখিত হলেও একেবারে ভেঙে পড়লেন না। কারণ তিনি দেশ ছেড়ে একেবারেই চলে এসেছেন। সেই অত্যাচারী হ্যারাল্ডের দেশে আর ফিরে যেতে রাজী নন। তার চেয়ে এখানে মরতে হয়, তাও তিনি প্রস্তুত।

অতঃপর তিনি সাহসে ভর করে একটা ভালো এবং বরফমুক্ত এলাকা বেছে নিয়ে তৈরি করলেন বসতি।

ইনগফ যেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন সেটা ছিলো একটি বরফমুক্ত সবুজ ঘাসে-ঢাকা সাগর সৈকত।



www.nagorikpathagar.org

এই এলাকাটি ছিলো বেশ চমৎকার এলাকা। এখানকার সাগরে কখনো বরফ জমতো না। বরফ না জমার অবশ্য কারণও ছিলো।

এখানের তীরে এসে লাগতো একটি উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত। উষ্ণ স্রোত এসে শীতল জলের সাথে মিশ[illegible]তো বলে এখানে বরফ জমতো না। আর সেই সাথে ঘটতো আর একটি মজার কান্ড। এখানটা স[illegible]র্বক্ষণ ঘন কুয়াশা ঘেরা থাকতো!

তাই ইনগফ এই সাগরটির নাম [illegible] দিলেন ধোঁয়ার সাগর (Smoky Bay). আজো এই নাম টিকে আছে। আজো এই সাগরটি[illegible] 'স্মোকী বে' বলা হয়। আইসল্যান্ডের ভাষায় যার নাম হলো রেকজাভিক (Reykjavik).

শুধু তাই নয়। আজ যেখানে আইসল্যান্ডের রাজধানী শ[illegible]হর গড়ে উঠেছে এটাই হলো ইনগফের প্রথম বসতি এলাকা। এখানেই বসেছে আজকের আধুনি[illegible] রাজধানী শহর।

ইনগফ আর লীফ যখন মনের দুঃখে স্বদেশ ছেড়ে এই বিজন দে[illegible]শে এসেছিলেন, তখন একাই এসেছিলেন। একা বলতে শুধু তাদের নিজেদের পরিবার [illegible] পরিজনই এসেছিলো। তারপর লীফ গেলো মারা।

তাই ইনগফের ধারণা হলো–এই বিজন দেশের বিরুদ্ধ পরিবেশে যদি টিকে থাকতে হয় তবে এখানকার লোকসংখ্যা বাড়াতে হবে। তাদের একার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

দেশ থেকে আরো লোক নিয়ে আসতে হবে। অবশ্য লোক আনা খুব কষ্টসাধ্য হবে না। চুলঅলা হ্যারাল্ডের অত্যাচার দেশে যেভাবে বেড়ে গেছে তাতে অনেকেই দেশ, ছেড়ে প্রাণ বাঁচানোর পথ খুঁজছে।

তারপর যদি আইসল্যান্ডের কথা সামান্য ফুলিয়ে–ফাঁপিয়ে বলা যায় তাতে লোক আকৃষ্ট হতে পারে।

হলোও তাই। ক্রমেই ওদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রথম বসতি স্থাপনের মাত্র পঞ্চাশ বছর পরে আইসল্যান্ডের লোকসংখ্যা দাঁড়ালো বিশ হাজারে।

নতুন আবিষ্কৃত দেশের খবর পেয়ে দলে দলে লোক আসতে লাগলো দেশ থেকে। প্রতি মাসেই দু'চারটে করে জাহাজ এসে ভিড়তে লাগলো 'স্মোকী বে' এর তীরে। গড়ে উঠতে লাগলো নতুন এলাকা। গড়ে উঠলো নতুন বসতি।

লোক বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একটি নতুন বিপদও দেখা দিলো।

একই দেশের লোক হলেও কারো সাথে কিন্তু কারো কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো না। তাই কারো প্রতি কারো ছিলো না কোনো শ্রদ্ধাবোধ বা সৌজন্যতা বোধ। সবাই চেষ্টা করছিলো নিজের নিজের সুবিধা আদায় করার।

যারা আগে এসেছিলো তারা ভালো জায়গা দখল করে বসেছে, বেশী জায়গা দখল করেছে, যারা পরে এলো তারা ঠকতে লাগলো। কেউ কেউ–যাদের গায়ের জোর আছে, তারা আগে আসা দখলকারীদের হটিয়ে দিয়ে তাদের ভালো জায়গাগুলো নিজেরা কেড়ে নিতে লাগলো।

সোজা কথা–এখানেও শুরু হলো 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থা।

আসলে এখানে এখনো কোনো আইনের শাসন চালু হয়নি। চারদিকে ছিলো না কোনো নিয়ম–শৃংখলা। কোনো কেন্দ্রীয় শাসন।

তাই অনেকে হতাশ হয়ে পড়লো। এরই মধ্যে কেউ কেউ পরামর্শ দিলো–এখানের এই নতুন বসতির জন্য একটি আইনের শাসন ব্যবস্থা চালু করা। প্রয়োজন একটি আইন সভার।

দেশে মানে নরওয়েতে '[illegible] থিংগ' (The thing) বলে একটি ভালো পুরনো আইনের



www.nagorikpathagar.org

বই আছে। সেখানে দেশ শাসনের সমস্ত কথা লেখা আছে। বইটা আনতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই উলভজট (Ulvjot) নামে এক লোককে পাঠিয়ে দেয়া হলো দেশে, বইটা নিয়ে আসতে।

সকলের প্রতিনিধি হয়ে অতপর দেশে ফিরে গেলো উলভজট। তিনি গেলেন আবার এলেন। তাও পুরো একবছর পরে, ৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরে এলেন আইন বই নিয়ে।

আইন বইয়ের খবর শুনে সারা আইসল্যান্ডের মানুষ এসে ভিড় করলো দেখবার জন্য। আর তাতেই বইটির এখানে একটি নতুন নামকরণ করা হলো। বইটির নতুন নাম রাখা হলো 'দি অল থিংগ' (The Allthing)। উল্লেখ্য যে এই 'দি অল থিংগাই' হলো বিশ্বের ইতিহাসের সর্ব প্রথম সংবিধান। এই আইসল্যান্ডেই বিশ্বের সর্বপ্রথম সংসদ গঠিত হয়। বসে সংবিধান মোতাবেক সংসদ অধিবেশন। আইসল্যান্ডে সেই নরওয়ের ভাইকিংরা যে সংসদ স্থাপন করে গেছে আজো সেটা চালু রয়েছে।

আজ সেখানে অবশ্য সংসদ সদস্যদের সভা করার জন্য ভবন তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে সংসদ ভবন। কিন্তু সেই ভাইকিংদের সময় কোনো সভা কক্ষ ছিলোনা।

তখন এই অধিবেশন বসতো উন্মুক্ত স্থানে। নদীর কিনারে কোনো খোলা জায়গায় বসে তারা আলোচনা করতেন। সমাধান করতেন রাজ্যের নানা সমস্যার। গত ১৯৩০ সালে আইসল্যান্ড সরকার তাদের দেশের পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার সহস্রতম দিবস পালন করেছেন। এ সময় আইসল্যান্ড শুধু ধনসম্পদে নয়, শিল্প সাহিত্যের দিকেও বেশ সমৃদ্ধিলাভ করেছিলো। এই সময়কার লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায়–কেমন করে তাঁদেরই পূর্ব পুরুষেরা কলম্বাসের অর্ধ সহস্রাধিক বছর আগেই আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

## ভাইকিংদের গ্রীনল্যান্ড আবিষ্কার

আইসল্যান্ডারদের প্রধান উপজীবিকা ছিলো মাছধরা ও পশুপালন। চাষাবাদ কিছু কিছু হতো, তবে প্রধান আয় ছিলো মাছ শিকার।

মাছ ধরার জন্যই এরা জাহাজ নিয়ে অনেক সময় বহু দূর–দূরান্তরে চলে যেতো। চলে যেতো গভীর সমুদ্র পর্যন্ত।

এদের কেউ কেউ মাছ শিকারের আশায় পালতোলা জাহাজ নিয়ে আইসল্যান্ডের মূল ভূ–খন্ড থেকে অনেক পশ্চিমেও চলে আসতো। তারাই মাঝে মাঝে দেখতো এখান থেকে আরো অনেক দূরে ধূ ধূ সমুদ্রের বহুদূরে যেনো দেখা যায় কি একটা উঁচু পাহাড়ের মতো। হয়তো বহুদূরে একটা দেশ বা কিছু আছে।

কিন্তু সেখানে কেউ কোনোদিন যায়নি। দেশটার নাম কি ? ওখানে লোক–বসতি আছে কিনা; দেশটাই বা কেমন? সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না।

আইসল্যান্ডে ইরিক দি রেড (Erik the Red) নামে এক লোক ছিলেন। আসলে তাঁর নাম ছিলো ইরিক, তবে তাঁর মাথার চুল লাল রঙের ছিলো বলেই লোকে তাঁকে রেড ইরিক বা লাল চুলওলা ইরিক বলে ডাকতো।

গ্রীনল্যান্ড এবং আমেরিকা আবিষ্কারের সাথে এই রেড ইরিকের নামটাই বিশেষভাবে জড়িত। এই লোকটিকে দিয়েই বলতে গেলে শুরু।

রেড ইরিক ছিলেন এক দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। যেমন ছিলো তার শক্তি সাহস; তেমনি ছিলেন তিনি হিংস্র।



www.nagorikpathagar.org

তিনি যখন নরওয়েতে ছিলেন তখনি সেখানে ঝোঁকের মাথায় এক বন্ধুকে খুন করে ফেলেছিলেন। তারপর আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে একদিন স্ত্রীপুত্র নিয়ে জাহাজে করে সোজা পাড়ি জমিয়েছিলেন নব আবিষ্কৃত আইসল্যান্ডে। দেশ থেকে পালাতে পারলে তাঁকে আর কে পায়?

তারপর এসে ঘর বাঁধলেন নতুন দেশে। কেটে গেলো বেশ কিছু দিন ভালোই। কিন্তু স্বভাব না যায় মরলে, এখানে এসেও ইরিক যে খুব একটা শান্ত জীবন যাপন করতেন, তা নয়। তিনি ছিলেন আসলেই খারাপ।

সর্বক্ষণই লোকজনের সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ করতেন। শেষে এখানেও বাধিয়ে বসলেন তেমনি আরেক কান্ড। একদিন সামান্য কারণে এক লোককে খুন করে ফেললেন।

কিন্তু খুন করার পরই তার হুঁশ হলো–এখন তাহলে উপায় ? সারা দ্বীপের লোক উঠলো ইরিকের উপর ক্ষেপে। তার বিচার হবে, শাস্তি হবে।

গ্রীণল্যাণ্ডের যেখানে রেড ইরিকসন প্রথম অবতরণ করেছিলেন।

কিন্তু দুষ্টু লোকের দুষ্টু বুদ্ধি সব সময়েই থাকে, সাহসও থাকে।

ইরিক বিপদের কথা চিন্তা করে আবারো পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এবার পালাবেন কোথায়? দেশে ফিরে যাবার তো আর উপায় নেই। সেখানেও তাঁর জন্য ফাঁসির দড়ি তৈরি করা আছে। গেলেই বিচার করে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর এখানেও থাকতে পারছেন না। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন এবার তিনি পালাবেন আর এক নতুন স্থানে।

সাগরে মাছ শিকার করতে গিয়ে তিনি নিজেও দেখেছিলেন ধু ধু পশ্চিমের সেই সাদা ধ্বধবে পর্বতের চূড়াটি। তিনি মাঝে মাঝে ভাবতেন–ওটা কোন্ দেশ?

তাহলে তিনি ওই সাদা ধবধবে পর্বতের দেশেই যাবেন। নিশ্চয়ই ওটা কোনো নতুন দেশ হবে। ওখানকার লোক তো আর তাঁকে চেনে না। তাই তাঁকে খুনী বলেও ফাঁসিতে লটকাতে আসবে না। তিনি ওখানে গিয়েই আবার নতুন করে শুরু করবেন জীবন। মিশে যাবেন নতুন দেশের নতুন মানুষের ভিড়ে।

যেই ভাবা সেই কাজ। তারপর তিনি আবার পালালেন আইসল্যান্ড থেকেও। যেমন করে একদিন গোপনে দেশ ছেড়ে এখানে এসেছিলেন, তেমনি আবার এদেশ ছেড়েও পাড়ি দিলেন আরেক অজানার পথে।

রাতের অন্ধকারে তাঁর নিজের দুটো মাছ ধরার জাহাজে নিজের লোকজন, কিছু



www.nagorikpathagar.org

গবাদি পশু, আর কয়েক মাসের খাবার তুলে নিয়ে পাড়ি ধরলেন অকূল দরিয়ায়।

তিনি ক্রমাগত চলতে লাগলেন পশ্চিম দিকে। সেই সাদা ধবধবে ঝলমলে পাহাড়কে লক্ষ্য করে। সাদা পাহাড়কে যতো দূরে বলে মনে হয়েছিলো এখন দেখলেন–ওটা আসলে তাদের আগের অনুমানের চেয়েও আরো অনেক বেশী দূরে। এতোটা যে দূরের তা তিনি আগে ভাবতেও পারেননি।

তবে দিনকয়েক চলার পরে সাদা পাহাড়টি তাদের কাছে আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। আরো বেশী উজ্জ্বল আর ঝলমলে হয়ে উঠলো।

তারপর একসময়ে সামনে এসে ধরা দিলো পাহাড়টি। ইরিক এই যে ধবধবে সাদা পাহাড়ওয়ালা দেশটিতে এসে পৌঁছালেন–এটিই হলো আজকের গ্রীনল্যান্ড। ইরিকই এই বিশাল ভূ-খণ্ডটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

ইরিক এই অচেনা দেশটির পূর্বতীরে এসে থামলেন। দেখলেন এটি একটি বিশাল দেশ। চারদিকেই সাদা ধবধবে তুষারে ঢাকা। কোথাও মাটির চিহ্নমাত্র নেই। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ।

সাদা বরফের উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন চোখ ঝলসানো আলোর ঝিলিক ছোটে–তখনি ওটা বহুদূর থেকে দেখা যায়। যেটা তাঁরা দেখতেন।

কিন্তু এদেশটার সত্যিকার চেহারা যে এমন তা তিনি ভাবতেও পারেননি। বরফ অবশ্য তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। তিনি নিজেও বরফের দেশের মানুষ। জন্ম থেকেই বরফ দেখে আসছেন।

কিন্তু এই সীমাহীন বরফের মাঝে একটু তো খোলা মাটিতে দাঁড়াবার জায়গা চাই। তিনি যে এখানে বসতি স্থাপন করতে এসেছেন তার জায়গা কোথায়?

আর তাছাড়া দেশটি কি একেবারেই জনপ্রাণীশূন্য ? যেদিকে চোখ যায় শুধু ধবধবে বরফ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। লোকজন পশুপাখি কিছুই নেই।

তবে ঘাবড়ে গেলেন না তিনি। পালিয়ে যখন এসেছেন তখন তো আর ফিরে যাবার পথ নেই। যাহোক তাঁকে সামনেই বাড়তে হবে, পেছনে যাবার পথ নেই। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু।

তাই কোথাও খোলা মাটি পাওয়া যায় কিনা এই আশায় তিনি এই বরফঢাকা জনশূন্য দেশটির পূর্ব উপকূল ধরে এগোতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে।

সেও অনেক পথ। আর শেষ হয় না। যতোই এগোতে থাকেন একই অবস্থা। যেনো এর আর শেষ নেই।

এমনি করে চলতে চলতে তিনি এক সময় গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছালেন। দেখলেন এখানেই শেষ হয়ে গেছে উপকূল, এরপর আবার মোড় নিয়েছে উত্তর দিকে।

তিনিও অতঃপর গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল ধরে এগোতে লাগলেন উত্তর দিকে।

এবারেও তাঁকে চলতে হলো বেশ কিছু দিন। তারপরই দেখতে পেলেন খানিকটা আশার আলো। দেখলেন –সামনেই একটি বরফমুক্ত খোলা মাটি। কিছু কিছু শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদও গজিয়েছে। ঘাস জাতীয় গাছ-গাছলাও আছে দু'চারটে করে।

চারদিকের সাদা নির্জন মৃত চেহারার বুকে এই সামান্য এক চিলতে সবুজের রেখা যেনো তাদের মনে খুশীর বন্যা বইয়ে দিলো।

অতঃপর এখানেই জাহাজ ভেড়ালেন তিনি। সাথে করে আনা গবাদি পশুগুলোকে ছেড়ে দিলেন খোলা মাঠে। ওরা বহুদিন পর দু'চারটে তাজা ঘাস পেয়ে রাক্ষসের মতো চিবতে লাগলো।



www.nagorikpathagar.org

তিনিও অতঃপর সেখানেই বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কোথাও কোনো জনমানুষ নেই। গোটা গ্রীনল্যান্ডে ইরিকই ছিলেন সর্বপ্রথম মানুষ।

গ্রীনল্যান্ডে কোনো গাছপালা ছিলো না। তাই আর কি করা যাবে। পাথর আর বরফের চাঁই জড়ো করে করেই তৈরি হলো থাকার ঘর।

তাদের ঘরগুলো ছিলো অনেকটা আজকের এস্কিমোদের ঘরের মতো। ঘরগুলো ছিলো অন্ধকার। কিন্তু বাইরের খোলা বাতাস ভিতরে ঢুকতে পারতো না বলে ছিলো বেশ গরম।

চাষাবাদ করার উপায় নেই। উপকূলের মাছ আর সীল মাছই ছিলো তাদের প্রধান খাদ্য।

এখানেই প্রায় বছর খানেক ছিলেন ইরিক। কিন্তু তারপরই তাঁর মন হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো। এই নির্জন দেশে প্রাণী বলতে তারাই শুধু।

তিনি, তার স্ত্রী, ছেলে লীফ ইরিকসন এবং সাথে আনা জনা কয়েক লোক।

কিন্তু এই ক'টা লোক নিয়ে তো আর সারা জীবন কাটানো যায় না। বড় একা একা মনে হয়। মনে হয় এ আর এক কারাদন্ড ভোগ। যেনো তিনি তাঁর দুই দুটো হত্যাকান্ডের শাস্তি পেতেই বন্দী হয়ে আছেন এই নির্জন দ্বীপে।

তাই আবার আইসল্যান্ডে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। মনে মনে ঠিক করলেন এখানে নতুন মানব বসতি স্থাপন করতে হলে আইসল্যান্ড থেকে আরো লোক নিয়ে আসতে হবে।

যেমন করে একদা নরওয়ে থেকে লোক নিয়ে এসে বসতি গড়ে তোলা হয়েছিলো আইসল্যান্ডে, তেমনি এখানেও করতে হবে।

কিন্তু আইসল্যান্ডে এসে তিনি এক প্রতারণার আশ্রয় নিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যদি দেশটি সম্পর্কে সত্যি কথা বলা হয়, তাহলে এই নির্জন বরফের দেশে কোনো লোকই আসতে চাইবে না।

তাই লোক আকৃষ্ট করার জন্য বানিয়ে বলতে হয় রূপকথার গল্প।

তাই হলো অবশেষে।

ইরিক আইসল্যান্ডে এসে এমন ভয়ানক গপ্পো ফেঁদে বসলেন যে, লোকের দু'চোখ বিস্ময়ে একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেলো।

তিনি বলতে লাগলেন, সে এক সুন্দর দেশ। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। গাছে গাছে কতো মিষ্টি ফল আর পাখ-পাখালী। তুমি ফল খাবে না পাখির মাংস খাবে, তাই বড় সমস্যা।

তাঁর কথা শুনে তো সবাই অবাক।–কি বললে তুমি ? এমন সুন্দর দেশ সেটা।

——সুন্দর বলে সুন্দর। ইরিক বলতে লাগলেন,–মনে হয় স্বর্গভূমি। মাথার উপরে রোদে ঝলমল খোলা মেঘমুক্ত আকাশ, চারপাশে সীমাহীন সবুজের সমারোহ আর সামনে ধূ ধূ ঢেউ খেলানো সাগর।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে যে দেশটির নাম গ্রীনল্যান্ড বা সবুজের দেশ হয়েছিলো, তা প্রতারক ইরিকের দেয়া নাম থেকেই। তিনিই মিথ্যে করে দেশটির নাম দিয়েছিলেন গ্রীনল্যান্ড (Greenland) বা সবুজের দেশ। সেই থেকেই নামটি চালু হয়ে আছে।

ইরিকের মুখে এমন সোনার দেশের গল্প শুনে অনেকেই যাবার জন্য লাফিয়ে উঠলো। অমন সবুজের দেশে যেতে পারলে এই মরা বরফের দেশে কে থাকে ?

তারপর মাস কয়েকের মধ্যেই অনেক লোক জুটিয়ে ফেললেন ইরিক।



www.nagorikpathagar.org

ইরিক গ্রীনল্যান্ড থেকে আইসল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে। আবার এই বছরই তিনি ফিরে রওনা দিলেন নব আবিষ্কৃত গ্রীনল্যান্ডে। সাথে নিয়ে গেলেন বিরাট এক নৌবহর। প্রায় ২৫টি জাহাজ ভরে লোকজন গবাদি পশু আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি ফিরে চললেন গ্রীনল্যান্ডে।

কিন্তু গ্রীনল্যান্ডে এসে পৌছেই ফাঁস হয়ে গেলো তার সব গোমর। প্রতারণা ধরা পড়লো ইরিকের। শেষে সব কথা খুলে বললেন ইরিক।

এখানে তাদেরকে ভুলিয়ে নিয়ে আসার জন্যই তিনি অমন রূপকথার গল্প বানিয়ে বলেছিলেন। নইলে কেউ আসতো না।

কিন্তু এখন আর কি করা যাবে ? একবার যখন এসে পড়েছে তখন তো আর ফিরে যাওয়া যাবে না।

ইরিককে যতোই গালমন্দ করা হোক তবু সেখানেই সবাইকে নামতে হলো। ঘর বাঁধতে হলো থাকার জন্য। আর এমনি করেই গ্রীনল্যান্ডে গড়ে উঠলো মানব বসতি।

ইরিক প্রতারণা করুক আর যাই করুক– গ্রীনল্যান্ড আবিষ্কার এবং সেখানে মানব বসতি স্থাপনের সবটুকু কৃতিত্বই তাঁর।

ডেনমার্কের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ গত কয়েক বছর আগে গ্রীনল্যান্ডে মানব বসতি শুরুর আদি ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করেছিলেন। তিনি গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে প্রাচীন গীর্জার এবং মনুষ্য বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

তিনি অনুমান করেন এই গীর্জা এবং ঘরগুলো দশম শতকের তৈরি হবে। এগুলো যে ইরিক এবং তার প্রায় সমসাময়িককালের লোকেরাই তৈরি করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত।

এছাড়াও চমৎকার তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। গ্রীনল্যান্ডের আপারনেভিক (Upernevik) নামক স্থানে তিনি একটি প্রস্তরখন্ড আবিষ্কার করেছেন। এই প্রস্তর খন্ডটির উপর তিনজন ভাইকিং নাবিকের নাম লেখা।

তবে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হলো এমনি আরও দু'তিনটি প্রস্তর খোদাই পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূলে।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ধারণা করেন তাহলে নিশ্চয়ই নরওয়ের ভাইকিংরা এই সুদূর আমেরিকা পর্যন্তও এসেছিলো। নইলে এই খোদাই পাথর এলো কেমন করে ? কারণ এ খোদাই পাথরগুলো যে ভাইকিংদেরই এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তারা না এলে এ পাথর এলো কেমন করে ? আর এ পাথরের মধ্যেও যে ভাইকিংদেরই নাম লেখা।

যদিও কেউ কেউ মনে করেন এগুলো হয়তো ভুয়া। এগুলো হয়তো কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার হওয়ার পর এবং এখানে লোক বসতি স্থাপিত হবার পরই এখানে কেউ তৈরি করেছে বা নিয়ে এসেছে।

এমন অবিশ্বাস করার হয়তো কারণ নেই। কারণ গ্রীনল্যান্ড থেকে ডেভিস প্রণালী পার হয়ে বাফীনল্যান্ড (Baffin Land) বা ল্যাবরাডর (Labrador) ভূ-খন্ড খুব একটা দূরে নয়। সেকালের পালতোলা ক্ষুদ্রাকৃতির জাহাজের পক্ষেও এই জায়গাটুকু পাড়ি দেয়া সম্ভব।



www.nagorikpathagar.org

# বিজার্নীর প্রথম আমেরিকা দর্শন

রেড ইরিক আইসল্যান্ড থেকে মিথ্যে কথা দিয়ে ভুলিয়ে যাদের গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো হারজলফ (Herjolf)।

উল্লেখ্য যে, এই হারজলফ এর নামানুসারেই গ্রীনল্যান্ডের একটি শহরের নামকরণ করা হয়েছে। এটি দক্ষিণ গ্রীনল্যান্ডের আজকের একটি বড় সমুদ্র বন্দর।

হারজলফ এর ছেলে বিজার্নীই (Bjarni) সভ্য জগতের মধ্যে প্রথম মানুষ যিনি আমেরিকা দেখেছিলেন। তিনি কেমন করে এখানে এলেন তার কাহিনী বলছি।

সেও ৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এ বছরই রেড ইরিক লোক আনতে আইসল্যান্ডে এসেছিলেন।

যেখানে নেমেছিলেন হারজলফ।

এ সময় বিজার্নী বাড়ি ছিলেন না। তিনি জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন বহুদূরে সাগরে মাছ শিকারে। দীর্ঘ মাসখানেক পরে যখন মাছ শিকার করে বাড়ি ফিরে এলেন তখন তো ব্যাপার দেখে অবাক।

ঘরে ফিরে এসে দেখলেন তাদের বাড়িঘর সব শূন্য। সেখানে বসে আছে অন্য লোক। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন–তার বাবা বাড়ি–ঘর সব বিক্রি করে দিয়ে ইরিকের সাথে গ্রীনল্যান্ড চলে গেছেন। সে বাড়ি কিনে নিয়েছেন তাদেরই চাচা।

গ্রীনল্যান্ডের কথা অবশ্য বিজার্নীও শুনেছিলেন। ইরিকের কাছেই শুনেছিলেন। তিনি তখন সদ্য ফিরে এসে গ্রীনল্যান্ডের রূপকথা বলে বেড়াচ্ছিলেন লোকের কাছে। তখন তারও শুনে অবাক লাগতো।

শুধু তাই নয় তিনি নিজেও একবার দু'বার পশ্চিম সাগরের বহু দূরের সাদা ধবধবে পাহাড়কে দেখেছেন। কিন্তু ওটাই যে অমন সবুজ শ্যামলিমাময় দেশ, তা কখনো ভাবেননি।

আর এটাও ভাবেননি বাবা তার সাথে কোনো রকম বুদ্ধি পরামর্শ না করেই হট্ করে সব বিক্রি করে দিয়ে ইরিকের সাথে সবুজের দেশে চলে যাবেন।

অতঃপর আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হলো না বিজার্নীর। তিনিও তেমনি আবার এসে জাহাজে উঠলেন।

নাবিকদের আদেশ দিলেন পাল তুলে দেবার।

নাবিকরা অবাক হয়ে শুধালো–আবার কোথায় যাবো ? এই তো এতোদিন পরে ঘরে ফিরলাম।

–এবার যাবো ভিন্ দেশে। বিজার্নী উত্তর দিলেন।

–কোন্ দেশ ?

–সবুজের দেশ গ্রীনল্যান্ডে। বিজার্নী বললেন, ওই যে আমরা পশ্চিম সাগরে গিয়ে



www.nagorikpathagar.org

সাদা ধবধবে সাদা পাহাড়ের চূড়া দেখেছি।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি।

–ওটাই হলো সবুজের দেশ। সেখানে আছে গাছে গাছে ফল, বনে বনে কতো শিকারের পশু-পাখি। সেখানে নেই কোন বরফ। কতোই না মজার দেশ।

–তাই নাকি ? ভারী মজাতো!

–হ্যাঁ, বিজার্নী বলতে লাগলেন বাড়ি গিয়ে শুনলাম বাবা সংসারের সব কিছু বেচে দিয়ে ওই সবুজের দেশে চলে গেছেন। তাই আমিও বাবার সাথে মিলিত হবো সেখানে গিয়ে।

অতঃপর আবার তাঁরা জাহাজের পাল উড়িয়ে দিলেন। বিজার্নীর জাহাজ ভেসে চললো পশ্চিম দিকে। তাঁরা যাবে গ্রীনল্যান্ডের সবুজ শ্যামল ভূমিতে।

এভাবেই তাঁরা পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে গেলেন। একসময় তাঁদের দেশ আইসল্যান্ড চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে। তখনও আকাশ পরিষ্কার, সুন্দর বাতাস বইছে। পালতোলা ছোটো জাহাজটি ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে পশ্চিম দিকে।

কিন্তু তারপরই ঘনিয়ে এলো বিপর্যয়। আকাশের সূর্য ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো প্রচন্ড ঝড়। চারদিক থেকে নেমে এলো ঘন কুয়াশা। এমন ঘন কুয়াশা যে, দু'চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। কোন্ দিকে পূর্ব আর কোন্ দিকে যে পশ্চিম তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না। এই বিপর্যয়কর অবস্থায় পাল তুলে রাখাও সম্ভব নয়।

অতঃপর তাঁরা জাহাজের পাল আর মাস্তুল নামিয়ে ফেললেন। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে তাদের মস্ত বড় জাহাজটি ডিঙ্গি নৌকার মতোই খাবি খেতে লাগলো।

এমনি করে চললো দিনের পর দিন। বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় কোন্ দিকে যে তাঁদের জাহাজটি ভেসে যাছিলো তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না। শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিরুদ্দেশের পথে ভেসে চললেন তাঁরা।

দীর্ঘ কয়েকদিন পর দুঃস্বপ্নের ঘোর অবশেষে কাটলো। বাতাস থেমে গেলো। কেটে যেতে লাগলো ঘন কুয়াশা। সাগরের ঢেউ এলো শান্ত হয়ে।

অবশেষে আকাশে দেখা দিলো সূর্য। আলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। তখন তাঁরাও জাহাজের পাল আবার তুলে দিলেন। একদিন চলার পর তাঁদের চোখে ভেসে উঠলো সত্যি সত্যি এক অপূর্ব সুন্দর সবুজের দেশ। চারদিকে ঘন অরণ্যরাজিতে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সুন্দর দেশ।

দেখে তো বিজার্নীর নাবিকেরা খুশী হয়ে উঠলো।

–এই তো আমরা এসে গেছি সবুজের দেশ গ্রীনল্যান্ডে। ওই তো সামনে ঘন সবুজ গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ দেশ। এটাই তো গ্রীনল্যান্ড।

নাবিকেরা খুশী হলেও-বিজার্নীর কেমন যেনো সন্দেহ হচ্ছিলো। তিনি বললেন, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

–কেনো ? সন্দেহ হবে কেনো ?

–গ্রীনল্যান্ডের পাহাড়গুলোতো শুনেছি অনেক উঁচু এবং সাদা ধবধবে তুষারে ঢাকা। এখানে তো কোনো উঁচু পাহাড় নেই। সব সমতল ভূমি।

–তাহলে?

–আমার মনে হয় এটা গ্রীনল্যান্ড নয়।

–বলো কি ?



www.nagorikpathagar.org

–হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা ঝড়ের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে অন্য কোনো নতুন দেশে এসে পড়েছি।

–কোন্ দেশ এটা ?

–তাতো জানিনে। তবে এটা যে গ্রীনল্যান্ড নয়, এটা আমি নিশ্চিত। বিজার্নী বললেন।

তিনি জাহাজের নাবিকদের পাল নামিয়ে ফেলতেও বলেছিলেন। নাবিকদেরও খুব আগ্রহ ছিলো এই তীরে নামার।

ওরা বলছিলো, নাই বা হলো গ্রীনল্যান্ড, তবু একবার যখন এমন একটা নতুন দেশে এসে পৌছেছি, তখন দেশটা কেমন তা একটু দেখে যাওয়া যাক।

কিন্তু রাজী হলেন না ক্যাপ্টেন বিজার্নী।

–না, আমরা বেরিয়েছি গ্রীনল্যান্ডের খোঁজে। সে দেশটা কোথায় আছে ওটাই খোঁজ করতে হবে আমাদের।

অতঃপর জাহাজের পাল তুলে দেয়া হলো। আবার জাহাজ এগিয়ে চললো উত্তর দিকে।

উল্লেখ্য যে, বিজার্নীরা প্রথম যে সবুজ দেশটির সন্ধান পেয়েছিলেন এটা ছিলো উত্তর আমেরিকার বাফিনল্যান্ড (Baffin land)।

এরপর তাঁরা আরো দু'দিন ধরে জাহাজ চালিয়ে গেলো সামনের দিকে। এবার তাঁরা আরো একটি দেশের সন্ধান পেলো। এটিও ছিলো ঘন অরণ্যে ঢাকা দেশ। এখানেও কোন পর্বত ছিলো না। গোটা দেশটাই ছিলো ঘন ঘাস আর গাছ–গাছালিতে পূর্ণ সমতল ভূমি।

নাবিকেরা এবার শুধালো, তাহলে এটাই হয়তো গ্রীনল্যান্ড। আমরা এবার সত্যি সত্যি সবুজ দেশে চলে এসেছি।

–না, এটাও সবুজ দেশ নয়। বিজার্নী বললেন–সেই দেশে আছে সাদা তুষারে ঢাকা পাহাড়, এ দেশে তো উঁচু কোনো পাহাড় নেই। তাই এটাও গ্রীনল্যান্ড হতে পারে না।

–তাহলে কোথায় তোমার সেই সবুজ দেশ ?

–তা জানিনে, তবে আমরা সেই দেশকে খুঁজে বের করবোই, সেখানে আমার বাবা আছেন।

–বেশ তো, তাই না হয় খুঁজে বের করবো। নাবিকরা বললো–আমরা যখন একটা নতুন দেশের সন্ধান পেয়ে গেছি। আর দেশটাও দেখতে ভারী সুন্দর। চারদিকে সবুজ শ্যামলিমাময় ঘেরা।

–তা বটে দেশটা সত্যি সুন্দর।

–তাহলে একবার তীরে নেমে দেশটি দেখে যাওয়া যাক। আর তাছাড়া এখানে হয়তো কিছু খাবার, শুকনো কাঠ আর খাবার জল পাওয়া যেতে পারে। এগুলো আমাদের দরকার। এখান থেকে আমরা এগুলো নিয়ে নিতে পারি।

–পারি। বিজার্নী গম্ভীর গলায় বললেন–তার চেয়েও আমাদের বেশী দরকার সবুজ দেশটিকে খুঁজে বের করা।

–তাহলে কি এখানে আমরা নামবো না ?

–না।

–কেনো ?

–কারণ সত্যিকার সবুজের দেশ এখনো আমরা খুঁজে পাইনি, তাই আমার আদেশ, এক্ষুনি সবগুলো পাল তুলে দাও। আমাদের হয়তো আরো অনেক দূর যেতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

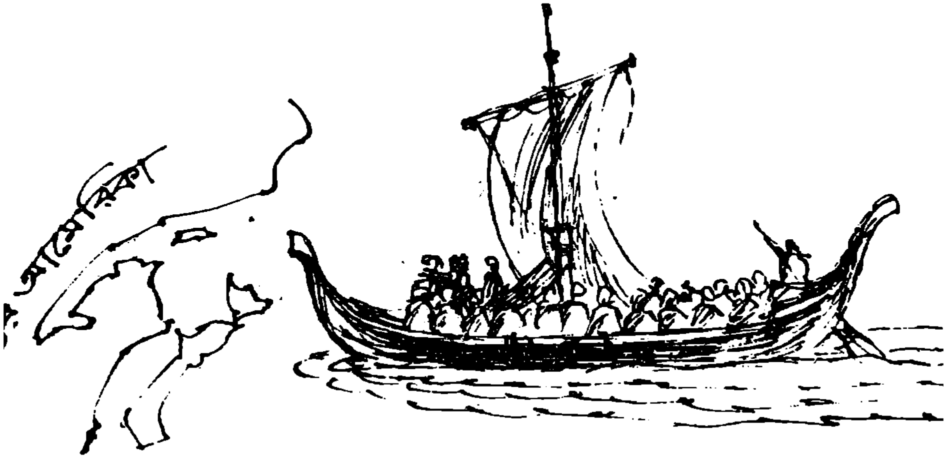


বিজার্নী ডাঙ্গার দেখা পেয়েও না নেমেই ফিরে এলেন।

অতঃপর তাই হলো। আবার তাঁদের জাহাজ ভেসে চললো অজানা সমুদ্রের পথে। বিজার্নী আমেরিকার মূল ভূ-খন্ডের সন্ধান পেয়েও এমনি করে তার তীরে না নেমেই চলে গেলেন।

দীর্ঘ কয়েকদিন একটানা জাহাজ চলার পর তাদের চোখে পড়লো সেই উঁচু পাহাড়। যার শীর্ষদেশ সাদা তুষারে ঢাকা। পাদদেশে সবুজ শ্যামলিমা নেই বটে, তবু কিছু কিছু ঘাস আছে। তবে কাছে গিয়েই বিস্মিত হলেন বিজার্নী। এই দেশটির তীরেই বাঁধা আছে একটি ছোটো জাহাজ।

বিজার্নীর চিনতে অসুবিধা হলো না। এটা তার বাবারই জাহাজ। এই জাহাজ নিয়েই তার বাবা হারজোলফ আইসল্যান্ড থেকে এসেছেন গ্রীনল্যান্ডে।

সত্যি সত্যি বিজার্নী খুঁজে পেলেন তার বাবাকে। মিলন হলো পিতা পুত্রের।

যেখানে বিজার্নীর পিতা হারজোলফ তাঁর জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেখানেই গড়ে উঠেছিলো একটি শহর। এবং হারজোলফ- এর নামানুসারেই এর নাম রাখা হয়েছে হারজোলফনেস। এই হারজোলফনেস গ্রীনল্যান্ডের একটি বড় সামুদ্রিক বন্দর এখন।

## লীফ ইরিকসনের আমেরিকা আবিষ্কার

বিজার্নী গ্রীনল্যান্ডে ফিরে তাঁর রোমাঞ্চকর সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন সকলের কাছে। তিনি বলতে লাগলেন তার ঘটে যাওয়া সমস্ত কথা।

কেমন করে আইসল্যান্ড থেকে রওনা দেবার পর পরই তাঁদের জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়েছিলো। কেমন করে তাঁরা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভেসে গেলেন কোন্ নিরুদ্দেশেরপথে।

তারপর আকাশ ফর্সা হলে দেখতে পেলেন-তাঁরা পৌঁছে গেছেন এক নতুন দেশে। কি অপূর্ব সুন্দর সেই দেশ। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। নেই কোনো পাহাড়, নেই কোনো তুষার। শুধু গাছ আর গাছ।



www.nagorikpathagar.org

বিজার্নীর মুখে নতুন দেশের খবর শুনে সবচেয়ে যিনি বেশী আকৃষ্ট হলেন তিনি হলেন স্বয়ং রেড ইরিকের পুত্র লীফ ইরিক্সন (Leif Eriksson)।
এই লীফ ইরিকসনও ছিলেন বাপকা ব্যাটা। বাপের চেয়ে তিনগুণ সাহসী। দুর্দান্ত তার সাহস। ভয় কাকে বলে তা সে জানে না।

বিজার্নীর মুখে এমন সুন্দর দেশের নাম শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। যেমন করেই হোক সেই সবুজ দেশে তাকে যেতেই হবে। লুটে আনতে হবে সব সম্পদ।

খবর শুনেই তিনি ছুটে এলেন বিজার্নীর কাছে।

–তুমি সত্যি দেখে এসেছো সে দেশ লীফ ইরিকসন জিজ্ঞেস করলেন।

–তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলেছি ?

–না, তা নয়। তবে তুমি সে দেশের মাটিতে নেমে সব ঘুরে দেখে এসেছো কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।

–না, তা নামিনি। বিজার্নী বললেন–আমার তখন মন ভালো ছিলো না, পথ হারিয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছিলাম। ঘরে ফেরার জন্য মনটা খুব ব্যাকুল ছিলো। তাই আর কোথাও বিলম্ব করতে মন চায়নি। তবে সে যে অপূর্ব এক সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী দেশ তা আমি বলতে পারি।

লীফ ইরিকসন বললেন–তোমার দেখা সেই সবুজ দেশে যাবার আমারও খুব ইচ্ছে।

–বেশ তো যাও না। বিজার্নী বললেন–যেতে চাইলে আমার জাহাজ নিয়েও যেতে পারো। আমি আর কোথাও যাবো না। ভাবছি জাহাজ এবার বেচে দেবো। তুমি ইচ্ছে করলে আমার জাহাজই কিনে নিতে পারো। তারপর যাত্রা করতে পারো নতুন দেশে।

বিজার্নীর জাহাজ বিক্রির কথা শুনে দারুণ খুশী হয়ে গেলেন লীফ ইরিকসন।

এমন সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নন লীফ। তারপর তিনি সত্যি সত্যি কিনে ফেললেন বিজার্নীর জাহাজটি। আয়োজন করতে লাগলেন নতুন দেশে যাবার।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি রওনা দিলেন লীফ ইরিকসন। বিজার্নীর জাহাজ আর ৩৫ জন নাবিক নিয়ে তিনি জাহাজ ভাসালেন অজানার পথে।

বেশ কিছুদিন একটানা চলার পর অবশেষে তাঁরা ডাঙার দেখাও পেলেন। সবার মনই এবার ভরে উঠলো খুশীতে।

উল্লেখ্য যে, বিজার্নী যেভাবে একটার পর একটা নতুন দেশের সন্ধান পেয়েছিলেন লীফ ইরিকসনের বেলায়ও তাই হলো, তবে উল্টো দিক থেকে। অর্থাৎ বিজার্নী সবশেষে যে দেশটির সন্ধান পেয়েছিলেন লীফ ইরিকসন সেই দেশটিতেই গিয়ে পৌঁছালেন সবার আগে।

ডাঙার দেখা পেয়েই তাঁরা জাহাজ ভেড়ালেন তীরে। ফেলা হলো নোঙর। তারপর ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে লীফ ইরিকসন নেমে এলেন ডাঙ্গায়।

ইউরোপীয়দের মধ্যে এই লীফ ইরিকসনই হলেন প্রথম মানুষ যিনি আমেরিকাতে পা দিলেন। বিজার্নী অবশ্য প্রথম দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি এর মাটিতে নামেন নি। দূর থেকে দেখেই চলে গিয়েছিলেন।

লীফ ইরিকসনই সভ্য পৃথিবীর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে এখানে পদার্পণ করলেন। কয়েকজন সাথী নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এর ভেতরে।

কিন্তু দেশটা দেখে তিনি তেমন খুশী হতে পারলেন না। বিজার্নীর কাছে যমন চমৎকার বর্ণনা শুনেছিলেন তার সাথে খুব একটা মিল নেই। কোথাও কোনো সবুজ ঘাস নেই। পাশে আছে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ ঢাকা। আর গোটা অঞ্চলটাই



www.nagorikpathagar.org

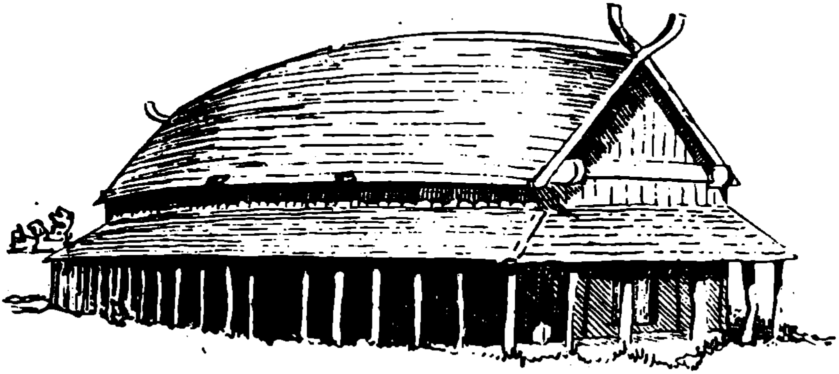

গ্রীনল্যাণ্ডে ভাইকিংদের তৈরি ঘরবাড়ির নমুনা।

পাথরে ভর্তি। কোথাও যেনো কোনো খোলা মাটি নেই।

তাই তিনি ভাবলেন–এদেশটা হয়তো তাদের কোনো কাজে আসবে না। এদেশ কোনো সম্পদশালী দেশ নয়।

লীফ ইরিকসন বললেন–দেশটার কথা বিজার্নীর কাছে যা শুনেছিলাম তেমন সমৃদ্ধ নয়।

–তাহলে কি ব্যাটা আমাদের ঠকিয়েছে ? লীফ ইরিকসনের প্রধান সহকারী টারকার (Tyrker) বললো।

–নাও হতে পারে।

–তাহলে ?

–হয়তো বিজার্নীর কাছ থেকে আমরা যে দেশটির কথা শুনে ছুটে এসেছি, এটা সে দেশ নয়। আমরা অন্য কোনো দেশে চলে এসেছি।

–এখন কি হবে ?

–আবার আমাদের সেই বিজার্নীর নির্দেশিত দেশ খুঁজতে হবে। তবে এসেই যখন পড়েছি তখন আমাদের চিহ্ন এখানেও রেখে যেতে হবে। আমরা এ দেশটির একটি নাম দিয়েযাবো।

–কি নাম?

–নাম দিলাম হেল্লোল্যান্ড (Helluland)।

নরওয়েজিয়ান ভাষায় এই হেল্লোল্যান্ড শব্দের অর্থ হলো Land of Rocks অর্থাৎ পাথরের দেশ।

তারপর আর তিনি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলেন না এই হেল্লোল্যান্ডে। তোলা হলো জাহাজের নোঙর। আবার তাঁরা পাল তুলে দিলেন নতুন দেশের সন্ধানে।

দক্ষিণ দিকে কিছুদূর এগিয়েই তারা আবারও একটি নতুন ভূ-খন্ডের সন্ধান পেলেন। আবার তীরে ভিড়লো জাহাজ। এটি ছিলো আরো ভালো একটি দেশ।

এখানে কোনো উঁচু পর্বত নেই। সর্বত্রই প্রায় সমতল ভূমি। চারদিকটা ঘন গাছপালায় ঘেরা।

মূল ভূ-খন্ড থেকে উপকূল এলাকা নিচু এবং সাদা বালুতে ভরা।

www.nagorikpathagar.org

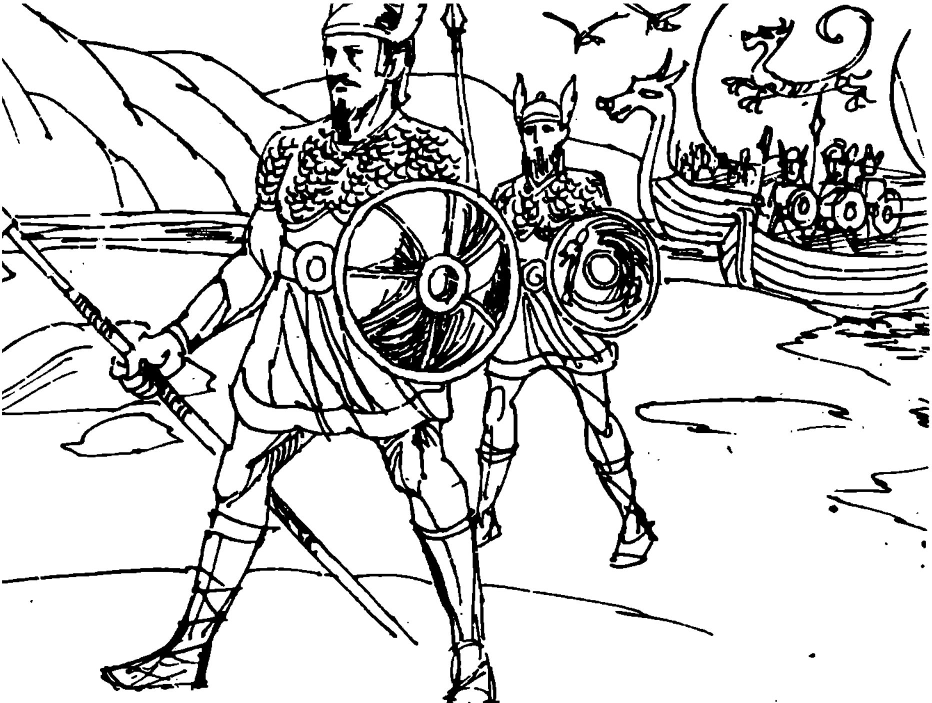

লীফ ইরিকসন তার সাথীদের নিয়ে নামলেন আমেরিকার মাটিতে।

লীফ ইরিকসন এবারও তার সাথী টারকারকে নিয়ে নামলেন তীরে। গোটা অঞ্চল দেখলেন ঘুরে ঘুরে। সাথীকে বললেন–বুঝলে টারকার ?

–জ্বি।

–আমরা আবার একটি নতুন দেশে এসে পড়েছি।

–আমার মনে হয়, এটাই হবে বিজার্নীর কথিত দেশ। এটাই তিনি দেখে গিয়েছিলেন।

লীফ ইরিকসন বললেন,হতে পারে, হয়তো তাই।

–তাহলে বিজার্নী মিথ্যে বলেনি।

–যাহোক আমরা যখন নতুন দেশে এসেছি তখন এরও একটা নাম দিতে হয়।

–কি নাম হবে এদেশটার ?

লীফ ইরিকসন হেসে বললেন, দেশটা যখন বন-জঙ্গলে ঘেরা, তাই এর নাম হওয়া উচিত মার্কল্যান্ড (Markland)।

মার্কল্যান্ড শব্দের অর্থ হলো 'অরণ্যের দেশ' (Land of Forest)।

দেশটা অবশ্য ভালোই লেগেছিলো তাঁদের। তাঁরা যেমন সুন্দর দেশ দেখার জন্য এতো দূর ছুটে এসেছিলেন, তার দেখা পেয়েছেনও।

তবু আবার তাঁরা নোঙ্গর তুললেন জাহাজের। তাঁদের যে আরো দেখার ইচ্ছে। এরও দক্ষিণে আরো কি দেশ আছে তাও দেখতে হবে তাঁদের।

তাই লীফ ইরিকসন আবারও চলতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে।

কিছু দূর আসার পরই তাঁরা দেখতে পেলেন এখানে একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। উত্তর



www.nagorikpathagar.org

পূর্ব দিকে প্রবাহিত ঝড়। তাঁরা অবশ্য সাবধানে পাশ কাটিয়ে এলেন ঝড়টিকে। তারপর আরো দু'দিন কাটার পর অবশেষে সামনে পড়লো আর এক বিশাল সবুজ ভূ-খন্ড।

তাঁরা এগিয়ে গেলেন এই ভূ-খন্ডের দিকে। নিশ্চয়ই তাঁরা আবারও একটি সুন্দর দেশের সন্ধান পেয়েছেন। দেখে বোঝা গেলো দেশটি উত্তরে দক্ষিণে লম্বা।

তবে দেশটি সত্যি সত্যি বড় সুন্দর। চমৎকার এর পরিবেশ আর আবহাওয়া। না ভীষণ শীত, না প্রচন্ড গরম। মাটি ঘন ঘাসে ঢাকা। চারদিক শুধু সবুজ আর সবুজ। তাঁরা মাটিতে নামলেন, তারপর দু'হাত ভরে তুলে নিলেন নরম মাটিকে। গন্ধ নিলেন মিষ্টি মাটির। মনে হলো এতো সুন্দর নরম মাটি তাঁরা আগে আর কখনো দেখেননি।

তারপর তাঁরা একটি বড় চ্যানেল ধরে জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়লেন আরো অনেক ভিতরে। তারা এই চ্যানেল ধরে উত্তর পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে গিয়েই দেখলেন সেখানে জলের গভীরতা খুব কম। তখন তারা তীর থেকে বেশ দূরে জাহাজ থামিয়ে ডিঙ্গি নৌকা করে এসে নামলেন তীরে।

দেখলেন সেখানেই রয়েছে একটি নদীর মোহনা। নদীটা হয়তো ভেতরের কোনো পর্বত কিংবা হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাঁরা যখন নদীর মোহনায় গিয়ে জাহাজ নিয়ে পৌঁছেছিলেন তখন ছিলো ভাঁটার সময়। তাই জলের গভীরতা ছিলো কম। তারপরই এলো জোয়ার। জলের গভীরতা আবার বাড়তে শুরু করলো।

তখন বড় জাহাজটিকেও টেনে নিয়ে এলেন নদীর মোহনার ভিতরে। নোঙর ফেলা হলো নদীর তীরে।

জায়গাটি দারুণ পছন্দ হয়ে গেলো। চারদিকে কি সুন্দর গাছপালার ছায়া। মাটি নরম পশমের মতো। ঘন ঘাস।

জায়গাটি লীফ ইরিকসনের দারুণ পছন্দ হয়ে গেলো, অতঃপর এখানেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

জাহাজ থেকে নামানো হলো তাঁবু খাটাবার জিনিসপত্র। গোটা শীতকালটা এখানেই কাটাবেন বলে ঠিক করলেন ইরিকসন। সঙ্গীরাও রাজী।

আশেপাশে প্রায় কোনো কিছুরই অভাব ছিলো না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো, নদীতে ছিলো প্রচুর মাছ। শ্যালমন ফিশ (Salmon Fish)।

নদীতে এমন বড় বড় সব শ্যালমন মাছ ছিলো যে ওরা দেখে অবাক। জীবনে কখনো এতো বড় শ্যালমন মাছ দেখেইনি ওরা কেউ।

শীতকালেও এখানে কোনো বরফ জমে না। তখনো চারদিক তেমনি সবুজ থাকে। এই শীতকালেও এখানে দিন-রাত সমান থাকে।

তাঁবু খাটানোর পর লীফ ইরিকসন তাঁর লোকজনদের ডেকে নিয়ে বললেন, পরবর্তী কর্তব্য কাজের জন্য একটা পরামর্শ করা দরকার। এরপর তারা কি করবেন।

লীফ ইরিকসন তাঁর লোকদের বললেন, আমার ইচ্ছে, এবার আমরা নতুন দেশটির অভ্যন্তর ভাগে অভিযান চালাবো।

সংগীরাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, আমাদেরও তাই ইচ্ছে। এমন সুন্দর দেশটির ভিতরে আরো কি সুন্দর আছে, তা দেখতে হবে।

–কিন্তু তা দেখতে হলেই তো আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। এবার থেকে আমরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে যাবো।

–তারপর?



www.nagorikpathagar.org

–তারপর একদল এখানেই অবস্থান করবে, যারা জাহাজ আর তাঁবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কারণ দেশটি সুন্দর বটে। কিন্তু এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক অসুন্দর কিছু। গভীর জঙ্গলে থাকতে পারে হিংস্র জীবজন্তু, থাকতে পারে স্থানীয় হিংস্র উপজাতীয় মানুষ। তাদের থেকে সব সময় সাবধানে থাকতে হবে। তাই একদল নিয়োজিত থাকবে পাহারায়।

আর একদলকে যেতে হবে অভিযানে। কিন্তু একটি বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে, কেউ কখনো দলছাড়া হয়ে একা কোথাও যাবে না। এবং কেউ এমন দূরে যাবে না, যেখান থেকে দিনে দিনে আস্তানায় ফেরা না যায়।

এভাবেই লীফ ইরিকসন তাঁর লোকজন নিয়ে উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তর ভাগে চালিয়েছিলেন অভিযান। আবিষ্কার করেছিলেন অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান ও দৃশ্য।

তবু এর মধ্যেই সেদিন ঘটে গেলো এক দুর্ঘটনা। লীফ ইরিকসন প্রথমে লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। তাঁর প্রধান সহকারী টায়ারকার ফিরেনি। অথচ বেলা পড়ে আসছে, সে এখনো ফিরে আসছে না।

তাহলে, কোনো বিপদ হয়নি তো ? হতেও তো পারে। চারদিকে বনজংগল। সেখানে থাকতে পারে হিংস্র জীবজন্তু। তার উপর আছে স্থানীয় উপজাতীরা। তাদের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই।

তখনি তিনি আদেশ দিলেন তার লোকদের। এক্ষুনি খুঁজতে বের হতে হবে।

আর অমনি বেরিয়ে পড়লো লোকজন।

অবশ্য বেশী দূর যেতে হলো না তাঁদের। কিছু দূর গিয়েই ওরা থমকে দাঁড়ালো। দেখলো টায়ারকার নিজেই এদিকে আসছে। তাঁর কাঁধে একটা বড় পুঁটলি।

লীফ ইরিকসন জিজ্ঞেস করলেন–কিহে টায়ার ? তোমার এতো দেরী হলো কেনো ? আমরা তো তোমার জন্য ভয়ে অস্থির।

–সে এক মজার ঘটনা। টায়ারকার হেসে বললো।

–কি মজার ঘটনা ?

–এই দ্যাখো কি এনেছি।

এই বলে তাঁর কাঁধের পুঁটলি খুলে ধরলো সবার সামনে। লীফ ইরিকসন দেখলেন, সে কোথা থেকে অনেকগুলো আঙ্গুর এনেছে।

–এ যে আঙ্গুর।

–হ্যাঁ, তাই তো। খুব স্বাদ খেতে।

–কিন্তু এগুলো এ দেশে কোথায় পেলে তুমি? লীফ ইরিকসন জিজ্ঞেস করলেন।

টায়ারকার তেমনি হাসতে হাসতে বললেন–সেই কথাই তো বলছি।

–বলো, বলো, শীঘ্র বলো কোথায় পেলে এসব।

–আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে।

–তারপর ? তারপর ?

–তারপরই আমার চোখে পড়লো এই আঙ্গুর ফলের বাগান।

–এখানে আবার আঙ্গুর ফলের চাষ করতে কে এলো ?

– না, না, কেউ চাষ করেনি।

– তাহলে ?

–এগুলো এমনি জংগল জুড়ে হয়ে আছে। জংলী আঙ্গুর।

–তাই নাকি ?



www.nagorikpathagar.org

–খেতে কিন্তু ভারী মজা। খেয়েই দ্যাখো না।

তখন সবাই মিলে খেতে লাগলো নতুন দেশের জংলী আঙ্গুর। আঙ্গুর খেতে খেতে লীফ ইরিকসন বললেন, এ কিন্তু ভারী মজার ঘটনা। যে দেশে এমন মজার আঙ্গুর ফল পাওয়া যায় সে দেশটারও একটা নাম থাকা দরকার। তাই এই নতুন দেশটার একটা নাম দিলাম–আঙ্গুরের দেশ (Wine land)।

তারপর লীফ ইরিকসন তাঁর দলবল নিয়ে গোটা শীতকালটাই কাটিয়ে দিলেন এই নতুনদেশে।

তিনি ঠিক কোনখানে তাঁর শীতকালীন তাঁবু খাটিয়েছিলেন তা জানা নেই। তবে সেটা অবশ্যই চীসাপিক (Chesapcaki) উপসাগরের তীরে কোথাও হবে। এখানেই ইউরোপ থেকে সর্বপ্রথম ব্যক্তি আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন। এখানেই তিনি ১০০২ থেকে ১০০৩ সাল পর্যন্ত কাটিয়ছিলেন।

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন গ্রীনল্যান্ডে। তিনি আসার সময় আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছিলেন প্রচুর পরিমাণে জংলী আঙ্গুর এবং মূল্যবান কাঠ।

এর দু'বছর পরে লীফ ইরিকসনের ছোটো ভাই থোরভাল্ড (Thorvald) আবার এসেছিলেন এই নতুন দেশে।

তিনি জাহাজ নিয়ে এসে নেমেছিলেন পূর্বের জায়গায়ই। সেখানে তিনি বড় ভাই লীফ ইরিকসনের ক্যাম্পের ধ্বংসবিশেষও খুঁজে পেয়েছিলেন।

থোরভাল্ড এখানে এসেছিলেন আরো একটি বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। বড় ভাই লীফ ইরিকসন এসেছিলেন শুধু নতুন দেশ আবিষ্কার করতে, কিন্তু থোরভাল্ড এসেছিলেন সেই নতুন আবিষ্কৃত দেশটি দখল করতে।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই দেশে নতুন বসতি গড়ে তোলা। একটি ভাইকিং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার। তিনি হবেন সেই নতুন সাম্রাজ্যের রাজা।

কিন্তু থোরাল্ডের সেই রাজা হওয়ার বাসনা পূরণ হয়নি। তিনি এখানে নতুন বসতি গড়ে তুলতে এসে নিজেই মারা পড়লেন স্থানীয় উপজাতীয়দের হাতে। স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে আড়াল থেকে তীর মেরে হত্যা করে।

তাঁকে এই ওয়াইনল্যান্ডেই সমাধিস্থ করা হয়েছিলো। যেখানে তিনি নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেখানেই কবর দেয়া হয়েছিলো তাঁকে।

এর পরেও আরো কয়েকবার ভাইকিংরা গিয়েছিলো আমেরিকায়। চেষ্টা করেছিলো নতুন বসতি স্থাপনের। কিন্তু পারেননি। তারা ছিলো সংখ্যায় নগণ্য তাই স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে তারা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের আর হয়ে ওঠেনি আমেরিকা দখল করা।

নইলে আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাদেরই হতো। তারাই হতো নতুন বিশ্বের লোকবসতি স্থাপনের অগ্রপথিক।

কিন্তু তা হয়নি। এদেরও ৫০০ বছর পরে কলম্বাস কেড়ে নেন এই কৃতিত্ব। কলম্বাস এসে আবিষ্কার করেন আমেরিকা।



www.nagorikpathagar.org

# কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

আমেরিকা আবিষ্কারের দাবীদার অনেক থাকলেও স্বীকৃতি পেয়েছেন একজনই এবং তিনিই হলেন দুঃসাহসিক নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস (Christopher Columbus)।

কলম্বাসের আগে কেউ কেউ হয়তো এই নতুন অজানা দেশটির মাটিতে পা রেখেছিলেন। কিন্তু সে আবিষ্কার কোনো দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

সেটিছিলো একান্তই কারো কারো নিজস্ব প্রচেষ্টা কিংবা অজান্তে আবিষ্কার।

কিন্তু কলম্বাসের পর থেকেই বিশ্বের কাছে এই নতুন পৃথিবীর কথা ছড়িয়ে পড়ে

এই দুঃসাহসিক নাবিক কলম্বাসের জন্ম হয়েছিলো ইটালীর বন্দর নগরী জেনোয়াতে। একেবারেই এক সাধারণ ঘরে জন্ম হয়েছিলো তাঁর। তাই উচ্চ শিক্ষার কোনো সুযোগ কখনো আসেনি তাঁর জীবনে।

বাল্যকালে বাপের সাথেই কাজকর্ম করতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের বড় স্বপ্ন ছিলো নাবিক হয়ে সমুদ্রে যাওয়ার।

জেনোয়া ছিল সমুদ্র বন্দর। এখানে প্রতিদিন এসে ভিড়তো কতো দেশ বিদেশের পালতোলা বাণিজ্য জাহাজ। আবার তারা পাল উড়িয়ে চলে যেতো কোন অজানার পথে।

কলম্বাস প্রতিদিন সমুদ্র বন্দরের তীরে এসে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন এই জাহাজগুলোর দিকে। আর ভাবতেন তিনিও যদি অমনি করে জাহাজে চড়ে পাড়ি দিতে পারতেন অজানার পথে।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি তার স্বপ্ন সফল হলো। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেবার পরই একদিন এমনি এক জাহাজে সাধারণ নাবিকের চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্র যাত্রায়।

এই হলো শুরু। বহুদেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পড়লেন পর্তুগালে।

শুধু সমুদ্র নয়। তিনি এ সম্পর্কে যতো বই আছে তার সবগুলো পড়তে লাগলেন একে একে।। খবর নিতে লাগলেন কোথায় কোন্ দেশ, কোন্ সাগর, কোন্ পর্বত আছে। আর এমনি করে তিনি নিজের উদ্যোগেই একটি সমুদ্র যাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে ফেললেন।

তিনি ভাবলেন, পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করে কুবলাই খানের দেশে পৌছতে পারবেন। এমনকি মশলার দেশ নামে খ্যাত ভারতবর্ষেও গিয়ে পৌছতে পারবেন বলে আশা করেন। কারণ পৃথিবীতো গোলাকার। তাহলে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে অবশ্যই পূর্ব দেশে পৌছানো সম্ভব।

তারপর সাহায্য প্রার্থনা করলেন রাজার কাছে। তিনি বললেন, যদি জাহাজ আর নাবিক পাওয়া যায় তবে তিনি নতুন দেশ আবিষ্কার করতে পারবেন।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কলম্বাসের এই পরিকল্পনা রাজার কাছে কেমন উদ্ভট বলে মনে হলো। তাই তিনি কলম্বাসের কথার খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে মর্মাহত হলেন কলম্বাস। আর এই রাগে তিনি দেশই ত্যাগ করলেন। সেখান থেকে সোজা চলে এলেন স্পেনে। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড এবং রাণী ইসাবেলার কাছে প্রস্তাব দিলেন সমুদ্র যাত্রার। কিন্তু তাঁরাও প্রথমটায় খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসতে হলো কলম্বাসকে।

কেটে গেলো কয়েকটি বছর। তারপরই একদিন সহসা স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে আবার ডাক এলো কলম্বাসের।

## কলম্বাসের প্রথম সমুদ্র যাত্রা

রাণী ইসাবেলা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কলম্বাসের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী। তিনি যেনো শীঘ্র তাঁর সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আনন্দে কলম্বাস তো দারুণ খুশী।

তাঁর সমুদ্রযাত্রার সকল বাধা এবার গেলো কেটে। তিনি তৈরি হলেন যাবার জন্য। তার জন্য তৈরি হলো তিন তিনটি পালতোলা সামুদ্রিক জাহাজ। এই জাহাজ তিনটির নাম হলো ম্যারিগ্যালান্ট (Marigalante)। যার সরকারী নাম ছিলো সান্তামারিয়া (Santamaria). এটি ছিলো বড় এবং পাটাতন জাহাজ। সান্টামারিয়ার দৈর্ঘ্য ছিলো ১১৭ ফুট (৩৬ মিটার)।

অপর দুটো জাহাজ ছিলো ছোটো এবং অনেকটা হালকা পাতলা ধরনের। এ দুটোর নাম ছিলো পিন্টা (Pinta) এবং নীনা (Nina)। এ দুটোই ছিলো মাত্র ৫০ ফুট (১৫ মিটার) করে লম্বা। অনেকটা ছোটো আকৃতির যুদ্ধ জাহাজের মতো।

শুধু তাই নয়। যাবার সময় এ দুটোকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতও করে নেয়া হয়েছিলো। কারণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কখনো নিরস্ত্র অবস্থায় যেতে নেই। জলদস্যুদের ভয় তোআছে।

গোটা অভিযানের প্রধান যদিও ছিলেন কলম্বাস নিজেই, তবু তিনটি জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনজন আলাদা আলাদা ক্যাপ্টেন ছিলেন। বড় জাহাজ সান্টামারিয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কলম্বাস নিজেই।

তবে অপর দুটো জাহাজ পিন্টার ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলেন কলম্বাসের প্রধান সহায়ক মার্টিন অলোনসো পিন্‌জন (Martin Alonso Pinzon)। এবং তার ভাই ফ্রান্সিস্কো মার্টিন পিন্‌জন (Francisco Martin Pinzon)। নিনা'র ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হয়েছিলেন এদেরই আরেক ভাই ভাইসেন্ট ইনাজ পিন্‌জন (Viccnt yancz Pinzon)।

কলম্বাস যে একটি নতুন দেশ আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন, তখনো কিন্তু তিনি তা জানতেন না। লক্ষ্য ছিলো সোজা পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে গিয়ে তাঁরা একদিন পৌঁছে যাবেন কুবলাই খানের দেশে। সেখানে থেকে আসবেন মশলার দেশ ভারতে। তাই যাবার সময় তাঁরা জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেলেন বানিজ্যিক পণ্য। এগুলোই তাঁরা ওখানে গিয়ে বিক্রি করবেন চড়া দামে। আর ফেরার সময় নিয়ে আসবেন ওদেশের পণ্য মশলা। এখানে যার রয়েছে প্রচুর চাহিদা।



www.nagorikpathagar.org

রাণী ইসাবেলাকে কলম্বাস তাঁর সম্ভাব্য অভিযান সম্পর্কে বুঝাচ্ছেন



www.nagorikpathagar.org

১৪৯২ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে সূর্যোদয়ের একঘন্টা আগেই কলম্বাস শুভক্ষণ দেখে তাঁর তিন-খানা জাহাজ সমুদ্রে ভাসালেন। জাহাজগুলো এগিয়ে চললো সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে।

তাঁরা ১২ই আগষ্ট তারিখে এসে পৌছলেন ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। এখানেই তাঁরা বেশ কয়েকদিন বিলম্ব করলেন।

বেশ কিছু দিন দেরী করার পর ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁরা ছাড়লেন ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ। ৯ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে তাঁরা গিয়ে পড়লেন একেবারে কূল-কিনারাহীন সাগরে।

পুরো একটা মাস তাঁদের তিনটি জাহাজ ভেসে চললো কূল-কিনারাহীন সাগরের বুকে। এর মধ্যে তাঁরা না দেখা পেলেন কোন জাহাজ, না দেখা পেলেন কোনো দেশ বা দ্বীপের। যেনো এই সমস্ত বিস্তৃত জলরাশির কোনো শেষ নেই। সীমা নেই।

তাই নাবিকদের মধ্যে দেখা দিল অবিশ্বাস আর ভয়। কে জানে সামনে যদি আর কোনোদিন কোনো দেশ বা মাটির সাক্ষাৎ নাই পাওয়া যায়? যদি এই কিনারাহীন সাগরের শেষ না হয়? তবে কি তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? কলম্বাস কি তাঁদের মারতে নিয়ে এসেছে? এমনি করে নাবিকদের মধ্যে দেখা দিলো অবিশ্বাস, হতাশা।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা সবাই উঠলো ক্ষেপে। এই একগুঁয়ে আর পাগলা লোকটা তাদের মারতে নিয়ে চলেছে। এবার আমরা নিজেরাই তাঁকে মেরে ফেলবো, তারপর ফিরে যাবো আবার দেশে।

২৬শে সেপ্টম্বরের দিকে এসে কলম্বাস নিজেও অনেকটা আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তাঁরও মনে হতে লাগলো হয়তো তারা সত্যি সত্যি দিক হারিয়ে ফেলেছে। আর যদি কোনোদিন কোন ডাঙার সন্ধান পাওয়া না যায়? কিন্তু এখান থেকে তো আবার ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

একদিন তো সান্টামারিয়ার নাবিকরা তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করে বসলো। ভাগ্যিস সে সময় জাহাজে পিনৃজন ছিলেন। তিনিই কোনোমতে বিদ্রোহ দমন করলেন। প্রাণে বেঁচে গেলেন কলম্বাস।

৬ই অক্টোবর পিনৃজন পরামর্শ দিলেন জাহাজকে এবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালানো হোক। কিন্তু কলম্বাস রাজী হলেন না। তিনি যে সোজা পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাচ্ছিলেন তাঁর গতি পরিবর্তন করাতে রাজী হলেন না। কারণ এভাবেই তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে জাপানে গিয়ে পৌছোবেন বলে আশা করছিলেন।

এরপরের দিনই 'নিনা' জাহাজ থেকে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেলো। দেখা গেলো কতগুলো পাখি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যাচ্ছে।

এই ঘটনা থেকেই তাঁরা অনুমান করলেন হয়তো এদিকে কোনো ডাঙা ভূমি আছে। নইলে পাখিরা ওদিকে যাচ্ছে কেনো?

কলম্বাসের নিজেরও কথাটা বিশ্বাস হলো। অতঃপর জাহাজের মুখ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক করেই চালাতে লাগলেন তাঁরা।

তারপর যতোই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন ততই পাখির ঝাঁক এবং পাখির কল কোলাহল শোনা যেতে লাগলো। তাঁদের মনেও কিছুটা আশার সঞ্চার হলো। হয়তো সামনেই কোনো ডাঙা ভূমি পাওয়া যাবে।

এবার সত্যি সত্যি তাঁদের [illegible] হলো ১২ই অক্টোবরের (১৪৯২ সাল) মধ্যরাতের দুর্ঘটনার পর তাঁরা [illegible] দেখা পেলেন।

রাতে আর নামা সম্ভব হলো না। [illegible] গেলো জাহাজেই। পরদিন দুপুর



www.nagorikpathagar.org

কলম্বাসের তিনটি জাহাজ – নীনা, পিন্টা ও সেন্টামারিয়া।

নাগাদ তাঁরা গিয়ে জাহাজ ভিড়ালেন সবুজ শ্যামল এবং অপূর্ব সুন্দর এক ডাঙা ভূমির তীরে।

পরের দিন কলম্বাস মহা আনন্দে তাঁর জাহাজের প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের সাথে করে রাজকীয় ব্যানার হাতে নিয়ে এসে পা রাখলেন নতুন দেশে। তাঁরা স্পেনের রাজা ও রাণীর পক্ষ থেকে দেশটি যথারীতি দখল করলেন।

কলম্বাস সাগর পাড়ি দিয়ে সর্বপ্রথম এই যে দ্বীপে গিয়ে অবতরণ করেন এই দ্বীপটি ছিলো বাহামা দ্বীপপুঞ্জের (Bahama Islands) একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ গুয়ানীহানী (Gucanchani)। পরে স্পেনীয়রা এর নাম রাখে সান সালভেদর।

মজার ব্যাপার হলো–তখনো কিন্তু কলম্বাস কিংবা তাঁর সাথীরা কেউ বুঝতে পারেননি যে তাঁরা যেখানে এসে পৌছেছেন সেটি একটি নতুন পৃথিবী, নতুন দেশ।

তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা জাপানেরই কোনো একটি দ্বীপে এসে পৌছেছেন।



www.nagorikpathagar.org

কলম্বাস তাঁর জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

তাঁরা আসার আগে তাঁদের গন্তব্যস্থল জাপানের একটি আনুমানিক মানচিত্রও নিয়ে এসেছিলেন। জাপানও দ্বীপের দেশ। এটিও একটি দ্বীপ। তাই তাঁরা ভাবলেন–নিশ্চয়ই তাঁরা জাপানে এসেছেন।

যদিও এই নতুন দ্বীপের স্থানীয় লোকদের চেহারা জাপানীদের মতো ছিলো না। স্থানীয় লোকদের নাকের ডগায় পরাছিলো সোনার আংটি।

কলম্বাসের এই ভুলের কথা জানা যায় তাঁর ডায়েরী থেকেই। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন– আমরা সম্ভবত সিপাংগোর (Cipangoic Japan) কোনো দ্বীপে এসে পৌঁছেছি।

এই দ্বীপেই প্রায় দিন পনেরো কেটে গেলো ওদের। কী অপূর্ব সুন্দর এই দ্বীপ। গাছ–পালা, পাখ–পাখালি আর উপজাতীয় মানুষ। আর অফুরন্ত সম্পদে পরিপূর্ণ যেনো এর সর্বত্র। কলম্বাস তার সংগী সাথীদের নিয়ে উপজাতীয়দের সাথে মিলেমিশে কাটাতে লাগলেন দিনের পর দিন। কিন্তু তারপরই একদিন ঘটলো এক দুর্ঘটনা।

গোলযোগটা সৃষ্টি করলেন কলম্বাস নিজেই। তিনি যখন কয়েকজন স্থানীয় লোককে ক্রীতদাস হিসাবে তাঁর জাহাজে তুললেন তখনি ওরা উঠলো ক্ষেপে।



www.nagorikpathagar.org

কলম্বাসের নাবিকরা দেখলো তাদের জাহাজের পাশে পাখি উড়ছে



www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার আদিবাসীরা সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছে আগন্তুকদের।

ওরা মারমুখো হয়ে এলো নবাগতদের প্রতি–অতঃপর কলম্বাসকে ছাড়তে হলো এ দ্বীপ।

এরপর তাঁরা জাহাজ নিয়ে চলে এলেন আরো অনেক পশ্চিমে। এই দ্বীপটি ছিলো আগের তুলনায় অনেক বড়। স্থানীয় ভাষায় দ্বীপটির নাম ছিলো ক্যানিবা (Caniba) অথবা ক্যানিবাল (Cannibal)।

এই নাম শুনে কলম্বাস ভাবলেন– এই ক্যানিবা শব্দটি হয়তো ক্যান (Can) বা খান (Khan) শব্দ থেকে এসেছে।

আর তাই যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা এবার খানদের দেশ অর্থাৎ মার্কোপোলোর স্মৃতিকথার বর্ণিত কুবলাই খানের দেশে এসে পৌঁছেছেন।

তিনি মার্কোপোলোর স্মৃতিকথায় পড়েছিলেন–কুবলাই খানের দেশে আছে প্রচুর সোনা। ওরা সোনার দেশে পৌঁছেছেন। তাঁরাও এবার জাহাজ বোঝাই করে নিতে পারবেন সেই সোনা।

স্থানীয় লোকদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন–এখানে কোথায় সোনা জন্মে। স্থানীয় লোকগুলো তাঁর কথার অর্থ না বুঝে বললেন, কুবানাকানে (Cubanacan) পাওয়া যায়।

কুবানাকান শব্দের অর্থ হলো দ্বীপের মধ্যভাগ। কলম্বাস বুঝলেন হয়তো এই কুবানাকানে গেলেই সোনা পাওয়া যাবে। তাই তিনি তাঁর দলের লুইস ডি টয়েস (Luis De Tosses )–কে পাঠালেন কুবানাকানের খানের কাছে।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু লুইস গিয়ে ফিরে এলো খালি হাতে। সেখানে কোনো খানের সাক্ষাৎই পাওয়া গেলো না। তবে সে একটি জিনিসের খবর নিয়ে এলো। দ্বীপের মধ্যভাগটি যে সম্পদে পরিপূর্ণ তা হলো তামাক। এখানে প্রচুর তামাক উৎপাদন হয়।

তাঁরা আবার সেখান থেকে নোঙ্গর তুললেন জাহাজের। কিন্তু ১২ই নভেম্বরই ঘটলো আরেক ঘটনা। এক প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে পিনজনের নেতৃত্বে চালিত 'পিন্টা' জাহাজটি হয়ে গেলো দলছাড়া। তার আর কোনো হদিস পাওয়া গেলোনা।

এই নিয়ে কলম্বাস পড়লেন মহা ভাবনায়। পিন্টা কি তাহলে পিনজন সহ সবাইকে নিয়ে ডুবে গেল? নাকি পিনজনই তাঁর আগে এই আবিষ্কারের বিজয় বার্তা নিয়ে স্পেনের দিকে রওনা হয়ে গেলো? সেখানে সে নিশ্চয়ই রাণীর কাছে সকল কৃতিত্ব নিজের বলে দাবী করবেন। কলম্বাস হেরে যাবেন। নাকি এমনও হতে পারে-পিনজন তাঁর আগেই এ দেশের খানের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করে ফেলেছেন। স্থান করে নিয়েছেন খানের জৌলুসময় রাজদরবারে। মার্কোপোলোর মতো। সব সোনাদানা তাহলে সেই পেয়ে যাবে?

কলম্বাস একজন ভালো নাবিক ছিলেন একথা সত্যি। কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব একটা ভালো ছিলেন না। তিনি ছিলেন হিংসুটে, লোভী এবং অহংকারী। সবকিছুতেই ছিলো তাঁর লোভ আর হিংসা। কাউকেই ভালো চোখে দেখতেন না।

কলম্বাস ভাবলেন-যেমন করেই হোক পিন্টা জাহাজটি কোথায় গেলো তার খোঁজ আগে করতে হবে।

অতঃপর তিনি পিন্টা জাহাজের সন্ধানেই তাঁর নিজের জাহাজ সান্টামারিয়া আর নিনাকে নিয়ে এগোতে থাকলেন দক্ষিণ দিকে।

তাঁরা ক্যানিবা বা কিউবা দ্বীপের পূর্ব উপকূল ধরেই ক্রমাগত এগোতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে। দু'দিন চলার পর তাঁরা আবার একটি চমৎকার নতুন দ্বীপের সাক্ষাৎ পেলেন।

কলম্বাস এই তৃতীয়বারে যে দ্বীপটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এটাই হলো বর্তমানের হাইতি দ্বীপ।

তিনি অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণ দ্বীপটির প্রথমে নাম দিয়াছিলেন ইস্পানোলা (Epanola) বা হিস্প্যানোলা (Hispanola)। স্পেনীশ ভাষায় যার অর্থ হলো স্পেনের দ্বীপ (The Spanish Island)।

দ্বীপটি ছিলো আগের কিউবা দ্বীপের চেয়েও অনেক সম্পদ আর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এখানকার স্থানীয় লোকেরাও ছিলো অনেক উন্নত, বুদ্ধিমান এবং সম্পদশালী। তিনি স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

স্থানীয় লোকেরাও কিন্তু নবাগতদের খুব আদর আর সম্মান করতে লাগলো। কলম্বাস যা বলতেন, যা চাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশ পালিত হতো। কলম্বাস যেনো ছিলেন তাদের কাছে স্বর্গীয় দেবতাতুল্য।

কিন্তু এই হাইতি দ্বীপে এসেই কলম্বাসের ঘটে গেলো মস্তবড় বিপর্যয়। ঘাটেই বাঁধা ছিলো জাহাজ সান্টামারিয়া। তবু ঘাটে বাঁধা অবস্থাতেই প্রচন্ড ঝড়ে আর সামুদ্রিক তুফানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো জাহাজটা।

এবার সত্যি মহাবিপদে পড়লেন তিনি।



www.nagorikpathagar.org

একদিকে 'পিন্টা' জাহাজ এর আগেই নিরুদ্দেশ-বড় জাহাজ সান্টামারিয়াও ধ্বংস হয়ে গেলো। এই অবস্থায় সবচেয়ে ছোটো জাহাজ 'নিনাতে' করে এতোগুলো লোক দেশে ফিরে যাবেন কেমন করে?

তখনি তিনি এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি ঠিক করলেন সবগুলো লোক নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছু লোক রেখে যেতে হবে।

হয়তো এটাই একই ঈশ্বরের ইচ্ছে। তাদের দিয়েই নতুন দেশে শুরু হবে বসতি স্থাপনের।

অতঃপর তিনি দুটো জাহাজ থেকে তিরিশ জন লোক বাছাই করলেন। তাদের জন্য তৈরি করা হলো থাকার ঘর। দেয়া হলো একবছরের খাবার আর ওষুধপত্র। আর দিয়ে গেলেন প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র।

স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান লোকেরা তাদের ভালোবাসে শ্রদ্ধাও করে, সেই সাথে যাতে ভয়ও করে তার ব্যবস্থাও তিনি করে গেলেন। তাহলে শ্রদ্ধা অটুট থাকবে।

এমনি করে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে দিয়ে তিনি ৪ঠা জানুয়ারী (১৪৯৩) রওনা দিলেন স্বদেশের পথে। এই রওনা দেয়ার দু'দিন পরে অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারী তারিখে কলম্বাস দেখা পেলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া জাহাজ পিন্টার।

পিনৃজন তাঁর এই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা দিলেন। কেমন করে তিনি এক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে দিক হারিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যদিকে। তাঁকেও তিনি খুঁজেছিলেন এ ক'টা দিন ধরেই।

কিন্তু অহংকারী এবং অবিশ্বাসী কলম্বাস তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁর ধারণা হলো নিশ্চয়ই পিনৃজন তাঁকে ফাঁকি দিয়ে খানরাজার কাছে গিয়েছিলেন এবং সোনার সন্ধানে গিয়েছিলেন।

তিনি রেগে বললেন-তুমি মিথ্যেবাদী, পিনৃজন। তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছো।

-না, মিথ্যে নয়। সত্যি আমি ঝড়ে পড়েছিলাম। পিনৃজন বললেন।

-না, আমি বিশ্বাস করিনা। কলম্বাস রেগে গিয়ে বললেন, আমি এ অভিযাত্রী দলের প্রধান। তাই আমার আদেশ ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারো না। দেশে গিয়ে আমি রাণীর কাছে তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা খুলে বলবো। তারপর তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো।

এই নিয়ে দু'জনেই হলো কথা কাটাকাটি। পিনৃজনও বললেন- আসার পথে নাবিক বিদ্রোহের সময় আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম। তুমি দলের প্রধান, আমি সেজন্য তোমাকে সম্মান করি। কিন্তু আমিও তোমাকে ছাড়বোনা। তুমি আমাকে অবিশ্বাস করলে।

কলম্বাসের অবশ্য একটা ভয় ছিলো। তিনি রাণীর বিনা অনুমতিতে তিরিশ জন লোককে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ফেলে গেছেন। যদি রাণী এটা মেনে নিতে না পারেন। পিনৃজন যদি এই ব্যাপারটি নিয়েই রাণীর কাছে সাত-পাঁচ কিছু বানিয়ে কিছু বলে।

তাই আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না কলম্বাস। অতঃপর পিনৃজনকে নিয়েই তাঁরা আবার রওনা দিলেন স্বদেশের পথে ১৬ই জানুয়ারী।

প্রথম কয়েকদিন তাদের ফিরতি যাত্রা ভালোই কটলো। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর



www.nagorikpathagar.org

মাঝামাঝি এসেই তাঁদের জাহাজ পড়লো ঝড়ে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ের ধাক্কায় তাঁদের দুটো জাহাজ একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। পুরো চারদিন চললো এই ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। এই চারদিনই তাঁদের কেটে গেলো অনিদ্রা আর আতংকের মধ্য দিয়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তাঁদের জাহাজ এসে নোঙর করলো অজোর (Azore) সাগরের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তীয় দ্বীপ সান্টা মারিয়াতে (Santa Maria)।

এখানে দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৪৯৩) তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু জাহাজ ছাড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আবারো পড়লেন ঝড়ের কবলে।

এই ঝড়ের ধাক্কায় তাঁদের জাহাজ গিয়ে ঠেকলো পর্তুগীজ অধিকৃত দ্বীপ সিন্ড্রা (Sindra)। তে। এখানে ছিলেন এক পর্তুগীজ রাজা। তিনি কলম্বাসকে সাদরে সম্ভাষণ জানালেন। এখান থেকে অবশেষে ১৫ই মার্চ (১৪৯৩) যাত্রা করলেন এবং তারা এসে পৌঁছোলেন পালোস (Palos) নামক স্থানে।

কিন্তু আশ্চর্য! যেদিন কলম্বাসের জাহাজ নিনা গিয়ে পালোসে পৌঁছোলেন ঠিক সেইদিনই পিনৃজনও তাঁর পিন্টা জাহাজ নিয়ে এসে হাজির হলেন পালোসে। কিন্তু পিনৃজনের বরাত খারাপ, এখানেই তিনি এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। কেউ কেউ বলেন-পিনৃজনের এই নিহত হওয়ার পেছনে কলম্বাসের হাত ছিলো।

এই পালোসে এসেই কলম্বাস রাণী ও রাজার কাছে তাঁর এই বিজয়যাত্রা জানিয়ে পত্র দিলেন। রাজা, রাণীও তাঁকে অবিলম্বে রাজদরবারে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কলম্বাস রাণী ইসাবেলার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে।

রাণী ইসাবেলা কলম্বাসকে জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁকে দিলেন প্রচুর উপঢৌকন। বাহুতে পরিয়ে দিলেন সিংহ চিহ্নিত রাজকীয় সম্মান সূচক প্রতীক। এমনি করে কলম্বাসের প্রথম সমুদ্রযাত্রা শেষ হলো।

## কলম্বাসের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা

শুধু নতুন একটি দেশ আবিষ্কার করেই কাজ শেষ হলো না কলম্বাসের। যে দেশটি আবিষ্কৃত হলো তাকে দখল করার এবং সেখানে লোকবসতি গড়ে তোলার জন্য চলতে লাগলো আয়োজন।

সুতরাং আবার সাগরে জাহাজ ভাসাতে হলো কলম্বাসকে। এবার রাণী কলম্বাসের আবিষ্কৃত নতুন দেশ এবং সেখানকার আদিবাসীদের শাসন এবং দেখাশোনা করার জন্য একজন প্রতিনিধিও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনিও যাবেন কলম্বাসের সাথে।

এই রাজ প্রতিনিধির নাম ছিলো জোয়ান ডি ফনসেকা (Zuan de Fonscea)। ফনসেকা ছিলেন স্পেনের বার্গোস (Burgose) গীর্জার একজন বিশপ। তিনি শুধু পাদ্রীই নন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন দক্ষ সৈনিক এবং একজন ভালো প্রশাসকও বটে।

কিন্তু ফনসেকার এই মনোনয়নের ব্যাপারটি কলম্বাসের খুব একটা পছন্দ হলো না। কারণ তার উপর খবরদারী করার জন্য একজন লোক দেয়া হলো। তাঁর পছন্দ হলো না।



www.nagorikpathagar.org

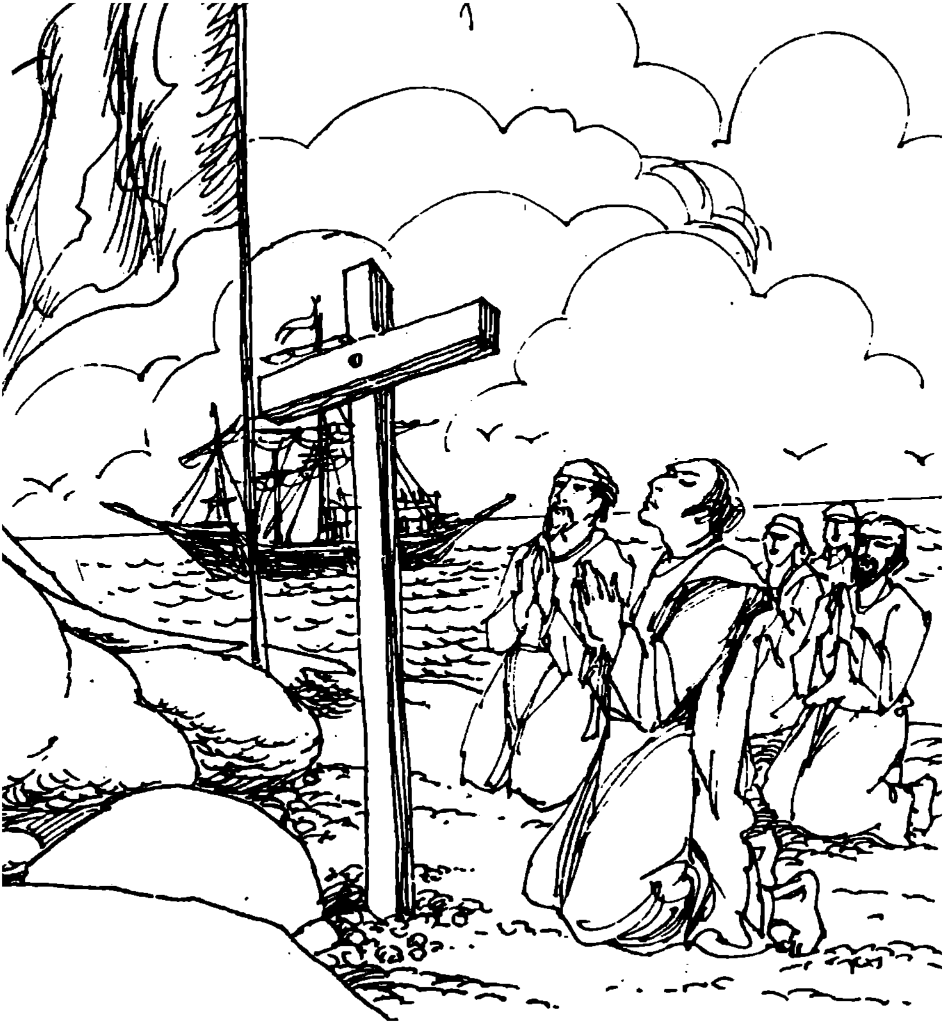

কলম্বাস দেশটি স্পেনের রাজার নামে দখল করে ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন

যদিও তাঁকেই দলীয় প্রধানই নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তবু সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিলো না। শাসন ক্ষমতা ছিলো ফনসেকার হাতে।

কিন্তু তবু রাণীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পেলেন না তিনি। আদেশ মেনে নিয়েই অভিযানে নামতে হলো তাঁকে।

এই দ্বিতীয় অভিযান ছিলো সত্যি সত্যি এক বিশাল ব্যাপার। এবারে জাহাজ তৈরি হলো সতেরোটি। লোক গেলো এক থেকে দেড় হাজারের মতো।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়েও রাণীর সাথে কলম্বাসের কিছুটা মত-পার্থক্য



www.nagorikpathagar.org

ছিলো। কলম্বাসের ইচ্ছে ছিলো যে দেশটি আবিষ্কার হয়েছে, সেটি দখল করা এবং তা থেকে সম্পদ, সোনা, ধনরত্ন আহরণ করা। তাছাড়া সেখান থেকে প্রচুর ক্রীতদাসও সংগৃহীত হতে পারে-যা থেকে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে।

কিন্তু রাণীর উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন দেশটি তাঁদের হোক। নব আবিষ্কৃত দেশটি হবে স্পেনের একটি নতুন উপনিবেশ। সেখানে গড়ে উঠবে নতুন বসতি। আর স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদেরকেও খৃষ্টধর্মে করতে হবে দীক্ষিত। করে তুলতে হবে শিক্ষিত ও সুসভ্য।

আসলে নতুন দেশে খৃষ্টান ধর্মের প্রসারের জন্যই কিন্তু তিনি পাদ্রী ফনসেকাকে সেখানে যাবার অনুমোদন দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অভিযানে কলম্বাসের কিছু নিজস্ব লোক ছিলো। এর মধ্যে প্রধান ছিলো তাঁর ছোট ভাই গিয়াকোমো (Giacomo)। তবে সে সবার কাছে ডন ডিয়াগো (Don Diego) নামেই পরিচিত ছিলো।

এই গোপন পত্র কলম্বাসের উগ্রতা, অসততা এবং আরো নানা খারাপ দিক সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এসব পড়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো রাণী ইসাবেলার।

এতো বড় একটা আবিষ্কার করে কলম্বাস যতোখানি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর নিজের চারিত্রিক দোষেই আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো।

নগরী ইসাবেলাকে কলম্বাস তাঁর ভাই ডনডিয়াগোর অধীনে রেখে নিজে চলে এলেন সিবাও (Cibao)-তে। এখানে সান্টো টমাস (Santo Tomas) নামক স্থানে গড়ে তুললেন একটি দুর্গ।

কিন্তু ২৯শে মার্চ ফিরে এসেই শুনলেন ইসাবেলাতে শুরু হয়েছে খাদ্যের অভাব। লোকজন সব অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি তখন ইসাবেলাতে একটি গমের মিল তৈরি করে খাদ্যের অভাব পূরণ করার নির্দেশ দিলেন এবং এই খাদ্য সংকট তৈরির জন্য দলের কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। এমনকি এদের কয়েকজনকে ফাঁসিতে পর্যন্ত ঝোলালেন।

এতে দলের মধ্যে অনেকেই কলম্বাসের বিপক্ষে চলে গেলো। এছাড়া এই দলে পাদ্রীদেরও একটি গ্রুপ ছিলো, তাঁরাও কলম্বাসের একনায়কত্ব এবং ধর্মহীনতাকে ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরাও গেলেন তাঁর বিপক্ষে। তবু এই মুহূর্তেই কেউ কলম্বাসের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার সাহস করলো না।

কলম্বাস ইসাবেলা এবং সান্টা টমাসের অবস্থা একটু শান্ত হয়ে এলে আবার বের হলেন নতুন স্থান আবিষ্কারে। জাহাজ যে কটা তারা নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে ১২টিই ফেরত নিয়ে গেলেন টোরেস। এগুলো ভরেই আবার লোক আসবে। এখানে ছিলো মাত্র ৫টি জাহাজ। কলম্বাস অতঃপর এই বাকী জাহাজগুলো নিয়েই সমুদ্রযাত্রার পথে বের হলেন ২৪শে এপ্রিল (১৪৯৪)।

যাবার সময় এবারও তিনি ভাই ডনডিয়াগোকে ইসাবেলার গবর্নর নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু ডনডিয়াগো লোকটা ছিলো অশিক্ষিত এবং অকর্মণ্য। তাই দলের লোকেরা তাকে খুব মানতো না।

কলম্বাস আসলে খুঁজছিলেন মূল ভূ-খন্ড। তিনি ২৯শে এপ্রিল তারিখে আবিষ্কার করলেন জ্যামাইক্যা দ্বীপ। অতঃপর আরো কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করে ফিরে এলেন



www.nagorikpathagar.org

ইসাবেলাতে। তাঁর তখন ধারণা হলো হয়তো কিউবাই হলো মূল ভূ-খন্ড।

এই সময় স্পেন থেকে এলেন কলম্বাসের আরেক ভাই বার্টোলোম (Bartolome)। কলম্বাস তাঁকেও ইসাবেলার সরকারী এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করলেন। যদিও এসব পদে কাজ করার মতো কোনো যোগ্যতাই তাঁর ছিলো না।

ফলে কলম্বাসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ আরো বাড়তে লাগলো। অবশেষে একগাদা অভিযোগ নিয়ে রাণীর কাছে নালিশ জানানোর জন্য স্পেন যাত্রা করলেন মার্গারেট (Margaret) এবং বুইল ( Buil) নামে দু'জন।

এই মার্গারেট এবং বুইল যে তাঁর বিরুদ্ধে রাণীর কাছে লাগাবে তা কলম্বাস জানতেন। অতঃপর তিনিও তাঁর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি টোরেস এবং তাঁর ভাই ডনডিয়াগোকে পাঠালেন স্পেনে। সংগে উপহার হিসেবে পাঠালেন ৫০০ জন ক্রীতদাস।

রাণী অতঃপর প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করে দেখার জন্য জোয়ান ডি আগোয়াডো (Juan de Augado)-কে পাঠালেন ইসাবেলাতে। আগোয়াডো এসে পৌছোলেন ১৪৯৫ সালের অক্টোবর মাসে।

তিনি এসে দেখলেন সত্যি এখানে স্পেনীয় লোকেরা কলম্বাসের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট। তার প্রধান কারণ হলো কলম্বাস স্পেনীয় লোকদের সোনা সংগ্রহ ও ব্যবহার করার উপর এক নতুন ধরনের কর ধার্য করেছেন। এই নিয়েই অসন্তোষ। কর আদায়ের জন্য তিনি করছেন নির্যাতন অত্যাচার।

আগোয়াডো এখানে আসার পরই তাঁর সাথে কলম্বাসের শুরু হলো বিবাদ। আগোয়াডো এসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কলম্বাসকে নিষেধ করলেন। কিন্তু কলম্বাস তা শুনলেন না। শুরু হলো তর্কবিতর্ক-শেষে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ। প্রায় মাস ছয়েক ধরে চললো এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ।

অবশেষে কলম্বাস ইসাবেলা ছেড়ে স্পেনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারও তিনি ইসাবেলা ছেড়ে যাবার সময় ইউরোপ থেকে প্রত্যাগত তাঁর ভাই ডনডিয়াগো এবং অপর ভাই বার্টোলোমের হাতে ইসাবেলার শাসনভার ছেড়ে দিয়ে দুটো ক্যারাভ্যান জাতীয় জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন স্পেনে ১৪৯৬ সালের ১০ই মার্চ তারিখে। তিনি স্পেনে এসে পৌছোলেন ২০শে এপ্রিল।

কলম্বাসের এই স্পেন আগমনও একটি বিশেষ কারণে বিখ্যাত। তিনি যে দুটো জাহাজ নিয়ে স্পেনে এসেছিলেন এ দুটো ছিলো আমেরিকায় তৈরি। ইসাবেলা বন্দরেই তৈরি হয়েছিলো এবং এ দুটোই হলো প্রথম আমেরিকান জাহাজ যা সর্বপ্রথম ইউরোপের বন্দরে নোঙর করলো।

## কলম্বাসের তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা

কলম্বাস স্পেনে প্রত্যাবর্তন করলেও রাণী ইসাবেলার সাথে তখনি সাক্ষাৎ করলেন না। ভয় ছিলো রাণী তাঁর প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করেন তা না জেনে তিনি সাক্ষাৎ করবেন না। আগে দেখা যাক পরিস্থিতি।

রাণীর কাছে নিশ্চয়ই তাঁর বিপক্ষরা অনেক কিছু লাগিয়েছে। ভারী করে তুলেছে রাণীর কান।

এর পর সত্যি কেটে গেলো কয়েক মাস। অবশেষে জুলাই মাসে তিনি রাণীর কাছ থেকে পত্র পেলেন। তাঁকে রাজদরবারে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন রাণী ইসাবেলা। রাণী



www.nagorikpathagar.org

সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁকে রাজদরবারে।

রাণীর কাছে কলম্বাসের বিরুদ্ধে এর আগে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন। তাতে রাণী দুঃখ পেয়েছেন। কলম্বাসের প্রতি তাঁর একটা স্নেহ মমতা ছিলো। বিশেষ করে কলম্বাস একটি নতুন ভূ-খন্ড আবিষ্কার করে রাণীর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর গুরুত্ব সহজে ম্লান হবার নয়। তবু তাঁর সম্পর্কে নানা লোক যখন নানা কথা বলতেন তখন দুঃখ হতো।

অবশেষে তিনি একটা কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলম্বাস একজন দক্ষ নাবিক হতে পারে কিন্তু প্রশাসনের বিষয়ে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অবশ্য কলম্বাস একটি নতুন দেশ দখল ও নেটিভদের দমিয়ে রাখার জন্য যে দমনমূলক ব্যবস্থা নিতেন তা কিয়দংশে ফলপ্রসূ হলেও একজন সৎ খৃষ্টান হিসেবে তা মানায় না।

রাণী কলম্বাসকে সরাসরি কিছু বললেন না। এবং তাঁকে প্রশংসা করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করলেন দরবারে। তিনি যতো অপরাধই করে থাকুক তাঁর অবদানকে অস্বীকার করতে চান না। এ দান তাঁর সকলের উপরে।

তিনি ইস্পানিয়াতে রাজ্য স্থাপন করে আবার সেখানে কলম্বাসকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

তবে টাকা-পয়সা সংস্থাপনের একটু অসুবিধা থাকাতে এই মুহূর্তেই পাঠানো সম্ভব হলো না। প্রায় বছর দুয়েক দেরী হয়ে গেলো।

কলম্বাস তাঁর তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন ১৪৯৮ সালের ৩০শে মে তারিখে। এই যাত্রায় জাহাজ ছিলো ৬টি এবং নাবিক বাদে লোক ছিলো ২০০.০০ এর মতো। কলম্বাস জাহাজ বহর নিয়ে ১৯শে জুন এসে পৌঁছোলেন ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের গোমেরাতে (Gomera)।

এছাড়াও এই অভিযানে আরো কিছু ডাক্তার, কামার, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি নানা পেশার লোকও ছিলো। একটি নতুন বসতি গড়ে তুলতে যে সকল লোকের দরকার হয় তার সবই ছিলো এই সময়।

অতঃপর এই বিশাল আয়োজনের নৌবহর নিয়েই কলম্বাস ১৪৯৩ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা করলেন দ্বিতীয় অভিযানে।

তিনি এবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে ১৩ই অক্টোবর গিয়ে পৌঁছোলেন তার নতুন দেশে। তিনি প্রথমে গিয়ে যে দ্বীপটির সন্ধান পেলেন সেটি হলো ডমিনিকা (Dominica) এবং ম্যারিগ্যালান্ট (Marigalant)। পরের দিনই তাঁরা আবিষ্কার করেন আরেকটি নতুন দ্বীপ গোয়াডালোপ (Guadalupe)। পরে খুঁজে পেলেন পোর্টোরিকো দ্বীপ (Puerto Rico)।

কিন্তু কলম্বাস খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন প্রধান ভূমি বা মেইন ল্যান্ড। তাঁর বিশ্বাস ছিলো এখানে যখন এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তাহলে আশেপাশে নিশ্চয়ই মূল ভূ-খন্ড আছেই। তিনি সেই মূল ভূ-খন্ডটি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

এছাড়া তিনি আরেকটি দ্বীপের সন্ধান করছিলেন। তিনি সেই যে প্রথমবারের অভিযানে এসে প্রায় বছর খানেক আগে তিরিশ জন লোককে রেখে গিয়েছিলেন, সেই ইস্পেনোলা দ্বীপটি কোথায়?

যে কয়েকটি দ্বীপ তিনি ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এগুলো তো ইস্পেনোলা দ্বীপ নয়। তাহলে সেটা কোথায়? তাঁর ফেলে যাওয়া লোকদের সন্ধানও তো তাঁকে করতে



www.nagorikpathagar.org

হবে। কে জানে তাঁদের অবস্থা এতোদিনে কি হয়েছে।

অবশেষে তিনি খুঁজে পেলেন ইস্পেনোলা দ্বীপটি। কিন্তু যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর নিজের চোখই বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেলো।

দেখলেন যেখানে ওদের রেখে গিয়েছিলেন সেখানে কিছুই নেই। পরে খবর নিয়ে জানলেন ওদের ফেলে যাবার কিছুদিন পরেই স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে সবাই মারা পড়েছে। রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের মেরে সকল কিছু লুটেপুটে নিয়ে গেছে। ঘটনা দেখে যারপর নাই মর্মাহত হলেন কলম্বাস। শুধু তার জন্যই এতোগুলো লোক এমন বেঘোরে প্রাণ হারালো।

কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখনকার ব্যবস্থা করতে হয়। আবার একটি নতুন বসতি স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন তিনি।

প্রায় একমাস ধরে জাহাজের বহর নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন এখানে সেখানে। এ দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে।

অবশেষে একটি দ্বীপের উত্তরপ্রান্তে সাগর তীরের সুন্দর জায়গা তাঁর পছন্দ হলো। এই জায়গাটিই ছিলো বর্তমান ডোমিনিক্যান প্রজাতন্ত্রের উত্তর উপকূল। এখানেই কলম্বাস সর্বপ্রথম এই নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয় নগরীর গোড়া পত্তন করেছিলেন, নগরীর নাম দেয়া হয়েছিলো স্পেনের রাণী ইসাবেলার নামানুসারে। এই ইসাবেলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো সেখানে আছে।

এখানে নগরীর গোড়াপত্তন করেই কলম্বাস স্পেনে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রাজদরবারে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

কলম্বাস রাজপরিবারের যে সদস্যকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন সেই এন্টোনিও ডি টোরেস ( Antonio de Torres)-কেই পাঠালেন স্পেনে। সাথে রাণীকে একটি পত্র লিখে দিলেন কলম্বাস। পত্রে তিনি এই এতো লোকের মৃত্যু সম্পর্কেও একটি কৈফিয়ৎ দিলেন।

কিন্তু পত্র পেয়ে খুবই মর্মাহত হলেন রাণী ইসাবেলা।

টোরেস শুধু কলম্বাসের পত্র নয়-তিনি এই নৌবহরের অর্থ বিভাগের প্রধান জোয়ান ডি সোরিয়ারও (Juan de Saria) একটি পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। সোরিয়া তাঁর

এখানে এসেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পরবর্তী যাত্রার। তিনি তিনটি জাহাজ পাঠালেন সোজা ইসাবেলাতে তাঁর ভাইয়ের কাছে। বাকী তিনটি জাহাজ নিয়ে তিনি নিজে চললেন দক্ষিণ দিকে।

১৪৯৮ সালের ২১শে জুন তারিখে একটি বড় জাহাজ এবং অপর দুটো ক্যারাভ্যাল জাহাজ নিয়ে রওনা দিলেন। তিনি এসে পৌছোলেন কেপ ভারডে দ্বীপে (Cape Verde Island)।

এর পর চলে এলেন আরো দক্ষিণে। একটি নতুন দ্বীপে গিয়ে পৌছোলেন। তিনি এর নাম দিলেন ত্রিনিদাদ (Trinidad)।

কলম্বাস কিন্তু এখানে সামান্য ভুল করেছিলেন। 'তিনি যে ত্রিনিদাদে গিয়ে পৌছোলেন-এটিও আসলে ছিলো একটি দ্বীপ। কিন্তু আমেরিকার মূল ভূ-খন্ডের প্রায় সংলগ্ন দ্বীপ। অথচ কলম্বাস এই মূল ভূ-খন্ডই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এতোদিন। কিন্তু সেই মূল ভূ-খন্ডের এতো কাছে এসেও তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন এটিও হয়তো একটি দ্বীপ।



www.nagorikpathagar.org

তিনি জাহাজ নিয়ে দ্বীপটির চারপাশ দিয়ে একটা চক্করও দিলেন। তারপর সোজা উত্তর-পূর্ব দিকে জাহাজ চালিয়ে চলে এলেন কিউবাতে। কারণ তখনো তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে কিউবাই হলো এই দ্বীপাঞ্চলের মূল ভূ-খন্ড। তখনো তিনি আমেরিকার মূল ভূ-খন্ডের সন্ধান পাননি।

ইস্প্যানোলাতে এসে তিনি দেখলেন এক মহা গোলযোগ অবস্থা। ফ্রান্সিসকো রল্ডন (Francisco Roldon) নামে যে লোকটাকে তিনি বিশ্বাস করে ইসাবেলার মেয়র নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন এবং কথা ছিলো রল্ডন আর কলম্বাসের ভাই বর্টোলোমস একত্রে কাজ করবেন। সেই রল্ডনই এখন তাঁর ৭০ জন অনুগামীকে নিয়ে ডনডিয়াগোর সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ করছে। সে ইসাবেলা ছেড়ে চলে এসেছে দক্ষিণ পশ্চিম ইস্প্যানোলার জারাগোয়াতে। ( Zaragua)।

বার্টোলোমের খবর নিয়ে কলম্বাস জানতে পারলেন রল্ডন এখন তাদের ভয়ানক শত্রু। তাঁদের প্রতি মারমুখো।

কলম্বাস অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে এই ঝগড়া ফ্যাসাদ-মিটিয়ে ফেলার জন্য একটা আপোস মিমাংসা করার জন্য পত্র দিলেন রল্ডনের কাছে।

তিনি লিখলেন-যদি রল্ডন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাঁকে আবার ইসাবেলার মেয়রের পদ দেয়া হবে। এতে আশ্বাস পেয়ে সত্যি সত্যি রল্ডন চলে এলো এবং বিবাদের একটা আপোষ রফা হয়ে গেলো।

কিন্তু এরই মধ্যে ঘটলো আরেক ঘটনা। ১৪৯৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরই এককালের শিষ্য ও সর্বকনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট এলোনসো ডি ওজেদার (Alonso de Ojida ) নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল এলো ইসাবেলাতে।

অনেকটা আকস্মিক ভাবেই এলো।

কারণ এই নতুন দেশে যারাই আসুক কলম্বাস তা জানতেন, বা তাঁর সাথে আলাপ করেই কেউ আসতো। কিন্তু ওজেদা এলো সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে।

কলম্বাস বুঝতে পারলেন না ওজেদার আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি রল্ডনকে পাঠালেন ওজেদাকে অনুসরণ করার জন্য। ওজেদা ইসাবেলাতে না ফিরে চলে গেলেন জারাগোয়াতে। রল্ডনও তাকে অনুসরণ করে জারাগোয়াতে এলো।

কলম্বাস জারাগোয়াতে ওজেদার দলের লোকদের পাইকারী হত্যার আদেশ দিলেন।

এই খবর গিয়ে পৌছোলো স্পেনে। রাণী ইসাবেলা আর বিলম্ব করলেন না, নতুন দেশ থেকে কলম্বাসের শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা এখন এই নতুন দেশ শাসন করার জন্য একজন উচ্চ শিক্ষিত ও বিজ্ঞলোককে শাসনকর্তা করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

অবশেষে সারা স্পেনের স্বনাম ধন্য শিক্ষিত ও সুবিচারক বলে খ্যাত ফ্রান্সিসকো বোবাডিল্লাকে ( Francisco de Bobadilla ) শাসনকর্তা করে পাঠানো হলো ১৪৯৯ সালের মার্চ মাসে।

বোবাডিল্লাকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে ইস্প্যানোলার গর্বনর এবং প্রধান বিচারপতি করে পাঠানো হলো। এই নিয়োগ-পত্রে কলম্বাস সম্পর্কে কিছু বলা থাকলো না। মূলতঃ এখন থেকে কলম্বাসের সকল প্রকার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলো।

বোবাডিল্লাকে এই মর্মে ক্ষমতা দেয়া হলো যে, তিনি সুশাসনের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। যাকে খুশী তিনি যে, কোনো পদমর্যাদার অধিকারী



www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিই হোক না কেনো, তাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি যদি স্বয়ং কলম্বাসও হন তাকেও তিনি প্রয়োজনে জোর করে স্পেনে পাঠাতে পারবেন।

রাণী শুধু বোবাডিল্লাকে লিখিত ক্ষমতা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। কলম্বাস এবং তার ভাই বার্টোলোমকেও পত্র লিখে দিলেন। কলম্বাসকে লেখা হলো-তিনি যেনো বোবাডিল্লার সকল আদেশ উপদেশ ও অধীনতা মেনে চলেন এবং তাঁর কাছে যে সরকারী বিষয়-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য মালামাল সকল কিছু বোবাডিল্লার কাছে হস্তান্তর করেন।

আদেশপত্র ও মনোনয়ন পেলেও বোবাডিল্লার ইস্প্যানোলা এসে পৌছোতে বেশ দেরী হলো। কারণ আদেশ দিয়েও রাণী ইসাবেলা নিজেই খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। এমন আদেশ দেওয়া সমীচীন হবে কিনা, কলম্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত ও অপমান করা ঠিক হবে কিনা-এই ভাবতেই সময় গেলো।

বোবাডিল্লা ইস্প্যানোলার সান্টো ডোমিংগো (Santo Domingo) তে এসে পৌছোলেন ১৫০০ সালের ২৩শে আগস্ট তারিখে।

এখানে পৌছোনোর আগেই তিনি লোকমুখে সংবাদ পেলেন যে, এ সপ্তাহেই বহু স্পেনীয়কে কলম্বাস এবং তার ভাই সামান্য কারণে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন, আরো পাঁচজনকে দু'য়েকদিনের মধ্যেই ফাঁসি দেয়া হবে।

তিনি শুনলেন, কলম্বাস এখন অবস্থান করছেন ইস্পানোলায় কনসেপকন (Concepcion). এ এবং তার ভাই বার্টোলোম আছে জারগোয়াতে। এদের দু'জনের কাছেই আছে অনেক বন্দী। এদের ভাগ্যে কি হবে কে জানে।

এখানে অবতরণের পরের দিনই অর্থাৎ ২৪শে আগস্ট তারিখেই বোবাডিল্লা তার নিয়োগপত্রের এবং ক্ষমতা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করলেন। তিনি কলম্বাসের ভাই ডনডিয়াগোকে আদেশ দিলেন তার হাতে যেসব বন্দী আছে তাদের সবাইকে যেনো ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ডনডিয়াগো এই আদেশকে কোনো পাত্তাই দিলো না।

পরের দিন বোবাডিল্লা তাঁর দ্বিতীয় দফা আদেশ জারী করলেন। জানিয়ে দিলেন যে স্পেনের রাজা ও রাণী তাঁকেই এ দেশের গবর্নর নিযুক্ত করেছেন। সকল ক্ষমতা এখন তাঁর হাতে।

কিন্তু তাতেও ডিয়াগো মাথা নত করলো না। তখন বাধ্য হয়েই বোবাডিল্লা শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং জোরপূর্বক সকল বন্দীকে নিয়ে এলেন নিজের জিম্মায়। বোবাডিল্লা ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দেখা করলেন কলম্বাসের সাথে এবং রাণীর আদেশের কথা তাঁকেও জানালেন। কিন্তু কলম্বাসও তা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, তা হতে পারে না। রাণী আমাকে এতোখানি অপমান করতে পারেন না।

কিন্তু রাণী তো লিখিত আদেশ দিয়েছেন। বোবাডিল্লা বললেন, এই তো রাজাদেশ।

-না, রাণী ইচ্ছে করলেই তা দিতে পারেন না। কলম্বাস রাগান্বিত হয়ে বললেন, এদেশ আবিষ্কার করেছি আমি। এখানে আমারই সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে। রাণী ইচ্ছে করলেই আমার ক্ষমতা খর্ব করতে পারেন না।

-তাহলে তুমি রাণীর আদেশ মানবে না?

-না।

-রাজাদেশ অমান্য করবে?

-প্রয়োজন হলে করবো। তবু তোমাকে আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারি না।



www.nagorikpathagar.org

বোবাডিল্লা দেখলেন কলম্বাসকে সহজ পথে বাগে আনা যাবে না। বল প্রয়োগ করতে হবে।

অবশেষে তাই করলেন। তিনি কলম্বাস এবং তার ভাই ডনডিয়াগোকে বন্দী করলেন। কলম্বাসের আরেক ভাই বার্টোলোম তখন ছিলো জারাগোয়াতে। তাঁর কাছে ছিলো ১৬ জন বন্দী। তিনি তাঁকেও বন্দী করে নিয়ে এলেন সান্টো ডোমিংগোতে।

তারপর বিশেষ জাহাজে করে তিন ভাইকেই পাঠিয়েদিলেন স্পেনে। কলম্বাসের হাতেপায়ে লোহার শিকল পরিয়ে তোলা হলো জাহাজে। যদিও তাঁর প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করা হচ্ছিলো কিন্তু শিকল খুলে নেয়া হলো না। এভাবেই তাঁকে পাঠানো হলো স্পেনে।

এই মুহূর্তে কলম্বাস কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। হয় তো তাকেও বিচার করে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

এই অবস্থাতেই কলম্বাস স্পেনে এসে পৌছালেন ১৫০০ সালের নবেম্বর মাসে। কলম্বাসের প্রত্যাবর্তনের কথা রাণীর কানেও গেলো। তিনি শুনলেন, বোবাডিল্লা কলম্বাস এবং তাঁর ভাইদেরকে গরু-ছাগলের মতো হাত-পা বেঁধে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শুনে তিনি যারপর নাই মর্মাহত হলেন। কলম্বাসের এতোখানি অপমান কিন্তু তিনিও সহজে মেনে নিতে পারলেন না। এ কি করেছেন বোবাডিল্লা? তিনি ডেকে আনতে বলেছিলেন-এমন হাত-পা বেঁধে আনার কথাতো বলেননি।

তাছাড়া কলম্বাসকে তিনি স্পেনে ডেকে আনতে বলেননি। শুধু বলেছিলেন, সেখানে কলম্বাস যদি কোনো বাড়াবাড়ি করে থাকেন, সেটা যেনো দমন করেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো-কলম্বাসকে তিনি অপমান করতে চান না। তাঁর যে অবদান তা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তাই কলম্বাসকে এতোখানি অপমান অপদস্ত করা ঠিক হয়নি বোবাডিল্লার।

সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আদেশ দিলেন এক্ষুনি যেনো কলম্বাসকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয়। শুধু মুক্তির আদেশ নয়। তিনি সাথে প্রচুর টাকা-পয়সাও পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে যেভাবে নিঃস্ব করে দেশে পাঠানো হয়েছে তাতে টাকাপয়সার দরকার হতে পারে।

তারপর পত্রে তিনি কলম্বাসকে ডেকে পাঠালেন রাজদরবারে। তিনি নিজের কানেই সব কথা শুনতে চান।

রাণীর পত্র পেয়ে কলম্বাসের মনে কিছুটা সাহস ফিরে এলো। তিনি তাই আর বিলম্ব না করে ছুটে এলেন রাজদরবারে। তিনি দরবারে ঘটিয়ে ফেললেন এক অভূতপূর্ব কান্ড।

দরবারে রাজা ও রাণীর সামনে পড়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কান্না আর আবেগে ভেঙে পড়লেন তিনি। কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন তার বন্দী ও অপদস্ত হওয়ার কাহিনী। বোবাডিল্লা তাঁর যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে কিভাবে পশুতুল্য অপমান করেছেন, তা রাণীকে সবিস্তারে শোনালেন।

রাণী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- আমি সব বুঝতে পেরেছি কলম্বাস, এই অঘটনের জন্য আমি দুঃখিত। তুমি আবার ফিরে যাবে ইস্প্যানোলাতে।

কলম্বাস বললেন, না তা হয় না মহারাণী, আমি যেখান থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যাবো না।



www.nagorikpathagar.org

-তোমার কোনো ভয় নেই কলম্বাস। রাণী বললেন, এই বাড়াবাড়ির জন্য বোবাডিল্লাকেও শাস্তি পেতে হবে। তাঁর বাড়াবাড়ির জন্য আমি শীঘ্রই তাকেও পদচ্যুত করে সেখানে নতুন লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তুমি দুঃখ করো না। তুমি নতুন বিশ্ব

আমেরিকার আদিবাসীরা এসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কলম্বাসকে।

আবিষ্কার করে স্পেনের মুখ যেমন উজ্জ্বল করেছো, তোমার সে অবদানকে আমি অস্বীকার করবোনা। তোমার শত অপরাধও আমার কাছে ক্ষমার যোগ্য।

কলম্বাস বললেন, আমিও আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ মহারাণী। আমি আপনার কাছে যে পুত্রসুলভ স্নেহ পেয়েছি তার ঋণ কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবো না।

রাণী বললেন, তুমি অতীতের সকল কথা ভুলে যাও। তুমি আবার সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

-বেশ আপনার আদেশ অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। কলম্বাস বললেন, এবার আমি যাবো অন্য কোনো কিছুর সন্ধানে।

-সে কিসের সন্ধান? রাণী জিজ্ঞেস করলেন।

কলম্বাস বললেন, আমরা যে নতুন দেশ আবিষ্কার করেছি, তার মধ্যদিয়ে আরো পশ্চিমে যাত্রা করে নতুন কোনো পথ বা সমুদ্র আবিষ্কার করা যায় কিনা আমার এবারের সমুদ্রযাত্রার লক্ষ্য হবে সেটাই।

রাণী বললেন, বেশ, তুমি যা ভালো বোঝো তাই হবে। তোমার দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি শীঘ্রই তোমার যাত্রার আয়োজন করছি।



www.nagorikpathagar.org

# কলম্বাসের শেষ সমুদ্রযাত্রা

কলম্বাস সর্বশেষ সমুদ্রযাত্রা করেন ১৫০২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

এটি ছিলো আসলে একটি বিশাল সমুদ্রযাত্রা। বিরাট ছিলো তার আয়োজন। নাবিক ছাড়াই লোক ছিলো আড়াই হাজার। জাহাজ ছিলো মোট ৩২টি।

এর মধ্যে ৮টি জাহাজ ছিলো কলম্বাসের নিজস্ব। এই ৮টি জাহাজ নিয়েই তিনি যাবেন তাঁর নতুন আবিষ্কারের পথে।

আর বাকীগুলোতে যাবে উপনিবেশ স্থাপনের লোকজন আর দ্রব্য সামগ্রী।

রাণী তাঁর কথা রেখেছেন। এই যাত্রায় তিনি কলম্বাসের সাথে পাঠালেন নিকোলাস ডি ওভান্ডোকে (Nicolas De Ovemdo). বোবাডিল্লাকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ওভান্ডো। এই সাথে রাণী বোবাডিল্লার নামেও নতুন আদেশ জারী করে পাঠালেন কলম্বাসের যে সম্পত্তি সোনাদানা যা কিছু অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা যেনো অবিলম্বে ফেরত দেয়া হয় এবং কলম্বাসকে তার পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কলম্বাস সমুদ্রযাত্রায় যাবার আগে এবার একটি নতুন কাজ করে গেলেন। এর আগে তিনি দেখেছেন তাঁর অবর্তমানে অনেক লোক এসে রাণীর কাছে তাঁর নামে বদনাম রটায়। সাতপাঁচ চৌদ্দ বানিয়ে রাণীর কান ভারী করে তোলে। তাই ঠিক করলেন, তিনি যাবার আগে রাজদরবারে তাঁর নিজের একজন প্রতিনিধি রেখে যাবেন। যাতে অন্য লোক এসে তাঁর নামে হাজার মিথ্যে কথা রটাতে না পারে। তিনি অন্য কাউকে নয়, তাঁর নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ডিয়াগো কেই (২১) রাজদরবারে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গেলেন। এই ডিয়াগোই এখানে বাবার প্রতিনিধিত্ব করবে।

আর সাথে নিয়ে গেলেন তাঁর ১৩ বছর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র ফার্নান্ডোকে (Femando)।

কলম্বাস তাঁর পুরো দলটিকে ইস্প্যানোলার দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের ৮টি জাহাজ ও ১৪৫ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা করলেন তাঁর নিজের পথে। নতুন আবিষ্কারের পথে।

তিনি ২৫শে মে তারিখে ক্যানবি দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে ১৫ই জুন (১৫০২) আবিষ্কার করলেন আর একটি নতুন দ্বীপ। দ্বীপটির নাম দেয়া হলো মার্টিনিনো (Matinino) বা মার্টিনিগো (Martinigue)।

এই নতুন দ্বীপটিতে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি আবার জাহাজ ভাসালেন সমুদ্রের বুকে। সোজা চললেন সান্টো ডোমিংগোর (বর্তমান ডোমিনিকান রিপাবলিকের রাজধানী) দিকে।

কিন্তু এখানে এসেই ঘটলো ঘটনা। নতুন গবর্নর ওভান্ডো তাঁকে ডোমিংগোতে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন না। অবশ্য তার কারণও আছে। রাজাদেশ ছিলো কলম্বাস তার পুরো দল নিয়ে আগে ইস্প্যানোলাতে যাবেন। সেখানে সব বুঝিয়ে দিয়ে তারপর অন্যদিকে যাবার হলে যাবেন। কিন্তু তিনি রাজাদেশ অমান্য করেই ওভান্ডোকে মাঝপথে ফেলে দিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন নিজের পথে। এতে যার পর নাই মর্মাহত ও অসুবিধায় পড়েছিলেন ওভান্ডো। তাই তিনিও কলম্বাসের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন প্রথমেই।



www.nagorikpathagar.org

এদিকে কলম্বাস ডোমিংগোতে প্রবেশাধিকার না পেয়ে সোজা চললেন পোর্টো হারমোসোর (Puerto Hermoso)। দিকে। এটি ছিলো ডোমিংগো থেকে ৫৫ মাইল (৮৮কিলোমিটার) পশ্চিম দিকে।

এখান থেকে তিনি রাজাদেশ অমান্য করার একটি কৈফিয়ৎ পত্র পাঠালেন ওভান্ডোর কাছে।

তারপর আবার যাত্রা করলেন জ্যামাইক্যার দিকে ১৪ই জুলাই (১৫০২)। সেখান থেকে আবার সোজা পশ্চিম দিকে। এই প্রথমবারের মতো কলম্বাস খুঁজে পেলেন মূল ভূ-খন্ড। এবারই সম্পূর্ণ হলো তাঁর আমেরিকা আবিষ্কার।

অবশ্য তখনো ভ্রান্তি কাটেনি তাঁর। তখনো তিনি বুঝতে পারেননি যে, এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী। তখনো তাঁর বিশ্বাস ছিলো এটি হয়তো এশিয়া মহাদেশেরই মূল ভূ-খন্ড। এগুলো তারই পাশের দ্বীপ। ভারতীয় দ্বীপসমূহ।

তিনি জ্যামাইক্যা থেকে জাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছোলেন হন্ডুরাসের উপকূলে। তারপর হন্ডুরাসের উপকূল ধরে এগোতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে। এসে পৌঁছোলেন গ্যাসিয়াস এ ডায়াস (Gracias a Dios) অন্তরীপে।

এখানে এসেই তাঁর স্থির বিশ্বাস হলো তিনি ভারতবর্ষের মূল ভূ-খন্ডে পৌঁছে গেছেন। সামনে মূল ভূ-খন্ড থেকে যে নদী এসে সাগরে পড়েছিলো তাঁর বিশ্বাস এটাই হয়তো ভারতের বিখ্যাত গঙ্গা নদী। তিনি এই গঙ্গা নদী আবিষ্কারে (যদিও এটা ছিলো ভুল) দারুণ খুশী হন। এবং রাজা-রাণীর কাছে অভিভূত হয়ে পত্র লেখেন এবং দেশটিকে বর্ণনা করেন একটি ভূ-স্বর্গ বলে।

তারপর আবার উপকূল ধরে এগোতে থাকেন দক্ষিণ দিকে। এসে পৌঁছান বর্তমান পানামায়। এখানের একটি অংশের তিনি নাম দিলেন বেলেন (Belen) বা বেথেলহাম (Bethlehem)।

তিনি একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানেও একটি নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলবেন। এখানে তার ভাই বার্টোলোমের অধীনে ৮০ জন নাবিককে রেখে যাবেন।

কিন্তু সম্ভব হলো না। প্রথমতঃ তাঁর নাবিকরাই কেউ রাজী ছিলেন না। তদুপরি স্থানীয় লোকদের সাথে প্রথমেই বেধে গিয়েছিলো সংঘর্ষ।

এমন অবস্থায় নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সাহস আর তাঁর হলো না।

অতঃপর আবার ফিরতি যাত্রা করলেন জ্যামাইক্যার দিকে। তিনি জ্যামাইক্যা এসে পৌঁছোলেন ২৩শে জুন (১৫০৩) তারিখে।

কিন্তু এখানে আসার পরেই তাঁর উপর নেমে এলো নানা দুর্যোগ। প্রচন্ড এক ঝড়ে তাঁর জাহাজ ও লোকজনেরও প্রচুর ক্ষতি হলো। জাহাজের নাবিকদেরও মধ্যে দেখা দিলো বিদ্রোহ।

তারপর শুরু হলো খাদ্যের অভাব। অসুক-বিসুখ। এরই সাথে শুরু হলো নেটিভদের আক্রমণ ও অত্যাচার। একবার তো তিনি নেটিভদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সাতদিন লকিয়েছিলেন এক পর্বত গুহায়।



www.nagorikpathagar.org

গোটা বছরটাই তাঁর কেটে গেলো এই অস্থিরতার মধ্যে। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে লাগলো দ্রুত। তখন আর অন্য উপায় না দেখে ইস্প্যানলোর গবর্নর ওভান্ডোর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

ওভান্ডো অবশ্য কলম্বাসের এই বিপদে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। পাঠিয়ে দিলেন দুটো জাহাজ। কলম্বাস ইস্প্যানোলা এসে পৌঁছোলেন ১৫০৪ সালের ২৮শে জুন তারিখে।

এখান থেকেই তিনি ভেবেছিলেন এবার ফিরে যাবেন স্পেনে। রওনাও দিয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রার পরই প্রচন্ড ঝড়ে পড়ে তাঁকে আবার ফিরে আসতে হলো ইস্প্যানোলাতে।

এদিকে কলম্বাসের স্বাস্থ্য দারুণ রকম ভেঙে পড়লো। এমন কি তার অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে আর চলতেই পারছিলেন না।

এরই মধ্যে জীবনে বজ্রপাতের মতো এলো আর এক দুঃসংবাদ। এলো স্পেনের রাণী ইসাবেলার মৃত্যু সংবাদ। রাণী ইসাবেলা মারা গেলেন ১৫০৪ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে। স্পেনের রাজা হয়েছেন তারই পুত্র দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড (Fardinand)।

তাঁর কত আশা ছিলো রাণী তাঁকে আবার পূর্বের সম্মানে বহাল করবেন। তিনি ফিরে পাবেন তাঁর হারানো সম্পদ।

কিন্তু রাণীর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। রাণী যেমন কলম্বাসকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, তার সকল অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখতেন, নতুন রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড তা দেখলেন না।

ফার্ডিনান্ড রাজা হয়েই কলম্বাস সম্পর্কিত তাঁর মায়ের আদেশ বাতিল করলেন। কলম্বাসকে পূর্ণ মর্যাদায় আর বহাল করা হলো না। তিনি তাঁর হারানো সম্পদও আর ফিরে পেলেন না।

কলম্বাস অবশ্য নতুন রাজার মন জয় করার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি রাজদরবারে তাঁর পুত্রকে লিখলেন রাজার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের। রাজার ঘনিষ্ঠ লোকজনদের ধরে তাঁদের জন্য সুপারিশ করতে। কিন্তু কিছুই হলো না।

সব কিছু হারিয়ে এবার কলম্বাস সত্যি সত্যি প্রচন্ড ভেঙে পড়লেন। তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এমনি করে ধূলোয় মিশে গেলো।

এদিকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো দ্রুত গতিতে। যতোটা না স্বাস্থ্য ভাঙলো তার চেয়েও বেশী ভেঙে পড়লো তাঁর মন। অবশেষে তিনি বিছানা নিলেন। ১৯শে মে (১৫০৬) তারিখে তাঁকে ভাল্লাডলিড (Valladolid) নামক স্থানে এক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। এখানেই তিনি পরের দিন (২০শে মে ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

স্পেন ছিলো ছোটো একটি দেশ। তাঁর জন্য আমেরিকার মতো একটি দেশ ছিলো বিশাল সম্পদ। সেই বিশাল সম্পদ যিনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেই কলম্বাস জীবিতকালে তাঁর কোনো সম্মানই পেলেন না। একান্ত নিঃস্ব ও অপমানিত অবস্থায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হলো। এই ইস্প্যানোলাতে তাঁকে সমাহিত করা হলো।

## আমেরিগো ভেসপুচি

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেও তিনি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি-এটি আসলে কোন দেশ। তাঁর ধারণা ছিলো এই বিশাল ভূ-খন্ডটি আসলে এশিয়ারই অংশ। ভারতবর্ষ এবং জাপান। কিন্তু এই ভুল ধারণা যিনি প্রথম ভাঙতে



www.nagorikpathagar.org

আমেরিগো ভেসপুচি

সক্ষম হন তিনি হলেন আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci : 1451--1512)। তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের এক ঠিকাদার। কলম্বাসের জাহাজেই মালপত্র জোগান দিতেন।

তাঁর আসল দেশ ইটালী হলেও তিনি পরে স্থায়ীভাবে স্পেনে বাস করতেন।

কলম্বাস কর্তৃক নতুন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনিও একদিন ভাগ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন জাহাজ নিয়ে। চলে আসেন কলম্বাসের নতুন দেশে। তিনি এসে নামেন আমেরিকার মূল ভূ-খন্ডে। তারপর নিজেই পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়েন আমেরিকার অভ্যন্তরে। আবিষ্কার করেন অনেক অজানা তথ্য।

তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন কলম্বাস এই যে বিশাল দেশটি আবিষ্কার



www.nagorikpathagar.org

করেছেন, এটা আসলে জাপান কিংবা মশলার দেশ ভারতবর্ষ নয়। এটি সম্পূর্ণ একটি অনাবিষ্কৃত নতুন দেশ। এটি আসলে একটি ভিন্ন পৃথিবী।

এই বিশাল দেশটিরও পশ্চিমে আছে আরো একটি বিশাল সাগর। তারও অপর পাড়ে হলো সেই জাপান কিংবা ভারত।

কলম্বাস এটাকে ভুল করে ভারত ভেবেছিলেন।

যেহেতু আমেরিগো ভেসপুচিই সর্বপ্রথম এই বিশাল দেশটির সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাই তাঁর নামেই দেশটির নামকরণ করা হয় আমেরিকা।

অবশ্য কলম্বাস যে ভুল ধারণা করে কিউবা দ্বীপপুঞ্জকে ভারতবর্ষ ভেবেছিলেন, তারও চিহ্ন একেবারে মুছে দেয়া হয়নি। কলম্বাসের ভুল ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই আজো কিউবা দ্বীপপুঞ্জকে বলা হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। যদিও ভারতবর্ষের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। তবু শুধু কলম্বাসের প্রথম ধারণার স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এটা করা হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

# ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

এই আনুমানিক তথ্য প্রমাণ করার জন্য কেউ কেউ সেই আদিকালেই সমুদ্র যাত্রাও করেছিলেন।

ইতিহাস থেকে যেমন জেনেছি নাবিক–ভাস্কো–ডা গামাই সর্বপ্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে ভারতে পৌছেন এবং ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন, কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।

আমেরিকা সর্ব প্রথম কলম্বাসই আবিষ্কার করেছেন একথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভাস্কো–ডা–গামাই যে সর্বপ্রথম ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন একথাও ঠিক নয়। তার আগেও এ ব্যাপারে চেষ্টা চলেছিলো এবং কেউ কেউ সফলও হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায়,সেই প্রাচীন কালেই জনৈক অজ্ঞাতনামা মিশরীয় নাবিক সর্ব প্রথম আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে চলতে চলতে এর চারদিক ঘুরে আবার ফিরে এসেছিলেন নিজের দেশে।

এই মিশরীয় নাবিক ছাড়াও হেরোডোটাস আরো দুজন নাবিকের নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন, কার্থেজিয়ান নাবিক হ্যানো (Hanue) এবং গ্রীক নাবিক পাইথাস (pythas).

সেই আদিকালেই মিশরীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সোনার অলংকার ব্যবহারের খুব প্রচলন ছিলো। তাই সোনার সন্ধানে মিশরীয় ও ফিনিশীয় নাবিকেরা ঘুরে বেড়াতেন দেশে বিদেশে। তারা সেই আদিকালেই সোনার সন্ধানে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে পূর্ব উপকূলে এসে পড়তেন। তারা মাদাগাস্কার দ্বীপ এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যবর্তী মোজাম্বিক চ্যানেলে গিয়ে পড়তেন।

কিন্তু এই মোজাম্বিক ছিলো খুবই বিপজ্জনক এলাকা। এখানেই সর্বক্ষণ বইতো প্রবল দক্ষিণ মুখো সমুদ্র স্রোত। এই প্রবল স্রোতে পড়ে অনেক জাহাজ তাল সামলাতে পারতো না, ডুবে যেতো।

এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতো, ফলে বিপুল পরিমাণ মালামালসহ ডুবে যেতো বাণিজ্য জাহাজ। নাবিকরাও মারা পড়তো। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক নাবিক এদিকে সাহস করে পারতপক্ষে আসতো না।



www.nagorikpathagar.org

# মিশরীয়দের সমুদ্র যাত্রা

এই সময় মিশরের ফারাও (সম্রাট) ছিলেন দ্বিতীয় নিকো (Niko the Second)। তিনিও এই সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। তাহলে আফ্রিকার পূর্ব-দক্ষিণ দিক এবাং মোজাম্বিক অঞ্চল না ঘুরে পূর্ব উপকূলে যাবার আর কোন সহজ পথ আছে কিনা-তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলেন।

তিনি ভাবলেন-যদি আফ্রিকার চারিদিকে সমুদ্র বেষ্টিত হয় তবে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঘুরে যাত্রা করে এর পূর্ব উপকূল হয়ে নিশ্চয়ই আবার নিজের দেশে আসা যাবে। যদি তা যাওয়া যায় তাহলে এর উল্টো যাত্রা করলেও পশ্চিম উপকূল ঘুরে আবার ফিরে আসাযাবে।

সহজ একটি পথ হয়ত এভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে তার আগে প্রমাণ করতে হবে আফ্রিকা সত্যি সত্যিই সমুদ্র বেষ্টিত কি না। শুধু অনুমানের কথা দিয়ে হবে না, তার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।

মিশরীয় রাজা বলল, সমুদ্রপথে আফ্রিকা ঘুরে আসা যায়।

সভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই পাশ্চাত্য জগতে পৌছে গিয়েছিলো দূরপ্রাচ্যের কথা। দূর প্রচ্যের দেশ-চীন, ভারত, জাপান এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কথা ইউরোপের বণিকরা আগে থেকেই জানতো।

ভূ-মধ্য সাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে ভেনিস (Venice) নগরীকে কেন্দ্র করে এক বাণিজ্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো মধ্যযুগে। তারাই তাদের পালতোলা



www.nagorikpathagar.org

জাহজে বাণিজ্য সম্ভার সাজিয়ে চলে যেতো দূরে কোনো বন্দরে।

তাদের কাছেই দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পদ আর সমৃদ্ধির কথা পৌছে ছিলো নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে। তারা জানতে পেরেছিলো মশলার দেশ ভারতবর্ষের কথা।

কিন্তু শুধু জানলেইতো হবেনা। সেখানে পৌছোতে হবে। সে দেশের বণিকদের সাথে গড়তে হবে বাণিজ্য-সম্পর্ক।

কিন্তু কেমন করে যাওয়া যায় সেখানে? অবশেষে তাও হলো। ভেনিস শহরের পোলোভ্রাতৃদ্বয়- মাফিয়া পোলো এবং নিকোলো পোলো পায় হেঁটে চলে এলো দূরপ্রাচ্যের দেশে মহান সম্রাট কুবলাই খানের দেশে। তাদের দ্বিতীয় বারের যাত্রায় সাথী হয়ে এলেন নিকোলো পোলোর ছেলে এবং বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো।

মার্কোপোলো কুবলাই খানের রাজদরবারে কাটিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের প্রায় ২৫টি বছর। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনিই তার এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনীর উপর রচনা করেছিলেন একটি মূল্যবান বই।

তার পর থেকে ইউরোপীয় বণিকদের সাথে দূরপ্রাচ্যের বণিকদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিলো ব্যবসায়িক সম্পর্ক। স্থলপথে চলতো এই বাণিজ্য।

কিন্তু স্থলপথে বাণিজ্যের খুব সুবিধে হচ্ছিলোনা। সুদূর ইউরোপ থেকে স্থলপথে দূরপ্রাচ্যের কুবলাই খানের দেশে আসা ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পথে দস্যুদের ভয়। প্রায়ই এই দীর্ঘ্য মরু পথে বাণিকদের বহরে ডাকাতি হতো। ডাকাতরা কেড়ে নিয়ে যেতোযথাসর্বস্ব।

তাই ইউরোপীয় বণিকরা দূরপ্রাচ্যে যাবার একটি সহজ পথের সন্ধান করছিলেন। বিশেষ করে তাদের যাবার ইচ্ছে ছিলো ভারতে।

তারা গল্প শুনেছে ভারতের মশলার। কিন্তু পায়ে হেঁটেতো আর ভারতে পৌছানো যাচ্ছেনা। তার জন্য সন্ধান করতে হবে ভিন্ন পথের।

ভারতে যাবার পথ খোঁজার জন্য পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশের আরো অনেক অভিযাত্রী করেছিলেন তাদের জীবন পাত।

মধ্যযুগে এমন এক সময় ছিলো যখন ইউরোপীয় বণিকরা ভারতে আসার জন্য হন্যে হয়ে পথ খুঁজে মরছিলেন এবং এরজন্য জীবনপাত করেছিলেন প্রিন্স হেনরী, হেনরী হাডসন, বার্থোলোনিও ডায়াস এর মতো দুঃসাহসী নাবিকেরা। অবশেষে এই প্রচেষ্টা সফল করেন ভাস্কো-ডা-গামা।

তারা আদিকাল থেকেই জানতেন যে আফ্রিকার চারপাশ ঘিরে আছে সমুদ্র। যদি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে যাত্রা করে কেউ এগুতে থাকেন তবে তিনি একদিন চার পাশ ঘিরে অবশ্যই আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারবেন।

অতঃপর তিনি ঠিক করলেন-তার অনুমান সত্য কিনা তা প্রমাণ করার জন্য একদল নৌ-বহর পাঠাতে হবে। তারা যদি তার নির্দেশিত পথে যাত্রা করে সত্যি সত্যি আবার ফিরে আসতে পারে, তবেই প্রমাণিত হবে আফ্রিকা জলবেষ্টিত দেশ।



www.nagorikpathagar.org

মিশরীয় ফারাও দ্বিতীয় নিকো তাঁর এই অভিযানটি করেছিলেন আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এই অভিযানেরও দেড়শো বছর পরে হেরো–ডোটাস এই অভিযানের কথা তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

একজন মিশরীয় নাবিকের অধীনে একটি ফিনিশীয় নৌ–বহর প্রেরণ করেন তিনি। তখনকার দিনে এতো বড় দুঃসাহসিক এবং বিশাল অভিযানের কথা কেউ কল্পনাও করতে পরতো না। এ ছিলো প্রায় ১,৪৪,০০০ কিলোমিটার (৯০,০০ মাইল) জলপথ।

নিকোর নির্দেশে একদিন সত্যি সত্যি রওয়ানা দিলো এই নৌ–বহরটি। তারপর তারা মিশর থেকে শুরু করে আফ্রিকার উত্তর উপকূল ধরে প্রথমে চলতে লাগলো পশ্চিম দিকে। তারপর পার হয়ে এলো জিব্রালটার প্রণালী।

আটলান্টিক মহাসাগরে পৌছে আবার তারা চলতে লাগলেন। চলতে লাগলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে, সোজা দক্ষিণ দিকে।

এ ছিলো যেনো তাদের অফুরন্ত যাত্রা পথ, দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমনি করে পার হয়ে গেলো বছরের পর বছর।

এদিকে মিশরের লোকেরা প্রথম প্রথম প্রতীক্ষায় ছিলেন হয়তো এই দুঃসাহসিক অভিযান শেষে নাবিকেরা আবার ফিরে আসবেন দেশে। সম্রাট যে জলপথ আবিষ্কার করতে তাদের পাঠিয়েছেন, শীঘ্রই তারা সেই শুভ সংবাদ নিয়ে ফিরে আসবেন।

কিন্তু এদিকে দিনের পর দিন, মাস বছর পার হয়ে গেলো–তবু তারা ফিরে আসছে না। তবে কি তারা হারিয়ে গেছে কোনো নিরুদ্দেশের পথে? নাকি সত্যি সত্যি আফ্রিকা ঘুরে আসার কোনো পথ নেই?

এদিকে যখন সত্যি সত্যি পথ চেয়ে থাকতে থাকতে কয়েক বছর পার হয়ে গেলো, তখন মিশরের রাজ দরবারের লোকেরাও তাদের ফিরে আসার আশা ছেড়ে দিলেন।

এমন কি ফারাও নিজেও ছেড়ে দিলেন নাবিকদের আশা। তিনি মেনে নিলেন তাঁর অনুমান হয়তো সত্যি নয়, আফ্রিকা ঘুরে আসার হয়তো সত্যি কোনো পথ নেই।

তার অনুমান প্রমাণ করতে গিয়ে প্রাণ দিলো এতগুলো মানুষ। অবশেষে ফারাও নিজেও ভুলে গেলেন নাবিকদের কথা। এদিকে দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তিনটি বছর।

আর তারপরই ঘটলো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দেশের সব মানুষ যখন তাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তখনই একদিন বিজয় গৌরবে রাজ দরবারে ফিরে এলেন দুঃসাহসিক মিশরীয় নাবিক। যদিও তার দলের অনেক সাথীই আজ আর নেই। এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় মারা পড়েছে অনেকেই। তিনি ফিরে এসেছেন কয়েকজন মাত্র ফিনিশীয় নাবিক নিয়ে।

কিন্তু তিনি জয় লাভ করেছেন এই সমুদ্র যাত্রায়। তিনি প্রমাণ করলেন যে ফারাও দ্বিতীয় নিকোর অনুমান সত্যি। আফ্রিকা সত্যি সত্যি সমুদ্র বেষ্টিত। তিনি তার জাহাজ নিয়ে শুধু উপকূল ধরে যাত্রা করে এই তিন বৎসরে ৯০,০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন মিশরে।



www.nagorikpathagar.org

নাবিকরা তারপর বর্ণনা দিলেন তাদের সুদীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী। তারা এই কয় বছরে কতো দেশ যে দেখেছেন, তারপর সেখানকার কতো যে আকাশছোঁয়া পাহাড় পর্বত, অত্যাশ্চর্য জীবজন্তু এবং মানুষ। কতো কিছুই তাদের চোখে পড়েছে। সবই একে একে তারা বর্ণনা করলেন রাজার কাছে।

সম্রাট নিকোও যার পর নেই খুশী হলেন এই সাফল্যে।

ফিনিশীয় এই জাহাজ আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে চলে লোহিত সাগরে প্রবেশ করে চলে এসেছিলো একেবারে আজকের সুয়েজ খালের মুখে। এই অংশটাওতো সেকালের মিশর বলেই পরিচিত ছিলো।

অবশ্য তারা লোহিত সাগরের উত্তর সীমানায় পৌঁছালেও ভূ-মধ্য সাগরে প্রবেশ করতে পারেননি। কারণ তখনতো সুয়েজখাল কাটা হয়নি। এই সামান্য অংশের জন্যই সেকালের নাবিকরা ভারতে আসার পথ বের করতে পারেননি। ঘুরে আসতে হতো গোটা আফ্রিকা।

## কার্থেজিয়ানদের সমুদ্র যাত্রা

শুধু মিশরীয় নাবিকরাই নয়, ৬৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় কার্থেজিয়ান নাবিকরাও তাদের বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন নানা দেশে। তারাও আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতেন নতুন নতুন নৌপথ, নতুন কোন বাণিজ্য বন্দর।

এই কার্থেজিয়ানদের মধ্যে হ্যানো নামে জনৈক নাবিক ছিলেন। (হিরোডোটাস যার কথা বর্ণনা করে গেছেন) ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তিনি একটি বাণিজ্য বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সমুদ্র যাত্রায়।

উদ্দেশ্য ছিলো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কার্থেজিয়ান উপনিবেশ স্থাপন করা।

এই উদ্দেশ্যেই তিনি জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে চলে আসেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। এখানে তিনি জাহাজ থেকে মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং লোকজন নামিয়ে তৈরি করতে লাগলেন উপনিবেশ।

তিনি কিছু দূরে দূরেই তৈরি করতে লাগলেন এমনি ধরনের ঘাটি। এই ঘাটিগুলোকে তিনি এক একটি সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন। এরপর যখন অন্য কোনো সামুদ্রিক জাহাজ আসতো তারা এই ঘাটি থেকেই মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করতেন। এ ছাড়া এখানে কার্থেজিয়ান বণিকরা বিশ্রামও নিতে পারতেন।

এমনি করে একটির পর একটি ঘাটি স্থাপন করতে করতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন নাবিক হ্যানো।

তিনি শুধু বাণিজ্য পণ্য আনানেয়াই করেননি, কিছু কিছু ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও করেছিলেন। তিনিই পশ্চিম আফ্রিকায় সর্বপ্রথম ক্যামেরুন পর্বত আবিষ্কার করেন। আফ্রিকার জঙ্গলেও তিনিই প্রথম দেখতে পান মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এক



www.nagorikpathagar.org

ভয়ানক হিংস্র জাতের প্রাণী। যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন জঙ্গলম্যান। (Jungle Man)।

জ্যাংগলম্যান শুধু দেখা নয়, প্রমাণ হিসেবে তিনি এর একটা ধরেও এনেছিলেন। ভীষণদর্শন একটি জ্যাংগলম্যান এনে উপহার দিয়েছিলেন রাজাকে।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে হ্যানোর বর্ণিত এই জ্যাংগলম্যান ছিলো প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকান গরিলা। তিনিই সভ্যজগতের প্রথম মানুষ যিনি আফ্রিকান গরিলা দেখেছিলেন।

ক্যার্থেজিয়ানরাতো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, বন্দর তৈরি করে ভালো ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছে। কিন্তু এতে বিপদ হলো গ্রীকদের।

গ্রীকরা ছিলো ক্যার্থেজিয়ানদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; কেউ কাউকে সহ্য করতে পরতো না।

যেই গ্রীক জাহাজগুলো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে যেতো, অমনি কার্থেজিয়ানরা তাদের আক্রমণ করে বসতো। তাদের জাহাজ লুট করে মেরে কেটে নিয়ে যেতো সব। তাই গ্রীকরা সমুদ্র পথে ওদিকে যেতেই পারতো না। তারা তখনো দূরপ্রাচ্যের সাথে ব্যবসা করতো স্থল পথে। সেও ছিলো খুব বিপজ্জনক।

## পাইথাসের সমুদ্র যাত্রা

এই সংকটজনক অবস্থার অবসান ঘটানোর চিন্তা করতে লাগলেন গ্রীক শাসকরা। কিভাবে তাদের ব্যবসা চালু রাখা যায়।

তখন তারা চিন্তা করতে লাগলেন–দক্ষিণ দিকে নয়, আফ্রিকার উপকূলে নয়,উত্তর দিকে কোন ঘাঁটি স্থাপন করা যায় কিনা বা উত্তর দিক দিয়ে কোন পথে দূরপ্রাচ্যে অর্থাৎ চীন বা ভারতে যাওয়া যায় কিনা তার সন্ধান করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যেই খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীক শাসকরা পাইথাস নামে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন সমুদ্র অভিযানে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো উত্তর অঞ্চলে কোনো বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করা যায় কিনা–তার সন্ধান করা।

এই পাইথাস ছিলেন খুবই পন্ডিত মানুষ। তিনি শুধু একজন নাবিক ছিলেন না, তিনি একজন অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভূবিজ্ঞানী ছিলেন। তখনো কম্পাস আবিষ্কার হয়নি। এই সময়েই তিনি দিক নির্ণয় করে জাহাজ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অন্য সব সাধারণ নাবিকের মত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে উপকূল ধরে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি আগে দীর্ঘদিন ধরে গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করতেন। এই গবেষণা থেকেই একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, যদি কোনো নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে সামনের দিকে এগুনো যায় তবে সমুদ্র পথে চলতেও পথ হারানোর ভয় থাকবে না।

তিনি আকাশের এমনি কিছু তারা বেছে নিলেন যেগুলো উত্তর দিকের আকাশে ওঠে। সেগুলোর গতিপথ ও অবস্থান তিনি লক্ষ্য করতেন খুব সাবধানে। তারপর তাদের লক্ষ্য



www.nagorikpathagar.org

করেই তিনি চলতে শুরু করেন সমুদ্র পথে।

কম্পাস আবিষ্কারেরও শত শত বছর আগেই মানুষ এমনি করে জ্যোতিষ গণনার দ্বারা দিক নির্ণয় করতে পারতেন।

সেই অতি প্রাচীন যুগেই পাইথাস উন্নত কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই হিসেব করে বুঝেছিলেন চাঁদের সাথে পৃথিবীর সাগরের জোয়ার-ভাটার একটা সম্পর্ক আছে।

শুধু তাই নয়, তিনি বিষুব রেখা বিষয়ক নানা গণনাও করতে পারতেন। তিনি বিষুব রেখার উত্তরের অক্ষরেখাগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব মাপার একটি পদ্ধতিও বের করেন। পাইথাস ছিলেন এমনি অভিজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তি।

এই পাইথাসের অধীনেই একটি গ্রীক নৌবহর যাত্রা করে উত্তর দিকে। তার সামনে ছিলো দুটো লক্ষ্য। এক হলো উত্তরের দেশগুলোতে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাজনক চলাচল পথ আবিষ্কার করা।

আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো উত্তর দিক দিয়ে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দিয়ে এমন কোনো পথ বের করা যায় কিনা-যে পথ দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে দূরপ্রাচ্যে পৌঁছানো যায়।

এই অভিযানে পাইথাসের দুটো বড় আবিষ্কার হলো গ্রেট বৃটেন, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে আবিষ্কার। মাত্র ছ'মাসের দীর্ঘ্য এক সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে তিনি অতিক্রম করলেন ঝড়ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ উত্তত সাগর। (North Sea)।

উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি নরওয়ের একেবারে সর্ব উত্তরে পৌঁছাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রীক পুরানে এই স্থানটিকেই পৃথিবীর সর্বশেষ উত্তর প্রান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতো উত্তরে এর আগে আর কোনো নাবিকের পক্ষেই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এই অভিযানে তার প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। তিনি ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে বেশ কয়েকটি বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সফল হয়নি।

তিনি উত্তর মেরুঅঞ্চল ঘুরে দূরপ্রাচ্যে আসার কোনো পথ খুঁজে পাননি। নরওয়ের সর্ব উত্তর প্রান্তে পৌঁছে আর এগুতে পারেননি। ঘন বরফে ঢাকা সাগর পেরিয়ে তার পক্ষে আর এগুনো সম্ভব হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ফিরে আসতে হয়েছিলো।

## প্রিন্স হেনরীর অভিযান

ভারতে আসার জন্য প্রাচীন যুগের নাবিকদের এইযে প্রচেষ্টা, এতো বড় দুঃসাহসিক অভিযান, এর কথা কিন্তু শতাব্দীর পরের নাবিকরা কেউ জানতেন না। পরবর্তী কালের নাবিকরা হেরোডোটাসের লেখার সাথেও পরিচিত ছিলেন না।

দূরপ্রাচ্যে আসার প্রচেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দি থেকে। মূলত মার্কোপোলোর পর থেকে।



www.nagorikpathagar.org

চতুর্দশ শতাব্দিতে যে দুঃসাহসিক নাবিক ভারতে আসার পথ আবিষ্কারের জন্য অভিযান চালিয়ে ছিলেন তিনি হলেন পর্তুগালের রাজপুত্র প্রিন্স হেনরী (Prince Henry-1394-60)। ইতিহাসে যিনি নাবিক হেনরী (Henry the Navigator) বলে খ্যাত। যদিও তিনি নিজে সত্যিকার অর্থে কোনো নাবিক ছিলেন না। তিনি পর্তুগালের রাজ পরিবারের সদস্য। জন্ম ১৩৯৪ সালে ৪ঠা মার্চ।

রাজপরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নৌঅভিযানের প্রতি তাঁর ছিলো প্রচন্ড আগ্রহ।

তিনি পর্তুগালের রাজা ও পিতা জনের অধীনে কিউটা (Ceuta) দ্বীপের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন । কিউটা ছিলো একটি সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপ। তাই হেনরীকেও তখন জাহাজে চড়েই যেতে হতো সেখানে। তখন থেকেই সমুদ্র যাত্রার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।

শুধু নৌবিদ্যা শেখার জন্য তিনি একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। সাগরে জাহাজ চালানোও যে আবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষা করতে হয়, এর উপর প্রশিক্ষণ নিতে হয়, এটা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন।

পরবর্তী সময়ে তার প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররাই সমুদ্র যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তার উদ্যোগে এবং আর্থিক সহায়তায় বহু নাবিক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে যাবার প্রষ্টো করেছিলেন।

তিনি তাঁর মনোনীত ন্যাবিকদের দ্বারা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ধরেই দূর প্রাচ্যে পৌছানো যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিলেন।

১৪১৮ সালেই তিনি দুটো নৌ-বহর প্রেরণ করেন। এর একটিতে ক্যাপটেন ছিলেন জোয়াও গণক্যালভেস জারকো (Goao Goncalves Zarco) দ্বীপ এবং অপরটিতে ছিলেন ত্রিসতাওভাস টিকজেরা (Tristaovaz Teixeira)।

এরাই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণ মুখী অভিযান চালাতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন অনেকগুলো নতুন নতুন দ্বীপ। এই নতুন দ্বীপগুলো হলো পোর্টো স্যান্টো (Parto Santo) এবং তার কাছা কাছি দ্বীপ ম্যাডিয়ারা (Madeira).

১৪১৯ সালে তিনি পর্তুগালের সর্ব দক্ষিণের প্রদেশ এ্যলগার্ভ (Algarve) এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই এ্যালগার্ভ প্রদেশেরই সর্বদক্ষিণের সাগ্রিস (Sagres) নামক স্থানে তিনি স্থাপন করেন নৌপ্রশিক্ষণ বিদ্যালয়।

এখানেই নাবিকদের শিক্ষা দেওয়া হতো। মানচিত্র অংকন ও পঠন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জাহাজ তৈরি এবং নৌচলাচলের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে দেয়া হতো প্রশিক্ষণ।

এটাই বিশ্বের সর্বপ্রথম নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়। ১৪২০ সালে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই প্রিন্স হেনরী মহামান্য পোপের কাছ থেকে গ্রাণ্ড মাষ্টার অব দি আর্ডার অব ক্রাইষ্ট (Grand Master of the order of Christ) লাভ করেন। তিনি পোপের



www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধি হিসাবে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও সম্প্রসারণের সনদ লাভ করেন।

এরপর থেকে তিনি সত্যি সত্যি খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের দিকে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর থেকে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় যে সব জাহাজ সমুদ্র অভিযানে যেতো তাদের জাহাজের পালের উপর প্রকান্ড আকৃতির রেডক্রস্ অঙ্কিত থাকতো।

এর পরে তিনি যতোগুলো অভিযান প্রেরণ করেছেন তার মূল লক্ষ্যও ছিলো খৃষ্টধর্মের প্রচার ও সম্প্রসারণ।

১৪২০ সালে তিনি নিকটবর্তী বন্দর ল্যাগোস (Lagos) থেকে প্রেরণ করেন একটি নৌবহর। এই সমুদ্র অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে যতোটা সম্ভব দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর সম্ভব হলে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পার হয়ে পূর্ব উপকূলে যাওয়া। সেখান থেকে দূর প্রাচ্যে যাওয়ার পথের অনুসন্ধান করা

এটা ছিলো তার এক উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো খৃষ্টধর্মের প্রচার করা। তারা যেখানেই যাবে, যে নতুন দেশ দ্বীপ কিংবা বন্দরই তারা আবিষ্কার করবে, চেষ্টা করবে সেখানে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করতে। নতুন দেশের নতুন মানুষদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে। এছাড়া তাঁর এই অভিযানের আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণ। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করা।

১৪৩৩ সালে হেনরীর পিতা রাজা জন মারা গেলে বড়ভাই ডোয়ার্টো (Duarte) রাজা হন পর্তুগালের। কিন্তু বড় ভাই ডোয়ার্টো ছিলেন ভীষণ স্বার্থবাদী। তিনি হেনরীর বিনা স্বার্থে পয়সা ওড়ানো পছন্দ করতেন না।

দেশ আবিষ্কার আর খৃষ্টধর্মের নামে লাখো লাখো টাকা খরচ করে জাহাজের বহর পাঠানোকে তিনি বাজে খরচ বলে মনে করতেন। নগদ লাভ ছাড়া তিনি কোনো কাজ করতেন না। তাই তিনি রাজা হয়ে হেনরীর এই বাজে খেয়াল বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হেনরীর ছোট ভাই পেড্রো (Pedro) ছিলেন আবার ভিন্ন মানুষ। ভাইদের মধ্যে পেড্রোই ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত এবং পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি মেজো ভাই হেনরীর এই অভিযান কাজকে খুবই উৎসাহ দিতেন এবং প্রশংসা করতেন।

বড়ভাই সিংহাসনে আরোহণ করার পরে পেড্রোর সাথেও তাঁর সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। তিনিও ডোয়ার্টোর স্বার্থবাদিতা পছন্দ করতেন না।

কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা ছিলো না। তাই মনক্ষুন্ন হয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে।

পর্তুগাল ছেড়ে তিনি চলে আসেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে যান মলডাভিয়া (Moldavia) এবং ওয়ালাসিয়া (Walachia) (বর্তমানের রোমানীয়া) ,ইটালী আরাগনো পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপের বহুদেশ তিনি ভ্রমন করেন। তার ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এইসব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

তিনি মেজো ভাই হেনরীর জন্য মার্কোপোলোর লিখিত ভ্রমণ কাহিনীটিও অনুবাদ



www.nagorikpathagar.org

করে দেন নিজেই।

অবশ্য বড়ভাইয়ের বিরোধিতা সত্বেও অভিযান বন্ধ করেননি হেনরী- এর আগের অভিযানগুলোর খরচ বহন করা হতো রাজকোষ থেকে। রাষ্ট্রীয় ভাবে পাঠানো হতো নৌবহর।

কিন্তু ডোয়ার্টো রাজহওয়ার পর এটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন হেনরী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকেই এই অভিযানের খরচ বহন করতে থাকেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। নেশার মধ্যে ছিলো ভৌগোলিক অভিযান চালানো এবং খৃষ্টধর্মের প্রচার।

১৪৩৪ সালে হেনরীর অভিযাত্রীদল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কার করেন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ঘাঁটি। এই বছর হেনরীর বিখ্যাত নাবিক ক্যাপটেন গিল ইয়ানেস (Gil Eanes) আবিষ্কার করেন কেপ বোজাডর (Cape Bojador) বন্দর।

এর পরের বৎসর হেনরীর নাবিকরা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হলো। আবিষ্কৃত হয় কেপ বোজাডর থেকে আরো অনেক দক্ষিণের বাণিজ্য ঘাঁটি রিও-ডি-ওরো (Rio-de-Oro)।

এই সময়ে হেনরী এবং তাঁর ছোট ভাই পেড্রোর উদ্যোগে পরিচালিত হয় আর একটি অভিযান।

অল্প কিছু পূর্বে আবিষ্কৃত আজোরেস (Azores) দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হয় এই অভিযাত্রী দলটি।

১৪৩৮ সালে রাজা ডোয়ার্টোর মৃত্যু হলে এবং তার কোনা যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় হেনরীকে রাজা হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই লোভ লালসাহীন মানুষ। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিলো না।

তিনি নিজেই ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ জানান এবং বিনিময়ে শুধু একটি আবদার তার ছিলো।

তিনি নিজের চেষ্টায় সাগ্রেজে যে নৌবিদ্যা প্রশিক্ষণ স্কুলটি খুলেছিলেন সেটা ডোয়ার্টো এসে অর্থ অপচয়ের অজুহাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওটাকে আবার চালু করতে দিতে হবে। স্বদেশে গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দিতে হবে।

ছোটভাই পেড্রো সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। লোভলালসাহীন ধার্মিক আর আদর্শবাদী ভাইয়ের প্রতি আগেই ছিলো তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

আদর্শের জন্য যে লোক রাজ সিংহাসনের লোভ পরিত্যাগ করতে পারেন তাকে কি শ্রদ্ধা না করে পারা যায়? পেড্রো সিংহাসনে বসেই ভাইয়ের জন্য তক্ষুনি প্রতিষ্ঠা করে দিলেন নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারপর পরবর্তী দশক হেনরী নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই চালিয়ে গিয়েছিলেন তার অভিযান কার্যক্রম।

তিনি সিয়েটার মূরদের কাছ থেকে শুনেছিলেন--দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর সোনা পাওয়া যায় এবং আরো পাওয়া যায় কৃতদাস।

এই সোনা আর কৃতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তিনি ১৪৪১সালে প্রেরণ করেন



www.nagorikpathagar.org

একটি মস্ত বড় নৌবহর।

কিন্তু হেনরীর এই অভিযান তেমন লাভজনক হয়নি। তাঁর নাবিকেরা কিছু কৃতদাস সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও সোনা সংগ্রহ করতে পারেননি। এর ফলে তাঁকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার অনেকে বলাবলি করতে শুরু করে--হেনরী অভিযানের নামে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় করছেন। তার এই অভিযানগুলো নিরর্থক অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সমালোচনা করলেও তাঁর অভিযান বন্ধ হয়নি। ১৪৪৫সালে হেনরীর নাবিক ডীনা ডায়াস (Dina Dais) সেনেগাল নদীর মোহনা আবিষ্কার করেন।

এই সেনেগাল নদী নীল নদের উৎসমুখ থেকে পশ্চিম মুখে প্রবাহিত একটি নদী। এটি পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।

এর এক বছর পরে হেনরীর অপর একজন সুদক্ষ ক্যাপ্টেন ত্রিস্তাও(Tristao) আবিষ্কার করেন গাম্বিয়া নদী। এই গাম্বিয়া নদী সেনেগাল নদীরও অনেক দক্ষিণে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের একটি অন্যতম বৃহৎ নদী।

১৪৪৮ সালের দিকে আরো কয়েকটি সার্থক অভিযান পরিচালনা করে হেনরীর ক্যাপ্টেনরা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রচুর কৃতদাস সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

এই কৃতদাস ব্যবসা পরিচালনা করার জন্যই হেনরীর উদ্যোগে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে আরগুন দ্বীপে (Arguin Island) একটি সমুদ্র বন্দর স্থাপন করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের এটাই হলো প্রথম সমুদ্র বন্দর।

এর পরে তাদের রাজ পরিবারে শুরু হয় এক নতুন দ্বন্দ্ব-কলহ। পেড্রো যখন রাজা হন তখন বড় ভাই ডোয়ার্টোর ছেলে ছিলো নাবালক। ছয় বছর বয়স।

এই অজুহাতেই পেড্রো সিংহাসনে বসেন। রাণীমাতা তার নাবালক সন্তান আফনসোকে (Afonso) নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আফোনসো যখন সাবালক হলো তখন দাবী করে বসলেন তাঁর পিতৃসিংহাসন। ফলে এই নিয়ে কাকা পেড্রোর সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ।

পরে ১৪৪৯ সালে পেড্রো গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন এবং আফোনসো রাজসিংহাসনেআরোহণকরেন।

কিন্তু হেনরী এই পারিবারিক কোন্দলে কোনো পক্ষই সমর্থন করেন নি। এই সময় সারাক্ষণ হেনরী থাকতেন তাঁর নৌবিদ্যা শিক্ষার স্কুলের কাজ নিয়ে।

ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হওয়ার পরও কিন্তু তাঁর সমুদ্র অভিযান বন্ধ হয়নি। কারণ নতুন আফোনসোও তার কাকা হেনরীকে শ্রদ্ধা করতেন।

তাই তাঁর কাজে কোনো রকম বাধা দান করেননি। তাঁর অভিযান আগের মত চলতে থাকে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায়।

১৪৫৬ সালের দিকে হেনরীর ক্যাপ্টেন এ্যালবিস কাডা মস্টো (Alvise Cadamosto)এবং পর্তুগীজ নাবিক ডিয়াগো গোমেজ ( Diogo gomes) কেপ ভার্ডে



www.nagorikpathagar.org

প্রিন্স হেনরী

দ্বীপপুঞ্জ (cape verde island)এবং পশ্চিম আফ্রিকায় আরো অনেক গুলো ছোটো দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

শুধু তাই নয় তার নাবিকেরা আরো দক্ষিণে গমন করেন। তারা পালামাস (Cape palamas) বা আধুনিক আইভরি কোষ্ট (Ivory coast) পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

কিন্তু হেনরীর নাবিকেরা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেননি। আবিষ্কার করতে পারেননি ভারতে আসার পথ। এরপর ১৪৬০ সালের ১৩ই তারিখে হেনরীর মৃত্যু হলে এই অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। পর্তুগালের নতুন রাজা আফোনসো এই সব ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না।



www.nagorikpathagar.org

# ভাস্কো—ডা—গামার
# ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার
## বার্থোলোমিও ডায়াস

প্রিন্স হেনেরীর জীবিতকাল পর্যন্ত কেউ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত অবধি পৌঁছোতে পারেননি।

এরপর এগিয়ে এলেন আরেক পর্তুগীজ নাবিক বার্থোলোমিও ডায়াস (Bartholomew Dias)।

ডায়াসও দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পৌঁছানোর পথ আবিষ্কারের জন্য বের হয়েছিলেন সমুদ্রাভিযানে। ১৪৮৬ সালে।

তিনিও প্রিন্স হেনরীর নাবিকদের পথ অনুসরণ করেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে। তারপর যেতে যেতে পৌঁছে গেলেন একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে।

কিন্তু দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেই কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হলো বিপর্যয়। তার জাহাজ পড়লো গিয়ে প্রচন্ড ঝড়ের কবলে।

তিনি দেখলেন এ কোনো সাধারণ আকস্মিক ঝড় তুফান নয়। এটা এমন এক ভয়ংকর স্থান যেখানে প্রায় অবিরাম বয়ে যায় এমনি প্রচন্ড ঝড় ঝঞ্ঝা। তাই তাঁর নাবিকেরা এত ঝড় তুফানের মধ্যে অগ্রসর হতে আর রাজী হলেন না। কে জানে যদি গোটা জাহাজই ডুবে যায়।

তাই বাধ্য হয়ে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ডায়াসকে যাত্রা থামিয়ে ফিরে আসতে হলো।

তিনি এই অন্তরীপটির নাম দিলেন ঝড়ের অন্তরীপ (Cape of storm)।

ডায়াস আবার ফিরে এলেন পূর্তুগালে। রাজার কাছে এই 'ঝড় ঝঞ্ঝার' কথাও সব খুলে বললেন। রাজা কিন্তু দুঃখিত হলেন না। এই ঝড় তুফানের কথা শুনেও তিনি খুশী হলেন।

রাজা বললেন,–ওটা ঝড়ের অন্তরীপ নয় হোয়াস। বলো ওটা আশার অন্তরীপ (Cape of good hope) ওখানে যে একটি অন্তরীপ আছে, ওখান দিয়েই যে ভারতে যাবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। ওই ঝড় তুফানই আমাদের দেখিয়েছে সে আশার আলো। তাই ওটা আমাদের কাছে উত্তম এক আশার অন্তরীপ। ঝড়ের অন্তরীপ নয়। আজো



www.nagorikpathagar.org

তাই এটা উত্তমাশা অন্তরীপ নামেই খ্যাত। রাজার দেয়া নাম।

পর্তুগীজ রাজ অবশ্য ঠিকই অনুমান করেছিলেন। এখান দিয়েই পাওয়া যাবে ভারতে যাবারপথ।

অতঃপর সেই পথ খুঁজে বের করার জন্য আবারো তিনি উদ্যোগ নিতে লাগলেন। ঠিক করলেন আবারো পাঠানো হবে অভীযাত্রী দল।

অবশেষে অভীযাত্রী দল পাঠানোর ব্যবস্থা হলো ১৪৯৭ সালে। এই অভিযানই প্রেরিত হলো বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে।

ভাস্কো-ডা-গামা ছিলেন বিখ্যাত নাবিক ইস্তাভাও-ডা-গামার পুত্র। (Estevao-da-gama)।

ভাস্কো-ডা-গামা

এই সময় পর্তুগালের রাজা ছিলেন রাজা জন (King John) তিনিই প্রিন্স হেনরীর পদাংক অনুসরণ করে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে জাহাজ প্রেরণের পরিকল্পনা করেন। অবশ্য তিনি পরিকল্পনা করলেও বাস্তবায়িত হয় পরবর্তী রাজা ম্যানুয়েলের সময়।

রাজা জনের সময় যখন প্রথম এই সমুদ্র যাত্রার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো তখন নৌবহরের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হয়েছিলো ভাস্কো-ডা-গামার পিতা ইস্তাভাও-ডা-গামাকে।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তিনি যেতে পারেননি। পরিকল্পনা নেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হতে খানিকটা সময় নিয়েছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি মারা যান।.

ভাস্কো-ডা-গামার পিতার মৃত্যু হলে রাজা ম্যানুয়েল অতঃপর এর দায়িত্ব অর্পণ করেন ভাস্কো-ডা-গামার বড় ভাই পৌলোর(Paulo) উপর। কিন্তু তার পক্ষেও যাওয়া হয়নি। স্বাস্থ্যগত কারণে তার পক্ষেও এই শ্রমসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি।

অবশেষে দায়িত্ব এসে পড়ে ভাস্কো-ডা-গামার উপর।তখন তিনি মাত্র ৩৭ বৎসরের যুবক। কিন্তু মনে তার প্রচন্ড সাহস। দেহে আছে অসীম শক্তি। নৌযাত্রায়ও প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁর। নৌযাত্রায় গামাদের ছিলো প্রায় পারিবারিক ঐতিহ্য। তিনিও এর আগে পিতার সাথে সমুদ্র যাত্রায় গেছেন। একবার প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের একটি নৌবহর আক্রমণ করার পুরো দায়িত্ব পড়েছিলো তাঁর উপর। তিনি অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে পালন করেছিলেন তার দায়িত্ব। তাই রাজারও প্রচুর বিশ্বাস ছিলো তাঁর প্রতি।

অতঃপর তাঁকেই ক্যাপ্টেন মনোনয়ন দান করা হলো।

## প্রথম সমুদ্র যাত্রা

ভাস্কো-ডা-গামা তাঁর প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু করেন ১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই তারিখে। যাত্রা শুরু হয় লিসবন থেকে।

ভাস্কো-ডা-গামার এই যাত্রায় জাহাজের সংখ্যা ছিলো মোট চারটি। এর মধ্যে দুটো ছিলো তিন মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ। ১২০ টন করে ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই জাহাজ দুটোর নাম ছিলো সাও গ্যাব্রিয়েল (Sao gabriel) এবং সাও র‍্যাফায়েল (Sao Rafael)।তৃতীয়টি ছিলো ৫০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যারাভ্যান জাতীয় জাহাজ- বেরিয়ো (Berrio) এবং চতুর্থ জাহাজটি ২০০টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। এটি ছিলো মাল জাহাজ (Storeship)·

ভাস্কো-ডা-গামার এই সমুদ্রযাত্রায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো। এই সময় তার সাথে ছিলেন বর্থোলোমিউ ডায়াস। তিনি আগের বার গিয়ে ঝড়ের মুখে পড়ে ফিরে এসেছিলেন। এবারও তিনি সাথে চললেন। তবে ক্যাপটেন হিসেবে নয়, ভাস্কো-ডা গামার প্রধান সহকারী ও উপদেষ্টা হিসেবে।

তাকে সাথে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো--যেহেতু তিনি আগেও একবার এসেছিলেন, তাই পথ ঘাট চেনা আছে। তাকে নিলে সুবিধা হবে।

ভাস্কো-ডা-গামা দুজন আরবীজানা দোভাষীকেও সাথে নিলেন। তিনি জানতেন ভারত কিংবা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তাকে আরব বণিকদের মোকাবিলা করতে হতে পারে। তাই তাদের ভাষা জানতে হবে। দোভাষী থাকলে সুবিধা হবে।



www.nagorikpathagar.org

এছাড়া তিনি সাথে নিলেন অনেকগুলো নামফলক বা পাড্রোও (Padrao)। এগুলো হলো দেশের নামাঙ্কিত প্রস্তর নির্মিত বিশাল ক্রস।

সেকালে নিয়ম ছিলো, যে দেশ আবিষ্কৃত হতো দখলস্বত্ব হিসেবে সেখানে একটি পাড্রোও পোঁতা হতো। এই ফলক পোঁতা হলেই সে দেশ তাদের দখল হয়ে গেলো।

ভাস্কো-ডা-গামাও সাথে করে অনেকগুলো পাড্রোও নিয়ে এসেছিলেন। পথে যেতে যেতে যদি কোনো নতুন দেশ কিংবা স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেখানেই পাড্রোও পুঁততেহবে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে চলতে চলতে তারা ২২শে নভেম্বর এসে পৌঁছালেন উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি।

এর তিনদিন পরে ভাস্কো-ডা-গামা মোসেল উপসাগরের (Mossel Bay) তীরে নোঙ্গর ফেললেন এবং সেখানে একটি প্যাড্রোও পোঁতা হলো।

এখান থেকে ৮ই ডিসেম্বর আবার যাত্রা শুরু করে ২৫শে ডিসেম্বর তিনি পৌঁছালেন নাটাল (Natal) উপকূলে। ১১ই জানুয়ারী (১৪৯৮ সালে) তিনি মোজাম্বিক (Mozambique) এবং নাটাল উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছোটো নদীর মোহনায় নোঙর করলেন। নদীটির নাম ছিলো রিও-ডো-কোব্রে (Rio-do-Cobre)। যার বর্তমান নাম কপার নদী (Copper River)। তিনি ২৫শে জানুয়ারী তারিখে মোজাম্বিকের কোলীম্যান নদীর (Quelimane River) মোহনাতেও আরো একটি প্যাড্রোও পুঁতলেন।

কিন্তু এই সময়েই তার জাহাজে দেখা ছিলো স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব। অনেক নাবিক আক্রান্ত হয়ে পড়লো এই জটিল ব্যাধিতে। তখন বাধ্য হয়েই ভাস্কো-ডা-গামাকে মোজাম্বিকের তীরে এক মাস নোঙর করে অপেক্ষা করে থাকতে হলো।

এছাড়া তার স্টোরশীপটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। সেটিও মেরামত করে নেয়া হলো এইসময়।

২রা মার্চ তারিখে তিনি এসে পৌঁছালেন মোজাম্বিক দ্বীপে। এই দ্বীপের আদিবাসীরা ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদের বিশ্বাস ছিলো পর্তুগালের অধিবাসীরাও বুঝি তাদের মতো মুসলমান। ভাস্কো-ডা-গামা শুনেছিলেন মোজাম্বিকের সাথে আরব দেশীয় বণিকদের ব্যবসা বণিজ্যের সম্পর্ক আছে। এই দ্বীপ থেকে আরবীয় বণিকরা সোনা হীরা জহরত রূপা এবং মশলা নিয়ে যায় নিজের দেশে। ভাস্কো-ডা-গামা ও মোজাম্বিকের মুসলিম সুলতানের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন।

মোজাম্বিকের সুলতানের অবশ্য পরে ভুল ভেঙে ছিলো। তিনি জেনে ছিলেন এই নাবিকরা মুসলমান নয় ,খৃষ্টান।

তখন তার কাছ থেকেই ভাস্কো-ডা-গামা জানতে পারলেন যে, এই দ্বীপের অনেক অভ্যন্তর ভাগে আরো এক রাজা আছেন, তিনি খৃষ্টান।



www.nagorikpathagar.org

তখন ভাস্কো-ডা-গামা চললেন সেই খৃষ্টান রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে। সুলতান তার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক না করলেও খুব খারাপ আচরণ করেননি। খৃষ্টান রাজার রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুলতান ভাস্কো-ডা-গামার সাথে দু'জন পথ প্রদর্শক দিয়েছিলেন।

তবে এখানেও ঘটেছিলো আর এক মাজার ঘটনা। এ দু জন গাইডের মধ্যে একজন ছিলো খুবই গোঁড়া পন্থী। সে যেই জানতে পারলো এই ভিনদেশী নাবিক খৃষ্টান, তখনই আর সে তার সাথে যেতে রাজী হলো না। অতঃপর অপর একজনকেই নিয়ে তিনি চললেন খৃষ্টান রাজার দেশে।

অনেক বনবাদাড় ভেঙে অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা গিয়ে পৌছালেন খৃষ্টান রাজার দেশে। তিনিও ছিলেন আসলে একজন আদিবাসী। বহু পূর্বে জনৈক পর্তুগীজ নাবিকের কাছে দীক্ষিত হয়ে ছিলেন খৃষ্টান ধর্মে।

ওটা ছিলো আসলে ভাস্কো-ডা-গামার এক কৌতূহলপূর্ণ অভিযান। তিনি শুধু দেখতে চেয়েছিলেন লোকটি কে?

মোজাম্বিক থেকে ৭ই এপ্রিল তারিখে ভাস্কো-ডা গামা যাত্রা করলেন মোমবাসা (Mombasa) এর দিকে। উল্লেখ্য যে, মোমবাসা বর্তমান কেনিয়ায় পড়েছে। এখান থেকে তারা মালিন্দায় (Malinda) এসে পৌছালেন ১৪ই এপ্রিল তারিখে। মালিন্দাও বর্তমান কেনিয়ায় অবস্থিত।

এই মালিন্দা থেকেই ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের দিকে যাত্রা করবেন ।মালিন্দায় এসে অবশ্য তার একটি উপকার হলো। তিনি একজন লোকের সাক্ষাৎপেলেন।

লোকটির বাড়ি মালিন্দাতেই। তিনি কেনিয়ার অধিবাসী। তবে তিনি এর আগেও বেশ কয়েকবার ভারতে গেছেন। পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্য বন্দর কলিকটেও কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর।

ভাস্কো-ডা-গামা তখন এই লোকটিকেই জাহাজে তুলে নিলেন। সাথে পথ চেনে এমন একজন লোক থাকলে ভালো হয়।

দীর্ঘ একটানা ২৩ দিন জাহাজ চালিয়ে তারা এসে পৌছালেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে। অনেক দূরে থাকতই দেখা গেলো একটি পর্বতের চূড়া।

যে লোকটি ভাস্কো-ডা-গামার সাথে এসেছিলো মালিন্দা থেকে সেই আঙুল তুলে দেখালো, -ওই যে স্যার পর্বতের উঁচু চূড়া দেখছেন।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ।

-ওটা একটি মাঝারি ধরনের পর্বত।

-কি নাম পর্বতটার?

-ওর নাম ঘাট পর্বত।

-আমরা তাহলে কালিকট বন্দরেপৌছোতে পারবো কখন



www.nagorikpathagar.org

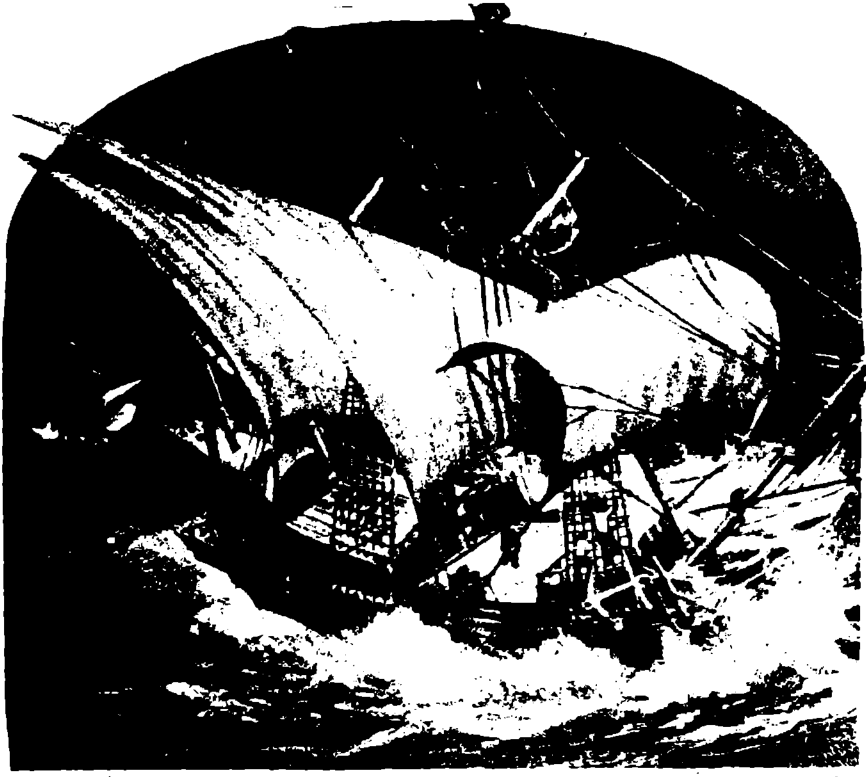

–ওই ঘাট পর্বতের সামান্য দক্ষিণেই কালিকট, আমরা আর অল্প পরেই বন্দরের দেখাপাবো।

ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌছালো ১৪৯৮ সালের ২০শে মে তারিখে।

এই কালিকট বন্দরে এসেও ভাস্কো-ডা গামা আর একটি প্যাড্রোও পুঁতলেন।

অর্থাৎ তিনি পর্তুগীজ রাজার পক্ষ থেকে ভারত সর্ব প্রথম আবিষ্কার করলেন এবং এখানে পর্তুগালের আধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। তার পরে আর কোনো ইউরোপীয় অভিযাত্রী এসে ভারত আবিষ্কারের দাবি করতে পারবে না। অন্য কোনো দেশ ভারতের স্বত্বও দাবী করতে পারবেনা।

তখন কালিকটে ছিলেন হিন্দু রাজা। রাজাকে বলা হতো জামোরিন (Zamorin)। ভাস্কো-ডা-গামা তার দেশ থেকে আনা নানাবিধ উপহার সামগ্রী



www.nagorikpathagar.org

নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন রাজার সাথে। দেখা করলেন রাজ দরবারে।

উপহার সামগ্রী পেয়ে জামোরিনও খুব খুশী হলেন। এই বিদেশী অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনাজানাবেনরাজদরবারে।

ভাস্কো-ডা-গামার ইচ্ছে ছিলো রাজার সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি করা এবং এখান থেকে ব্যবসাকরা।

কিন্তু তা সম্ভব হলো না। এর নানা কারণ ছিলো।

প্রথম কারণ হলো--তিনি যে সমস্ত পণ্য নিজের দেশ থেকে এবং আসার পথে পূর্ব আফ্রিকা থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোর এখানে ভালো বাজার ছিলো না।

দ্বিতীয়তঃ আরব সাগরে তখন প্রভাব ছিলো আরব বণিকদের। এখানে প্রায় একচ্ছত্রভাবে বাণিজ্য করে বেড়াতো আরবরা। তারা চাইতো না এখানে অন্য কোনো দেশের লোক এসে তাদের মুনাফায় ভাগ বসাক। আরব বণিকরা বিদেশী জাহাজ দেখলেই তাদের আক্রমণ করে বসতো। লুট করতো জাহাজ।

আরব বণিকদের এই হিংসাত্মক তৎপরতার মুখে নিশ্চিন্ত মনে কিছু করতে পারছিলেন না ভাস্কো-ডা-গামা।

শুধু গামা নয়, কলিকটের দরবারে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন। কলিকটের জামোরিন তাকে সহযোগিতা করছেন। আরবীয় বণিকরা এটাও সুনজরে দেখলো না। আরবীয়রা জামোরিনের উপরেও নাখোস হয়ে পড়লো। শেষে তখন আরবীয় বণিকরা ভারতীয় বণিকদের জাহাজও আক্রমণ করতে শুরু করলো।

এই অবস্থায় ভাস্কো-ডা-গামা দেখলেন এখানে আর বেশীদিন তার অবস্থান করা সমীচিন নয়। এখানে বাণিজ্য করা যাবে না।

অতঃপর ভাস্কো-ডা-গামা মাত্র কয়েক মাস থেকে আগষ্ট মাসেই কালিকট ত্যাগ করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ছাড়তে হলো কালিকট।

আর কোনো স্থানে নয়, তিনি এবার ফিরে চললেন নিজের দেশে। প্রধান যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন তা সফল হয়েছে। তিনি ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছেন। এই অভিযানে এটাই ছিলো তাঁর সব চেয়ে বড় সাফল্য।

তিনি এবার স্বদেশে ফিরে গিয়ে এই বিজয় বার্তা পৌঁছে দেবেন পর্তুগীজ রাজার কাছে।

তিনি এখানে বসে বাণিজ্য করতে চেয়েছিলেন সেটা হলোনা। নাই বা হলো। তাঁর প্রধানউদ্দেশ্যতোসফলহয়েছে।

তিনি ফিরে যাবার সময় একটা কাজ করলেন। তিনি কালিকটে জামোরিনের কাছে চেয়ে নিলেন পাঁচজন ভারতীয় হিন্দু নাগরিক। তারা ভাস্কো-ডা-গামার সাথে পর্তুগালে যাবেন। তিনি যে সত্যি সত্যি ভারতে এসেছিলেন তার প্রমাণ এরাই তাকে দেবেন। এছাড়া তারা ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কেও রাজাকে বলতে পারবেন।



www.nagorikpathagar.org

স্বদেশের পথে রওনা দিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিমে গোয়ার (Goa) সন্নিকটে আঞ্জিদ্বীপ দ্বীপে (Anjidiv Island)। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি মালিন্দিতে (আধুনিক মালদ্বীপ) এসে পৌছালেন ১৪৯৬সালের ৮ জানুয়ারী তারিখে।

এই সময়ে আরব সাগরের আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তাই আরব সাগর পাড়ি দিতেই তাঁর সময় লেগে যায় প্রায় তিন মাস। এই প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর জাহাজের অনেক নাবিকের মৃত্যুও হয়। জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ছাড়িয়া পড়ে স্কার্ভি রোগ।

মালিন্দিতে এসে জাহাজের নাবিকসহ সংকটের মুখে পড়েন তিনি।

বেশ কয়েক জন নাবিক মারা গেছে, যারা আছে তাদের দিয়ে চারটি জাহাজ চালানো সম্ভব নয়।

তাই তিনি নৌবহরের একটি জাহাজ কমিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাথের 'রাও রাফীল' নামের জাহাজটি তিনি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দিলেন।

এবার তাঁর জাহাজ থাকলো মাত্র তিনটি। তিনি মালিন্দিতে এসেও একটি পোড্রো স্থাপন করলেন, এটিও দখল হয়ে গেলো পর্তুগীজ রাজার নামে।

মালিন্দি থেকে তিনি এলেন মোজাম্বিকে। মোজাম্বিকে এসে ১লা ফেব্রুয়ারী স্থাপন করলেন তার শেষ পোড্রো। এরপর তিনি তার নৌবহরের দুটো জাহাজ সাও গাব্রিয়েল এবং বেরিও একসাথেই অতিক্রম করলো উত্তমাশা অন্তরীপ। কিন্তু অন্তরীপ পার হয়ে আসার পথেই পড়লেন প্রবল ঝড়ের মুখে।

এই ঝড়ে দুটো জাহাজ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলো। কোনটি যে কোনদিকে হারিয়ে গেলো তার খোঁজই পাওয়া গেলোনা।

এই ঝড়ের সময় ভাস্কো-ডা-গামা ছিলেন সাও গালিয়ে জাহাজে। কিন্তু সাথের বেরিও জাহাজটা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তিনি আর খোঁজই করতে পারলেননা।

অবশ্য বেরিও জাহাজটি ডুবে যায়নি। বরং বহাল তবিয়তেই ছিলো। তারাও ফ্ল্যাগ শীপের দেখা না পেয়ে মনে করলো হয়তো সেটি ঝড়ে ডুবে গেছে। মৃত্যু হয়েছে ক্যাপটেন ভাস্কো-ডা-গামার।

তাই তারা আর বিলম্ব না কারে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দ্রুত ছুটে এলো পর্তুগালের দিকে। বেরিও জাহাজটি ভাস্কো-ডা-গামারও তিনমাস আগে এসে ১০ই জুলাই তারিখ লিসবন পৌছায়। এবং উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের বিজয় বার্তা পৌছে দেয় এবং সেই সাথে জানায় ক্যাপ্টেন ভাস্কো-ডা-গামার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর।

এরপর তিন মাস পর ৯ই সেপ্টম্বর সশরীরে এসে হাজির হলেন ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি খুলে বললেন তার নিজের বিপর্যয়ের কথা। গামা যে বেঁচে আছেন এবং তিনি যে ফিরে এসেছেন তাতে রাজাও দারুণ খুশী হলেন।

শুধু বিপর্যয়ের জন্যই নয় ,ভাস্কো-ডা-গামার ফিরতে বিলম্ব হয়েছিলো অন্য কারণেও। তিনি অন্যদিকেও গিয়েছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

তিনিও ফিরছিলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরেই।

এই পশ্চিম উপকূলেই টারসিয়েরা (Terceira) দ্বীপে থাকতেন ভাস্কো-ডা-গামার বড় ভাই পাওলো (Paulo) এবং এই দ্বীপেই তিনি মারাও গিয়েছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তাই ভাইয়ের কবর দর্শন করার জন্য গিয়েছিলেন টারসিয়েরাতে। এখানে এসেই তাঁর ফিরতে কিছুদিন দেরী হয়।

স্বদেশে ফেরার পর রাজা প্রথম ম্যানুয়েল তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। ভূষিত করলেন ডোম (Dom) উপাধিতে। এটি হলো দেশের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি যা ইংল্যান্ডের 'স্যার' উপাধির সমতুল্য।

শুধু উপাধি নয়, এই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে অনেক আর্থিক সুবিধাও দান করা হলো। দেয়া হলো বার্ষিক ১০০০ ক্রুসাডোস (Cruzados) এর ভাতা এবং প্রদান করা হলো একটি জমিদারী।

## দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযান

ভাস্কো-ডা-গামাতো ভারতে যাবার জলপথ আবিষ্কার করে এসেছেন। এবার এই পথকে কাজে লাগাতে হবে। বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ভারতের সাথে।

এই উদ্দেশ্যেই রাজা প্রথম ম্যানুয়েল ভারতে একটি বাণিজ্য নৌবহর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এই নৌবহরটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো প্রখ্যাত নাবিক পেড্রো আল ভ্যারেস ক্যাব্রোল (Pedro Alvares cabral) এর উপর। এই নৌবহরে মোট জাহাজের সংখ্যা ছিলো ১৩টি।

তারপর যথা সময়ে ক্যাব্রোলের নেতৃত্বে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে পর্তুগীজ নৌবহরটি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছালো যথা সময়ে। কিন্তু বাণিজ্য করা আর হলোনা।

পর্তুগীজদের প্রতি আরব বণিকরাতো আগে থেকেই ক্ষেপে ছিলো। আরব বণিকরা এবার ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো ভারতীয় লোকদেরও।

এই বিপর্যয়ের মাঝেই পড়ে গেলেন ক্যাব্রোল। আরব বণিকরা সহসা আক্রমণ চালিয়ে পর্তুগীজদের গোটা নৌবহরটা লুট করে এবং ধ্বংস করে দিলো। ক্যাব্রোল কোনোমতে জান নিয়ে যথাসর্বস্ব হারিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের কাছে। কিন্তু রাজা ভেঙে পড়লেন না। এই বিপর্যয়ের পরও তিনি আবার একটি নতুন নৌবহর পাঠানোর ব্যবস্থা নিলেন। দ্বিতীয় অভিযানেও প্রথমে ক্যাপ্টেন মনোনীত হয়েছিলো ক্যাব্রোলকেই। কিন্তু পরে রাজা তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

হয়তো তিনি ভাবলেন, যিনি একবার পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন তার নেতৃত্বে আর অভিযান করা ঠিক নয়। তাই রাজা ক্যাব্রোলকে বাদ দিয়ে ভাস্কো-ডা-গামাকেই ক্যাপ্টেন পদে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। গামাকে পদোন্নতি দিয়ে এ্যাডমিরাল



www.nagorikpathagar.org

করা হলো।

শুরু হলো ভাস্কো-ডা-গামার দ্বিতীয় বার ভারত অভিযান। এই অভিযানে তাঁর সাথে জাহাজের সংখ্যা ছিলো মোট দশটি। এর সাথে ছিলো ৫টি করে দুটো যুদ্ধ জাহাজের বহর। এদের কাজ ছিলো বাণিজ্য জাহাজগুলোকে পাহারা দেয়া। এমনি একটি সুসজ্জিত নৌবহর নিয়ে রওনা দিলেন তিনি।

ভাস্কো-ডা-গামার এই দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় ১৫০২ সালের জানুয়ারী মাসে।

এই বিশাল নৌবহর নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা কেপভার্ডে দ্বীপপুঞ্জের সোফালা বন্দরে এসে পৌছালেন ফেব্রুয়ারী মাসে। সেখান থেকে চলে এলেন মোজাম্বিকে। তারপর তিনি জাহাজ ভেড়ালেন কিলওয়াতে (Kilwa)। এই কিলওয়া হলো বর্তমানের তানজানিকা।

কিলওয়ার সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম। এই সুলতান ইব্রাহিমের হাতেই এর আগের পর্তুগীজ নৌবহর নাজেহাল হয়েছিলো। নাবিক ক্যাব্রোল তার যথাসর্বস্ব হারিয়ে ছিলেন এই সুলতানের বাহিনীর হাতেই।

ভাস্কো-ডা-গামা এবার নিজেই চড়াও হলেন সুলতানের উপর। এবার তাঁর হাত অনেক শক্তিশালী। তিনি কিলওয়ার সুলতানকে এই বলে হুমকি দিলেন যে, যদি তিনি তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করেন এবং পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েলকে রাজা বলে মেনে না নেন, তাহলে কিলওয়াতে আগুন ধরিযে দেয়া হবে।এই হুমকিতে অবশ্য কাজ হলো। কিলওয়ার সুলতান ঘাবড়ে গেলেন এবং বশ্যতা স্বীকার করলেন ভাস্কো-ডা-গামার কাছে।

কিলওয়ার সুলতানকে বশ মানিয়ে তিনি এবার যাত্রা শুরু করলেন ভারতের কালিকট বন্দরের দিকে। তিনি আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত হয়ে এসে পৌছেলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়াতে।

গোয়া থেকে আরো একটু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে অবস্থান নিলেন কান্নানোর (Cannanore) বন্দরে। কান্নানোর হলো কালিকটের উত্তরে অবস্থিত একটি ছোটো সামুদ্রিক বন্দর।

এখানে অবস্থান নেবার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিলো ভাস্কো-ডা-গামার। তিনি এবার মনে মনে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এখানে প্রভাব বিস্তার করতে হলে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। এদেরকে ভয় দেখিয়ে বশে আনতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে ত্রাস।

তিনি কান্নানোর বন্দরে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন কোনো আরবীয় জাহাজ আসে কিনা। কোনো আরব বণিকের জাহাজ দেখলেই তা লুট করতে হবে।

হলোও তাই। চার পাঁচদিন অপেক্ষা করার পরই দেখা গেলো কান্নানোর বন্দরের দিকে একটি আরব জাহাজ এগিয়ে আসছে।



www.nagorikpathagar.org

এটি ছিলো আসলে একটি আরব যাত্রীবাহী জাহাজ। এই জাহাজে ছিলো নারী ও শিশুসহ প্রায় চারশো জন যাত্রী। এরা আরব উপদ্বীপ থেকে ভারতের কান্নানোরেই আসছিলো।

নাগালের মধ্যে আসতেই ভাস্কো-ডা-গামা অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলেন জাহাজটি। তারপর লুট করা হলো জাহাজের যাবতীয় ধনরত্ন ও সম্পদ। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামার হিংস্রতা এখানেই নিবৃত্ত হলো না। তিনি জাহাজের যথাসর্বস্ব লুট করে নারী ও শিশুসহ সকল যাত্রীকে একে একে হত্যা করে ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রে। তারপর জাহাজেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো।

ভাস্কো-ডা-গামার জীবনে এটাই ছিলো সবচেয়ে কলঙ্কময় এবং নৃশংসতম কাজ। তিনি পর্তুগীজ স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই ঘটিয়েছিলেন এই নির্মম হত্যাকান্ড।

এই কান্নানোরেও এক রাজা ছিলেন। কান্নানোরের রাজার সাথে কালিকটের সম্পর্ক ভালো ছিলো না। প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে এদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হতো।

ভাস্কো-ডা-গামা কান্নানোরের রাজার সাথে মিত্রতা করলেন। রাজাও তাকে গ্রহণ করলেন সাদরে। কিছুদিন কাননোরের রাজ দরবারে অবস্থান করে ভাস্কো-ডা-গামা অগ্রসর হলেন কালিকটের দিকে।

কালিকটের জামোরিনও ভাস্কো-ডা-গামার সাথে মিত্রতা স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু সেই মিত্রতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না তিনি।

বরং তিনি কালিকটের জামোরিনকে এই বলে হুমকি দিলেন যে, তিনি যদি তার রাজ্যের সকল মুসলমান বণিকও নাগরিককে হত্যা না করেন, তাহলে তিনি কালিকট ধ্বংসকরবেন।

কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামার এই অন্যায় ও নৃশংস আদেশ মেনে নিতে পারলেন না কালিকটের জামোরিন। তাই পরে তাকে এর খেসারতও দিতে হলো।

ভাস্কো-ডা-গামা এই অবাধ্যতার প্রতিশোধ নিলেন। তিনি ৩৮ জন নিরীহ হিন্দু জেলেকে সাগর পাড় থেকে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। জেলেদের হত্যা করে লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হলো সাগরে, যাতে এগুলো ভাসতে ভাসতে কালিকট বন্দরে গিয়ে পৌঁছায় এবং জামোরিন নিজের চোখে তার অবাধ্যতার পরিণাম দেখতে পান।

এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন কোচিন (Cochin) বন্দরের দিকে। এই কোচিনের রাজাও ছিলেন কালিকটের জামোরিনের শত্রু। ভাস্কো-ডা-গামা কোচিন রাজের সাথেও মিত্রতা করলেন।

এরপরেও এতো শত্রুতার পরেও কালিকটের জামোরিন ভাস্কো-ডা-গামার সাথে মিত্রতা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি তাকে। ভাস্কো-ডা-গামার সন্দেহ হয়েছিলো হয়তো জামোরিন তাকে মিত্রতার লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে গেয়ে বন্দী করবেন। কারণ তিনি কালিকট রাজের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন



www.nagorikpathagar.org

এরপরেও তারা তার সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে চান–তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হননি।

তিনি কিছুদিন কোচিনে অবস্থান করে আরব ফিরে এলেন কান্নানোরে। এই ফেরার মুখেই তিনি সহসা আরব জাহাজের দ্বারা আক্রান্ত হন।

অনেকগুলো আরব জাহাজ এই নিষ্ঠুর বিদেশী নাবিকটাকে শায়েস্তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলো। তাদের সাথে ভাস্কো–ডা–গামার এক বড় রকমের যুদ্ধও হয়।

এই যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হলেও অবশেষে ভাস্কো–ডা–গামারই জয় হয়। আরব জাহাজগুলো পর্তুগীজদের সাথে না পেরে পালিয়ে যায়। তখন ভাস্কো–ডা–গামাও বুঝতে পারেন আর নয়, এবার তাকে জান নিয়ে পালাতে হবে। চারিদেকে যেভাবে আরবের মুসলমান এবং ভারতের হিন্দু বণিকরা তার উপর ক্ষেপে উঠেছে তাতে আরও বড় বিপদ আসতেপারে।

অতএব বড় বিপদ আসার আগেই পালানো ভালো।

ভাস্কো–ডা–গামা স্বদেশের পথে কান্নানোর বন্দর ছাড়লেন ১৫০৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। সেখান থেকে মোজাম্বিক। তিনি দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রা শেষ করে লিসবন প্রত্যাবর্তন করেন ১১ই অক্টোবর (১৫০৩ সাল) তারিখে।

## তৃতীয় এবং শেষ সমুদ্রযাত্রা

এরপর দীর্ঘদিন ঘরেই ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা থেকে স্বদেশে প্রত্যাববর্তন করে আর কোথাও তিনি বের হননি। রাজা প্রথম ম্যানুয়েল তাঁকে নিযুক্ত করেছেন ভারত বিষয়ক উপদেষ্টা। এই পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন ভাস্কো–ডা–গামা।

এরপর রাজা প্রথম মানুয়েল মারা যান। রাজা তৃতীয় জন আবার তাঁকে পাঠালেন ভারতে ১৫২৪ সালে। তাকে ভারতে ভাইসরয় করে পাঠানো হলো।

তিনি রাজ প্রতিনিধি হয়ে ভারতে এসে পৌছালেন ১৫২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু ভারতের কোচিন বন্দরে এসেই তার শরীর খুব ভেঙে পড়লো। এর মাত্র মাস চারেক পরেই ২৪ সে ডিসেম্বর (১৫২৪) তারিখে তিনি কোচিন বন্দরে মৃত্যু বরণ করেন। এই কোচিন বন্দরেই তাঁকে সমাধিস্থ করাও হয়েছিলো। পরে অবশ্য ১৫৩৮ সালে তাঁর মৃতদেহ কোচিন থেকে তুলে এনে রাজধানী লিসবনে পুনঃ স্থাপন করা হয়।



www.nagorikpathagar.org

# ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ

## প্রস্তুতি পর্বের কথা

মধ্যযুগের ভৌগোলিক আবিষ্কার যুগে যেসব দুঃসাহসিক নাবিক সর্বাধিক কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন তার মধ্যে ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান অন্যতম। ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলানের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকান্ড হলো বিশ্বভ্রমণ। তিনিই বিশ্বের প্রথম মানুষ যিনি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে পৃথিবীর এক পাশ থেকে রওনা দিয়ে পৃথিবী ঘুরে আবার পূর্বের স্থানেই ফিরে এসেছিলেন। আর এর ফলেই হাতেনাতে প্রমাণিত হয়েছিলো যে পৃথিবী সত্যিকার অর্থে গোল। এটা আর অনুমান নয়। বাস্তব সত্যি।

তিনি ছিলেন পর্তুগীজ। কিন্তু তিনি ভূ-প্রদক্ষিণের সমুদ্রযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন স্পেনের পতাকাবাহী জাহাজে। জন্ম তাঁর পর্তুগালের পুর্টো (Porto) নামক শহরে। পিতার নাম ছিলো রুই ডি ম্যাগেলাস (Rui de Magalhaes) এবং মা ছিলেন আলদা ডি মেসকুইটা (Alda de Mesquita)

বাল্যকালেই তিনি পর্তুগীজ রাজা ম্যানুয়েলের (Manuel) অধীনে চাকরি নিয়ে আসেন লিসবনে। প্রথম জীবনেই ১৫০৫ সালে সমদ্রে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করেন। শুরু হয় তাঁর নাবিক জীবন।

এই সময় ফ্রান্সিসকো ডি আলমেডা (Francisco de Almeida)নামে এক লোককে পুর্তুগীজ ভাইসরয় করে পাঠানো হয় আফ্রিকা এবং ভারতে। পুর্তুগীজ রাজের উদ্দেশ্য ছিলো- এই অঞ্চলে প্রভাবশালী মুসলিম শক্তির মোকাবিলা করা এবং পুর্তুগীজ স্বার্থ সংরক্ষণ।

আলমোড়া একটি বিশাল নৌবহর নিয়ে রওনা দেন ভারতের উদ্দেশ্যে। এই নৌবহরেই ছোটো একটি চাকরী নিয়ে উঠে পড়েন ম্যাগেলান। তাদের জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এসে নোঙর করে ভারতের মালাবার উপকূলে।

এ সময় থেকেই ম্যাগেলান সাগর এবং জাহাজ পরিচালনার উপর বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জনকরেন।

প্রায় বছর খানেক ম্যাগেলান এ নৌবহরের সাথে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ছিলেন। তারপর ১৫০৬ সালে ক্যাপ্টেন নুনোভাস পেরেরা (Nuno Vaz Pereira) এর সাথে চলে আসেন মোজাম্বিক উপকূলে। এই সময় মোজাম্বিকে পর্তুগীজদের একটি বাণিজ্য ঘাটি স্থাপিত হয়েছিলো।

কিন্তু দু'বছর পরে ১৫০৮ সালে বিখ্যাত ডিউ (Diu) যুদ্ধে অংশে গ্রহণের জন্য



www.nagorikpathagar.org

আবার ভারতে আসতে হয় তাকে। ভারত মহাসাগরে অনুষ্ঠিত এই নৌযুদ্ধে তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন এবং বলতে গেলে তার কৃতিত্ব ও দক্ষতার কারণেই ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ হয়। তিনি ভারতের কোচিন বন্দর দখল করে পর্তুগীজদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

তারপর সেখান থেকে তিনি যাত্রা করেন মশলার দীপ নামে খ্যাত মূলাক্কা দ্বীপে। এরপর তিনি ভারতের গোয়া (Goa) বন্দর অধিকার যুদ্ধেও অংশ নেন এবং যুদ্ধে জয়লাভকরেন।

ভারতের পশ্চিম উপকূল এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখলে আসার পর গোটা ভারত মহাসাগরেই পুর্তুগীজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাফ্যল্যে ম্যাগেলানের কৃতিত্বই ছিলো বেশি।

www.nagorikpathagar.org

১৫১২ সলে ম্যাগেলান ভারত মহাসাগর থেকে স্বদেশে লিসবনে ফিরে আসেন। পরে তিনি মরোক্কর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিপুল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মরোক্কর শক্ত ঘাঁটি আজামোর (Azamor) দখল করেন।

এটা ছিলো ম্যাগেলানের জীবনের একটি বড় ধরনের বিজয় এবং গোটা পর্তুগীজ জাতির জন্যও গৌরবের ব্যাপার।

তিনি যুদ্ধ জয় করে ১৫১৪ সালের নভেম্বর মাসে রাজধানী লিসবনে ফিরে আসেন। যেহেতু এই মরোক্কোর আজামোর দখল তাঁর জন্য ছিলো একটি মস্ত বড় কৃতিত্ব, তাই এই কৃতিত্বের জন্য তিনি পর্তুগীজরাজ ম্যানুয়েলের কাছে একটি পদোন্নতির আবেদন করেন।

কিন্তু সেনাবাহিনীতে তাঁর ছিলো অনেক প্রতিপক্ষ। ম্যাগেলানের কৃতিত্ব অনেকের কাছেই ছিলো ঈর্ষার কারণ। তাই ম্যাগেলান রাজার সুনজরে পড়ুক বা পদোন্নতি লাভ করুক এটা অনেকেই চাইতো না। তাই তারাও লেগে গেলো তাঁর পেছনে। তারাও ম্যাগেলানের বিরুদ্ধে নানা কুকথা বলে রাজার কান ভারী করে তুলতে লাগলো।

শত্রুরা এই বলে রাজার মন নষ্ট করতে লাগলো যে ম্যাগেলানের জন্য যদিও আজামোর দখল হয়েছে কিন্তু তাঁর জন্যই পর্তুগীজদের সৈন্য ও জানমালের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ম্যাগেলান শত্রুপক্ষের সাথে যোগ সাজোশ করেই এই ক্ষতি করেছেন।

রাজা এই অপপ্রচারের সত্যতা যাচাই না করেই ম্যাগেলানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে ফেললেন। ম্যাগেলানকে প্রমোশন তো দেয়াই হলো না বরং পুনরায় তাকে আবার উল্টো মরোক্কতে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো।

ম্যাগেলান রাজার এই অন্যায় আদেশে যারপর নেই মর্মাহত হলেন। তিনি মরোক্কতে ফিরে যেতে অস্বীকার করে বসলেন। এতে ফল আরোও উল্টো দাঁড়ালো। রাজা ম্যাগেলানের প্রতি ক্ষেপে গেলেন।

রাজা তখন এই মর্মে আদেশ দিলেন--হয় ম্যাগেলান মরোক্কোতে ফিরে যাবেন আর নইলে দেশ ত্যাগ করে যে কোনখানে চলে যেতে পারেন।

ম্যাগেলান তখন দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলেন। তিনি পর্তুগীজ সরকারের চাকরী ছেড়ে চলে এলেন স্পেনে। ম্যাগেলান পর্তুগীজ ছেড়ে স্পেনে আসেন ১৫১৭ সালের ২০শে অক্টোবরতারিখে।

ম্যাগেলান স্পেনে এসে প্রথমে রুই ফলেরো (Rui Faliero) নামে এক লোকের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই ফলেরো নিজেও ছিলেন পর্তুগীজ। তিনিও বছর খানের আগে ভাগ্যের অন্বেষণে স্বদেশ ছেড়ে স্পেনে এসেছিলেন। তারপর ম্যাগেলানকে পেয়ে তিনিও খুশী হলেন।

তারপর তাঁরা দুজনেই স্পেনে ভাল্লাডোলিড (Valla dolid) কোর্টে গিয়ে স্থায়ীভাবে স্পেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। ম্যাগেলান শুধু নাগরিকত্বই নিলেন না,



www.nagorikpathagar.org

নিজের নামটাও পাল্টে ফেললেন। তিনি নিজের পর্তুগীজ নাম সংশোধন করে রাখলেন ফার্ডিনান্ড ডি ম্যাগেলান।

এরপর তাঁরা দুজনেই স্পেনের রাজা প্রথম চার্লস পরে (সম্রাট পঞ্চম চার্লস )এর কাছে গিয়ে চাকরী গ্রহণ করলেন।

## ম্যাগেলানের সমুদ্র যাত্রা

এই সময় স্পেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো প্রর্তুগাল। ইউরোপের এই দুটো দেশই সারা বিশ্বজুড়ে সাগরে মহাসাগরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে বেড়াতো।এদের পালতোলা জাহাজগুলো রাজহাঁসের গরিমায় ভেসে বেড়াতো সাগর জলে।

কিন্তু এই দুটো দেশের কেউ কাউকে দেখতে পারতো না। মুখোমুখী হলেই সংঘর্ষ বেধে যেতো। সর্বক্ষণ প্রতিযোগিতা চলতো কে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে যাবার জল পথ আবিষ্কার করেছেন। যেহেতু এটা পর্তুগীজরা আবিষ্কার করেছে তাই তাদের দাবী হলো- এ পথের একছত্র মালিক তারাই। এ পথে অন্য কেউ আসতে পারবে না।

স্পেনের কোন জাহাজকে তারা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসতে দিতে রাজী নয়।

স্পেনের রাজা তখন চিন্তা করতে লাগলেন কি করে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। উত্তমাশা অন্তরীপ ছাড়া আর কি কোনো পথ নেই ভারতে যাবার?

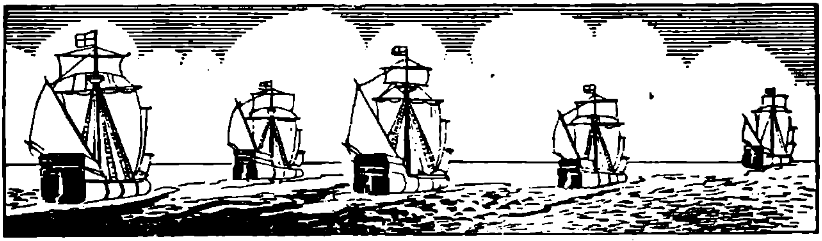

তখনই এগিয়ে এলেন ম্যাগেলান। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করলেন এর একটি বিকল্প পথ বের করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

-কিন্তু কি ভাবে?

তিনি বললেন, আমরা সোজা পশ্চিম দিকে রওয়ানা দিয়েই একদিন দূরপ্রাচ্যের মশলার দেশে গিয়ে পৌছাতে পারবো।



www.nagorikpathagar.org

-কিভাবে সম্ভব?

-যেহেতু পৃথিবী গোলাকার, তাই অবশ্যই আমরা পশ্চিম দিকে যেতে যেতে এক সময়ে আবার পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে পারবো।

ম্যাগেলানের অনুমান হয়তো ঠিক। কিন্তু এর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো অন্য একটি সমস্যা।

তখনোও সকলের ধারণা ছিলো কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে যে বিশাল দেশটি আবিষ্কার করেছেন সেই আমেরিকা নাকি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে জলপথে যাবার কোনো পথ নেই।

যদি তা না থাকে তবে সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে ভারতে পৌছানো যাবে কেমন করে?

ম্যাগেলান বললেন, আটলান্টিক মহাসগর থেকে আমেরিকা পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করার কোনো জলপথ আছে কিনা এটাই আমরা দেখতে চাই।

অবশেষে ১৫১৮ সালের ২২শে মার্চ ম্যাগেলানের প্রস্তাব রাজ দরবারে গৃহীত হলো। সিদ্ধান্ত হলো-ম্যাগেলান এবং ফলেরার যৌথ নেতৃত্বে একটি স্পেনীয় নৌবহর পাঠানো হবে। তারা স্পেন থেকে দূর প্রাচ্যের মসলার দেশ মোলাক্কাস যাবার পথের অনুসন্ধান করবেন। রাজার সাথে তাদের এই মর্মে চুক্তি হলো যেনো পথে যেতে যেতে তারা যদি কোনো দ্বীপের বা দেশের সন্ধান লাভ করেন, তবে সেই আবিষ্কৃত দেশের দায়িত্ব ভার দেয়া হবে তাদের উপর। আর এই সমুদ্র যাত্রা থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তারও শতকরা ৫ ভাগ পাবে তারা। এই সমুদ্রযাত্রার সমস্ত খরচ বহণ করবেন স্পেন সরকার।

আরও শর্ত হলো-এই সমুদ্র যাত্রায় স্পেন থেকে আটলান্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত অংশের নেতৃত্ব দেবেন ম্যাগেলোন এবং তাঁর নেতৃত্বেই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশের পথের সন্ধান হবে।

এ পথের সন্ধান পাওয়া গেলে নৌবহর ক্রমাগত পশ্চিমে অগ্রসর হতে থাকবে এবং এ ভাবে তারা পূর্বদেশে গিয়ে পৌছাবে। আবিষ্কৃত হবে উত্তোমাশা অন্তরীপ বাদে পূর্বের দেশে যাবার ভিন্ন পথ।

এই সমুদ্রযাত্রায় মোট জাহাজের সংখ্যা ছিলো ৫টি। প্রধান জাহাজ ছিলো ত্রিনিদাদ (Trinidad)। অপর চারটি হলো- সানএ্যান্টোনিও (San Antino), কনসেপসন (Concepcion), ভিক্টোরিয়া (Victoria)এবং সান্টিয়াগো (Santiago)।

এখানে আরো একটি মজার ব্যাপার ছিলো। এই সমুদ্রযাত্রায় যদিও ম্যাগেলানের সাথে যৌথ নেতৃত্বে যাবার কথা ছিলো ফলেরার, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফলেরা এই অভিযানেই যেতে পারেননি শেষ পর্যন্ত।

যাত্রার কিছু দিন আগেই সহসা তিনি আক্রান্ত হন এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে। তাই অসুস্থতার কারণেই তাকে অভিযানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। তখন বাধ্য হয়েই



www.nagorikpathagar.org

অভিযানের একক নায়ক নির্বাচিত হন ম্যাগেলান নিজেই। এই অভিযানে তাঁর সহযোগী নাবিকের সংখ্যা ছিলো ২৭০ জন।

এরপর ১৫১৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি স্ত্রী বিয়েত্রিস বারবোসা (Beatriz Barbosa) এবং একমাত্র নাবালক পুত্র রড্রিগোর (Rodrigo) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন অভিযানে।

ম্যাগেলানের নৌবহর ২৬শে সেপ্টেম্বর এসে পৌছে টেনারী দ্বীপপুঞ্জে। ৩রা অক্টোবর (১৫১৯ ) এসে পৌছে ব্রাজিল উপকূলে। সেখান থেকে গিয়েনা উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমের অগাস্টিন অন্তরীপে উপনীত হন ২৯শে নভেম্বর। এরপর তিনি রিওডি জিনেরো (Rio de Jenero) উপসাগরে প্রবেশ করেন ১৩ই নভেম্বর।

এরপর তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্ব উপকূল থেকে অগ্রসর হতে থাকেন আরো দক্ষিণে। প্রবেশ করেন রিও ডি লা প্লাট(Rio de La Plate) নদীর মোহনায়।

এখানে এসেই ম্যাগেলানের ধারণা হয়েছিলো হয়তো এখান দিয়েই তিনি পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে বের হবার পথ পাবেন। তিনি কিন্তু মোহনা ধরে কিছু দূর এগিয়ে গিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। দেখলেন এটা কোন প্রণালী নয়। এটি আসলে একটি নদীরমোহনা।

অতঃপর তিনি পিছিয়ে এসে আবার চলতে লাগলেন দক্ষিণ দিকে এবং এভাবে তিনি ৩১শে মার্চ তারিখ সেন্ট জুলিয়ান (St julian) বন্দরে এসে পৌছালেন। এটা ছিলো প্রায় ৪৯·২০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ।

এখানে তাকে একটি বড় বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। তাঁর জাহাজে দেখা দিলো নাবিক বিদ্রোহ। দু'জন স্পেনীয় ক্যাপটেনের নেতৃত্বে শুরু হয় এই বিদ্রোহ।

আসলে জাহাজের সব নাবিকই ছিলো স্পেনীয়। কিন্তু তাদের ক্যাপ্টেন জাতে পর্তুগীজ, যদিও তিনি পরে স্পেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবুতো তিনি জন্মগত সূত্রে পর্তুগীজ। আর পর্তুগীজরা হলো স্পেনীয়দের শত্রু। নাবিকরা তাই শত্রুর দেশের ক্যাপ্টেনের অধীনে সমুদ্রযাত্রায় যেতে রাজী নয়।

বিদ্রোহী ক্যাপ্টেনদ্বয় সাধারণ নাবিকদের এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো যে, ম্যাগেলান হলো শত্রুর দেশের গুপ্তচর। নিশ্চয়ই তিনি জাহাজ নিয়ে পুর্তুগীজদের হাতে ধরিয়ে দেবেন। জাহাজের সব নাবিকদের হত্যা করা হবে।

জাহাজের সাধারণ নাবিকের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিভ্রান্ত হলো অপপ্রচারে। গড়ে উঠলো তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।

অবশ্য তিনিও ছিলেন খুব দৃঢ়চেতা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রথমে অপপ্রচারের বিভ্রান্ত সাধারণ নাবিকদের বুঝালেন। তাদের যে কুমতলবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তা ধরিয়ে দিলেন। নাবিকদের প্রায় সবাই শ্রদ্ধা করতো ক্যাপ্টেন ম্যাগেলানকে। যারা সাময়িক বিভ্রান্ত হয়েছিলো তাদের এবার ভুল ভাঙলো।



www.nagorikpathagar.org

ম্যাগেলান নাবিকদের ভুল ভাঙিয়ে দিয়েই মুখোমুখি দাঁড়ালেন সকল ষড়যন্ত্রের হোতা দু'জন সহাকারী ক্যাপ্টেনের।

একজনের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো ম্যাগেলানকে। তিনিওতো ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। সুতরাং তাকে কাবু করতে বেগ পেতে হলো না। একজন ম্যাগেলানের তরবারির আঘাতে সেখানেই প্রাণ দিলো

আর একজনকে অবশ্য প্রাণে মারা হলো না, তাকে নামিয়ে দেয়া হলো সাগর তীরে। সেন্ট জুলিয়ান বন্দরের দক্ষিণের এক জঙ্গলে নামিয়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো



www.nagorikpathagar.org

নিজের ভাগ্যের উপর। লোকটি আপাতঃ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে ঢুকলো গিয়ে পাশের গভীর অরণ্যে। তারপর তার ভাগ্যে কি হয়েছিলো, কেউ তার খবর জানে না।

ম্যাগেলানের নৌবহরে এই দূঃখজনক নাবিক বিদ্রোহ হয়েছিলো সেন্ট জুলিয়ান বন্দরের কাছাকাছি থাকার সময় ১৫২০ সালের ২৪শে আগষ্ট। সেন্ট জুলিয়ান থেকে আরো কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হয়েই সান্টা ক্রুজ (Santa Cruz) এর কাছাকাছি আসতে তাঁর নৌবহরে ঘটে আরও একটি দূর্ঘটনা।

তাঁর নৌবহরের ৫টি জাহাজের অন্যতম সান্টিয়াগো জাহাজটি আগে থেকেই খারাপ ছিলো। এবার আরো ভেঙে পড়লো। ম্যাগেলান জাহাজটি মেরামত করার অবশ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারা গেলো না। অতঃপর এটিকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

ম্যাগেলান তাঁর নৌবহর নিয়ে দক্ষিণ সাগরে (Sea of the South) প্রবেশ করলেন ২৮শে নবেম্বর (১৫২০)। তারপর তিনি এই সাগর ধরেই সোজা চলতে লাগলেন পশ্চিম দিকে। আর তারপই এলো তাঁর চরম সাফল্য।

ম্যাগেলানসহ জাহাজের সব নাবিক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা একটি সংকীর্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করেছে বিশাল সাগরে অর্থাৎ কাঙ্খিত প্রশান্ত মহাসাগরে।

তাহলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করার পথ তিনি সত্যি সত্যিই আবিস্কার করে ফেলেছেন? তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে? আনন্দে তিনিতো শিশুর মতো লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর এতো পরিশ্রম আর সাধনা সফল হলো?

ম্যাগেলান যে প্রণালী পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে বের হয়ে এলেন পরবর্তী সময়ে এই প্রণালীরই নাম রাখা হয় ম্যাগেলান প্রণালী। তাঁর নামেই রাখা হয় নাম।

এই প্রণালী আবিস্কার করেই ম্যাগেলান প্রমাণ করলেন যে আমেরিকা দক্ষিণ মেরু বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। মাঝ দিয়ে ফাঁক আছে।

ম্যাগেলান প্রণালী পার হওয়ার সময়েই কিন্তু তাঁর তৃতীয় আরো একটি দূর্ঘটনা ঘটে।

কিছুদিন আগেই তাঁর একটি জাহাজ ভেঙে পড়েছিলো। ম্যাগেলান প্রণালীতে ঢুকে তাঁর আরো একটি মালবাহী জাহাজ সান এ্যান্টোনিও ভেঙে পড়লো। অতঃপর সেটিকেও পরিত্যাগ করতে হলো। তিনি যখন ২৮শে নভেম্বর (১৫২০) প্রশান্ত মহাসাগরে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর সাথে মাত্র তিনটি জাহাজ আছে। ত্রিনিদাদ, কনসেপসন এবং ভেক্টোরিয়া।

এই তিনটি জাহাজ নিয়েই তিনি শুরু করলেন তাঁর অভিযান, দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে বের হবার পথের অনুসন্ধান করা। সেটা তিনি পেয়ে গেছেন। এবার তাঁকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পৌছোতে হবে পূর্বভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের মোলাক্কাস মশলার দ্বীপে।



www.nagorikpathagar.org

ম্যাগেলান ২৮শে নভেম্বর প্রবেশ করেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে। তারপর ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি চিলির উপকূল ধরেই অগ্রসর হতে লাগলেন উত্তর দিকে। এরপর তিনি জাহাজের মুখ ঘোরালেন উত্তর পশ্চিম দিকে।

এবার তিনি পাড়ি ধরলেন প্রশান্ত মহাসাগরে। পাড়ি দিতে হবে বিশ্বের বৃহত্তম জলধি। ম্যাগেলানই প্রথম মানুষ যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ ভাসিয়েছেন এবং তাকে জয়ও করেছেন।

ম্যাগেলানের আগে আর কেউ আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্বের সাগরে যেতে পারেনি।

ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ম্যাগেলানের তিনটি জাহাজের নৌবহর। সেকি সহজ পথ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেছে, কিন্তু পথ আর শেষ হয়না। চোখে কোনো ডাঙা ভূমিও পড়ে না। চারিদিকে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত জল আর জল।

এদিকে ম্যাগেলানের খাবার ক্রমেই ফুরিয়ে আসতে লাগলো। এই অনন্ত বিস্তৃত সাগরে খাবার সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? যা দু চারটা সামুদ্রিক মাছ ধরা পড়ে, তাওতো অতি সামান্য। তাতেই কি আর এতো- গুলো মানুষের ক্ষুধা মেটে। তাই চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলো জাহাজে। নাবিকরা অনাহারে কাটাতে লাগলো দিনের পর দিন।

ম্যাগেলানের লিখিত কাহিনী থেকে জানা যায় এই সময় তারা এমন খাদ্য সংকটে পড়েছিলেন যে, তা বলার মতো নয়। অনাহারে এক একজনা করে মরতে লাগলো নাবিক। যারা তখনোও বেঁচে আছে তারাও অত্যন্ত দুর্বল। তারা এই সময় পেটের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করার জন্য পায়ের জুতো পর্যন্ত সিদ্ধ করে খেয়েছে।

এভাবেই তাদের কাটতে লাগলো দিন। জাহাজ তখনও এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। অবশেষে ১৫২১ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারা অনন্ত বিশাল প্রশান্ত সাগরের বুকে একটা দ্বীপের সন্ধান পেলেন।

দীর্ঘদিন পর এই প্রথম তারা একটি ডাঙা ভূমির সন্ধান পেলেন।

ম্যাগেলান এই প্রথম যে ডাঙাভূমিটির দেখা পেলেন এটি ছিলো সম্ভবত পূর্ব প্রশান্ত মাহাসাগরের টোয়ামোটো আরসিপেলাগো (Tuamotu Archipelago) অঞ্চলের পোকা পোকা (Puka Puka ) নামে একটি দ্বীপ। এটি ছিলো বিষুবরেখা অঞ্চলের প্রায় ১৫৮° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ বরাবর।

৬ই মার্চ তারিখে সর্ব প্রথম দেখা পেলেন লোকালয়পূর্ণ ডাঙা ভূমির। এটি ছিলো মারিয়ানা (Mariana) অঞ্চলের গুয়ান (Guan) দ্বীপ।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে যাত্রা করার দীর্ঘ ৯৯ দিন পর তারা দ্বীপে নেমে টাটকা খাবার খেতে পারলেন। তারা যেনো মৃত্যুর গুহা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে পেলেন নিজেরপ্রাণ।

এখান থেকে তিনি গমন করেন মোলাক্কা মশলার দ্বীপে। এই মশলার দ্বীপে আগমন তাঁর অবশ্য এটাই প্রথম নয়।



www.nagorikpathagar.org

প্রথম জীবনে তিনি যখন সেনাবাহিনীর সাথে ভারতে এসেছিলেন তখনোও একবার এসে ছিলেন এই মশলার দেশে। আবার এলেন বহুদিন পর।

তাঁর অনেক জায়গাই চেনা জানা ছিলো। যোগাযোগ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হলোনা।

তিনি দ্বীপে এসেই সাক্ষাৎ করলেন রাজার সাথে। তারপর তিনি রাজাকে হস্তান্তর করলেন স্পেনের রাজা প্রথম চার্লসের উপহার। মোলাক্কাসের রাজার সাথে স্পেনের স্বাক্ষরিত হলো বাণিজ্য চুক্তি।

এখন থেকে স্পেনও মোলাক্কাসের সাথে মশলার ব্যবসা করতে পারবে। রাজা খুবই সমাদরে গ্রহণ করলেন এই ভিন্‌দেশী নাবিক ম্যাগেলানকে। কিন্তু মোলাক্কাসের রাজদরবারে বেশিদিন থাকা হলো না ম্যাগেলানের। তাঁকে আবার ফিরে যেতে হবে স্বদেশে। তিনিতো এখানে অবস্থান করে বাণিজ্য করতে আসেননি।

তিনি এসেছিলেন প্রশান্ত মাহসাগর ঘুরে মশলার দেশে আসা যায় কিনা তা প্রমাণ করার জন্য। সে প্রমাণ তাঁর হয়ে গেছে। তাঁর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা সফল হয়েছে। যে পথের সন্ধানে রাজা তাঁকে পাঠিয়েছেন, তা তিনি পেয়ে গেছেন।

এই শুভ সংবাদটা তাঁকে তাড়াতাড়ি পৌছে দিতে হবে স্পেনের রাজদরবারে। তবেই না তাঁর দায়িত্ব শেষ।

কিন্তু স্পেনে পৌছাতে হলে তখনো তাঁকে পাড়ি দিতে হবে আরো অনেক পথ। আরো তাঁকে পার হতে হবে দুই দুটো মহাসাগর। ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর। তাই হিসেব মতো তাঁকে আরও অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

তাই আর বিলম্ব নয়। যাত্রা বিরতি করলে তাঁর চলবে না। তাঁকে আবার জাহাজে পাল তুলে দিতে হবে।

তিনি ৯ই মার্চ তারিখে (১৫২১) মুলাক্কা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন পশ্চিম দিকে। এবার তাকে প্রথমে পাড়ি দিতে হবে ভারত মহাসাগর।

তিনি মুল্লাক্কা থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে আবার কতগুলো দ্বীপের দেখা পেলেন। এটাই পরবর্তী কালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত হয়েছিলো।

এই ফিলিপাইনের মেসাভা দ্বীপে (Massava) এসেও তিনি এক স্থানীয় রাজার সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। তারপর তিনি আসেন সেবু নামে (Cebu); একটি দ্বীপে। তিনি এই দ্বীপের রাজাকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর সাথেও হয় স্পেনের বাণিজ্য চুক্তি। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে ম্যাকটন (Macton) নামে একটি দ্বীপে এসে। এই দ্বীপের আদিবাসীরা ছিলো হিংস্র এবং অসভ্য বর্বর। তারা বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখতো।

ম্যাগেলান অনেক চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারলেন না যে তারা এখানে এসেছে মিত্রতা করতে। তাদেরকে জানতে। তাদের সাথে বাণিজ্য করতে। স্থানীয়দের ক্ষতি তাদের উদ্দেশ্য নয়।



www.nagorikpathagar.org

আদিবাসীরা সোজা এসে আক্রমণ করে বসলো তাদের জাহাজ। এই আক্রমণে ম্যাকটন দ্বীপের আদিবাসীদের হাতেই প্রাণ দিতে হলো ম্যাগেলানকে।

তিনি মারা যান ১৫২১ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে।

উপজাতীয়দের সাথে সংঘর্ষ শুধু ম্যাগেলানই নিহত হলেন না। তাদের আরো বড় ধরনের ক্ষতি হলো। তাদের একটি জাহাজও উপজাতীয়রা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলো। এই সংঘর্ষে ম্যাগেলানের কনসেপসন জাহাজটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার প্রায় শ'খানেক নাবিকও নিহত হয় এই সংঘর্ষে।

এই চরম বিপর্যয়ের পর ক্যাপটেন বিহীন হয়ে ম্যাগেলান নৌবহর প্রথমে খুব মুষড়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, যেমন ভাবেই হোক তাদের তো দেশে ফিরতে হবে। যাত্রার শেষ পর্যন্ত তাদের পৌঁছাতে হবে।

ম্যাগেলানের অধীনে এই সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কনসেপসন জাহাজের ক্যাপটেন ছিলেন জোহান সেবেষ্টিয়ান ডি ইলক্যানো (Juan Sebastian de Elcano)। তিনিই শেষে এই নৌবহরের পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। ইলক্যানো হলেন ক্যাপটেন।

এই ইলক্যানোর একটি পূর্ব পরিচয়ও আছে। আসার পথে সেন্টজুলিয়ান বন্দরের কাছে ম্যাগেলানের বিরুদ্ধে যে নাবিক বিদ্রোহ হয়েছিলো, এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের সাথে ইলক্যানো নিজেও জড়িত ছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় ম্যাগেলান তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এই ইলক্যানো এবার নিজেই হলেন জাহাজের ক্যাপটেন। এখন আরতো ম্যাগেলান নেই, কিন্তু তাঁর প্রতি চাপা ক্ষোভ তার তখনো ছিলো। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেইতো নিহত।

যাই হোক ম্যাগেলানের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হলো মোলাক্কাস দ্বীপে। এই মিত্র দেশেই তাকে করা হলো সমাধিস্থ।

তারপর ইলক্যানো যাত্রা করলেন স্বদেশের পথে। তবে যাওয়ার আগে তিনি আরোও একটি জাহাজকে এখানে পরিত্যাগ করলেন।এখানে কিছু নাবিককেও নামিয়ে দেয়া হলো। যদিও এই দীর্ঘ যাত্রায় নানা অসুখে বিসুখে অনাহারে এবং বিদ্রোহে মারা পড়েছিলো বেশীর ভাগ নাবিক। ২৭০ জনের মধ্যে তখন জীবিত ছিলো মাত্র এক শতের মতো।

ইলক্যানো এই একশ জনের মধ্য থেকেও অর্ধেক নামিয়ে দিলেন এই মোল্লাকাস দ্বীপে। এরা আপাতত এই দ্বীপেই অবস্থান করবে। অবশ্য তাদের জন্য একটি জাহাজও রেখে যাওয়া হলো। পরিত্যক্ত নাবিকদের জন্য ত্রিনিদাদ জাহাজটিও ছেড়ে দেয়া হলো।

শুধু ৮৫ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিক্টোরিয়া জাহাজটি নিয়ে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন ইলক্যানো।

ইলক্যানো স্বদশে ফিরে আসেন ১৫২২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

এই সময় তাঁর সাথে নাবিক ছিলো মাত্র ২১ জন। অবশ্য এর মধ্যেও আবার ৪ জন



www.nagorikpathagar.org

ছিলো পূর্বদেশের স্থানীয় আদিবাসী।

এই সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিলেন ম্যাগেলান আর শেষ করলেন ইলক্যানো। কিন্তু স্পেনের সম্রাটের কাছে ইলক্যানোই নিজেকে সব কৃতিত্বের দাবীদার বলে আবেদন করলেন। তার যুক্তি ছিলো ম্যাগেলানতো অর্ধপথেই মারা গেছেন এবং সমুদ্র যাত্রা তিনিই শেষ করেছেন। তাই কৃতিত্ব তারই।

অতঃপর স্পেনের রাজাও তাই মেনে নিলেন। তিনি ইলক্যানোকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা দিলেন। তাঁর বাহুতেই বেঁধে দিলেন বিজয় পদক। গ্লোব অঙ্কিত যে স্বর্ণ পদকে লেখা ছিলো (Primus Circumdedisti me) যার সরল ইংরেজী হলো " You were the first to encircle me" -তুমিই প্রথম যে আমাকে বন্ধনকরেছো।)

ইলক্যানোর হাতে সম্রাট পদক তুলে দিলেও পরবর্তী কালে ইতিহাস কিন্তু ম্যাগেলানকেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

ম্যাগেলানকেই প্রথম ভূ-প্রদক্ষিণকারী বলে গ্যা করা হয়। কারণ তিনি ফিরে না আসতে পারলেও তার জাহাজ ভিক্টোরিয়া ফিরে এসে ছিলো। ভিক্টোরিয়া তারই পরিচালিত জাহাজ। এদিক দিয়ে বিচার করলে পদকের প্রকৃত দাবিদার তিনিই।

ইলক্যানো ফেরৎ আসার সময় ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামার পথেই স্পেনে ফিরে এসেছিলেন। আর এভাবেই প্রমাণিত হয়ে ছিলো একটি ভৌগোলিক সত্য। পৃথিবী যে গোল এটা এতো দিন অনুমান ছিলো মাত্র। ছিলো জ্যোতির্বিদদের অংকের ফল। এবার তা হাতেনাতে প্রমাণিত হলো।

## হেনরী হাডসনের অভিযান

ভারত তথা দূর প্রাচ্যে আসার জলপথ আবিষ্কারের জন্য আরো যে ব্যক্তিটি বিলেয়ে দিয়েছিলেন নিজের জীবন, তিনি হলেন হেনরী হাডসন। (Henry Hadson-1550-1611)তিনিও একদিন অভিযানে বের হয়েছিলেন উত্তর মেরু পার হয়ে এশিয়ায় পৌছোনোর পথ খোঁজার জন্য।

তাঁর ধরণা ছিলো বেরিং প্রণালী দিয়ে উত্তর মেরু পার হতে পারলেই এশিয়া মহাদেশ পাওয়া যাবে।

যে সময়ের কথা তখন উত্তর মেরুর দিকে যাবার কথা কল্পনাও করা যেতো না। এতো উত্তরে তখনো কেউ পৌছোতে পারেননি। মেরু অঞ্চল নিয়ে সেকালের মানুষের মনে ছিলো নানা রকম কুসংস্কার আর ভীতিজনক আজগুবী সব গল্প কাহিনী। সেকালের লোকের ধারণা ছিলো উত্তর মেরু অঞ্চলে কোনো মনুষ্য বসতি নেই। সেখানে থাকে সব দৈত্যআরদানবেরা।

সেখানকার সাগরে আছে মৎস্যকুমারী।সেই মায়াবী মৎস্যকুমারীর হাতে পড়লে আররক্ষে নেই।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এতো সব ভীতিজনক কাহিনী শুনেও ভয় পেলেন না হাডসন। তাঁর ছিলো অভিযানেরনেশা।

কিছুদিন আগে ভাস্কো-ডা -গামা আবিষ্কার করেছেন জলপথে ভারতে পৌঁছানোর পথ। সে হলো দক্ষিণের পথ। সে পথে যেতে হয় আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে। ঝন্‌ঝা বিক্ষুব্ধ অন্তরীপ পার হয়ে।

কিন্ত হাডসন চাইছিলেন বেরিং প্রণালী দিয়ে অনুরুপ এবং নিরাপদ কোনো পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি একদিন একটি পুরানো পালতোলা জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

এই অভিযানে তার সাথে ছিলো তাঁর বালক পুত্র জন। বাপের কাছে অভিযানের রোমাঞ্চকর আর মজার মজার গল্প শুনে তারও মাথায় চেপে গিয়েছিলো অভিযানের নেশা।

যতোই তাঁর জাহাজ উত্তর দিকে এগুতে লাগলো ততই বাধা আসতে লাগলো একটার পর একটা। ক্রমে গিয়ে তাঁর জাহাজ ঢুকলো সীমাহীন বরফের রাজ্যে। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ।

হাডসন এই বড় বড় বরফের চাঁই পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর বরফের চাঁই আরও ঘন হয়ে আসতে লাগলো।

এক সময় অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে আর কোনো মতেই জাহাজ নিয়ে এগুনো সম্ভব হলো না। জাহাজ চালানো তখন একেবারেই অসাধ্য হয়ে উঠলো।

হাডসন বুঝলেন আর এগুনো যাবে না। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে এভাবে উত্তর মেরু পাড়ি দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তিনি আগে যা ভেবেছিলেন তা হয়তো ভুল।

অগত্যা তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হলো সেবারের মতো। কিন্তু তিনি দমলেন না।

তিনি ভাবতে লাগলেন--সোজা উত্তর মেরুর মধ্য দিয়ে হয়তো যাবার কোনো পথ নেই। কিন্তু মেরু অঞ্চলের ডানে কিংবা বামে ঘুরে কোনো পথ আছে কিনা তাতো খুঁজে দেখা হলো না। হয়তো এমন একটা পথ মিলতেও পারে।

তিনি ভুল করেছেন- এতদূর গিয়েও কোন কিছু ভালোভাবে না দেখেই তিনি ফিরে এসেছেন, এটা তার ঠিক হয়নি।

তাই আবার যেতে হবে। অভিযান তাঁকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

তাই আবার চললো প্রস্তুতি।

আবার তাকে যেতে হবে অভিযানে। তাঁকে ব্যর্থ হলে চলবে না। সাত আট মাস ধরেই চললো তাঁর এই প্রস্তুতিপর্ব। তারপর সব আয়োজন শেষ করে জাহাজ নিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর সাথে সংগী হয়ে গেলেন মোট ১৩ জন।

চলতে চলতে আবার তিনি এসে পড়লেন সেই সীমাহীন বরফের রাজ্যে। এবার আর সোজা পথেনয়।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ডানে আর বাঁয়ের পথে বেশ কিছুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করেও কোনো বেরুবার পথ পেলেন না তিনি।

বিশেষ করে বরফের চাঁইগুলো এমন করে জমাট বেঁধে আছে যে পালতোলা জাহাজ নিয়ে এগুবার কোনো উপায়ই নেই। সুতরাং এবারও তাকে ফিরতে হলো ব্যর্থ হয়ে।

দু' দু'বার ব্যর্থ হবার পরেও কিন্তু আশা ছাড়লেন না হাডসন। অভিযানের নেশা দূর হলো না তাঁর মন থেকে।

তিনি আবারো অভিযানে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এবার অবশ্য তাঁর জন্য একটি সুবিধে হলো, তাঁর এই অভিযানের বিষয়ে ওলন্দাজরা খুব আগ্রহ দেখাতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিলো হয়তো হাডসনের এই অভিযানে কোনো নতুন দেশ বা ভূখন্ড আবিষ্কৃত হয়েও যেতে পারে। আর তা যদি হয় তবে প্রচুর লাভ হবে।

তাদের উদ্যোগে অভিযান প্রেরিত হলে নতুন ভূখন্ডটির তারাই মালিক হবে। স্থাপন করাযাবেউপনিবেশ।

তাই তারাই বেশী করে উৎসাহ দিতে লাগলো হাডসনকে। ওলন্দাজরাই দুটো জাহাজ জোগাড় করে দিলেন তাঁকে।

দুটো সেকেলে পালতোলা জাহাজ। হাডসন তাঁর জাহাজ দুটোর সুন্দর সুন্দুর নাম দিলেন। একটির নাম দেওয়া হলো আশাপ্রদ (Hopeful) এবং অপরটির নাম দেয়া হলো 'অর্ধচন্দ্র '(Halfmoon)।

'অর্ধচন্দ্র'ও 'আশাপ্রদ' জাহাজ দুটো নিয়ে আবার তিনি যাত্রা করলেন অভিযানে। আবার সেই বরফের দেশের অজানা পথ।

কিন্তু এবারও তাঁর খুব সুবিধে হলো না। সঠিক পথের দিশা তিনি করতে পারলে না এবারও। কেমন যেনো সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। তিনি নিরুদ্দিষ্টভাবে এগুতে লাগলেন বরফের দেশের বিপদ সংকুল পথে। চারিদেকে শুধু বরফ আর বরফ।

এখানে কোথায় তিনি খুঁজে পাবেন পথের সন্ধান? ব্যাপার দেখে এবার তাঁর জাহাজের নাবিকরাও হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের ভয় হলো যদি এই বরফের মধ্যে জাহাজ একবার আটকে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই।

তাই নাবিকরা এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে রাজী হলেন না। তারা বসলো বেঁকে। তারা এ ধরনের পাগলামো করতে পারবে না। ঘরে ফিরে যাবে।

অতঃপর বাধ্য হয়েই হাডসনকে ফিরতে হলো। তবে তিনি পুরোপুরি ফিরে এলেন না। যারা খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়েছিল তাদেরকে একটি জাহাজ অর্থাৎ আশাপ্রদতে করে পাঠিয়ে দেয়া হলো ফেরত।

আর যাদের মনোবল তখনো শক্ত ছিলো তারা রইলো ক্যাপটেন হাডসনের সাথে। তিনি এদেরকে নিয়ে অর্ধচন্দ্র জাহাজে করে ঢুকে পড়লেন আটলান্টিক মহাসাগরে। কিন্তু



www.nagorikpathagar.org

তাতেও খুব একটা সুবিধা হলো না। তিনি প্রশান্ত মাহাসাগরে প্রবেশ করার কোন পথই পেলেননা।

তবে এই যাত্রায় তিনি গোটা কয়েক নতুন দ্বীপ এবং একটি নদী আবিষ্কার করলেন। এবারও তাঁকে অবশেষে ফিরতে হলো হতাশ হয়ে।

কিন্তু হাডসন ছিলেন অসীম ধৈর্যের অধিকারী। প্রচন্ড ছিলো তার মনোবল। এই যে বারবার পরাজয়, এই বারবার পরাজয়ের পরও তাঁর মনের উৎসাহ কমলো না। তিনি নিরুৎসাহ হলেন না।

তিনি বলতে লাগলেন, আমি একটি মাত্র জিনিস চাই, কিন্তু অন্য একটি জিনিস কখনওচাইনা।

বন্ধুরা শুধালেন,- তোমার চাওয়ার জিনিসটি কি?

হাডসন হেসে বললেন,-এর একটি হলো সাফল্য অথবা মৃত্যু।

-আর না চাওয়া বস্তুটি কি ?

-ব্যর্থতা। ব্যর্থতাক আমি কখনো চাইনা। এ শব্দটা আমার নামের সাথে জড়িয়ে থাকুক এটা আমি কখনও চাইনা। কখনো না।

অতঃপর তাই হলো। যে উত্তর মেরু অভিযানে তিনি বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছেন, আবারো তিনি সেই অভিযানে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। সফল তাঁকে হতেইহবে।

এবারও তিনি দুটো জাহাজ আর জনাকুড়ি লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে। এবারও তাঁর ছেলে জন সাথী হলো পিতার।

যেমন পিতা তেমনি ছেলে। বাপের নেশা পেয়ে বসেছে ছেলেকেও।

এবার তাকে যেমন করেই হোক প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করতেই হবে। তার পর খুঁজে বের করতে হবে এশিয়ায় যাবার পথ।

অভিযানের প্রথম কয়েক দিন তাদের ভালোই কাটলো। তারপর তাদের জাহাজ এক সময়ে গিয়ে প্রবেশ করলে বরফের রাজ্যে।

এবার কিন্তু হাডসন সাহেব একেবারে প্রতিজ্ঞা করেই ঘর ছেড়ে ছিলেন। হয় সফলতা, না হয় মৃত্য। কিছুতেই তিনি পিছু হটতে রাজী নন।

এমনি করে বরফ কেটে কেটে চলতে চলতে জাহাজ একসময় এসে পড়লো খোলাসমুদ্রে।

এই খোলা সমুদ্র দেখে হাডসনের মন তো আনন্দে উঠলো নেচে। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। এবার তাহলে এশিয়া যাওয়ার পথ পাওয়া যাবে।

কিন্তু হাডসন দ'চারদিন পরেই নিজের ভূল বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তিনি যে খোলা সাগরে প্রবেশ করেছেন এটা প্রশান্ত মহাসাগর নয়। এটা অজানা কোন সাগর।



www.nagorikpathagar.org

তিনি যে খোলা সাগরে প্রবেশ করেছিলেন ওটা ছিলো আসলে একটি উপসাগর। এটা হাডসনেরই আবিষ্কার। তাই পরবর্তী সময় এই উপসাগরের নাম রাখা হয়েছে হাডসনউপসাগর।

যা হোক হাডসন তো এই উপসাগরকে চষে বেড়াতে লাগলেন,তিন মাস ধরে অনবরত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন এই খোলা সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু কোনো পথই তিনি বের করতে পারলেন না। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। যেমন করেই হোক পথ একটা তাকে খুঁজে পেতেই হবে। তখন তিনি যেনো মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

এদিকে তিনি যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছেন পথ খোঁজার জন্য, তেমনি তার জাহাজের নাবিকরা হয়ে উঠেছে অধৈর্য। তারা আর ক্যাপ্টেনের পাগলামির সাথী হতে রাজী নয়।

নাবিকরা ভাবলো ক্যাপ্টেন হাডসন হয়তো সত্যি সত্যি পাগল আর তাদের পাগলামোর জন্য এবার জীবন যেতে বসেছে তাদেরও।

এই অভিযাত্রীদের মধ্যে সবাই যে হাডসনের মতো অভিযানের নেশায় পাগল ছিলেন,তা নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন পেটের দায়ে চাকরী করতে, কেউ এসেছিলেন সখে। তাদের কাছে মনে হয়েছিলো অভিযানটি বুঝি সত্যি খুব সখের। আর কেউ ছিলেন যারা এসেছিলেন নাম কিনতে। যদি ক্যাপ্টেন হাডসন বিশ্বকাঁপানো একটা কিছু আবিষ্কার করেই ফেলতে পারেন, তাহলে তার সহকারী হিসেবে তাদের নামও লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু তারা এখন দেখলেন এ যে সখের খেলা বা নামের খেলা নয় অতপর সেখানেই আটকে থাকতে হলো তাদেরকে।

এযে বেঘোরে প্রাণ যেতে বসেছে। এমনটাতো তারা আশা করেনি। তা হলে কি হাডসনের জন্য তাদের জীবন যাবে?

নাবিকদের মধ্যে একটি লোক ছিলো বেশি বেয়াড়া। নাম গ্রীন। এই গ্রীনও ইচ্ছে করেই হাডসনের সাথে এসেছিলো যেচে সেধে। ইচ্ছে ছিলো এমন একটি রোমাঞ্চকর অভিযান করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন সে দেখলো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। সখের অভিযান করতে এসে যেতে বসেছেনিজেরজীবন।

তাই সে নিজেই জাহাজের নাবিকদের নিয়ে দল পাকাতে শুরু করলো। একদিন তো স্বয়ং হাডসনের সাথেও হয়ে গেলো তুমুল বাকবিতণ্ডা।

গ্রীন বললে,-ক্যাপটেন, এবার আমরা দেশে ফিররো।

-কেনো?

-কারণ এমন মৃতের দেশে এমন দিশে-হারার মতো আমরা দিনের পর দিন ঘুরতেপারিনে।



www.nagorikpathagar.org

–কিন্তু যতক্ষণ আমরা লক্ষ্য–স্থল খুঁজে না পাই ততো–দিন ঘুরতেই হবে।

–না, এভাবে আর আমরা অনিশ্চিত যাত্রায় অগ্রসর হতে পারিনে।

–কিন্তু ধৈর্য্য হরালে চলবে না। আমাদেরকে যে ভাবেই হোক সফল হতে হবে।

–কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার দেশে ফিরবো।

কথা শুনে এবার হাডসন নিজেও রেগে গেলেন। বললেন, দেখ গ্রীন, দেশে ফিরে যাবো কি অভিযান চলবে সে সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব আমার। আমার কথা মতোই কাজ হবে।

–কিন্তু আপনিও আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন না। আপনার খেয়ালের জন্য আমরা জীবন দিতে পারি না।

–কিন্তু তাহলে এলে কেনো আমার সাথে ? হাডসন বলতে লাগলেন– আমিতো কাউকে জোর করে আনিনি–

–কিন্তু তখনতো কথা ছিলো না যে আপনার সাথে এসে আমাদেরকে এই বিজন বিভূঁইয়ে বেঘোর প্রাণ দিতে হবে।

কবে আবার শীতকাল শেষ হবে, তখন বরফ গলে যাবে এই আশায় বসে থাকতে হবে।

হাডসনের এই ব্যবহার আরো অধৈর্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালো নাবিকদের কাছে। যদি শীতকালটা দ্বীপের ডাঙা ভূমিতে কাটাতে পারতো তাহলে অনেক খানি আরাম হতো।

কিন্তু হাডসনের একগুঁয়েমির জন্যই তা হলোনা। নাবিকরা তাই এটাকে হাডসনের নিবুর্দ্ধিতা বলে ধরে নিলো।

কিন্তু শীত এক সময় শেষ হয়ে এলো। বরফ কাটতে শুরু করলো। আবার সাগরের জল জাহাজ চলাচলের উপযোগী হলো।

কিন্তু বিপদ দেখা দিলো ভিন্ন দিক থেকে। শীতের এই সময় কোন শিকার করা সম্ভব হয়নি। জাহাজের জমানো খাদ্য খেয়েই কাটাতে হয়েছে তাদের।

জাহাজে যা খাবার ছিলো তা শীতের এই কদিনেই শেষ হয়ে গেছে। জাহাজে দেখা দিলো চরম খাদ্যের অভাব। খাদ্য শেষ হয়ে এমন অবস্থা এসে দাঁড়াল যে খাবার ঘরে শুধু গোটা কয়েক চীজের টুকরো ছাড়া আর কিছুই রইলোনা। তখন হাডসন সেই চীজের টুকরোগুলো সবার মাঝে সমান করে ভাগ করে দিলেন।

জাহাজের এই খাদ্য অভাবই শেষ পর্যন্ত বিপদ ডেকে আনলো হাডসনের জন্য। গ্রীন তাঁর পেছনে অনেক আগে থেকেই লেগেছিলো। এখন আরো মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলো সে।

খাদ্যাভাবকে কেন্দ্র করে সে জাহাজের নাবিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো হাডসনের বিরুদ্ধে। সে গোপনে একটি দল পাকাতে লাগলো।

সে এই বলে প্রচার করতে লাগলো যে ক্যাপটেন হাডসন তাদেরকে মারার জন্য চেষ্টা করছেন। এবং তাদের কিছু লোককে খাদ্য কম দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।



www.nagorikpathagar.org

তবে সবাই যে গ্রীন–এর কথায় ক্ষেপে গেলো তা নয়। জাহাজে এমন লোক ছিলো যারা সত্যিকার অর্থেই হাডসনকে ভালবাসতো এবং শ্রদ্ধা করতো।

তারা অবশ্য গ্রীনের কথায় কান দিলো না। তারা বরং গ্রীনের এই বিদ্রোহী কার্যকলাপে বাধা দিতে লাগলো।

ফলে জাহাজের নাবিকদের মধ্যে হয়ে গেলো দুটো দল। একদল ক্যাপটেন হাডসনের অনুসারী এবং অপর দল হলো বিদ্রোহী দল। গ্রীনের নেতৃত্বে।

একদিন গ্রীনের লোকেরা আক্রমণ করে বসলো হাডসনের লোকদেরকে। শুধু আক্রমণ নয়, ওরা হাডসনের অনুগত কয়েকজনকে খুনও করে ফেললো।

জাহাজের বিদ্রোহী গ্রীনের লোকেরাই ছিলো সংখ্যায় বেশি। তাই হাডসনের লোকেরা পেরে উঠলোনা বিদ্রোহীদের সাথে।

এতেও কিন্তু সন্তুষ্ট হলোনা গ্রীন। হাডসনের প্রতি আক্রোশ তার মিটলো না।

নৌকায় হাডসন ও তার ছেলে.



www.nagorikpathagar.org

এরপরেও মারমুখো হয়ে রইলো সে।

তারপরের দিনই আবার গ্রীন আক্রমণ করে বসলো। এবার তার লক্ষ্য ছিলো মূল হাডসনেরউপর।

গ্রীন তার লোকজন নিয়ে হাডসন, তার ছেলে জন এবং হডসনের অনুসারী যে কয়জন ছিলো তাদের সবাইকে বেঁধে ফেললো।

তারপর জাহাজের কোঠো ভাঙা ডিঙ্গী নৌকোটা বের করা হলো। নির্দয় এবং পাষন্ড গ্রীন সবাইকে তুলে দিলো সেই ভাঙ্গা ডিঙ্গী নৌকায়।

গ্রীন সরাসরি হত্যা করলো না হাডসনকে। কিন্তু সদলবলে ও সপুত্র মৃত্যুবরণ করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করলো অত্যন্ত সুনিপুণ হাতে।

ভাঙা ডিঙ্গী নৌকায় হাডসন তাঁর পুত্র কিশোর বয়সী জন এবং তাদের অনুগত লোকদের ভাসিয়ে দিয়ে গ্রীন জাহাজ নিয়ে কেটে পড়লো। তারপর হাডসন এই ভাঙা ডিঙ্গী নৌকায় ভাসতে ভাসতে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিলেন তার আর কোন নামনিশানাও পাওয়া যায়নি। এমনি করে একটি প্রাণের হয়েছিলো চির সমাপ্তি।

হাডসন তার কথা রেখে ছিলেন। জীবনে হয় সফলতা না হয় জীবন দান। সফলতা তার জীবনে আসেনি সত্যি, কিন্তু সফলতার পথে তিনি নিবেদন করেছিলেন নিজের প্রাণ। আর সেই গৌরবেই আজো ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন ক্যাপটেন হেনরী হাডসন।

হাডসন বললেন,- জীবন দিতে হয় দেবে, কিন্তু তবু অভিযান সফল না করে আমি ঘরে ফিরবো না। আমার জাহাজে এসেছো তোমাদের ইচ্ছেয়, কিন্তু ফিরে যাবে আমার ইচ্ছেয়,এর ব্যতিক্রম হবে না।

এই উপসাগরে ঘুরতে ঘুরতেই দিন কয়েক পরে তারা একটি দ্বীপের সন্ধান পেলেন। এটিও ছিলো হাডসনের একটি আবিষ্কার।

নাবিকরা অতঃপর বললে–সামনেই শীত আসছে, তাই আমরা শীতকালটা এই দ্বীপেই কাটাতে চাই।

হাডসন বললেন,–এই দুই দুটো মাস এখানে অলস হয়ে বসে কাটাবো?

–শীতকালে এখানকার সমুদ্রের জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায়।

– তা যায়।

–কখন আমাদের গোটা জাহাজটাই বরফের চাঁইয়ে আটকে পড়ে যেতে পারে।

–তাও পারে।

–তাই আমরা এমন বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

–কি করবে তাহলে?

বিদ্রোহী নাবিদের প্রধান গ্রীন বললে,– আমরা ঠিক করেছি শতীকালটা আমরা এই দ্বীপেই কাটাবো। তারপর আবার যখন বরফ গলে যাবে তখন শুরু হবে অভিযান।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু রাজী হলেন না হাডসন।

হাডসন বললেন–এতটুকু নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। যতক্ষণ জাহাজ বরফে আটকে না যায়, ততোক্ষণ চলা বন্ধ হবে না।

তখন যেন সত্যি সত্যি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন হাডসন। তাঁর আর এই মূহূর্তে অন্য কিছু চিন্তা করারও অবকাশ ছিলো না। তাঁর মরণ ভয় পর্যন্ত যেনো দুর হয়ে গিয়েছিলো। তিনি প্রায় সব নাবিকদের আপত্তি সত্ত্বেও জাহাজ চলা অব্যাহত রাখলেন।

ফলে যা হবার তাই হলো। শীতকাল আসতে আসতেই সাগরের সমস্ত জল জমে হয়ে গেলো বরফ। আর সেই অখন্ড বরফে আটকে গেলো হাডসনের জাহাজটাও।

জাহাজের চারিদিকে জমে গেলো বরফ। আর চলা সম্ভব হলো না।

## জন ক্যাবটের অভিযান

পূবের দেশে আসার জন্য হেনরী হাডসনের মতো এমন করে মেরু সাগর পাড়ি দেবার চেষ্টা করেছিলেন আরোও অনেকে। হয়তো হাডসনের মতো বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর হাতে তাদের এমন করে মর্মান্তিক মৃত্যবরণ করতে হয়নি। কিন্তু পথ হারিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছিলেন তার মতো আরো অনেকে।

পূবের দেশের রঙীন স্বপ্ন তখন পশ্চিমের দেশের মানুষগুলোকে যেনো সত্যি পাগল করে দিয়েছিলো। ওদেশে যেতে পারলেই পাওয়া যাবে কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে জহরত আর হাজার রকমের মশলা–যা পশ্চিমের দেশে এনে বিক্রি করতে পারলে সোনার দাম পাওয়া যাবে।

হাডসনের মতো আর যারা উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্য দেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আরেক জনের নাম জন ক্যাবট(John Cabot)Ç জন ক্যাবটের বাড়ি ছিলো ইংল্যাণ্ডে। তার ধারণা ছিলো কানাডার উত্তরে যে সাগর সেই সাগর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারলে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানো যাবে। তারপর সেখান থেকেপ্রাচ্যের দেশে।

জন ক্যাবটও অভিযান করেছিলেন হাডসনের মতো নিজের ছেলেকে সাথে নিয়েই। জন ক্যাবট এর ছেলের নাম ছিলো সিবাষ্টিয়ান ক্যাবট (Sibastiaan cabot)

এই ক্যাবটও অবশ্য তার অভিযান সফল করতে পারেননি। তিনি উত্তর সাগর ধরে গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ঢোকার কোনো পথ খুঁজে পাননি। ঘন বরফের মধ্যে জাহাজ চালানো সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

## স্যার হোগের অভিযান

এর পরে যিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিনি হলেন স্যার হাগ উইলোবি (sir Hugh Willoughby-1500-1554)। উইলোবি অবশ্য জন ক্যাবটের খবর জেনে ছিলেন। তিনি হিসেব করে ছিলেন ক্যাবট যখন পশ্চিমে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন সুতরাং আর ও পথে গিয়ে লাভ হবে না।



www.nagorikpathagar.org

তা হলে উত্তর সাগরের পূর্ব দিক দিয়ে বেরুবার কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করা যেতে পারে।

তাই তিনি নরওয়ের উপকূল থেকে শ্বেতসাগর পর্যন্ত পৌছেছিলেন। তিনি সর্ব উত্তরে ন্যাপল্যাণ্ড পর্যন্ত চলে এসেছিলেন।

কিন্তু তাঁরও ভাগ্য খারাপ। এতো উত্তরে পৌছে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে দলবল সহ সবাইকে নিয়েই মারা পড়েছিলেন।

অবশ্য এই মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছিলো এর তিন বছর পরে। এর পরের যে অভিযাত্রীরা গিয়েছিলেন, তারাই বরফে জমে যাওয়া তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন।

তার এমনি মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিলো যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেখানে বরফে তাদের জাহাজ আটকে গিয়েছিলো ওরা সেই জাহাজের মধ্যেই শীতে জমে গিয়ে মরে পড়ে ছিলেন এক একজন।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও উইলোবি ছিলেন তার জাহাজে টেবিলের সামনে বসে। চারপাশে ছড়ানো ছিলো তার কাগজপত্র, মানচিত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাপাতি। পাশে ছিলো তার ডায়েরী। ডায়েরীর শেষ তারিখে তিনি লিখেছিলেন--জাহাজের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে কতো অজানা অচেনা জীবজন্তু।

তারপরই হয়তো প্রচণ্ড শীতে তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর এ ভাবেই হয়েছিলো তার মর্মান্তিক মৃত্যু।

## মার্টিন ফ্রবিশারের অভিযান

এই বিপদসংকুল পথে এরপর যিনি অভিযান চালিয়ে ছিলেন তিনি মার্টিন ফ্রবিশার (Martin Frobisher)।

তিনিও শুনেছিলেন দূর প্রাচ্যের কথা। তাই তাঁর ইচ্ছে ছিলো যদি কোনো মতে চীন দেশে পৌছতে পারতেন তা হলে সেখান থেকে প্রচুর সোনাদানা নিয়ে আসতে পারতেন জাহাজ বোঝাই করে।

এই উদ্দেশ্যেই তিনি বের হলেন পথে। তিনি রওনা দিলেন সমুদ্র পথে।

ফ্রবিশার তিন তিনটি পালতোলা জাহাজে ৩৫ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তারপর এক সময় তার জাহাজ এসে পৌছলো বরফের রাজ্যে।

এই অভিযানে ফ্রবিশার কিছু কিছু আজগুবি কাজও করে ফেলেছিলেন। দিয়েছিলেন বোকার পরিচয়। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মানুষ হেসেছিলো।

তিনি একটু বেশি লোভী ছিলেন মনে হয়। তার প্রচণ্ড আশা ছিলো তিনি চীনে গিয়ে জাহাজ বোঝাই করে সোনা আনবেন। তার মাথাতে সর্বক্ষণ শুধু এই চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। যেতে যেতে ফ্রবিশার, এক দ্বীপের দেখা পেলেন। আর এই দ্বীপেই তিনি পেয়ে গেলেন তাল তাল সোনা। একেবারে যেনো কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা। জনমানবহীন



www.nagorikpathagar.org

বরফে ঢাকা এই নির্জন দ্বীপের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এই সোনা।

ফ্রবিশার এতো সোনা দেখে জাহাজ ভর্তি করে ফেললেন সোনা দিয়ে।

কিন্তু যখন তিনি সোনার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তার এই সোনা পরীক্ষা করে দেখা গেলো এগুলো আদৌ কোনো সোনাই নয়। সোনার মত দেখতে এক ধরনের ফালতু জাতীয় ধাতু।

ফ্রবিশার নিজের বোকামির জন্য নিজেই লজ্জায় মরে যেতে লাগলেন। এতো আশা করে আর এতো কষ্ট করে শেষে কিনা এই অবস্থা?

ফ্রবিশার

এ ধরনের বোকামি আরো করেছিলেন তিনি। এই সোনার দ্বীপেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এক আজব প্রাণীর শিং।

সেকালে উত্তরমেরু অঞ্চল নিয়ে ছিলো হাজারো রকমের আজগুবি রূপকথা। উত্তর মেরুতে নাকি ইউনিকর্ন (Unicorn) নামে এক ভয়ংকর শিংঅলা দৈত্য বাস করে। তাদের আকৃতি হলো বিশাল, মাথায় আছে মস্ত বড় শিং। চেহারা ঘোড়ার মতো আর লেজটা সিংহের মতো।

এই মস্ত বড় শিং দেখে ফ্রবিশার ভেবেছিলেন এটা নিশ্চয়ই ইউনিকর্নের শিং। তাই



www.nagorikpathagar.org

তিনি মহা খুশি হয়ে নিয়ে এলেন এই শিং।

কিন্তু দেশে এনে পরীক্ষা করে দেখা গেলো তা আসলে ন্যাবহোয়েল নামে এক জাতের তিমির মাথার হাড়। আর ওখানে তো দৈত্য-টৈত্য বলে কিছু নেই। এই শিং নিয়েও ফ্রবিশার খুব লোক হাসিয়েছিলেন। ফ্রবিশারের আরেকটি মজার কাণ্ড ছিলো এস্কিমোদের নিয়ে। তিনি উত্তর মেরু পার হওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন এস্কিমোদেরদেশে।

তিনিতো এর আগে আর কখনো এদেরকে দেখেননি। এস্কিমোদের দেশে গিয়ে দেখলেন এস্কিমোরা বঁড়শীতে টোপ ফেলে সীল শিকার করছে।

তিনি ভাবলেন ওরা সত্যি অদ্ভুত কোনো প্রাণী শিকার করছে। কিন্তু ওগুলো ছিলো সীল।

ফ্রবিশার অবশ্য গিয়েছিলেন অনেক উত্তর পর্যন্ত। তিনি কানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যান্ডেরল্যাব্রাডর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

## উইলিয়ম ব্যারেন্টসের অভিযান

ফ্রবিশারের পর যিনি মেরুর পথ আবিষ্কারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন উইলিয়াম ব্যারেন্টস। ব্যারেন্টস সাহেবের বাড়ি ছিলো হল্যান্ডে।

মেরু পার হয়ে পূর্বের দেশে যাবার পথ আবিষ্কারের জন্য তিনিও প্রায় প্রতিজ্ঞা করেই এসেছিলেন। এর আগে কেউ পারেননি। তাঁকে পারতেই হবে। এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি এসেছিলেন এই তুষার রাজ্যে।

তিনি এই তুষার রাজ্যে এসেছিলেনও বহুবার। এই মেরু জলপথ আবিষ্কারের জন্য তিনি একাই প্রায় একাশিবার অভিযান করেছিলেন। তার মতো এতো অধিকবার আর কোনো অভিযাত্রী অভিযান পরিচালনা করেননি।

এই বারংবার এসে তিনি এই অঞ্চলের বহু অঞ্চল দেখেছিলেন, পরীক্ষা চালিয়েছিলেন আর ভ্রমণ করেছিলেন প্রায় দু'হাজার সতশো তিরিশ মাইল জলপথ।

তিনি শেষবার অভিযান পরিচালনা করেছিরেন ১৫১৪ সালে। আর এটাই ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসাহসিক ও মর্মান্তিক অভিযান।

তিনি জাহাজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছিলেন নোভায়া জেমলায়া নামক স্থানে। কিন্তু এখানে আসার সাথে সাথেই নামতে শুরু করলো শীত।

চারদিকের বরফ জমে গেলো পাথর হয়ে। জাহাজের চারিদিকের খোলাজল রূপান্তরিত হলো অখন্ড পাথরে। তিনি আর জাহাজ চালাতে পারলেন না।

সে যে সত্যি সত্যি কি ভয়ংকর অবস্থা তা কল্পনাও করা যায় না।

এদিকে জাহাজ গেছে বরফে আটকে। শীতকাল থাকতে আর জাহাজ বরফমুক্ত হবে না। গোটা সময়টাই তাদের আটকে থাকতে হবে এই বরফের রাজ্যে।

তাই তারা জাহাজের বাইরে বরফের চাঁইয়ের উপর নাবিকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা



www.nagorikpathagar.org

করতেলাগলেন।

ভেসে আসা কিছু কাঠ জোগাড় হলো। তাই দিয়েই তৈরি হতে লাগলো নাবিকদের জন্য থাকার ঘর। কাঠের তক্তা দিয়েই ১৫/২০ জনের থাকার মতো তৈরি হলো ছোটো ছোটো গোটা দুয়েক ঘর।

কিন্তু এই কুঁড়ে ঘরে রাত কাটানো আর এক বিপদ। একেবারে ভাঙাচোরা ঘর। প্রচন্ড শীতের হাওয়া। কনকনে শীত। তার উপর শুরু হলো আর এক উৎপাত। ওরা যে অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছিলো সে অঞ্চলে ছিলো শ্বেত ভালুকের আনাগোনা। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো বিশাল বিশাল আকৃতির এক একটা শ্বেত ভালুক।

শ্বেত ভালুক কিন্তু খুব হিংস্র। সুযোগ পেলে আক্রমণ করে বসে যাকে তাকে। এদের হিংস্রতা থেকে আত্মরক্ষা করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই শ্বেত ভালুকেরা প্রায়ই তাদের কুঁড়ে ঘরে আক্রমণ করে বসতো। খাবারের সন্ধান করার জন্য এই ভালুকগুলো কুঁড়ে ঘরের ছাদ খুলে ফেলতো, বেড়া ছিঁড়ে ফেলতো।

তাই শ্বেত ভালুকের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সর্বক্ষণই পাহারায় থাকতে হতো।

অবশ্য এই শ্বেত ভালুকেরা অভিযাত্রীদের উপকারও করতো অন্য দিকে। অভিযাত্রীরা শ্বেত ভালুক শিকার করে তাদের মাংস খেতো। চামড়া দিয়ে বানাতো গায়ের জামা আর না হয় বিছানার চাদর। ভালুকের গায়ের লোমশ চামড়া দিয়ে খুব সুন্দর ওভারকোট তৈরি হতো।

এছাড়া ওদের মাংসও খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। শুধু শ্বেত ভালুকের মাংস নয়, মেরু অঞ্চলে লাল বর্ণের এক জাতের শিয়ালও ঘুরে বেড়াতো। অভিযাত্রীরা এই শিয়ালও শিকার করতো, তাদের মাংস খেতো।

কিন্তু এমন প্রচন্ড শীতে এ ঘরের মধ্যে হাঁটু অবধি বরফ জমে যেতে লাগলো। অবশেষে শীত শেষ হয়ে গেলো। গলতে শুরু করলো জমাটবাঁধা বরফ। জাহাজের চারপাশে যে বরফ জমে ছিলো তাও কাটতে লাগলো ধীরে ধীরে। জাহাজ মুক্ত হয়ে গেলো।

তখন ব্যারেন্টস জাহাজ নিয়ে রওনা দিলেন দেশের পথে। একদা তিনি প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন যেমন করে হোক মেরু পার হয়ে পূবে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করবেনই। কিন্তু তা পারলেন না। অবশেষে তাঁকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসতে হলো।

অবশ্য ফিরে তিনি আসলেনি। ফিরে অসার পথে মারা যান ১৫৯৭ সালে। বাড়ি পৌঁছাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যারেন্টস নোভায়া জেমনায়া অঞ্চলে যে কাঠের কুঁড়ে ঘরগুলো তৈরি করে রেখে এসেছিলেন, সেগুলো তার পরেও কয়েকশো বছর পর্যন্ত তেমনই ছিলো।



www.nagorikpathagar.org

ব্যারেন্টস সাহেবেরও প্রায় পৌনে তিনশো বছর পরে ১৮৭১ সালে আর এক অভিযাত্রী দল এসেছিলেন এই নোভায়া জেমনায়াতে। তারা এসে এই কুঁড়ে ঘরগুলো তখনো দেখেছিলেন। এমনকি তারা ব্যারেন্টস সাহেবের ডায়েরীটি পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিলেন।

ব্যারেন্টশ সাহেবের পর থেকেই এই উত্তর পথের প্রতি অনেকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সবার ধারণা হয়েছিলো হয়তো এদিকে সত্যি কোনো পথ নেই। শুধু শুধু বিপদসংকুল পথে গিয়ে মরণ ডেকে আনা।

তাই অনেকদিন পর্যন্ত আর এদিকে কেউ উৎসাহ নিয়ে পা বাড়ায়নি। তারপর প্রায় কেটে গিয়েছিল একশো বছরের মতো। এদিকে আর কেউ আসেননি।

## ভাইটাস বেরিং—এর অভিযান

অনেকদিন পর সোভিয়েট ইউনিয়ন আবার নতুন করে উদ্যোগ নিলো এব্যাপারে। এশিয়া ও আমেরিকার মধ্য দিয়ে কোনো পথ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য উদ্যোগনিলেনতারা।

অবশ্য রাশিয়ার এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার একটি কারণও আছে। কিছুদিন আগে। অর্থাৎ ১৬৪৮ সালে সাইমন ডেসিনাফ (Simon Deshinaf) নামে একজন অভিযাত্রী উত্তর অঞ্চল ঘুরে এসে ঘোষণা করলেন যে, এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে এক বিশাল সাগর রয়েছে। কিন্তু সেদিন তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মকর্তারা এই কথার উপর ভিত্তি করেই বিশ্বাস করলেন যদি সত্যি সত্যি এমন বড় সাগর থেকে থাকে তাহলে এই বড় সাগর পার হয়ে অবশ্যই পুবের দেশে পৌছানোর পথ পাওয়া যাবে।

তাদের এই অনুমান সত্যিই কিনা তা প্রমাণ করার জন্য একটি অভিযাত্রীদল পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন। রাশিয়ার এই উদ্যোগে যিনি অভিযানে গেলেন তিনিই হলেন ভাইটাস বেরিং (Vitus Bering-1680-1741)। যদিও বেরিং নিজে রাশিয়ান ছিলেন না। তার বাড়ি ছিলো ডেনমার্কে কিন্তু তিনিদীর্ঘ দিন ধরেই রাশিয়ায় বাস করতেন। তাই রাশিয়ান সরকার তার নেতৃত্বেই একটি দল প্রেরণ করলেন।

তাদের লক্ষ্য ছিলো এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যকার কোনো প্রণালীর অনুসন্ধান করা।

বেরিং সাহেবের ধৈর্য ছিলো অসম্ভব। তিনি এই কাজে লেগেছিলেন তার জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়। তিনি এ ব্যাপারে প্রায় একটানা ষোল বছর ধরে কাজ করেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে জলপথের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি বরফের মধ্য দি য় পায়ে হেঁটে ছিলেন প্রায় ছয়হাজার চারশো চৌদ্দ মাইল পথ।

বেরিং—এর এই অভিযানটি ছিলো বিশাল এক আ য়োজন। অভিযানে তার সহযোগীর সংখ্যা ছিল ৫০০ এর মতো। এই পাঁচশো লো কের মধ্যে বেশ কয়েকজন





www.nagorikpathagar.org

ছিলেন বিজ্ঞানী, ভূ-তত্ত্ববিদ, আবাহাওয়া বিজ্ঞানী। এছাড়াও ছিলেন কামার, ছুতোর, নাবিক ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকজন।

এই বিশাল লোকবহরের মালামাল বয়ে নিয়ের যাওয়ার জন্য আটশো ঘোড়ার প্রয়োজনহয়েছিল।

বেরিং তাঁর অভিযান শুরু করেছিলেন রাশিয়ায় পেট্রোগ্রাড (Petrograd) থেকে। এই অঞ্চল পুরোটাই ছিলো তুষার জমা পথ। এই পথে বিশাল বহর নিয়ে যেতে তাঁদের যারপর নেই কষ্ট হয়েছিলো।

এতো মালামাল খাদ্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁদের দেখা দিয়েছিলো খাদ্যাভাব, ফুরিয়ে গিয়েছিলো রসদ। শেষে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা নিজের চামড়ার জুতো, ঘোড়ার জিন পর্যন্ত কামড়ে খেয়েছিলেন। অনাহারে আর প্রচন্ড শীতে মারা গিয়েছিলো দলের অর্ধেকেরও বেশি।

এই অভিযানে খরচ হয়েছিলো লক্ষ লক্ষ পাউন্ড।

প্রথম ধাক্কায় অভিযান চলেছিলো একনাগাড়ে তিনি বছর। তিনি মাসের পর মাস ঘুরে বেড়ালেন দুর্গম মেরু অঞ্চলের পথে বিপথে। কিন্তু এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে স্থলভাগের কোনো যোগ দেখতে পেলেন না। তিনি শুধু দেখলেন সাগর আর সাগর।

এই অভিযানে প্রায় এক বছর কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন সোভিয়েট ইউনিয়নে।

বেরিং দ্বিতীয় বার অভিযানে বের হয়েছিলেন ১৭৭৩ সালে।

এটাই কিন্তু ছিলো সার্থক অভিযান। এই অভিযানে গিয়ে তিনি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন এশিয়ার পূর্বপার্শ্বের দেশ জাপানের উদ্দেশ্যে।

সেই জাহাজ বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দুর্গম বরফ-ঘেরা পথ পেরিয়ে অবশেষে জাপানে পৌছতে সক্ষমও হয়েছিলো।

আবিষ্কৃত হয়েছিলো মেরু পার হয়ে এশিয়ায় পৌছানোর পথ। এটি ছিলো তার জন্য একটি ঐতিহাসিক আবিষ্কার। যে পথের জন্য এতোদিন এত হাজার হাজার লোক আত্মদান করেছেন, বিফল হয়েছেন। এতো প্রচেষ্টা আর অর্থ আবিষ্কৃত হলো সেই পথ।

এবার বিশ্বের সবাই জানলো শুধু আফ্রিকার দক্ষিণ পাশ ঘুরে নয়, উত্তর দিক দিয়েও এশিয়ার পূর্ব পার্শে অর্থাৎ দূর প্রচ্যে পৌছানোর পথ আছে। যদিও সে পথ অত্যন্ত দূর্গম এবং কষ্টসাধ্য।

শুধু পূর্ব দিকের পথ নয়, তিনি গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম দিক দিয়ে আমেরিকার পাশ দিয়ে প্রশান্ত মাহাসাগরে পৌছানো যায় কি না তার জন্যও জাহাজ প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু আমেরিকার তীরের দিকে জাহাজ ভাসাতে তার লেগে ছিলো আট বছর। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিলেন আমেরিকার তীরে।

তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন সাইবেরিয়াতে। কিন্তু সাইবেরিয়া থেকে ফেরার পথেই তিনি এক প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লেন। ঝড়ে তার জাহাজের প্রচুর ক্ষতি হয়। লোক মারত যায় অনেক এবং নষ্ট হয় তার খাদ্য সামগ্রী।



www.nagorikpathagar.org

উত্তর মেরু পথে উননব্বই ডিগ্রী অক্ষাংশ যে পার হতে পারবে তাকে ৫ হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে।

পরে ব্রিটিশ সরকার ক্রমান্বয়ে তাদের এই পুরস্কারের অর্থ আরোও বৃদ্ধি করতে থাকেন। শেষে তারা এই পুরস্কারের পরিমাণ ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার পাউন্ডে বৃদ্ধি করে ন।

এই ঘোষণার পর সত্যি সত্যি অনেক অভিযাত্রী এগিয়ে এলেন। এই সময়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন স্যার জন রস (Sir John Ross-1777-1855), স্যার উইলিয়াম এ্যাডওয়ার্ড পেরী (Sir William Edward Parry-1790-1855) এবং স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir Games Clark Ross-1800-1862)

এর মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড পেরী অভিযানে বের হলেন প্রথমে। তিনি অভিযান শেষে ফিরে এসে বললেন–ব্যাফিন আসলে কোনো উপসাগর নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সাগর।

পেরী এই ব্যাফিন সাগরের উপর অনেক জরিপও চালিয়েছিলেন। তিনি চারদিক ঘুরে ফিরে মেপেও দেখেছিলেন।

সাগরটি বছরের অধিকাংশ সময়ই বরফ জমে থাকে। সারা বছরে মাত্র চার মাস নৌ চলাচল উপযোগী থাকে। এই সাগরের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১২৮২·৭ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৪৪৯ কিলোমিটার। তারা ব্যাফিন সাগরে ঘন বরফ ঠেলে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারলেন না। যদি পারতেন তাহলে তারাই প্রথমে ছিনিয়ে নিতে পারতেন পুরস্কার। তারা উত্তর মেরু বিন্দু পর্যন্ত পৌছতে পারতেন।

কিন্তু তারা উত্তরে যেতে না পেরে চললেন পশ্চিম দিকে। আর এখানেই তারা মূল লক্ষ্য থেকে চলে গেলেন অনেক দূরে। তারা আর জিততে পারলেন না।

তারা পশ্চিম দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন একটি নতুন দৃশ্য। দেখলেন উত্তর পাশ ঘন মেঘে ঢেকে আছে।

কিন্তু ঐই ঘন মেঘ গুলোকে কেউ অন্ধকারে ভাল করে চিনতে পারলেন না। তাদের মনে হলো হয়তো উত্তরে বিরাট প্রাচীরের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি পর্বতমালা। এতেই তারা বুঝলেন আর ওদিকে যাওয়া যাবে না।

তারা এই দেখেই সোজা ফিরে এলেন দেশে। দেশে ফিরে এসেও জানালেন উত্তরে এগুবার কোনো পথ নেই। সুতরাং এই নিয়ে বাজি ধরা যায় না।

কিন্তু একথার প্রতিবাদ করে বসলেন এডওয়ার্ড পেরী।তিনি বললেন –এখানে ওমন উঁচু কোনো পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে আমার তা মনে হয় না।

–তাহলে কি আমরা ভুল দেখেছি?

নিশ্চয় ভুল দেখেছো। পেরী বললেন,– দৃঢ়তার সাথে।

–বেশ কথা আমরা গিয়ে দেখে এলাম আর উনি এখানে বসে না গিয়েই আমাদের



www.nagorikpathagar.org

ফলে জাহাজে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। জাহাজের খালাসিরা আক্রান্ত হয় কার্ভি রোগে।

এই নিদারুণ অবস্থার মধ্য দিয়েই তিনি কোনো রকমে রাশিয়ার ইকম্যান্ডার আইল্যান্ড দ্বীপের খাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নেন।

তারপরই এসে যায় শীতকাল। আবার চারিদিকের জল জমে হয়ে যায় বরফ।

জাহাজ চলাচল হয়ে যায় বন্ধ। অতঃপর এখানেই আটকে থাকতে হয় তাকে। এদিকে জাহাজে খদ্যের অভাব, অনেকে রোগাক্রান্ত।

সে এক দুঃসহ অবস্থা।

নিজেদের মজুদ খাবার বলতে তখন তাঁদের হাতে কিছুই ছিলো না। শুধু মাত্র শিকারের উপর নির্ভর

করে চলছিলো দিন। কিছু কিছু সীল আর সামুদ্রিক মাছ শিকার করে কোনো মতে প্রায় অনাহারে চলছিলো তাদের দিন।

অনেকে এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা পড়ছিলো। যারা বেঁচেছিলেন তারা কেউ তাঁবু খাটিয়ে,কেউ জাহাজের ডিঙি নৌকা উল্টো করে তার নিচে করছিলো আত্মরক্ষা।

এই বিপদের সময়েই শুরু হয়েছিলো আর এক উৎপাত। মেরু শিয়ালেরাও ভয়ানক উৎপাত করতো। যখন তখন ওরা দল বেঁধে আক্রমন করতো নাবিকদেরকে। চুরি করে নিয়ে যেতো খাবার। কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতো ওদের পোশাক পরিচ্ছদ। জিনিসপত্র।এমন কি সুযোগ পেলে অসুস্থ মানুষ এবং ঘুমন্ত মানুষকে পর্যন্ত কামড়াতো।

এই প্রতিকূল অবস্থায় তার দলের অনেকে মারা পড়েছিলো। বেঁচে ছিলেন অল্প কয়েক জন মাত্র। তাদের অবস্থাও ছিলো খুব খারাপ।

শুধু নাবিকরা কেনো এই সময় স্বয়ং বেরিং সাহেবও ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অবস্থা এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করলো যে তিনি একেবারে চলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন।

অতঃপর একটি নির্জন দ্বীপে তাঁবু খাটানো হলো। আশা ছিলো তাঁবুতে কিছুদিন বিশ্রাম নিলে হয়তো একটু সুস্থ হবেন। সুস্থ হলে আবার যাত্রা করবেন।

কিন্তু সেই সুস্থ আর হলেন না বেরিং। এই নির্জন দ্বীপে আসার পরে তাঁর অবস্থা আরোও খারাপ হয়ে পড়লো। তারপর এখানে এই নির্জন দ্বীপেই তিনি ১৭৪১ সালে মারা গেলেন। দেশে ফেরা আর তাঁর হলো না।

যে নির্জন দ্বীপে ভাইটাস বেরিং এর মৃত্যু হয়েছিলো পরবর্তী সময় এই দ্বীপটির নাম করণ করা হয় বেরিং এর নামে। বেরিং দ্বীপ (Bering Island)।

আর যে এলাকাটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার নামও তার নামেই হয়েছে বেরিংপ্রণালী।

এরও প্রায় ২২- ২৩ বছর পরে ১৭৭৬ সালে উত্তর মেরু অভিযানের জন্য ব্রিটিশ সরকার এক পুরষ্কার ঘোষণা করলেন। ব্রিটেন থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হলো



www.nagorikpathagar.org

সাথে তর্ক করছেন। রস বলেসেন, বেশ আমি গিয়েই প্রমাণ করে দেবো যে তোমরা যা দেখে এসেছো তা ভুল।

–তাহলে আর বসে না থেকে চলে যাও।

–যাচ্ছিইতো।

তারপর এ্যাডওয়ার্ড পেরী সত্যি সত্যিই শুরু করলেন অভিযান। তিনি উত্তরে অগ্রসর হয়ে দেখলেন সেখানে আকাশ–ছোঁয়া বড় পাহাড় বলতে সত্যি কিছু নেই। রস যাকে পাহাড় বলে ভুল করেছিলেন ওটা হলো ঘন মেঘের স্তর মাত্র। দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের মতো। দিগন্ত রেখায় ঘন হয়ে জমে আছে।

কিন্তু তবুও পেরী সাগরের জমে থাকা ঘন বরফ ঠেলে আর বেশি দূর এগুতে পারলেন ন। বাজি জেতার জন্য তিনি উত্তর মেরু বিন্দু পর্যন্ত যেতে পারলেন না।

তিনি অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করা যাকে বলে। বরফের চাপে পড়ে শেষে তার কাঠের জাহাজটি ভেঙে চিড়েচ্যাপটা হয়ে গিয়েছিলো।

এরপরেও তিনি দমেননি। জাহাজ ভেঙে গেলে তিনি স্থলপথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি মাত্র জনদুয়েক সাথী আর একটি স্লেজ গাড়ী নিয়ে রওনা দিলেন তার দুর্ধর্ষ অভিযানে। পেরীর এই অভিযান যেমন ছিলো রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃসাহসিক। শুধু একবার নয়। পেরী এবং তারই ভাতিজা ক্লার্ক পেরী এরপরেও চারবার চালিয়েছিলেন এই মেরু অভিযান। তিনি উত্তর মেরু বিন্দুতে পৌঁছাতে অবশ্য সক্ষম হননি। তবে উত্তর মেরু বিন্দুর নকশা এবং সঠিক অবস্থান তিনি স্থির করে ফেলে ছিলেন।

## স্যার জন ফ্রাংকলিন

এরপর এগিয়ে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন (Sir John Franklin-1786-1847)। তিনি অবশ্য বৃটেন সরকারের পুরস্কার লাভের জন্য আসেননি। তিনি এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে প্রেরিত অভিযানে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারই তাকে পাঠিয়ে ছিলেন আমেরিকার উত্তরাংশের তটরেখা সম্পর্কে জরিপ চালানোর জন্য। এছাড়া এই অভিযানে তিনি স্পিটশবার্গেনের সমুদ্রের গভীরতাও মেপে এসেছিলেন।

এ ছাড়াও তিনি আরোও কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বারের অভিযানে ম্যাকাঞ্জি নদীর উপর গবেষণা করেন।

১৮৪৫ সালেও আবার অভিযানে বের হয়েছিলেন ফ্রাংলিন। এবারের অভিযানটি ছিলো তার সবচেয়ে ব্যাপক। জাহাজ ছিলো দুটো। লোকজন ছিলো ১৩৪ জন।

কিন্তু এই অভিযানেই তার ঘটে মর্মান্তিক পরিণতি। তিনি জাহাজ নিয়ে বেরিং প্রণালী দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই তার শেষ যাত্রা, তার পর যে তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তারা আর ফিরেও আসেনি। তার



www.nagorikpathagar.org

দলের একটি লোকেরও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

এরপর কেটে গিয়েছিলো তিন তিনটি বছর। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই অভিযাত্রীদলের সন্ধান করার বহু চেষ্টা করেছেন। তাদের সন্ধানে পাঠানো হলো অনুসন্ধানকারী দল।

কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে লাগলো একের পর এক। কোনো সন্ধানই মেলেনি। একে একে ৩৯টি অনুসন্ধান দল পাঠানো হলো হারিয়ে যাওয়া ফ্রাংকলিনের খোঁজে।

অবশেষে পাওয়া গেলো কিছু কিছু টুকরা টুকরা খবর। স্থানীয় এস্কি- মোদের কাছে জিজ্ঞেসা করে করে সংগ্রহ হলো তথ্য। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেলো।

জন ফ্রাংকলিন

এস্কিমোদের কাছ থেকে জানা গেলো অভিযাত্রীদের দুটো পালতোলা জাহাজ ম্যাকক্লিনটক(Macklintock) প্রণালীতে এসে আটকে পড়েছিলো বরফে। বরফের প্রচণ্ড চাপে তাদের দুটো জাহাজই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। পরে বাধ্য হয়ে জাহাজদুটোকে ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য ভাবে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করেছিলো।

পয়েন্ট ভিক্টরিয়াতে (Point Victoria) এসে অনুসন্ধানীরা এস্কিমোদের সহায়তায় জাহাজের কিছু ধ্বংসাবশেষও উদ্ধার করেছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

এই ধ্বংসাবশেষের সাথে জাহাজের প্রধান নাবিক ফ্যাংকলিনের সহকারী ক্রোজিয়ের একটি ডায়েরী পাওয়া যায়। এই ডায়েরী থেকে জানা যায় ১৮৪৬সালের১২ই সেপ্টেম্বর তাদের জাহাজ দুটো সম্পূর্ণভাবে বরফে আটকে যায়। উত্তরে যাবার পথ বন্ধ।

তারপরও তারা জাহাজে অবস্থান করে ছিলেন এবং এই অবস্থায়ই জাহাজের বেশ কয়েকজন নাবিক অনাহারে আর প্রচণ্ড শীতে মারা যায়।

শুধু নাবিকরা নয়, এই আটকে পড়া জাহাজেই ১৮৪৭ সালের ১২ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ফ্রাংকলিনেরও মৃত্যু হয়। এরপরও তারা বেশ কিছু দিন জাহাজেই ছিলেন।

কিন্তু জাহাজে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় এবং জাহাজ দুটো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় তারা জাহাজ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে যাবার চেষ্টা করেন।

তারপর ১৮৪৮সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে নতুন ক্যাপ্টেন ক্রোজিয়ের নেতৃত্বে জাহাজের অবশিষ্ট ১০৫জন নাবিক জাহাজ ত্যাগ করেন।

কিন্তু তারা জাহাজ ত্যাগ করে কোন্ দিকে গিয়েছিলেন কিংবা তারা সবাই মারা পড়েছিলেন--তারা কোথায় মারা পড়েছিলেন--তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

এই একমাত্র ডায়েরী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। ক্যাপ্টেন ফ্রাংকলিন সহ জাহাজের ১৩৪ জন নাবিকের কারো মৃত্যু দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের অনুসন্ধান করার জন্য খরচ করেছিলেন প্রায় এক কোটি পাউন্ড।

## এরিক নরডেনশিল্ড

এডলফ এরিক নরডেনশিল্ড (Adloff Erik Narden Shield-1832-1901) এমনি আরেক অভিযান পাগলা মানুষ। যে পথে এর আগে মারা গেছে শত শত মানুষ, যে পথে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা, মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে, তিনি সেই পথেই পা বাড়াবার জন্য এগিয়ে এলেন নির্ভয়ে।

লোকটা নিজেও ছিলেন নির্ভীক। আজীবনের গোঁয়ার আর একগুঁয়ে। যেমন বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী তেমনি মনে দুর্দান্ত সাহস।

তার আসল বাড়ি ছিলো ফিনল্যাণ্ডে। কিন্তু দেশে নিজের গোঁয়ার্তুমি আর একগুঁয়েমির জন্য টিকতে পারলেন না, ছাড়তে হলো দেশ। চলে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে।

আর এখানে এসে তাকে পেয়ে বসলো এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। উত্তর মেরু অভিযানের কথা শুনে তার শরীরের রক্ত আবার উঠলো টগবগিয়ে।

তারপর লোকজন জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লেন পথে। তিনি এশিয়ার তীর ধরে চলে এলেন কারা সাগরে (Kara)। এই কারা সাগর ছিলো নোভায়া জেমলোনয়ার একটু আগে। তিনি প্রমাণ করলেন যে এই কারা সাগর বছরে অন্তত তিনি-চার মাস বরফমুক্ত থাকে। তখন নৌ চলাচল সম্ভব।

তিনি ১৮৭৯ সালে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন। তিনি জাপানের ইয়াকোহামা বন্দরে এসে পৌঁছালেন।



www.nagorikpathagar.org

এর আগে বেরিংও জাহাজে করে পৌছেছিলেন। এখানে কিন্তু তার পথ সম্পর্কে তখনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। তিনি অনির্দিষ্ট পথেই ঘুরতে ঘুরতে জাপানে এসেছিলেন।

কিন্তু নরডেনশিল্ড প্রথম সঠিক পথে পৌছোতে সক্ষম হলেন। তাই পূবে আসার পথ আবিষ্কারক হিসাবে পর নর ডেনশিল্ডকেই ধরা হয়।

## চূড়ান্ত বিজয়

পূর্বের পথ যেমন শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন নরডেনশিল্ড, তিমনি বেরিং প্রণালী পার হয়ে পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করেন বিখ্যাত অভিযাত্রী রোনাল্ড অ্যামুন্ডসন।

উল্লেখ্য যে, এই অ্যামুন্ডসনই দক্ষিণ মেরু বিন্দু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালানোর আগে তিনি উত্তর মেরুতে অভিযান চালান।

তিনি উত্তর পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করেন ১৯০৬ সালে। ষোড়শ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে। হেনরী হাডসন যে অভিযানের শুরু করেছিলেন, বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে এসে অ্যামুন্ডসনের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করলো।

অ্যামুন্ডসনও সহসাই এই দুর্গম পথ আবিষ্কার করতে পারেননি। উত্তর মেরুতে তিনি অভিযান শুরু করেন ১৯০৩ সাল থেকে। তিনি এই বছরই ক্রিস্টিয়ানিয়া (Cristiania) থেকে শুরু করেন তার অভিযান। তিনি ক্রমেই পশ্চিম দিকে যাত্রা করে এসে প্রবেশ করলেন বাফিন সাগরে।

তখন ছিলো বসন্তকাল। বাফিন সাগর তখন প্রায় বরফমুক্ত। তিনি প্রায় বিনা বাধায় এই সাগার পাড়ি দিলেন। তারপর বাফিন সাগরের পশিম কিনারে ডিলা রোকেট (Dela Rocket) দ্বীপ পার হয়ে চলে এলেন উত্তর মেরু ছাড়িয়ে।

এরপর তিনি মোড় নিলেন পূবের দিকে। চলে এলেন কিং উইলিয়াম ল্যান্ডে (King Williamland) দু'বছর তাকে এখানেই কাটাতে হলো।

এরপর ১৯০৫ সালে তিনি পৌছলেন ম্যাকেঞ্জেল্যান্ডের কিংপয়েন্টে। শীত এসে পড়ায় আবারো তাকে কিছুদিন আটকে থাকতে হলো এখানে।

শীতে বরফ জমে জাহাজ আটকে গেলেও তার অভিযান ক্ষান্ত করলেন না তিনি। তিনি জাহাজ ছেড়ে এবার রওনা দিলেন স্থল পথে। তিনি স্লেজ গাড়িতে চলতে লাগলেন এবং পাড়ি দিলেন প্রায় চব্বিশ শো কিলোমিটার পথ। এভাবে তিনি এসে পৌছোলেন আলাস্কাতে।

এর পরের গ্রীষ্মে তিনি আবার জলপথে এলেন আলাস্কাতে। ১৯০৬ সালে দীর্ঘ ১৭৬৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তিনি ১লা সেপ্টম্বর তারিখে এসে নোঙর করলেন আলাস্কার নোম (Nome) শহরে। এভাবেই উত্তর মেরুতে দু'টো পথই আবিষ্কৃত হলো। উত্তর মেরুর সকল রহস্যেরই অবসান ঘটলো এমনি করে। তারপর তৈরি হলো মানচিত্র। নতুন করে লেখা হলো এর ভৌগোলিক বিববরণ।



www.nagorikpathagar.org

# ফ্রান্সিস ড্রেকের বিশ্বভ্রমণ

১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই সকলের নজর পড়লো এই বিশাল মহাদেশটির উপর। আমেরিকা আবিষ্কার করেছে স্পেন। তাই তার দাবি সবার আগে।

কলম্বাসের পর থেকে স্পেনের নাবিকরা একে একে নামতে লাগলেন আমেরিকার মাটিতে। ক্রমে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলেন দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে।

প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো আমেরিকার উত্তর অংশে এবং দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে বহু স্পেন উপনিবেশ।

এই সময় মেক্সিকোয় ছিলো আদি আজটেক গোষ্ঠির সভ্যতা। এখন সেখানে আধুনিক মেক্সিকো শহর। ষোড়শ শতাব্দির গোড়ার দিকে এখানেই একটি শহর ছিলো। সেই প্রাচীন শহরটির নাম ছিলো টেনোচটিটলান (Tenochtitlan) অর্থাৎ আজকের আধুনিক মেক্সিকো শহরের প্রাচীন নামই ছিলো টেনোচটিটলান। এই শহর ছিলো আজটেক রাজা মন্টেজোমার ( Monten Zuma) রাজধানী। সোনাদানা হিরেজহরত পরিপূর্ণ ছিলো তার রাজধানী।

তারপরই একদিন হার্নাণ্ডো করটেজ (Hernand cortes) এর নেতৃত্বে উপনিবেশবাদী স্পেনের একটি সেনা দল হানা দিলো টেনোচটিটলানে। কর্টেজ তার

কার্টেজ



www.nagorikpathagar.org

জাহাজ নিয়ে এসে মেক্সিকো উপসাগর পাড়ি দিয়ে প্রথমে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন পশ্চিম তীরে। তারপরই সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসলেন আদিবাসীদের রাজধানী।

আজটেক সৈন্যরা তাদের সেকেলে লাঠি, তীর, ধনুক দিয়ে কর্টেজের আধুনিক অস্ত্রধারী সৈন্যদের ঠেকাতে পারলো না।

হার্নান্ডো কর্টেজ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আজটেক রাজা মন্টেজোমার সন্ধির সকল শর্ত ভংগ করে তাকে হত্যা করলেন এবং দখল করলেন আজটেক রাজ্য। আর এমনি করেই পতন ঘটলো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সভ্যতার।

মন্টেজোমার দেবতার মন্দির ভেঙে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধমূর্তি। কর্টেজ হলেন এই স্পেন উপনিবেশের প্রথম শাসনকর্তা স্পেন সরকারের প্রতিনিধি।

এমনি আরেকটি ঘটনা ঘটালেন স্পেনের আরেক কুখ্যাত নাবিক সেনাপতি ফ্রান্সিস্কো পিজারো (Fransisco Pizzar-1470-1541)।

১৪৫৩ সালের ঘটনা এই পিজারোর নেতৃত্বেই স্পেনের এক দল নাবিক একদিন রাতের বেলা এসে চুপিচুপি হানা দিয়ে বসলো দক্ষিণ আফ্রিকার পেরুর ইনকা (Inca) উপজাতীয়দের রাজা আতাহুয়ালপার (Atahualpa) রাজধানী।

পিজারো লোকমুখে শুনে এসেছিলো ইংকারাজা নাকি অগাধ ধন সম্পত্তির অধিকারী। রাজার কোষাগারে, দেবমন্দিরে কতো যে সোনা দানা হিরেজহরত আছে তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

পিজারোর উদ্দেশ্য ছিলো যদি ইংকা রাজাকে বন্দী করা যায় তবে তার দেশের সমস্ত সোনাদানা লুট করা যাবে।

হলোও তাই। অগাধ সম্পত্তির মালিক হলেও রাজার কোনো সৈন্যবল ছিলো না। পিজারো গুটি কয়েক সৈন্য নিয়ে অনায়াসে দখল করে ফেললো রাজধানী। বন্দী করলো স্বয়ং রাজাকেও। রাজা তখন পিজারোর কাছে বিপুল অর্থের বিনিময়ে তার মুক্তি চাইলেন।

ইংকা প্রজারা তাদের প্রিয় রাজাকে বিদেশী দস্যুর হাত থেকে মুক্ত কারার জন্য যার কাছে যতো সোনা ছিলো এনে জমা দিতে লাগলো। চোখ ঝলসানো সব ধনরত্ন।

কিন্তু এতো ধনরত্ন দেখে কুখ্যাত পিজারোর মাথা গেলো আরো খারাপ হয়ে। সে ভাবলো যদি গোটা দেশটাই দখল করা যায় তবে সারা দেশের সব ধন-রত্নের সে-ই মালিক হবে।

তখন বিশ্বাসঘাতক পিজারো সন্ধির শর্ত অমান্য করে রাজা আতাহুয়ালাপাকে হত্যা করে এবং দেশ দখল করে। এমনি করে পেরুর ইংকা সভ্যতারও অবসান হয় এবং সেখানে স্থাপিত হয় স্পেনের উপনিবেশ।

এমনি করে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনের উপনিবেশ। গড়ে ওঠে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে অনেকগুলো সমুদ্র বন্দর



www.nagorikpathagar.org

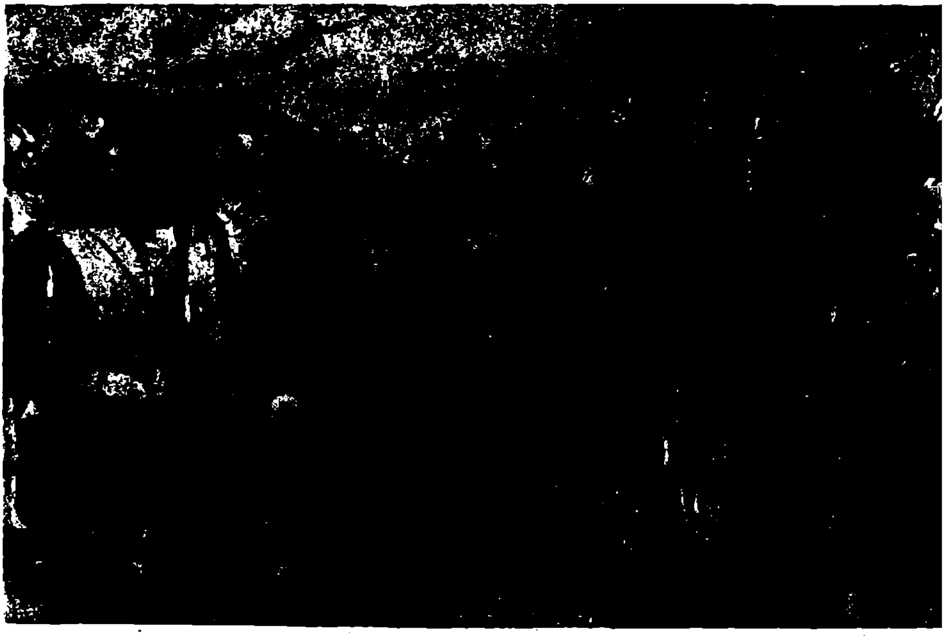

ফ্রান্সিসকো পিজারু দাঁড়িয়ে আছেন ইংকা রাজার সামনে

আরবণিজ্য–ঘাঁটি।

দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে স্থানীয় আদিবাসীদের কাছ থেকে হাত করা, লুট করা রূপা সোনা ও মূল্যবান মণি মুক্তার বেচাকেনা হতো এই সব সমুদ্র বন্দরে। এখানেই গড়ে ওঠে মণিমুক্তার বাজার।

এখান থেকে এইসব মণিমুক্তা প্রথমে জাহাজে করে চলে আসতো মধ্য আমেরিকার পানামাতে। এখানে যে সমুদ্র বন্দর ছিলো তার নাম হলো নমব্রডি ডায়াস (Nombre-de-dios)। এখান থেকে আসতো আরও উত্তরে মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত সান জোয়ানডে উলা (San juande Ulua) বন্দরে। এই সানজোয়ানডে বন্দরের আধুনিক নাম হলো ভেরা ক্রুজ (Vera cruz)। এই ভেরা ক্রুজ থেকে বড় বড় পালতোলা সামুদ্রিক জাহাজে করে এগুলো পাঠানো হতো স্পেনের রাজধানীতে প্রতি বছর। বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন আসতে লাগলো এই স্পেনীয় কলোনী থেকে।

স্পেন তখন তাদের উপনিবেশগুলো থেকে ধনরত্ন এনে দিনেদিনে ফুলেফেঁপে উঠতে লাগলো। বাড়তে লাগলো দেশের সমৃদ্ধি ও জৌলুস।

এই সময় (১৫৫৮) ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিলেন রানী প্রথম এলিজাবেথ। ধর্ম নিয়ে



www.nagorikpathagar.org

মহামান্য পোপের সাথে ইংল্যান্ডের রাজার যে দ্বন্দ ছিলো তারও অবসান হচ্ছিলো এই সময়। ইংল্যান্ড আবার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে এগুচ্ছিলো।

এই সময় ইংল্যান্ড দেখলো স্পেন তাদের উপনিবেশ থেকে প্রচুর ধনরত্ন আনছে। উপনিবেশগুলোতে তারা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করছে। কিন্তু তখনো ইংল্যান্ডের কোনো উপনিবেশ নেই। তাই কোথাও থেকে এমন ধনরত্ন আসছে।

তাই রানী এলিজাবেথ চাইলেন দক্ষিণ মধ্য ও উত্তর আমেরিকাতে নাই বা থাকলো তাদের উপনিবেশ, তারা স্পেনের উপনিবেশগুলোতে গিয়েই ব্যবসা করবে। স্পেন সরকার পছন্দ করুক আর নাই করুক।

এদিকে স্পেন সরকারেরও ছিলো কড়া নজর।তাদেরও কড়া নির্দেশ ছিলো একমাত্র স্পেনের জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজই যেনো আমেরিকায় ঢুকতে না পারে।

অন্য কোনো দেশের জাহাজ মেক্সিকো উপসাগর কিংবা ক্যারিবিয়ান সাগরে ঢুকলেই যেনো তাদের আক্রমণ করা হয়। এর জন্যে স্পেন সরকার সেখানে মোতায়েন করলো যুদ্ধজাহাজ। তারাই পাহারা দিতো।

এদিকে হলো আরেক ঘটনা। স্পেন থেকে যারা ভাগ্যের অন্বেষণে আমেরিকায় হিজরত করছিলো, গড়ে তুলেছিলো বসতি, তারাতো এক একজন বিরাট বিরাট উর্বরভূমি দখল করে গড়ে তুলেছিলো কৃষি খামার। কেউ গড়ে তুলেছিলো বনাঞ্চল।

এই লোকবসতি স্থাপন কিন্তু স্পেন সরকার করেনি। যারা এসেছিলো তারা নিজেদের তাগিদেই এসেছিলো। তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্বও স্পেন সরকার নিচ্ছে না।

এই যে তারা নিজেরা বড় বড় খামার গড়ে তুলেছিলো, তাদের ছিলো কাজের লোকের এবং যন্ত্রপাতির খুব অভাব।

অতএব বড় বড় খামারে কাজ করার জন্য তো শ্রমিক চাই, যন্ত্রপাতি চাই।এগুলো পাওয়া যাবে কোথা থেকে?

তারা নিজেরাই কোনো উৎস থেকে এসব সংগ্রহ করতো। তারা গোপনে আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করতো কৃতদাস। যারা এ শ্রমিক কৃতদাস সরবরাহ করতে পারতো, উপনিবেশবাদীরা তাদের সাথেই ব্যবসা করতো। কারণ তাদের প্রয়োজন। তাই তারা যেকোন উপায়ে তা সংগ্রহ করতো।

তারা স্পেন সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে চোরাই পথে সংগ্রহ করতো কৃতদাস। এই সরবরাহকারীদের অধিকাংশই ছিলো ভিন্ন দেশের লোক। এর মধ্যে ইংরেজরাও ছিলো।

দাস ব্যবসাটা ছিলো যেন খুব চমৎকার ব্যবসা। এক সময় আফ্রিকায় দাস ব্যবসা যে কতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো এটাই ছিলো তার মূল কারণ। আফ্রিকার অধিকাংশ ক্রীতদাস চালান হতো আমেরিকায়। আজকে আমেরিকায় যে কৃষ্ণকায় মানুষের বংশ বিস্তার ঘটেছে এরা ছিলো এই কৃতদাসদেরই বংশধর। আমেরিকায় নিগ্রো



www.nagorikpathagar.org

এসেছে আফ্রিকা থেকেই।

ইংল্যান্ডে সেই সময় জন হকিনস (John hawkins) বলে একজন নাবিক ছিলেন। তিনি দেখলেন--এতো ভারী চমৎকার ব্যবসা। কোনো মতে আফ্রিকা থেকে গরু ভেড়ার মতো এক পাল নিগ্রো ধরে জাহাজ ভর্তি করে আমেরিকায় নিয়ে ফেলতে পারলেই কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ।

কিনতে তো আর পয়সা লাগেনা। শুধু জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পশু শিকারের মতো শিকার করা মাত্র।

এই জন হকিনসই ১৫৬২ সালে আফ্রিকা থেকে দু' জাহাজ নিগ্রো ধরে নিয়ে পাড়ি দিলেন আটলান্টিক। তারপর সবার অলক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়। কালো কৃতদাস নিগ্রোগুলো মুহূর্তে বিক্রি হয়ে গেলো চকচকে সোনার দামে। মহা খুশী হয়ে জাহাজ ভর্তি টাকা নিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে হকিনস ফিরে এলেন নিজের দেশে ইংল্যান্ডে।

শুধু এই একবারই নয়, এর বছর পাঁচেক পরে ১৫৬৭ সালে তিনি আবার একটি ক্রীতদাসের চালান পাঠানোর জন্য যাত্রা করলেন। লোভ তো বেড়ে গিয়েছিলো। আর এমন চমৎকার ব্যবসায় কার না লোভ হয়?

হকিনসের এবারের আয়োজনটা ছিলো আরও বিশাল। এবার জাহাজ ছিলো ছয়টি।

এখানে সবচেয়ে মজার এবং গুরুত্বপর্ণ ঘটনা হলো--এই দ্বিতীয় বারের ব্যবসায় হকিনসের একজন পার্টনার ছিলেন। এই পার্টনার আর কেউ নন। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের অধিকারী স্বয়ং রাণী প্রথম এলিজাবেথ। অবশ্য খুবই গোপনে। স্বয়ং রাণী জড়িত থাকার ঘটনাটি জানতেন শুধু হকিন্স এবং তার প্রধান সহকারী ফ্রানসিস ড্রেক।

চালানের প্রথম পর্বটি ভালো ভাবেই শেষ হলো। হকিনস আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জাহাজ ভিড়িয়ে মনের সুখে নিগ্রো শিকার করতে লাগলেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছয় ছয়টি জাহাজ ভরে ফেললেন কালো আদমি দিয়ে।

তারপর পাড়ি দিলেন আটলান্টিক। পথঘাট আর নিগ্রোবেচার বাজার তার চেনা ছিলো। তাই কোনো কিছুতেই অসুবিধা হলো না তার। এবারও তিনি কালো আদমির বিনিময়ে পেলেন জাহাজ ভর্তি সোনাদানা।

এবার ঘরে ফেরার পালা। সামনে অবশ্য একটা ভয় আছে। সামনের মেক্সিকো উপসাগর আর ক্যারিবিয়ান সাগরটা পাড়ি দিতে পরলেই তবে রক্ষা। এখানেই স্পেনের নৌবাহিনীর জাহাজগুলো রাতদিন টহল দিয়ে বেড়ায়। সামনাসামনি পড়ে গেলে বিপদ হবে।

সত্যিসত্যি সেই বিপদ হলোই। অভিযানের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ভালোভাবে কাটলেও শেষ রক্ষা হলো না।

ওদের জাহাজগুলো মেক্সিকো সাগর ছাড়ানোর আগেই ধরা পড়ে গেলো। স্পেনের টহলরত একটি নৌবাহিনী তাদের দেখে ফেললো। তাদের ঘেরাও করে ফেললো।

হকিনস তখন স্পেন সেনাপতির উদ্দেশ্যে বললেন,- আমরা কোনো ঝগড়া ফ্যাসাদে



www.nagorikpathagar.org

যেতে চাই না। যদি আমাদেরকে ভালয় ভালয় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা স্পেন জাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করবো না কথা দিচ্ছি।

কিন্তু হকিনসের সন্ধি প্রস্তাবের জবাব এলো গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে। স্পেন জাহাজ থেকে শুরু হলো সোজা কামানের গোলাবর্ষণ।

হকিনসের জাহাজগুলো ছিলো বাণিজ্য জাহাজ। আর অস্ত্রশস্ত্র তেমন ছিলো না। অন্তত একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রবল হকিনসের ছিলো না।

তাই হকিন্‌স টিকতে পারলেন না স্পেন–বাহিনীর সামনে। তার বহরের ছয়টির মধ্যে চারটি জাহাজই ডুবে গেলো। কামানের গোলার আঘাতে।

হকিন্‌স আর ফ্রান্সিস ড্রেক কোনো মতে দুটো জাহাজ নিয়ে পালিয়ে এলেন। যা কিছু লাভ হয়েছিলো সব গেলো শেষ হয়ে। এই ঘটনায় শুধু হকিন্‌স আর ফ্রান্সিস ড্রেকই নন, মর্মাহত হলেন স্বয়ং রানী এলিজাবেথও।

তখন ফ্রান্সিস ড্রেকের বয়স ছিলো অল্প। রক্ত ছিলো গরম। এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি সহজে মেনে নিতে পারলেন না।

তখন প্রতিজ্ঞা করলেন--বাকী জীবন ধরেই তিনি এর প্রতিশোধ নিয়ে যাবেন। তিনি সারা জীবন ধরে সংগ্রাম চলিয়ে যাবেন স্পেন সরকারে বিরুদ্ধে। তিনি যেখানে যতো স্পেন জাহাজ পাবেন সব লুট করবেন।

শুধু তিনি নন। এই প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে রানী এলিজাবেথেরও পূর্ণ সমর্থন ছিলো। রানী ফ্রান্সিস ড্রেক এব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করারও আশ্বাস দিলেন। রাণীর সমর্থন পেয়ে ড্রেক আরো শক্তিশালী হলেন। তারপরই শুরু হলো তার প্রতিশোধ অভিযান। ফ্রান্সিস ড্রেক অতি গোপনে দুটো ছোটো আকারের সুসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন মধ্য আফ্রিকার দিকে। মনে তার তখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

তার লক্ষ্য ছিলো মধ্য আমেরিকায় পানামার ইসথাস (Isthus) দখল করা। কারণ এই ইসথাসই হলো প্রধান ঘাঁটি। গোটা আমেরিকার অধিবাসীদের কাছ থেকে স্পেনীয়রা যে ধনদৌলত সোনাদানা লুট করে আনে তা এই ইসথাসে এসেই প্রথমে জড় হয়। তারপর এখানে থেকে জাহাজে করে পাঠানো হয় স্পেনে। তাই ফ্রান্সিস ড্রেকের লক্ষ্য হলো ইসথাস দখল করে মূল ধন–ভান্ডার লুট করা এবং ওদের ঘাঁটি ভেঙে দেয়া।

সত্যি বড় দুঃসাহসী ছিলেন ড্রেক। ১৫৭২ সালে মাত্র দুটো ছোটো জাহাজ এবং সতেরো জন লোক নিয়ে তিনি ইসথাস প্রদেশের নমব্রে ডি ডায়াস নগরী অনায়াসে দখল করেফেললেন।

কিন্তু শহর দখল করলেও ড্রেক সেখানে কোনো সোনাদানা হিরে জহরতের সন্ধান পেলেন না। মাস তিনেক পরে এই শহরেই ফ্রান্সিস ড্রেক সহসা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পেলেন। এতোদিন তার ভয় ছিলো তার লোকবল কম। যদি স্পেন বাহিনী তাকে আক্রমণ করে বসে? কিন্তু এরই মধ্যে ঘটলো আরেক ঘটনা। ফ্রান্সের একটি



www.nagorikpathagar.org

জাহাজ সহায়তায় এগিয়ে এলো। এই জাহাজটিও স্পেন বাহিনীর ভয়ে কোথাও কিছু সুবিধা করতে পারছিলো না ব্যবসা বাণিজ্যে। তখন ড্রেকের সাথে এদের চুক্তি হয়ে গেলো--স্পেন শক্তির মোকাবিলায় এরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।

তাতে দু'পক্ষেরই লাভ।

এর মধ্যে আরও একটি সুযোগ এলো ফ্রান্সিস ড্রেকের। একদল কৃতদাস পালিয়ে এসে যোগ দিলো তাদের সাথে। এই ক্রীতদাসগুলো স্পেনের প্রভুদের দু'চোখে দেখতে পারতো না। এরাও মুক্তির আশায় আশ্রয় নিলো ফ্রান্সিস ড্রেকের কাছে।

এতে আরো শক্তি বৃদ্ধি হলো তার। পরে এই মিলিত বাহিনী নিয়েই তিনি পানামার ইসথাস প্রদেশে জংগলের মধ্য দিয়ে প্রশ্চিম দিকে চলে আসেন। পশ্চিম দিকের এক উঁচু পর্বতের চূড়া থেকে প্রথম দর্শন করেন প্রশান্ত মহাসাগর।

জংগলের মধ্যেই তিনি আরো একটি কাজ করলেন। জংগলে অবস্থান করার সময় তিনি দেখলেন অনেকগুলো গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে এদিকে আসছে। তিনি গোপনে সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন এ গাড়ীগুলোর সবগুলোই সোনাদানা হিরেজহরতে বোঝাই। এগুলো আসছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। যাবে নমব্র ডি ডায়াস বন্দরে। তারপর সেখান থেকে পাঠানো হবে জাহাজে করে স্পেনে। এগুলো স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে লুট করে আনা।

উপনিবেশে স্পেনের একমাত্র বড় ব্যবসাই হলো স্থানীয়দের ধন-সম্পদ লুট আর তা নিয়ে দেশে পাড়ি দেয়া।

স্পেনের নাম শুনেইতো ক্ষেপে গেলেন ফ্রান্সিস ড্রেক। তিনি তক্ষুনি তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেনীয় গুরুর গাড়ী বহরের উপর। তারপর সব লোককে মেরে কেটে নিয়ে এলেন লুট করে।

যে ধন-সম্পদ নমব্রে ডি ডায়াস বন্দর হয়ে স্পেনে যাবার কথা ছিলো সেগুলোই এখন ফ্রান্সিস ড্রেকের ৭০ টনী পাশা (Pasha) এবং ৫০ টনী সোয়ান (Swan) জাহাজে করে চলে এলো ইংল্যান্ডে।

এই ঘটনা কানে গেলো স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের। তিনি তখনই ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এর প্রতিকার চাইলেন এবং এই জলদস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি দানের প্রার্থনাকরলেনা।

রানী এলিজাবেথ অবশ্য মুখে খুবই নিন্দা করলেন ফ্রান্সিস ড্রেকের এবং তার উপযুক্ত শাস্তি দানের আশ্বাসও দিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিছুই করলেন না। কারণ তিনিতো সবই জানতেন এবং তার নির্দেশেই করা হয়েছে এসব। তাই তিনি কি আর ড্রেকের বিচার করতে পারেন? আর তাছাড়া ড্রেক যে ধনরত্ন লুট করে এনেছে, রানী নিজেওতো তার ভাগ পেয়েছেন।

রাণী তাকে কিছুই বললেন না, বরং তাকে আরো জাহাজ আর সৈন্য দিয়ে পাঠালেন নেদারল্যান্ডের (বর্তমানের হল্যান্ড এবং বেলেজিয়াম) বিদ্রোহ দমনের জন্য। তারপরই



www.nagorikpathagar.org

আবার তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সমুদ্র যাত্রায়।

যাতে তাকে আর সহসা বিচারের মুখোমুখি হতে না হয়, স্পেনের রাজার কথার মুখোমুখি হতে না হয় রানীকে–তাই তাকে আবার দেওয়া হলো আড়াল করে।

## ফ্রান্সিস ড্রেকের বিশ্বভ্রমণ।

পানামায় গিয়ে যেদিন পহাড়ের চূড়ায় উঠে ফ্রন্সিস ড্রেক সর্বপ্রথম প্রশান্ত মহাসাগর দর্শন করেছিলেন, সেদিন তার বুকটা এক অনাবিল আনন্দে ভরে গিয়েছিলে। সেদিন তিনি বলেছিলেন--ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এমন বিশাল সাগর দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেদিন আরোও খুশী হবো যেদিন আমি জাহাজ নিয়ে এর বুকে পাড়ি জমাতে পারবো। সেদিন হবে আমার নাবিক জীবনের সার্থকতা।

তারপর সত্যিই তার জীবনে এলো এই স্মরণীয় মুহূর্ত। প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ ভাসানোরসৌভাগ্য।

পৃথিবী যে সত্যি সত্যিই গোল–এই চরম সত্যটি যিনি হাতেকলমে প্রথমে প্রমাণ করেছিলেন তিনি হলেন নাবিক ম্যাগেলান। তিনিই প্রথম পশ্চিম দিকে যাত্রা করে আবার পূর্বের স্থানে ফিরে এসেছিলেন। প্রমাণিত হয়ে ছিলো পৃথিবী গোল। ফ্রন্সিস ড্রেকও তাই ম্যাগেলানের পথ ধরে যাত্রা করতে চান। তার ধারণা ইংল্যান্ডের প্লিমাউথ থেকে সোজা পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে অবশ্যই চীন এবং ভারতবর্ষে পৌছানো যাবে।

ফ্রান্সিস ড্রেক



www.nagorikpathagar.org

ফ্রান্সিস ড্রেক তার এই বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করে ১৫৭৭ সালে। তার এই সমুদ্র যাত্রার লক্ষ্য ছিলো দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনিশ কলোনীর বাহিরে অবস্থানকারী লোকদের সাথে ইংরেজদের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে আরো কোন অজ্ঞাত মহাদেশ বা দ্বীপ আছে কিনা তার অনুসন্ধান করা। এভাবেই ক্রমাগত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে দূর প্রাচ্যে পৌছানো।

ফ্রান্সিস ড্রেক প্রথম যাত্রা করেন ১৫৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সমুদ্র যাত্রায় তার জাহাজের সংখ্যা ছিলো ৫টি এবং নাবিক ছিলো ২০০ জন। প্রধান জাহাজটির নাম ছিল পেলিক্যান (Pelican)। পরে অবশ্য ড্রেক তার জাহাজের নাম পাল্টে রাখেন দি গোল্ডেন হিন্ড (The Golden Hind)। এই গোল্ডেন হিন্ড ছিলো সত্যি মস্তবড় একটি জাহাজ। এর ধারণক্ষমতা ছিলো ১০০ টন।

সমুদ্র যাত্রাটিও হয়েছিলো সম্পূর্ণ রানী এলিজাবেথের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থসাহায্যে। এবারও ড্রেকের সাথে রানীর একটি ভাগাভাগি চুক্তি হয়েছিলো।

এই যাত্রায় ড্রেক যা কিছু লাভ করুক, সে নগদ অর্থই হোক আর দেশ-মহাদেশই আবিষ্কৃত হোক, তার অর্ধেক পাবেন ড্রেক আর বাকী অর্ধেক পাবেন স্বয়ং রানী। বিনিময়ে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন রানী।

ফ্রান্সিস ড্রেক প্রথমে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা চলে এলেন দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে। তিনি একটানা জাহাজ চালিয়ে ১৫৭৮ সালের বসন্তকালে এসে জাহাজ ভেড়ালেন ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে।

এই চার মাসের সমুদ্রযাত্রায় ড্রেক তাঁর অভিযানের প্রাথমিক পর্ব শেষ করলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁকে অনেক গুলো প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে হয়েছিলা। তার এই আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার সময় খুব ভালভাবে কাটেনি। জাহাজে দেখা দিয়েছিলো নাবিক বিদ্রোহ। কিন্তু ফ্রান্সিস ড্রেক অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন এইবিদ্রোহ।

বিদ্রোহের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সে ছিলো তারই মামাতো ভাই থমাস ডফটি। আসলে গোটা ষড়যন্ত্র ছিলো ডফটির নিজের। তার মতলব ছিলো নানা কথা বলে যদি ড্রেকের বিরুদ্ধে নাবিকদের ক্ষেপিয়ে তোলা যায় তখন তাকে মেরে সে নিজেই হর্তে পারবে জাহাজের ক্যাপটেন।

কিন্তু অপরিণামদর্শী ও লোভী ডফটি শেষ সামাল দিতে পারলো না। ড্রেকের ব্যক্তিত্বের কাছে সে দাঁড়াতে পারলো না। পরাজিত হলো নিজেই। শুধু পরাজিত নয়। ফ্রান্সিস ড্রেক ছিলেন সত্যি এক ভিন্ন মানুষ। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী ও শক্তিশালী, তেমনি ছিলেন নির্দয় ও নির্মম। কঠোর ছিলো তার আইন শৃঙ্খলা, কেউ তার মুখের উপর কথা বলুক-এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

তিনি নিজের ভাইকেও ক্ষমা করলেন না। নির্মমভাবে তিনি নিজের হাতেই হত্যা করলেন নিজের বিদ্রোহী ভাইকে। শুধু ভাই নয়, তার সাথে আরো যারা যারা জড়িত





www.nagorikpathagar.org

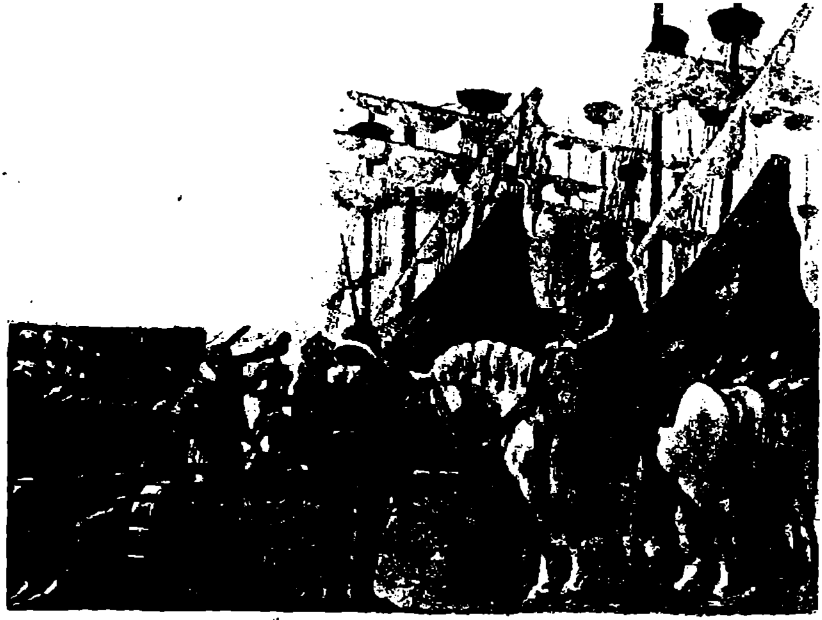

রাণী প্রথম এলিজাবেথ নিজে এসে ফ্রান্সিস ড্রেকের সমুদ্র যাত্রার আয়োজন করে দিচ্ছেন।

ছিলো তাদেরও তিনি রেহাই দিলেন না। সবাইকে হত্যা করে ফেলে দেয়া হলো আটলান্টিকের বুকে।

যতক্ষণ না তার বিশ্বাস হলো এবার আর জাহাজে তার বিপক্ষ কেউ নেই, ততক্ষণই চললো তার হত্যালীলা। পাঁচটি জাহাজের দুটো ছিলো খাদ্য ভর্তি। শেষে এমন হলো যে, এই খাদ্য বোঝাই জাহাজ দুটো চালাবারই আর কোন লোক থাকলো না।

বিদ্রোহ দমন করে তিনি এসে জাহাজ ভেড়ালেন ব্রাজিলের তীরে। এরপর ১৫৭৮ সালের ২১শে আগষ্ট তিনি প্রবেশ করলেন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ম্যাগালান প্রণালীতে (Straits of Magellan)।

উল্লেখ্য যে, প্রণালীটি আবিষ্কার করেছেন নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাগালান এবং তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

ম্যাগালান প্রণালী পার হতেই তার লেগে গেলো প্রায় ১৬ দিন। এরপরে তিনি গিয়ে পড়লেন প্রশান্ত মহাসাগরে।এবারই শুরু হলো তার সত্যিকার সমুদ্র যাত্রা। বহুদিনের স্বপ্নের সাগর প্রশান্ত মহাসাগর।

তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েই ডায়েরীতে লিখলেন-'এ এক সুবিশাল সাগর- এখানকার বাতাস এবং ঝড় তুফান সকলি মনে হয় আমাদের প্রতিকূলে। তবু আমরা সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবো সামনের দিকে-'



www.nagorikpathagar.org

কিছুদূর যাবার পরই ফ্রান্সিস ড্রেকের জাহাজগুলো প্রবল ঝড়ের কবলে নিপতিত হয়। পুরো একদিন ধরে চললো ঝড় তুফান। এই তুফানে তার জাহাজ বহর থেকে প্রধান সহকারীর জাহাজটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

যখন ঝড় নামলো তখনো প্রধান সহকারী তাদের বহরের অন্য জাহাজগুলো আর দেখতে পেলেন না। তখন তার ধারণা হলো হয়তো অন্য জাহাজ সবগুলোই ডুবে গেছে মারা গেছে ক্যাপ্টেন ড্রেকসহ সকলে।

তাই এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর নিয়ে তিনি ফিরে চললেন লন্ডনে। এদিকে প্রধান বহরসহ ফ্রান্সিস ড্রেক ভাবলেন হয়তো তাঁর বহরের একটি জাহাজ ডুবে গেছে। যে জাহাজে ছিলো তাঁর প্রধান সহকারী।

কিন্তু ড্রেক ফিরলেন না। ঝড় থামার পর আবার তিনি চলতে লাগলেন দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল ধরে। ড্রেক তার জাহাজ নিয়ে ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমনি সময়ে ঘটলো আরেক ঘটনা।

ড্রেক আক্রমণ করে বসলেন স্পেনের জাহাজ।



www.nagorikpathagar.org

তিনি দেখলেন একটি বাণিজ্য জাহাজ এগিয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে। দেখেই চিনতে পারলেন এটা স্পেনিশ শীপ। হয়তো পানামা থেকে হিরে মণিমানিক্য বোঝাই করে যাচ্ছে নিজের দেশে স্পেনে। ম্যাগেলান প্রণালী ঘুরে যাবে।

স্পেনের জাহাজ দেখেই সাহসা আবার গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠলো তার। আবার মনের ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো সেই ঘুমন্ত হিংস্র দানবটা

তিনি সহজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন স্পেনীয় জাহাজটি লুট করবেন। কারণ জাহাজটি ছিলো সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এপাশে স্পেনের নৌবাহিনীর কোনো জাহাজ থাকে না আর জাহাজটিও একা। যদিও জাহাজটি তার গোল্ডেন হিন্ড এর থেকে বড়, তবু ড্রেকের মতো দুর্ধর্ষ লোকের পক্ষে স্পেনীয় জাহাজটিকে কাবু করা অসুবিধা হবে না।

যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি সোজাসুজি গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালেন স্পেনীয় জাহাজটির। তারপর কোনো রকম সতর্ক সংকেত না দিয়েই অকস্মাৎ শুরু করলেন গোলাবর্ষণ।

স্পেনের জাহাজটি সত্যি সত্যি সোনাদানা হিরে জহরতে ছিলো পরিপূর্ণ। আর তাছাড়া ওদের সাথে তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিলো না।

আসলে ওদের হিসেবেই ছিলো ভুল। ওদের ধারণা ছিলো পানামার পশ্চিম উপকূল ধরে এগিয়ে গেলে কোনো জলদস্যুদের সামনে পড়ার ভয় নেই। কারণ এদিক দিয়ে কেউ কখনো আসে না। এটা হলো বাইরের পথ এবং নির্জন পথ। জাহাজ চলাচল আটলান্টিক মহাসাগর অঞ্চলেই হয়।

তাই এই দিক দিয়ে যেতে পরলে তেমন ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু এমন অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়তে হবে তা ভাবতেই পারেনি। তাই তারা আক্রান্ত হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লো। আর কিছু বুঝে ওটার আগেই ফ্রান্সিস ড্রেক প্রচন্ড গোলা বর্ষণ করে স্পেনীয় জাহাজের পাল ও মাস্তুল ভেঙেচুরমার করে দিলেন।

প্রচন্ড ঝটিকা আক্রামণ চালিয়ে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেললেন স্পেনীয় জাহাজটিকে। ওদের মেরে-কেটে একেবারে দিলেন শেষ করে। একজন লোকও জীবিত রইলো না স্পেনের জাহাজের। তারপর দেখলেন সত্যি অবাক কান্ড। স্পেনীয় জাহাজটি সত্যি সত্যি পরিপূর্ণ ছিলো সোনা হিরে জহরতে। ঐতিহাসিকগণ বলেন---এই দস্যুবৃত্তি করে ফ্রান্সিস ড্রেক যে ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন তার ভারে তাঁর নিজের জাহাজ গোল্ডেন হিন্ড ডুবে গিয়ে ছিলো আরো একহাত।

অর্থাৎ এতো এতো সোনা ছিলো যে সবগুলো যখন তুলে এনে ফ্রান্সিস ড্রেকের নিজের জাহাজে বোঝাই করা হলো, এখন দেখা গেলো তার জাহাজটি মালের ভারে আগের তুলনায় একহাত নিচের দিকে ডুবে গেছে। এতো প্রচুর ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন তিনি।

শুধু এশ্বর্য নয়, এই স্পেনীয় জাহাজ থেকে তিনি প্রচুর খাবারও পেয়েছিলেন। তার প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়াতে যথেষ্ট সাহায্য করছিলো। পূরণ হয়েছিলো খাদ্য ঘাটতি।

এরপর তিনি জাহাজ নিয়ে আরো উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন। একেবারে ৪৮ ডিগ্রী



www.nagorikpathagar.org

উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন।

এদিকে আসার তার অবশ্য একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করা যায় কিনা তা খুঁজে দেখা।

কিন্তু তিনি এই অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন। কারণ প্রচন্ড শীত আর জমে থাকা বরফের চাঁই ও হিমশৈল ডিঙিয়ে তার পক্ষে আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। অত:পর তিনি সে আশা পরিত্যাগ করেন।

অবশেষে তিনি আবার দক্ষিণ দিকে ফিরতে শুরু করেন। তবে কিছুদূর এসেই উত্তর আমেরিকার একটি জায়গা আবিষ্কার করেন এবং রাণী এলিজাবেথের নামে দখল করেন। নাম দেন নিউ এ্যালবিয়ন (New ALbion)

এখানে ফ্রান্সিস ড্রেকের আরো একটি কৃতিত্ব হলো তার আগে উত্তর আমেরিকার বিশেষ করে বর্তমান কানাডার উশ্চিম উপকূল ধরে এতো উত্তরে আর কেউ যেতে পারেননি। ইউরোপীয়দের মধ্রে ফ্রান্সিস ড্রেক প্রথম ব্যক্তি যিনি উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে এতোটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এবার তিনি শুরু করলেন তার মুল অভিযান। এবার তার জাহাজ চলতে শুরু করলো সোজা পশ্চিম দিকে। পাড়ি দিতে হবে প্রশান্ত মহাসাগর। একটানা চলতে লাগলো ফ্রান্সিস ড্রেকের জাহাজ। দিনের পর দিন এগিয়ে চললো গোল্ডেন হিন্ড পশ্চিম দিকে।

এরমধ্যে আর তাদের কোনো ডাঙা চোখে পড়েনি। তারা সর্বপ্রথম ডাঙার দেখা পেলেন ১৫৭৯ সালের জুলাই মাসে। যাত্রা শুরুর করার ৬৮ দিন পরে।

এই দীর্ঘদিন পর তারা যে দ্বীপটির দেখা পেয়েছিলেন সেটি ছিলো প্যালাও দ্বীপপুঞ্জের একটি নির্জন ও ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখান থেকে তারা আরো পূর্বে এসে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশকরেন।

ড্রেক এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেরই মালোকাস (Moluccas)নামে একটি দ্বীপে আসেন এবং এই দ্বীপের রাজার সাথে সাক্ষৎ করেন।

রাজা ফ্রান্সিস ড্রেককেও খুব সাদরে গ্রহণ করেন। ড্রেক এই রাজ দরবারে কিছু কাল অবস্থান করেন এবং রাজার সাথে ইংল্যান্ডের মশলার ব্যবসা বিষযে একটি চুক্তিপত্র করেন। এখন থেকে ইংল্যান্ডের বণিকেরা মোলাক্কা দ্বীপে এসে মশলার ব্যবসা করতেপারবে।

এরপর তিনি আসেন জাভা দ্বীপে। এই জাভা দ্বীপেও কিছুকাল অবস্থান করে। ফ্রান্সিস ড্রেক এবার জাহাজ ভাসালেন পশ্চিম দিকে। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এলেন আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে। উত্তমাশা অন্তরীপে।

এরপর আরো পশ্চিম দিকে এসে পৌছে গেলেন ম্যাগালান প্রণালীতে। দীর্ঘ দু'বছর পরে ফ্যান্সিস ড্রেক তার পৃথিবী পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে ফিরে এলেন পূর্বের স্থানে।

যখন তিনি যাত্রা শুরু করেন তখন তার জাহাজের নাবিক ছিলো ১৫৬ জন। কিন্তু যখন দু'ছরের সমুদ্রযাত্রা শেষ হলো তখন তার জাহাজে নাবিক ছিলো মাত্র ৫৬ জন।



www.nagorikpathagar.org

বাকী ১০০ জনের মধ্যে কিছু মারা পড়েছিলো আর কিছু কিছু রয়ে গিয়েছিলো বিভিন্ন দ্বীপে। বিশেষ কাজে মোলকাস রাজার দরবারে এবং জাভা দ্বীপে।

ম্যাগেলান প্রণালী পর্যন্ত পৌছে বিশ্বভ্রমণ শেষ করে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন স্বদেশের পথে। তিনি ইংল্যান্ডের প্লীমাউথ বন্দরে এস পৌছিলেন ১৫৮০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

এই সময় তার জাহাজ পরিপূর্ণ ছিলো ধনরত্ন আর মশলাপাতিতে। রাণীকে বড় রকমের হিস্যা দেবার পরও তার ভাগে যা পড়লো তাতেই তিনি লন্ডনের মধ্যে একজন অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।

শুধু ধন-সম্পদ নয়,এই বিশ্বভ্রমণে কিন্তু তার একটি কৃতিত্বও অর্জিত হয়েছিলো। তিনি নৌপথে বিশ্বভ্রমণ করে এসেছিলেন।।

অবশ্য তার আগেও স্পেনীয় নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান বিশ্বভ্রমণ করেছেন। সে দিক থেকে বিচার করলে তিনিই সর্ব প্রথম বিশ্বভ্রমণকারী ব্যক্তি।

কিন্তু তা হলেও ম্যাগেলানের একটি ক্রুটি ছিলো। তিনি পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে জীবিত ফিরে আসতে পারেননি। তার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। তার সাথীরা মিশন শেষকরেন।

কিন্তু ফ্রান্সিস ড্রেকই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেই পৃথিবী পরিভ্রমণ করে জীবিত ফিরে আসতে পেরেছেন; সেদিক থেকে বিচার করলে তারও একটি কৃতিত্ব দাঁড়িয়ে যায়।

এছাড়া ইংরেজ নাবিকদের মধ্যেও তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ নিয়ে গেছেন।

যদিও ফ্রান্সিস ড্রেকের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ছিলো স্পেন সরকারের কাছে তিনি ছিলেন 'কুখ্যাতজলদস্যু'।

তার বিরুদ্ধে স্পেন সরকার ইংল্যান্ডের রানীর কাছে বহুবার বহু অভিযোগ উথাপন করছেন, কিন্তু রাণী তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। বরং তাকে আরো পুরস্কৃত করেছেন নানাভাবে। রাণী তাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছেন পূর্ণ সহযোগিতা।

এবার ফিরে আসার পরও স্পেন সরকার ফ্রান্সিস ড্রেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। স্পেনের সরকারী বাণিজ্য জাহাজ লুট এবং নরহত্যার অভিযোগে তার ফাঁসি দাবী করেন। কিন্তু রাণী তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না বরং বিশ্বভ্রমণ করে ইংরেজ জাতির মুখোজ্জ্বল করার জন্য তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হলো পুরস্কৃত এবং দেয়া হলো নাইট উপাধি। এবং কিছু দিন পরেই তাকে (১৫৮১ সালে) প্লীমাউথের মেয়র নিযুক্ত করা হয়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্পেন সরকার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবতে লাগলো। রানী তৎক্ষণাৎ (১৫৮৫সালে) ২৫টি যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে পাঠালেন ড্রেককে। দুঃসাহসী ড্রেক এই মিশনেও সাফল্য লাভ করেন। স্পেনের নৌযুদ্ধ ঘোষণার আগেই আক্রমণ করে সব চুরমার করে দিলেন।



www.nagorikpathagar.org

স্পেনের নাবিকদের সাথে ড্রেক কথা বলছেন।

এরপর পুর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তারপর আর তিনি কোনো বড় অভিযানে যাননি। প্লীমাউথেই থাকতেন।

দীর্ঘদিন পর ১৫৯৫ সালে ফ্রান্সিস ড্রেক এবং হকিন্সকে আবার পাঠানো হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। তিনি পানামার নমব্রে ডি ডায়াস বন্দর আবারও দখল করেন। কিন্তু তবু এই প্রথমবারের মতো তার পরাজয় হলো। তার নিজের দলের লোকেরাই তার বিরোধিতা করলো। শুধু তাই নয়, তাকে নিরস্তও করা হলো।

তখন অবশ্য তার পূর্বের সেই তেজ ছিলো না। বয়স বেড়ে গিয়েছিলো। দেহের ও মনের জোরও কমে এসেছিলো।

তাই এই বিদ্রোহ দমন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অপমানিত অবস্থাতেই তিনি পানামার পুর্টোবেলো (Puerto Bello) শহরে ২৮ শে জানুয়রী তারিখে মৃত্যুবরণকরেন।



www.nagorikpathagar.org

# অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার

প্রায় চল্লিশ লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেছিলেন তার সঠিক কোনো নাম বা তারিখ নেই।

অবশ্য অনেক আগে থেকেই লোকে জানতো যে দক্ষিণ গোলার্ধে একটি মস্তবড় দেশ আছে। কিন্তু দেশটি কি? কোথায় তার সঠিক অবস্থান? কিংবা ওখানে কারা বাস করে তার কোনো হদিস কেউ জানে না। তাদের সবই ছিলো অনুমান মাত্র।

সেই পালতোলা জাহাজের যুগে যখন ইউরোপের নাবিকরা নতুন দেশের সন্ধানে এবং মশলার সন্ধানে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতেন, তারাই হয়তো কেউ প্রথম দেখেছিলেন এই বিশাল ভূ-খণ্ডটাকে। তবে কোন্ দেশের নাবিকরা প্রথম অস্ট্রেলিয়া দর্শন করেছিলেন, তা নিয়ে মত বিভেদ আছে। ইংল্যাণ্ড, স্পেন পর্তুগাল এবং ফ্রান্স সবদেশে নাবিকরাই প্রথম অস্ট্রেলিয়া দেখেছিলেন। তারা নিজ নিজ দাবীর প্রেক্ষিতে কিছু কিছু তথ্য প্রমাণাদিও হাজির করেছেন। তবু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন—এই দাবীদারদের মধ্যে পর্তুগীজদের দাবীই বেশী যুক্তিসংগত।

তারা মনে করে খুব সম্ভবত ১৫২৪ থেকে ১৫৪২ সালের মধ্যে পর্তুগীজদেরই কোনো নাবিক সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন,- বাইনল ডি গোনেভিল (Binol de gouneville) নামে জনৈক ফরাসীই সবার আগে ১৫০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেন।

তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মশলার দেশ ভারতে আসার চেষ্টা করেছিলেন—এই সময় মাদাগাস্কারের কাছে এসে তার জাহাজ প্রবল ঝড়ের কবলে নিপতিত হয়।

এই ঝড়ই জাহাজটি কোন দিকে নিয়ে যায় ঠেলতে ঠেলতে। ঝড় যখন থামলো, তখন দেখতে পেলেন তার জাহাজ এসে ঠেকেছে মস্তবড় একটি ভূ-খণ্ডের তীরে, বিশাল মরুময় একটি দেশ। তিনি দাবী করেন এটাই হলো দক্ষিণ গোলার্ধের সেই কথিত দেশটি।

অনেকে অবশ্য তার কথা বিশ্বাস করেননি। তারা বলেন—গোনেভিল মিথ্যে কথা বলেছেন। তিনি কখনোই আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মাদাগাস্কার দ্বীপ ছাড়িয়ে যাননি।

এরপর এলেন-অ্যালভারো মেণ্ডালা ডি নেয়ারা (Alvaro Mendalade Neyra) নামে অপর এক নাবিক। তিনি এসেছিলেন পেরু থেকে। দেশ থেকে বিশ্ব ভ্রমণে আসার সময় তাকে বলে দেয়া হয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে যে দ্বীপ বা দেশের সন্ধান পাবেন সেটাই পেরু সরকারের নামে দখল করবেন।

তিনি ঘুরতে ঘুরতে প্রশান্ত মহাসাগরে সত্যি সত্যি একটি নতুন ভূ-খণ্ডের সন্ধান পেয়েও গেলেন। তিনি ভাবলেন দেশটি হয়তো একটা আস্ত মহাদেশ হবে।

উল্লেখ্য যে, মেণ্ডেলা যে দেশটির সন্ধান পেয়েছিলেন—এটি ছিলো আসলে আধুনিক সলোমন দ্বীপ পুঞ্জ। তখন অবশ্য এর কোনো নাম ছিলনা। তিনিই প্রথম এটি আবিষ্কার করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেননি।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে দেশে ফিরে এলেন মেণ্ডেলা। সংগে করে নিয়ে এলেন স্বরচিত এক রূপকথার গল্প। দেশে ফিরে এসে সবাইকে এক আজব গল্প বলে



www.nagorikpathagar.org

বেড়াতে লাগলেন। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন তিনি যে দেশটি আবিষ্কার করেছেন ওখানেই ছিলো বাদশা সোলায়মানের রত্নখনি। এখান থেকে মণিমানিক্য এনেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন জেরুজালেম প্রাসাদ।

পরে অবশ্য তাঁর গল্প-গল্পই থেকে গেছে। তবু তার নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে দ্বীপটির নাম করণ করা হয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।

সেই আদিকালে পর্তুগীজ নাবিকরা অস্ট্রেলিয়ার একটি মানচিত্রও অংকন করেছিলেন। পরে পর্তুগীজদের এই মানচিত্র নকল করে ফরাসী এবং ওলন্দাজরা।

এরপর যিনি অস্ট্রেলিয়ার সন্ধানে এসেছিলেন তিনি হলেন পেড্রো ফার্নান্ডেজ কুইয়াস (Pedru Ferrnandes quias) নামে জনৈক স্পেনীয় নাবিক।

তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটি দ্বীপের সন্ধান পান। তিনি মনে করেছিলেন এটাই হয়তো সেই বড় মহাদেশটি। তাই তিনি এর একটা নামও দিলেন। নাম দিলেন অস্ট্রেলিয়া।

তবে মজার ব্যাপার হলো তিনি যে দ্বীপটির নাম অস্ট্রেলিয়া দিয়েছিলেন, ওটা ছিলো আসলে নিউ হেব্রাডিস দ্বীপ।

পরে অবশ্য তিনি সত্যি সত্যি অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তিনি নন। একাজটি করেছিলেন তাঁরই দলের লোক লুই ভেইজ দ্য টরেস (Louis Vaez de Torres).

টরেস একটি ছোট জাহাজ নিয়ে নিউগিনির উপকূল ধরে এগুতে ছিলেন। খুব ভয়ে ভয়ে। কারণ জায়গাটি ছিলো খুব বিপদসংকুল এবং ঝড়ো হাওয়াপূর্ণ।

এমনি করে চলতে চলতে তিনি একটি প্রণালীতে এসে পৌঁছোন। এই প্রণালীটি ছিলো প্রায় সোয়াশো কিলোমিটারের মতো চওড়া।

এই প্রণালীটিরই এক পাশে ছিলো নিউগিনি এবং অপর পাশে ছিলো অস্ট্রেলিয়া।

টরেস দূর থেকেই অস্ট্রেলিয়া দর্শন করলেন। কিন্তু নিকটে যেতে পারলেন না। তার জাহাজের নাবিকরা এই বিপদসংকুল পথে এগোতে সাহস করলো না। অগত্যা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ফিরতে হলো।

তিনি দূর থেকে দেখেছিলেন –উঁচু পাহাড় ঘেরা একটি বিশাল ভূ-খণ্ড।

পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে তিনি দূর থেকে যে পাহাড় দেখেছিলে-ওগুলো ছিলো অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের পাহাড়।

এই সময়ে সেখানে একটি ওলন্দাজ জাহাজও এসেছিলো। টরেসতো ভয়ের চোটে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নামতে সাহস করেননি। কিন্তু ওলন্দাজ নাবিকরা সাহস করে গিয়েছিলো আরো এগিয়ে।

তারা অস্ট্রেলিয়ার তীরে গিয়েই জাহাজ ভিড়িয়েছিলো। কিন্তু তার পরিণামও হয়েছিলো মারাত্মক। যেই জাহাজ থেকে তীরে নামতে গেলো অমনি ঝোপের আড়াল থেকে স্থানীয় আদিবাসীরা বিষাক্ত তীর ছুড়তে লাগলো তাদের লক্ষ্য করে। ওরা মারা পড়তে লাগলো একের পর এক।

শেষে নতুন দেশে পা ফেলা আর হলো না তাদের। অনেক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে অনেক সংগী সাথীকে হারিয়ে জান নিয়ে পালাতে হলো তাদেরকে।

ওদের এই পরিণতি দেখে টরেস এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। আর এগোতে সাহস হলো না তার।

এরপর কেটে গেলো প্রায় বছর দশেক। এবার এলেন আরো এক ওলন্দাজ নাবিক। নাম ছিলো তার ক্যাপ্টেন ডার্ক (Dark)। ডার্ক ছিলেন খুবই সাহসী।



www.nagorikpathagar.org

ডার্ক তাঁর জাহাজ নিয়ে এসে সরাসরি নেমে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার কূলে। তবে তিনি জাহাজ ভিড়িয়ে ছিলেন জনমানব শূন্য মরু অঞ্চলে।

এদিকে স্থানীয় আদিবাসীদের কোন ভয় ছিলনা। তিনি এই মরুঅঞ্চলে নেমে এক মজার কাজ করলেন। তিনি যে এখানে এসেছিলেন তার একটা চিহ্নতো রাখা চাই।

তাই মাটিতে একটি খুঁটি পুঁতলেন। তারপর খুঁটির গায় পেরেক দিয়ে আঁটকে দিলেন একটি টিনের থালা। থালার উপর লিখলেন নিজের নাম। তার নিজের পরিচয় এবং তারিখ দিলেন ১৬১৬ সালের ২৫ শে অক্টোবর। এই তারিখে তিনি এখানে এসেছিলেন।

তারপর কেটে গিয়েছিলো আরো সুদীর্ঘকাল। দীর্ঘ একাশি বছর ধরে ডার্কের টিনের থালাটি তেমনি ছিলো। তার নামটাও মুছে যায়নি। কেউতো এদিকে আসেনি। তাই যেমন রেখেছিল তেমনি ছিলো।

একাশি বছর পরে এলো আরেক ওলন্দাজ নাবিক। ক্যাপ্টেন ভ্লীমিং (Vlimming).

তিনিও ঠিক ডার্কের একই জায়গায় এসে জাহাজ ভেড়ালেন, তারপর তীরে নেমে মরু অঞ্চলের বালুতে পোঁতা ডার্কের খুঁটিটা খুঁজে পেলেন। পুরনো হয়ে গেলেও জিনিসটা ছিলো।

কারো হাত পড়েনি, শুধু ঝড়বৃষ্টিতে যা কিছু নষ্ট হয়েছে; নাম ঠিকানা সবই পড়তে পারলেন তিনি।

কিন্তু তারপরই তার মাথায় এলো এক দুষ্টু বুদ্ধি। তিনি ডার্কের খুঁটিটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক সেখানেই নিজের নাম ঠিকানা ও তারিখ লেখা আরেকটি খুঁটি পুতে দিলেন। ভ্লীমিং এসেছিলেন ১৬৯৭ সালে।

অবশ্য এরপর থেকেই অস্ট্রেলিয়া নামের এই মহাদেশটির কথা সভ্য সমাজের কাছে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে। নানা দেশের নাবিক আসতে থাকেন একের পর এক।

কিন্তু কেউই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করতে পারেননি। এর প্রধান কারণ দেশটার অধিকাংশ হচ্ছে বালুময় মরুভূমি। মূল্যহীন মাটি।

তবু এর মধ্যে যেটুকু আছে সেখানেও ভিনদেশীরা সহজে প্রবেশ করতে পারছিলোনা। স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে তারা এঁটে উঠতে পারছিলেন না। অনেকেই আদিবাসীদের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন। মারা পড়ছিলেন অনেকে। এমনি করে কেটে গেলো শতবর্ষ।

এরপর একে একে আসতে শুরু করেন ইংরেজ নাবিকরা। যে সব ইংরেজ নাবিক অস্ট্রেলিয়া অভিযান করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের(১৬৫২-১৭১৫)।

লোকটা ছিলেন একজন ডাকাত। জলদস্যু। পালতোলা জাহাজ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এক সাগর থেকে আরেক সাগরে। আর ফাঁক পেলেই জাহাজ লুট করে কেড়ে নিতেন তাদের যথাসর্বস্ব।

এই ড্যাম্পিয়েরই ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে। তার এই অভিযানের কাহিনী নিয়ে তিনি একটি বইও লিখেছেন। তার বইতেই লেখা ছিলো এসব কথা।

ড্যাম্পিয়ার কিন্তু ইতিহাসে আরো একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সে ১৭০৩ সালের ঘটনা।



www.nagorikpathagar.org

ড্যাম্পিয়ের জাহাজে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে একজন অল্পবয়স্ক নাবিক ছিলো। ড্যাম্পিয়ারের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ঠ হয়ে সে জাহাজে বিদ্রোহ করে। তখন ড্যাম্পিয়ার তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জয়নি ফারাণ্ডেজ নামে একটি পর্বতময় নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দেন।

শেলকার্ক এই নির্জন দ্বীপেই একাকী চার বছর কাটিয়ে ছিলেন। তারপর অন্য একটি জাহাজের নাবিকরা তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তারপর এই শেলকার্কের কাহিনী শুনেই বিখ্যাত লেখক ড্যানিয়েল ডিফো একটি বই লেখেন। এটাই গোটা বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমরগ্রন্থ—'রবিনসন ক্রুসো'।

কিন্তু ড্যাম্পিয়ার তার বইতে অস্ট্রেলিয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। তিনি লিখেছেন অস্ট্রেলিয়া নামের এই দেশটি হলো সম্পূর্ণ রুক্ষ মরুময় একটি দেশ। এখানে কোনোকালে ফসল ও ফল ফলেনা। এমনকি গাছ হয়না।

এ ছাড়া উপকূল ভাগও খুবই বিপদসংকুল। এখানে আছে নানা রকম দৈত্য দানো আর ভূত প্রেতের আড্ডা।

পরে প্রমাণিত হয়েছে ড্যাম্পিয়র ভূত প্রেত বলতে যাদের বুঝিয়ে ছিলেন এরা হলো অস্ট্রেলিয়ার বিচিত্র দর্শন ও হিংস্র আদিবাসী।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণার যিনি অবসান ঘটান তিনি হলেন বিখ্যাত নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক।

জেমস কুকই সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়ার উর্বর ও সবুজ শ্যামলিমাময় পূর্ব উপকূল আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে দেশটা সম্পর্কে আগে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সত্যি নয়। এর সবটাই রুক্ষ আর মরুময় নয়। এখানেও আছে উর্বর মাটি আর বিচিত্র সব জীবজন্তু, পাখ-পাখালিতে পূর্ণ অঞ্চল। আসলে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সত্যিকার রূপ।

এরপর থেকেই সভ্য জগতের মানুষের দৃষ্টি পড়ে অস্ট্রেলিয়ার উপর। একে একে আসতে থাকে লোকজন। গড়ে উঠতে থাকে লোকবসতি। অস্ট্রেলিয়ার লোক বসতি হওয়ার পেছনে ক্যাপ্টেন জেমস কুকেরই আছে সবচেয়ে বড় অবদান।



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# মেরু অভিযান

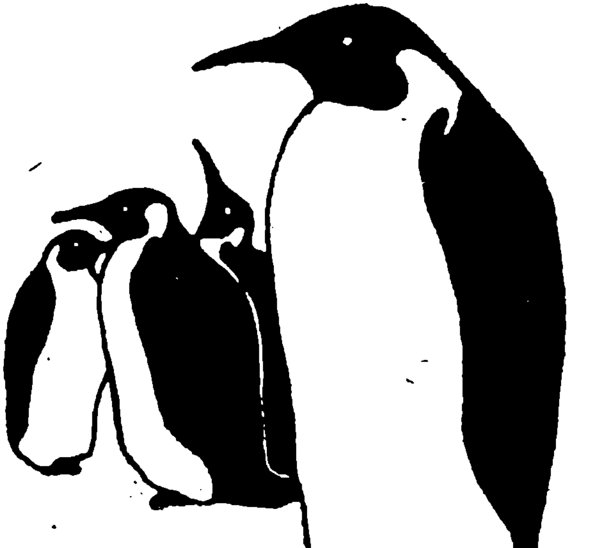



www.nagorikpathagar.org

## উত্তর মেরু অভিযান

উত্তর মেরুকে ভূগোলের ভাষায় বলা হয় সুমেরু। এখানেই পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দুর অবস্থান। ৯০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা। প্রচণ্ড শীতে ঘেরা আর ধব্‌ধবে তুষারে ঢাকা এই অঞ্চলটিই হলো উত্তর মেরু।

পৃথিবীর আরেকটি রহস্যময় কেন্দ্রবিন্দু আছে যেটি রয়েছে পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। উত্তর মেরুর মতোই তারও একটি ভৌগোলিক নাম আছে- কুমেরু। এখানেই পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুবিন্দুর অবস্থান। ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখা।

পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় এবং দুর্গম অঞ্চলই হলো এই দুটো মেরু বিন্দু। এই বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে এসেও মানুষের কাছে আজো সবচেয়ে রহস্যময় ও দুর্গম অঞ্চল হচ্ছে মেরুদ্বয়। মানুষ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেছে সেই মৃত্যুভয়াল দুর্গম পথে পাড়ি জমাবার। কিন্তু পারেনি সহজে।

এই দুর্গম পথে পা বাড়াতে মানুষের ব্যর্থতা এসেছে, সাহস হারায়নি। যতোবার ব্যর্থ হয়েছে ততোবারই নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। দুর্গম পথে। তারপর একদিন পরাজয় স্বীকার করেছে সেই দুর্গম পথও। মানুষের দুর্জয় মনের কাছে অবশেষে হার মেনেছে যুগযুগের অজেয় তুষারপ্রান্তর।

কিন্তু মানুষের দুর্গম পথ ভাঙার সেই যে বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর কাহিনী, কেমন করে মানুষ মৃত্যুকে অবহেলায় আলিঙ্গন করে এগিয়ে গেছে দুস্তর প্রান্তরে তা ভাবতে গেলেও বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে আসে। অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের কতো যে তীব্র এসব ব্যক্তিদের না দেখলে সহজে তা বিশ্বাস করা যায় না।

দক্ষিণ মেরুর অবস্থান মানুষ বসতি থেকে বহু দূরে। একেবারে ভিন্ন একটি পরিবেশে। কিন্তু উত্তর মেরু বা সুমেরু অঞ্চল মনুষ বসতিরই লাগোয়া অঞ্চল। এশিয়ার উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে যার অবস্হান। তাই মেরু বিজয়ের ইতিহাসে উত্তর মেরুর কথাই আগে আসে। উত্তর মেরুর দিকেই মানুষের চোখ পড়েছিলো সর্ব প্রথম।

শুধু অভিযান শুরু নয়, উত্তর মেরুতে মানুষ পৌঁছেছিলোও আগে। দক্ষিণ মেরু বিজয়ের আড়াই বছর আগেই বিজিত হয় উত্তর মেরু।

উত্তর মেরু বিজয়ের চেষ্টা চলছিলো দীর্ঘকাল থেকেই। ইউরোপ এশিয়া এবং আমেরিকার অভিযাত্রী দল এসেছিলো একটির পর একটি।

একদল ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবা পর আবার নতুন উদ্যমে এগিয়ে এসেছিলো আর একদল।

## জন ফ্রাংকলিন

জন ফ্রাংকলিন (Sir John Franklin 1786-1847) নামে এক লোকই সর্ব প্রথম উত্তর মেরু অভিযান করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি এসেছিলেন কানাডার উত্তর প্রান্তর দিয়ে। কিন্তু দূর্ভাগ্য তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। এই দুর্গম তুষার প্রান্তরে তিনি কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিলেন তার আর কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি।

স্যার অগাষ্টাস ইঙ্গলফিল্ড (Sir Augstas Inglefield) নামে তাঁর ছিলো এক বন্ধু। দীর্ঘ দিন ধরে যখন বন্ধু আর ফিরে আসছেন না, তখন বন্ধুকে খুঁজতেই বের হলেন ঈঙ্গল ফিল্ড। সে ছিলো ১৮৫২ সালের কথা।

কিন্তু এই পথহারা কূল-কিনারাবিহীন তুষার ঢাকা মেরুপ্রান্তরে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না তাঁর বন্ধুকে।



www.nagorikpathagar.org

বন্ধুকে না পেলেও তিনি কিন্তু কিছু কিছু নতুন কাজ করেছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম এই মেরু-অঞ্চলে একটি নির্জন দ্বীপ আবিষ্কার করলেন। দ্বীপটি যদিও ছিলো নির্জন ও অনুর্ভর ভূমি। তবুতো একটি নতুন এবং অজানা ভূখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেলো। নাম দেয়া হলো এলেজমিয়ার দ্বীপ (Allesmere Island).

কিন্তু মূল যে উদ্দেশ্যে তিনি এই মেরু অভিযানে এসেছিলেন তার আর কিছু হলো না। বন্ধুকে তিনি আর খুঁজে পেলেন না। হয়তো এই মৃতের রাজ্যে চিরতরে হারিয়ে গেছেন কোনো নির্জন প্রান্তরে।

## ডঃ এলিসা কেন্ট ক্যান

এরপরের বছর এলেন এলিসা কেন্ট ক্যান (Elisha Kent Kane-১৮২০-১৮৫৭) নামে আর একজন অভিযাত্রী। তাঁর বাড়ি ছিলো ফিলাডেলফিয়াতে।

তিনি ছিলেন পেশায় ডাক্তার। কিন্তু সহসাই তাঁকে পেয়ে বসলো মেরু অভিযানের নেশায়। অতঃপর সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এলেন মেরু প্রান্তরের তুষার রাজ্যে।

কিন্তু কেন্ট ক্যানের ভাগ্য খুব ভালো ছিলোনা। তিনি অভিযানে বের হয়েই পড়ে গেলেন পরপর কয়েকটি বড় বিপদে। তারপর পথের নিদারুণ কষ্ট আর বিপর্যয় সহ্য করতে না পেরে মারাই পড়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

কেন্ট ক্যানের অভিযান হয়তো সফল হয়নি। কিন্তু তিনি অপর একটি বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম গ্রীনল্যাণ্ডের মেরুবাসী এস্কিমোদের কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি এস্কিমোদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য সহযোগিতাও পেয়েছিলেন।

গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের মধ্যে ছিলো হ্যান্স হেন্ড্রিক (Hance Hendrek) নামে উনিশ বছরের এক যুবক। এই যুবকটিকেই অনেক আদর আর উপহার দিয়ে হাত করেছিলেন কেন্ট ক্যান।

এই হেন্ড্রিকই কেন্ট ক্যানের লোকদের পাখি শিকার আর মেরুভালুক শিকার করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর তার ফলে এই বিরান অঞ্চলেও তাদের দূর হয়েছিলো খাদ্য সমস্যা।

হেন্ড্রিক ছিলো একজন ভালো শিকারী। সে শিকার ধরায় নিজের উদ্ভাবিত মজার মজার সব কৌশল অবলম্বন করতো।

একটি ফুট দশের মতো লাঠি ছিলো তার। এই লাঠির মাথায় সে সীল মাছের চামড়ার তৈরি একটি জাল বেঁধে নিতো। তারপর চুপ করে গিয়ে বসে পড়তো বরফের পাহাড়ের উপরে।

যেই দেখতো সমুদ্র থেকে পাখি উড়ে আসছে পাহাড়ের দিকে কাছাকাছি এলেই সে অমনি কৌশলে জাল দিয়ে আটকে ফেলতো পাখিগুলোকে। এমনি করে সে প্রচুর পাখি শিকারকরতো।

মজার কৌশলটি সে কেন্ট ক্যানের লোকদেরকেও শিখিয়ে দিয়েছিলো।

এই হেন্ড্রিকের সাহায্যেই কেন্ট ক্যান আবিষ্কার করেছিলেন উত্তর মেরু অঞ্চলের অনেক অজানা পথ এবং অচেনা জায়গা।

তিনি স্লেজগাড়ীতে চড়ে চলে গিয়েছিলেন মাইলের পর মাইল পথ। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ক্যান বেসিন (Kane Basin).

এই অভিযানে তিনি যেসব পথ আবিষ্কার করেছিলেন পরবর্তী অভিযাত্রীদের তা অনেক উপকারে এসেছিলো। এই পথ ধরেই তারা অগ্রসর হয়েছিলো আরো বহুদূরের



www.nagorikpathagar.org

পথ।

কিন্তু এ সব পথ আবিষ্কার করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত নিজে মারা পড়েছিলেন কেন্ট ক্যান।

বরফে আটকে পড়েছিলো তাঁদের স্লেজগাড়ী। এদিকে স্লেজ আটকে পড়েছে বরফে, অপরদিকে শুরু হলো তুষার ঝড়।

এমনি এক বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি তিনজন সংগীসহ বরফে জমে মারা পড়েছিলেন। তাদের হয়েছিলো তুষার সমাধি।

## চার্লস ফ্রান্সিস হল

শুধু কেন্ট ক্যান সাহেবই নয়, এই উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে এসে মারা পড়েছিলেন আরো অনেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী।

কিন্তু এসব জেনেও আবার আরেক দল এগিয়ে এসেছিলেন নতুন নেশায়, নতুন উদ্যমে।

এরপর যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হলেন চার্লস ফ্রান্সিস হল (Charles Francis Hall-১৮২১-১৮৭১). মিঃ হল ছিলেন আমেরিকার ওহিয়ো রাজ্যের সিন্‌সিনাটি শহরের বাসিন্দা।

প্রথম জীবনে ছিলেন কামার। পরে হয়েছিলেন সাংবাদিক। শেষে সব ছেড়ে দিয়ে এসে নামলেন মেরু অভিযানে। দুর্গম পথের নেশায় পেয়ে বসলো হল সাহেবকেও।

অবশ্য এটাই তাঁর প্রথম অভিযান নয়। প্রথম মেরু অভিযাত্রী ফ্রাংকলিনকে খোঁজার জন্য ১৮৬০ সালে একটি দল পাঠানো হয়েছিলো। হল ছিলেন তারও অন্যতম সদস্য।

অবশ্য সেবার তারা ফ্রাংকলিনের কোনো সন্ধান করতে পারেননি। তারপর দুবছর পরে ১৮৬২ সালে তিনি নিজেই একটি দল গঠন করে বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে।

অবেশেষে হল সাহেবই কিন্তু ফ্রাংকলিনের অনুসন্ধান করতে সক্ষম হলেন এই দুবছর পরে। তিনি কানাডার অনেক উত্তরে এক বিরান তুষার অঞ্চলে আবিষ্কার করলেন ফ্রাংলিন এবং তার সাথীদের হাড় গোড়। খুঁজে পেলেন তাদের ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র এবং ফ্রাংলিনের ডায়েরী পর্যন্ত।

এই ডায়েরীতে লেখা ছিলো কেমন করে তারা এরই বিরাট অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে আর প্রচন্ড শীতে মারা পড়েছিলেন। একে একে হয়েছিলো তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু। এই হল সাহেব কিন্তু সত্যিই খুব সাহসী লোক ছিলেন। এই অভিযানে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বহু অজানা পথ। উত্তর মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের দেশে প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়ে ছিলেন এক নাগাড়ে।

তার আগে এতো দীর্ঘ দিন কেউ আর মেরু অঞ্চলে কাটাতে পারেননি।

দীর্ঘ পাচঁ বছর কাটিয়ে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন দেশে।

এরপর তিনি আবারো গিয়েছিলেন অভিযানে। ১৮৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে পোলারিস নামে একটি জাহাজের ক্যাপটেন করে পাঠিয়েছিলেন উত্তর মেরু অভিযানে। এই দ্বিতীয় অভিযানে তিনি স্মিথ প্রণালী পার হয়ে আরো বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবং ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরই সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর আর দেশে ফেরাই হয়নি। তিনি গ্রীনল্যান্ডে মারা গিয়েছিলেন অবশেষে।

শুধু তাই না ক্যাপটেন মারা যাবার পর এই পোলারিস জাহাজের নাবিকদের উপরেও নেমে এসেছিলো নানা বিপদ আর বিপর্যয়। জাহাজে ছিলো উনিশ জন নাবিক। ১৮৭১ সালের পর এক বছরের মধ্যে তারাও সহসা কেমন করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।



www.nagorikpathagar.org

তাদের পোলারিস জাহাজটিও যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো তা কেউ বলতে পারে না। জাহাজের হতভাগ্য পাঁচজন নাবিক ডিঙ্গি নোকা করে প্রাণে বাঁচার শেষ চেষ্টা করেছিলো। সম্ভবত পোলারিস দুটো বিশাল দেহী হিমশৈলের মাঝে চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো।

এই ভাসমান অবস্হাতেই নাবিকরা অনাহারে ও শীতে মারা পড়েছিলো একে একে। অবশেষে একটি তিমি ধরা জাহাজের জেলেরা কয়েকজনকে সাগরে ভাসতে দেখে কেপ ইয়র্ক থেকে উদ্ধার করে। এমনি করে হল সাহেবের দুঃসাহসিক ও মর্মান্তিক মেরু অভিযানের হয়েছিলো পরিসমাপ্তি।

## জার্মানদের অভিযান

এরপর অভিযান চালাতে এগিয়ে আসে জার্মানীরা। ১৮৬৯ সালে জার্মান সরকার দুটো অভিযাত্রীদলকে একসাথে পাঠালো উত্তর মেরু অভিযানে। দুটো দল ভিন্ন ভিন্ন পথে শুরু করলো অভিযান।

দুটো দলেরে জন্য জার্মান সরকার আলাদা দুটো জাহাজও দিয়েছিলেন। জাহাজ দুটোর নাম ছিলো (Jarmania) জার্মানিয়া এবং হানসা (Hansa)

কিন্তু অভিযান শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের একদলের উপর নেমে এলো বিপদ। যে দল হানসা জাহাজে করে গিয়েছিলো বিপদ এলো তাদেরই উপর।

বিশাল বিশাল হিমশৈলের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একদিন সহসা হানসা আটকে গেলো বিশাল এক বরফের পাহাড়ের মধ্যে। জাহাজের চারপাশের খোলা জল প্রচন্ড শীতে জমে গিয়ে হয়ে গেলো অখন্ড বরফের চাতাল।

এই যখন অবস্হা তখনো নাবিকদের আশা ছিলো হয়তো একমাসে বরফ আবার গলে যাবে। মুক্তি পাবে তাদের বন্দী জাহাজ। তারা বেরুতে পারবেন।

কিন্তু তা আর হলো না। বরং বিশাল বড় বরফের পাহাড়টি যখন নিচের সাগর স্রোতের ধাক্কায় ঘুরতে লাগলো, এর প্রচন্ড চাপে পড়ে তাদের কাঠের তৈরি জাহাজটি গেলো ভেঙে চুরমার হয়ে। অনেকটা পোলারিস জাহাজের দশাই হলো ওদের।

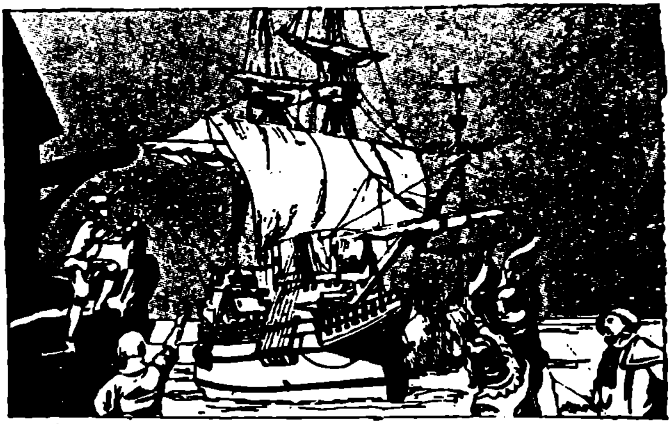

মেরু অভিযানে 'জারমানিয়া' ও 'হানশা' জাহাজ



www.nagorikpathagar.org

জাহাজ ভেঙে গেলো আর নাবিকরা আটকে পড়ে গেলো বরফের চাঁইয়ের মধ্যে। বিশাল এক বরফ খন্ড। তারই উপর নিঃস্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা কয়েকজন নাবিক।

ভাঙা জাহাজ থেকে যা কিছু খাদ্য ও সরঞ্জাম উদ্ধার করতে পেরেছিলো তাই আছে সাথে। কিন্তু এখান থেকে বের হবার যে কোনো উপায় নেই।

অতপর এই ভাসমান বিশাল বরফ খন্ডের উপর কাটতে লাগলো ওদের দিন।

এদিকে বরফ গলে গলে ওদের বরফের ভেলায় আকৃতিটাও ক্রমে ছোটো হয়ে আসতে লাগলো। প্রায় একটি বছর তারা বন্দী হয়ে রইলেন এই বরফের ভাসমান খন্ডের উপর। সে যে কি দুঃসহজীবন যাপন, তা ভাষায় বলে শেষ করা যাবে না।

প্রচন্ড শীতে আর অনাহারে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি নাবিক মারা পড়লেন একে একে। যারা কোনো মতে জীবন মৃত অবস্থায় টিকে ছিলেন তারাই এক বছর পরে পাড়ি দিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশের পথে। ফিরে এলেন দেশে।

ওদিকে জার্মানীয় জাহাজের অভিযাত্রীরাও খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না। প্রচন্ড বরফ আর শীতের তীব্রতা ঠেলে তারাও আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। ফিরে গেলেন ব্যর্থ হয়ে।

## জুলিয়াস পেয়ার

১৮৭১ সালে অষ্ট্রিয়া থেকেও আসে আর একটি অভিযাত্রী দল। দলের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল ওইপ্রেবট (Carl Weyprcht) তার সহযোগী ছিলেন জুলিয়াস পেয়ার (Julias Payer)

দলের অধিনায়ক ওই প্রেবট হলেও দলের প্রধান অভিযাত্রী ছিলেন জুলিয়াস পেয়ার।

এরাও অভিযানে নামার কিছু দিনের মধ্যেই পড়ে গেলেন গোলক ধাঁধায়। তাদের পালতোলা কাঠের জাহাজটি ক্রমাগত ভাসতে লাগলো বরফের ভাসমান পাহাড়গুলোর পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে। কিন্তু কোনো অখন্ড ডাঙার সন্ধান আর তারা বের করতে পারলেন না।

এমনি ভাবে কেটে গেলো প্রায় দুই দুটো বছর। তারা শুধু সাগরে ভেসেই বেড়াতে লাগলেন অসহায়ের মতো।

'এরপর ১৮৭৩ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে সাক্ষাৎ পেলেন একটি ভূমির। দেখা পেলেন একটি দ্বীপ পুঞ্জের।

এটিই ছিলো নোভায়া জেমলিয়ার উত্তরে উত্তর সাগরের (North sea) একটি দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপ পুঞ্জটির নাম দিলেন ফ্রান্স জোসেফ ল্যান্ড। (France Josef Land)

এতোদিনে তাদের কেটে গেছে ঘন কুয়াশার মধ্যে। প্রায় দুটো বছর তাদের জাহাজ খানি ভেসে বেড়িয়ে ছিলো এই ঘন কুয়াশার মধ্যে। তারপর কুয়াশা কেটে যেতেই তাদের চোখে পড়লো এই ডাঙ্গা ভূমি।

কিন্তু বরফের স্তর ঠেলে ডাঙ্গার কাছে যেতেই লেগে গেলো আরো পুরো দুমাস।

জাহাজ ভেড়ানো হলো বরফ ঢাকা ডাঙ্গার তীরে। অভিযাত্রী পেয়ার দুজন সাথী আর স্লেজ গাড়ী নিয়ে নেমে এলেন মাটিতে।

স্লেজ গাড়ি চালিয়ে এগুতে লাগলেন সামনের দিকে। স্লেজ গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুকুরে, কিন্তু সহসাই ঘটলো দুর্ঘটনা।

উপরে দেখে কিছুই বুঝা যায় নি। সব ছিলো সমতল বরফে ঢাকা। কিন্তু এই সমতল চাতালের নীচেই যে অমনি খাদ ছিলো তা কে জানতো।



www.nagorikpathagar.org

মেরুভালুক

যেনো বাঘ ধরার ফাঁদ আর কি। নিচে গর্ত খুঁড়ে উপরটা মাটি বিছিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। পা দিলেই ভেঙে পড়বে গর্তে।

ঠিক তারাও তেমনি ভেঙে পড়লেন। যেই ওরা গহবরের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলেন অমনি উপরের পাতলা বরফের স্তর পড়লো ভেঙে।

স্লেহ গাড়ি সহ পেয়ার সাহেবের দুজন লোকই পড়ে গেলো গহ্বরের নিচে। প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট নিচে। স্লেজ গাড়ির সাথে বাঁধা রশির অপর প্রান্ত ধরা ছিলো পেয়ার সাহেবেরহাতে।

তিনি রশির মাথা ধরে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্বের মতো। নিচে রশিতে ঝুলতে লাগলো স্লেজ গাড়ি, সাথী লোকটি আর গাড়ীর সাথে বাধা কুকুরগুলো।

এদিকে পেয়ার সাহেবের মনে হতে লাগলো নিচের ঝুলন্ত গাড়ির প্রচণ্ড টানে তিনি যেনো নিজেই দু'টুকরো হয়ে যাবেন। রশি আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। কোমরে বাঁধা রশি যেনো কেটে নিয়ে যাচ্ছিলো তাকে। যেনো দু'টুকরো হয়ে যাবেন তিনি।

তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন রশি কেটে দেবেন। নইলে হয়তো তিনিও নিচে পড়ে যেতে পারেন।

কিন্তু যেই তিনি চাকু দিয়ে রশি কেটে আত্মরক্ষা করতে যাবেন অমনি নিচের ঝুলন্ত লোকটা আর্তকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলো—দোহাই স্যার, রশি কাটবেন না।

পেয়ার সাহেব উপর থেকেও তেমনি যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন—কিন্তু আমিও যে আর ভার সহ্য করতে পারছিনা। আমিও যে মারা যাবো নইলে।



www.nagorikpathagar.org

নিচের লোকটি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগলো–কিন্তু রশি কেটে দিলে যে আমরা আরো অনেক নিচে পড়ে যাবো। নির্ঘাৎ মারা যাবো স্যার।

কিন্তু পেয়ার সাহেব দেখলেন সাথী লোকটি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছে। রশি কেটে দিলে সে মাত্র হাত দশেক নিচে পড়ে যাবে। হাত দশেক নিচেই তারা আরো একটি বড় বরফের চাইয়ের উপর দাঁড়াতে পারবেন।

সুতরাং নিজের প্রাণ বাঁচানো এবং ওদেরকেও বাঁচানোর জন্য তিনি সত্যি সত্যি রশি কেটেদিলেন।

সত্যি তাই হলো। স্লেজগাড়ি শুদ্ধ লোকটা হাত দশেক নিচে পড়েই আশ্রয় পেলো। ওদের তেমন কিছু আঘাতও লাগেনি। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে তিনি দেখতে পেলেন।

এমনি করে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের জন্য নিজেও বাঁচলেন, ওদেরকেও বাঁচাতে পারলেন। তিনি রশি কেটে দিয়েই উপর থেকে বলতে লাগলেন,–তোমরা ভয় পেয়ো না। ঘন্টা কয়েক অপেক্ষা করো, আমি শীঘ্রই তোমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

ওদের আশ্বাস দিয়েই তিনি ছুটলেন জাহাজের দিকে। জাহাজ ওখান থেকে পুরো নয় কিলোমিটার দূরে। তিনি বরফের উপর দিয়েই প্রাণপণে ছুটলেন জাহাজের দিকে। শরীর যাতে হালকা হয় তিনি আরো জোরে দৌড়াতে পারেন তার জন্য পায়ের জুতো, গায়ের জামাও খুলে ফেললেন। তারপর ছুটতে লাগলো প্রাণপণে।

ছুটে জাহাজে ফিরে এসে আরো কয়েকজন সাথীকে নিয়ে আবার ফিরে এলেন ঘটনাস্থলে।

তারপর সবাই মিলে মোটা রশি নামিয়ে দিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত স্লেজ গাড়ীটাকে টেনে তোলা হলো উপরে।

কিন্তু এদিকে ঘটলো আরেক বিপদ। দর্ঘটনা কবিলত স্লেজ গাড়িটাকে টেনে উদ্বার করে যখন পরের দিন ফিরে এলেন, দেখলেন যেখানে তাদের জাহাজ ছিলো এখন সেখানে নেই। কিন্তু এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে জাহাজটি গেলো কোথায়? পেয়ার আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পেলেন না জাহাজটি। কিন্ত সাহস হারালেন না।

পাশেই উঁচু বরফের পাহাড় ছিলো। তিনি উঠে পড়লেন সেই পাহাড়ের উপর। এবার তাকিয়ে দেখলেন—জাহাজটিকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে।

তিনি বুঝতে পারলেন ভাসমান বরফের ধাক্কায় জাহাজটি অতো দূরে চলে গেছে। তাহলে এখন উপায়? তারা জাহাজে ফিরবেন কি করে?

এদিকে হয়তো জাহাজটিকে এঘাটে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। হয়তো যতো বেশি বিলম্ব হবে জাহাজটি ততো বেশি দূরে চলে যাবে।

যা করতে হয় এই মুহূর্তেই করতে হবে। যতো দেরী হবে বিপদও ততো বাড়বে। তিনি দ্রুত ভাবতে লাগলেন। আর ভাবতে ভাবতেই তাঁর মাথায় খেলে গেলো এক নতুন বুদ্ধি।

তিনি দ্রুত নেমে এলেন নিচে। তারপর দুটো কুকুরকে সাথে নিয়ে আবার উঠে এলেন পাহাড়ের চূড়ায়। তারপর কুকুরগুলোর মাথা সোজা করে তুলে ধরে তাদেরকেও দেখালেন জাহাজটিকে।

জাহাজটি দেখতে পেয়েই কুকুরগুলো লাফাতে লাগলো আর ডাকতে লাগলো "ঘেউ" "ঘেউ" করে। তিনি কুকুরগুলোকে সাথে নিয়ে দ্রুত নেমে এলেন পাহাড় থেকে। তিনি বুঝতে পারলেন কুকুরগুলো তার ইশারা ধরতে পেরেছে।

তারপর সত্যি সত্যি তাই হলো। কুকুরগুলো নেমে পড়লো জলে। শুরু করলো সাঁতরানো। শেষে ওরাও কুকুরের লেজ ধরে ধরে শুরু করলো সাঁতার। অবশেষে সত্যি সত্যি তারা বহুকষ্টে সাঁতরে উঠে এলেন জাহাজে।



www.nagorikpathagar.org

এমনি করে পেয়ার দু'দুবার নিজের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার বলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেও মরণ তাদের পিছু ছাড়লো না।

তারাতো কোনো মতে কুকুরের সহায়তায় প্রাণ নিয়ে এসে উঠলেন জাহাজে। কিন্তু জাহাজে এসেই জানতে পারলেন আরেক বিপদের কথা। তাদের জাহাজটি বন্দী হয়ে আছে বরফের চাঁইয়ে। চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিমশৈল। এর এক একটি চূড়ায় প্রায় কয়েক হাজার ফুট থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত।

এই বরফের পাহাড়গুলোই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে আছে পেয়ারের জাহাজটিকে। বেরুবার কোনো পথই নেই।

জাহাজটির কোনো দিকে নড়বার চড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ভাসমান বরফের সাথে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে।

ওরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বরফ কেটে যায়। কখন একটু পথ পাওয়া যায় এই ঘেরাও থেকে বের হবার। অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে কেটে গেলো সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছর পর্যন্ত। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। বরফ কেটে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

এদিকে জাহাজে দেখা দিলো খাদ্যের অভাব। সাথে যে খাবার ছিলো তা গেলো ফুরিয়ে। অবশেষে যে কুকুরগুলো একদিন তাদেরই জীবন বাঁচিয়েছিলো তাদেরকেও হত্যা করে খেতে হলো।

কিন্তু তবু খাবারের অভাব মিটলো না। এদিকে বরফের চাঁই সরে যাবারও কোনো লক্ষণ দেখা গেলোনা।

অতঃপর তখন বাধ্য হয়েই তারা জাহাজটিকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তাদের সাথীদের সংখ্যাও কমে আসছে। ইতিমধ্যে অনাহার আর শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন মারা পড়েছে।

কিন্তু তারপরই পেয়ারদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তা আর জানা যায়নি। জানা গেলো আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে।

পঞ্চাশ বছর পরে ১৯২১ সালে জনৈক অধ্যাপক অভিযাত্রী পেয়ারদের পরিত্যক্ত জাহাজ এবং পেয়ারের নিজের ডায়েরীটি উদ্ধার করেছিলেন।

এই ডায়েরীর বিবরণ থেকেই জানা গেলো পেয়ার এবং আরো দু'জন অভিযাত্রী জাহাজ থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি।

তারা পথেই মারা পড়েছিলেন। তাদের নির্মম মৃত্যু ঘটেছিলো উত্তর মেরুর বিজন প্রান্তরে।

## বেঞ্জামিন লেখ স্মিথ

বেঞ্জামিন লেখ স্মিথ (Bengamin Leigh Smith) এবং তার বন্ধু জেমস ল্যামন্ট (James Lanmont) দুজনেই ছিলেন ইংরেজ।

এরা দুজনেই ছিলেন খুব সাহসী মানুষও। তাই কাজটাও করেছিলেন আরো বড় দুঃসাহসের।

সবাই এই ভয়ংকর বরফের দেশে অভিযানে আসেন বড় বড় জাহাজে করে। কিন্তু এই দু বন্ধু দেখালেন আরো বড় দুঃসাহস।

এরা এলেন একেবারেই একটি ডিঙি নৌকা করে। এদের ডিঙি নৌকাটার আবার একটা মজার নামও ছিলো। নাম ছিলো –'ইরা' (Eira)



www.nagorikpathagar.org

এই ইরাতে করেই দু'বন্ধু বের হয়েছিলেন দুঃসাহসিক অভিযানে। এদের মধ্যে লেখ স্মিথ সাহেব ছিলেন ব্যারীষ্টার এবং খুবই পণ্ডিত মানুষ

ডিঙ্গি নৌকায় করে ভাসতে ভাসতে তারা নরওয়ের অধিকারভুক্ত উত্তর মেরু সাগরের দ্বীপ স্পিটস্ বার্গেনে (Spitsbergen) এসে পড়লেন। এখানে তারা একটি কয়লার খনিও আবিষ্কার করে ফেললেন।

আর খনিটিও ছিলো খুব সমৃদ্ধশালী। সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে খুঁড়েই তারা তিনদিনে প্রায় দশ/বারো টন কয়লা বের করে ফেললেন।

শুধু কয়লার খনি আবিষ্কার নয়। তারা এই স্পিটসবার্গেনে এসে আরো একটি বড় কাজ করেছিলেন। উদ্ধার করেছিলেন একটি তুষারবন্দী একটি অভিযাত্রী দলকে।

তারা এসে দেখলেন–১০১ জনের অভিযাত্রী দল আটকে পড়ে আছে বরফের মধ্যে। তাদের জাহাজ পড়েছে বরফে আটকা। এদিকে তাদের খাদ্যও শেষ। যা খাবার মজুত আছে তাতে বড় জোর দিন পনেরো যেতে পারে। তারপরই সবাইকে মরতে হবে অনাহারে।

এই দুর্গম পথ পায় হেঁটে চলে আসাও সম্ভব নয়। তাদের নির্ঘাত মরতে হতো।

ঠিক এমনি সময়েই এসে উপস্থিত হলেন দুবন্ধু। তাদের সাথে ছিলো প্রচুর খাবার। এই অতিরিক্ত খাবার পেয়ে বন্দী অভিযাত্রীরা যারপর নেই খুশি হলো। এই মুহূর্তে যদি ওরা না আসতেন তাহলে বন্দী অভিযাত্রীদের ভাগ্যে যে কি মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতো তা ভাবাও যায় না।

স্মিথ তারপর বিপদগ্রস্ত এই গোটা দলকেই উদ্ধার করলেন। তাই সেবার আর তাদের কোনো সফল অভিযান হলোনা, উদ্ধার কাজেই কেটে গেলো সময়।

এরপরও তারা আবারও যাত্রা করলেন অভিযানে। উল্লেখ্য যে মিঃ স্মিথ এর পরও প্রায় চারবার অভিযান চালিয়েছিলেন উত্তর মেরুতে।

এই দ্বিতীয় অভিযানেও তিনি একটি নতুন আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য এটি তার নতুন আবিষ্কার নয়। এখন থেকে ছয় বছর আগে পেয়ার যে ফ্র্যান্স জোসেফ ল্যাণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন এই দ্বীপটিই আবার নতুন করে আবিষ্কার করলেন তারা।

কিন্তু জোসেফ ল্যাণ্ডের আশেপাশের স্থানটি ছিলো বড় ভয়ংকর। এখানে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। বিপদে জড়িয়ে পড়লেন স্মিথ সাহবে নিজেও। তাদের ছোট্টো নৌকাটি আটকে গেলো বরফে। তখন আর কি করেন। দ্বীপের উপরই কাদা আর বরফ দিয়ে তৈরি করলেন থাকার ঘর।

কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? কিন্তু তাদেরও দেখা দিলো খাদ্যের অভাব। তাই তারা সিন্ধু ঘোটক আর সীল হত্যা করে তাদের মাংস খেয়ে কাটাতে লাগলেন দিন।

তারপর যখন গ্রীষ্মকাল এলো চলতে লাগলো বরফের বড় বড় চাঁই। স্মিথ সাহেব এবার তাদের ডিঙ্গি নৌকাটিও উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন। তারপর বিছানার চাদর আর গায়ের জামা ছিঁড়ে তাই দিয়ে তৈরি হলো নৌকার পাল, এভাবেই তারা কোনো মতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

## জর্জ নেয়ারস

এমনি করেই একের পর এক চলছিলো দুঃসাহসিক অভিযান। আজ পর্যন্ত যারাই এসেছিলেন তাদের কেউ বলতে গেলে সফল হননি। কিন্তু অভিযান থেমে যায়নি।

১৮৭৫ সালে তিন তিনটি বড় সামুদ্রিক জাহাজ নিয়ে উত্তর মেরু অভিযানে এলেন স্যার জর্জ নেয়ারস (Sir Geroge Nares)



www.nagorikpathagar.org

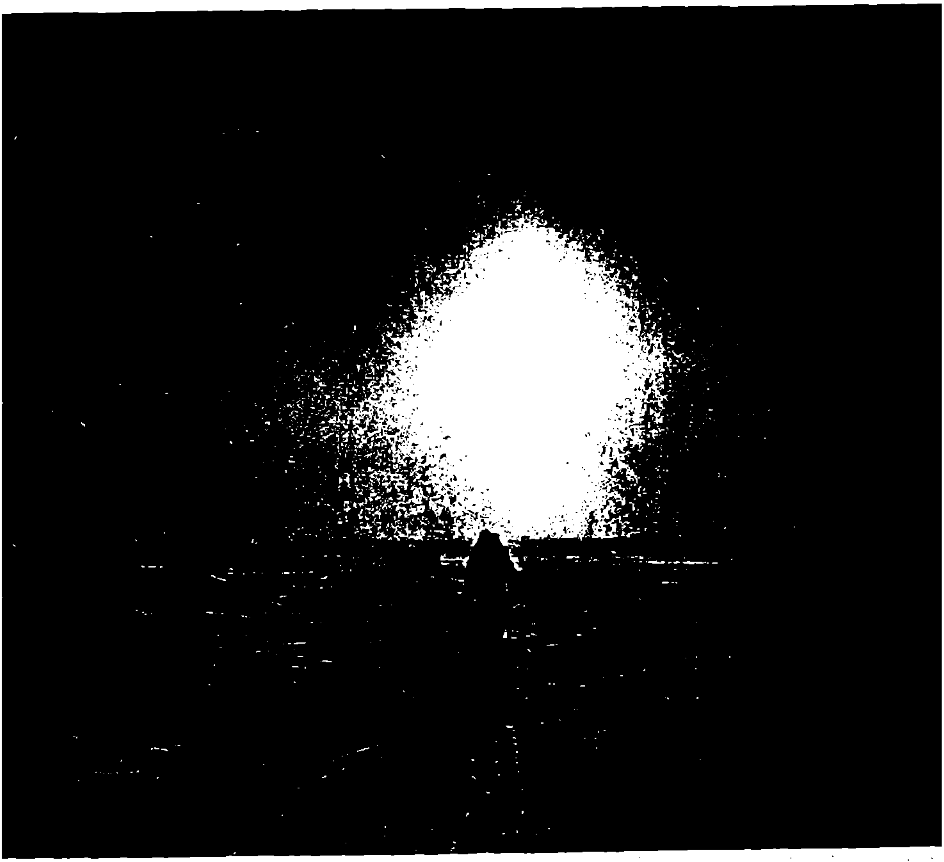

মেরু অঞ্চলে রাতের দৃশ্য।

বৃটিশ সরকারই তাকে পাঠিয়েছিলেন এই অভিযানে। অভিযানে সহযোগীদের সংখ্যা ছিলো ৮০০ এর মতো।

আয়োজনও তার বড়ই ছিলো। কিন্তু মূল লক্ষ্যস্থল উত্তর মেরুতে পৌছতে তিনি সক্ষম হননি। তবু তার অভিযানকে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলো তাও বলা যায় না। তিনি উত্তর মেরুর প্রায় ৬৩৯ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

এছাড়া তার দলে কয়েকজন ভূ-তত্ত্ববিদও ছিলেন। এরা উত্তর মেরু অঞ্চলে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছিলেন।

এছাড়া এই অভিযানে তারা একটি চমকপ্রদ জিনিসও আবিষ্কার করেছিলে। বহু উত্তরে ওয়াশিংটন আর্ভিং ল্যাণ্ডে সন্ধান পেয়েছিলেন একটি প্রাচীন প্রস্তর স্তুপের।

এই পাথরের স্তুপটি দেখে তাদের মনে হয়েছিলো এটি আপনা থেকে তৈরি হয়নি। কেউ নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেছে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গ হবেন, কিন্তু



www.nagorikpathagar.org

তিনি কে?

যিনিই হোন তিনি নিশ্চয়ই তাদেরও অনেক আগে এখানে এসে পৌছেছিলেন। কিন্তু তিনি কে? কোন্ দেশে তার বাড়ী, কিংবা তিনি কবে এখানে এসেছিলেন তার কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারেননি।

এখানে তারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। সে হলো স্যাণ্ডারনিং নামে এক জাতের পাখির বাসা আবিষ্কার।

সামান্য একটি পাখির বাসা এই জন্যই বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্যাণ্ডারনিং জাতীয় পাখির বাসা পাওয়া যায় তুন্দ্রা অঞ্চলের সর্ব উত্তর প্রান্তে।

এ থেকে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে যে তাহলো পূর্বে কি তুন্দ্রা অঞ্চল এতো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো?

এই পাখির বাসাটি আজো প্রাণি বিজ্ঞানের ইতিহাসের চিহ্ন হিসেবে যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

## জর্জ ওয়াশিংটন দ্যালং

১৮৭৯ সালে উত্তর মেরু অভিযানে এগিয়ে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন দ্যালং (Georege Washington Delong -1844-1881)

যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সরকারী ভাবে পাঠিয়েছিলে এই অভিযানে। তিনি জাহাজ নিয়ে সানফ্রান্সিসকো থেকে সোজা চলে আসেন উত্তর মেরুর দিকে। প্রায় একটানা দুমাস চলার পর তিনি হেরাল্ড আইল্যাণ্ড (Herald Island) ছাড়িয়ে চলে আসেন আরো উত্তরে।

লঙ সাহেবের অভিযানও অবশ্য সফল হয়নি। হেরাল্ড দ্বীপ ছাড়িয়ে আসার পরই তিনি পড়েছিলেন মহাসংকটের মধ্যে। জাহাজ আটকে গিয়েছিলো জমাট বাঁধা বরফের চাঁইয়ে।

তারপর শুরু হয়েছিলো প্রচণ্ড শীত। এমন ভয়ংকর শীত, যা কল্পনাও করা যায়না। প্রচণ্ড শীতে তারা দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত জ্বালাতে পারছিলেন না। শেষে এক নাবিকের শরীরের মধ্যে প্রায় দুঘন্টা দেশলাই চেপে রেখে তাঁরপর আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলেন।

প্রচণ্ড শীতে তাঁর জাহাজের ইঞ্জিনের তেল পর্যন্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। তিনি আগুন জ্বালিয়ে তেল গরম করে আবার ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

শেষে চারপাশের বরফের চাঁই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এমন ভয়ংকর জমাট বেঁধে গেলো যে, তার প্রচণ্ড চাপে গোটা জাহাজটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

জাহাজের বেশ কয়েকজন নাবিকও এই ভয়ংকর শীতে মারা পড়লো। যারা তখনো বেঁচে ছিলো তাদের নিয়ে লঙ সাহেব এবার আশ্রয় নিলেন ডিঙি নৌকায়।

কিন্তু এই সামান্য ডিঙি নৌকায় ভেসে আর কে কত দিন বাঁচতে পারে? দলের লোক মরতে লাগলো একে একে।। অনাহারে আর শীতের প্রচণ্ড তীব্রতায়।

শুধু দলের লোকেরা নয়, শেষে লঙ সাহেব নিজেও মারা গিয়েছিলেন। এই দলের জনতিনেক লোক কোনো মতে জান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তাদের কাছেই শোনা গিয়েছিলো লঙ সাহেবের মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী।

তাঁর মৃত্যুর ঘটনার সাথে জড়িয়ে ছিলো তাঁরই এক চেনা রাঁধুনীর বিস্ময়কর গল্প।

এই ছেলেটি একান্ত সখেই সামান্য রাঁধুনীর কাজ নিয়ে এসেছিলো লঙ সাহেবের সাথে। কিন্তু সে ছিলো প্রভুর একান্ত বিশ্বাসী চাকর। তার এই প্রভুভক্তের কাহিনী ছড়িয়ে আছে আজো হাজারো রূপ কথার মতো।

অভিযানের এই বিপদের মুহূর্তে সে এক মুহূর্তের জন্যও প্রভুকে পরিত্যাগ করেনি।



www.nagorikpathagar.org

শত অনাহার দুঃখ কষ্ট আর কঠোর পরিশ্রমও তাকে এই প্রভুভক্তি থেকে বিরত করতে পারেনি।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার হাত পা অবশ হয়ে গিয়েছিলো, গা ফেটে রক্ত বের হচ্ছিলো, তবু সে লঙ সাহেবের কাছ থেকে মুহূর্তের জন্য দূরে যায়নি। সারাক্ষণ লক্ষ্য রাখতো সে তার মনিবের প্রতি।

লঙ সাহেব শক্তিশালী আর দৃঢ়চেতা মানুষ হলেও তিনি ছিলেন পৌঢ়। আর সে ছিলো নবীন যুবক। তাই নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়ে বৃদ্ধ মনিবকে জড়িয়ে ধরে শীতের হাত থেকে বাঁচানের চেষ্টা করতো সে সব সময়।

পরের বারের অভিযাত্রীরা গিয়ে যখন লঙ সাহেব ও তাঁর দলের সদস্যদের বরফে ঢাকা মৃত দেহগুলো উদ্ধার করেছিলেন তখনি তারা লক্ষ্য করেছিলেন একটি বিস্ময়কর দৃশ্য।

বরফ কেটে যখন লঙ সাহেবের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন, তখনই তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন লঙ সাহেবের দেহের নিচেই ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে চীনা ছেলেটির মৃতদেহ। অর্থাৎ ছেলেটি হয়তো মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও মনিবকে বাঁচানোর জন্য তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। শেষে প্রভু- ভৃত্য দু'জনেই এক সাথে মৃত্যুকে আলিংগন করেছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল।

লঙ সাহেবের জাহাজটি বরফে চাপা পড়ে ভেঙে গিয়েছিলো সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলের কাছাকাছি কোনা এক পাশে।

বছর তিনেক পরে আবার যখন সেখানকার বরফ গলে গিয়েছিলো তখন জাহাজের টুকরো টুকরো অংশ ভেসে এসেছিলো স্রোতের সাথে।

জাহাজের এই টুকরো অংশগুলো বেরিং প্রণালী দিয়ে (এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত) ইউরোপে পৌঁছতে শুরু করেছিলো।

## ন্যানসেন

এই ভাঙা জাহাজের কাঠের টুকরো ভেসে যাওয়ার ঘটনাটিও ছিলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য।

এই সামান্য ঘটনা থেকেই কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন তাহলে কি বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে ইউরোপে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে বের হবার কোনো পথ আছে?

এমন একটি চিন্তা যার মাথায় প্রথমে প্রবেশ করেছিলো তিনি হলেন নরওয়ের বিখ্যাত অভিযাত্রী ও পণ্ডিত ডঃ ফ্রিচফ ন্যানসেন। (Dr. Fridtjof Nansen).

ন্যানসন সাহেবও ছিলেন খুব বিদ্বান লোক। যেমন ছিলো তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিলেন সাহসীও।

উত্তর মেরুতে একটি অভিযান পরিচালনা করার বাসনাও তার ছিলো দীর্ঘদিনের। প্রস্তুতিও তিনি নিতে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।

উত্তর মেরু অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, সম্ভাব্য বিপদ আপদ পথঘাট এবং আগে যারা যারা অভিযানে গিয়েছিলেন তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আগেই তিনি পড়ে নিয়েছিলেন মনোযোগ দিয়ে।

তারপরই একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন অভিযান চালাবেন উত্তর মেরুতে। তৈরি হলো জাহাজ। জাহাজটি আকৃতিতে অবশ্য ছোটো. কিন্তু মজবুত। যাতে বরফের চাপ লেগে সহজে ভেঙে না যায়।

জাহাজের নাম দেয়া হলো ফ্র্যাম (Fram) এর অর্থ হলো- এগিয়ে চলা। তারপর



www.nagorikpathagar.org

একদিন সবাইকে নিয়ে রওনা হলেন ন্যানসন উত্তর মেরুর উদ্দেশ্যে।

তিনি জাহাজ নিয়ে এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত চেলেস্কিন অন্তরীপ পার হয়ে চলে এলেন সাইবেরিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রায় কাছাকাছি।

এখানে এসেই তিনি দেখলেন, চারদিকেই চাপ চাপ বরফে ঘেরা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটি বরফের চাঁই। যেনো এক একটি অসমান বরফের দ্বীপ বিশেষ।

আশেপাশে কোথাও ডাঙ্গা ভূমি নেই। অতঃপর তিনি সেই ভাসমান বরফখণ্ডের উপরই জাহাজের নোঙর ফেললেন। বরফের খণ্ডগুলাও নীচের সাগর স্রোতে ক্রমাগত ভেসে চললো উত্তর দিকে। উত্তরে আরো উত্তরে।

কিন্তু সেই যে বরফের চাঁইয়ের ভেসে চলা সেও তো যেমন তেমন ভেসে চলা নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাসে, এমনকি বছরের পর বছর চললো ভেসে চলা। কেটে গেলো প্রায় তিন তিনটি বছর। একইভাবে ভাসতে ভাসতে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন ১৮৯৩ সালে। অবশেষে ১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাস নাগাদ তাদের জাহাজে বরফমুক্ত হলো। চারপাশের বরফ কেটে গেলো। খোলা সমুদ্রে আবার ভাসতে লাগলো ফ্র্যাম।

এবার ন্যানসন জাহাজ চালালেন ডেন্স দ্বীপের দিকে। এই দ্বীপটির অবস্থান হলো স্পিটস্‌বার্গেনে।

ডাঃ ন্যানসেন



www.nagorikpathagar.org

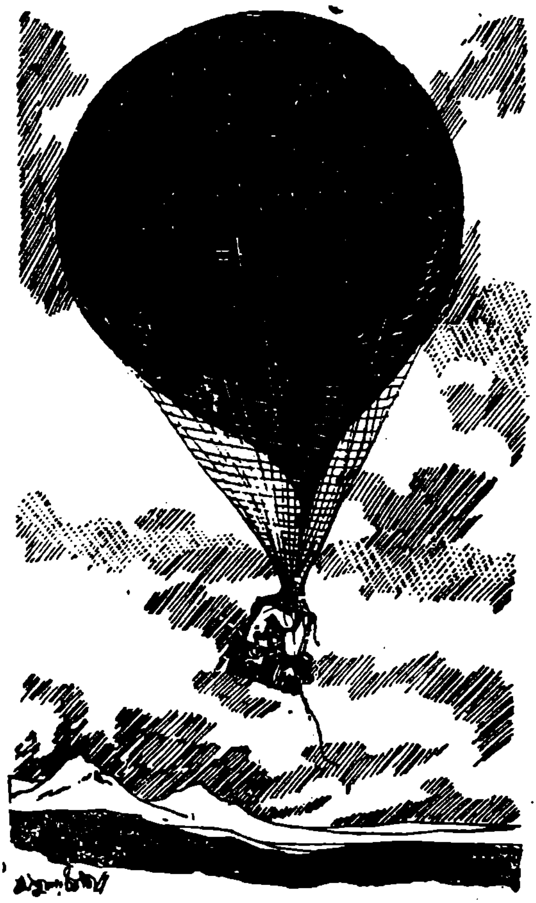

আন্দ্রের বেলুনে চড়ে উত্তর মেরু বিজয়ের ব্যর্থ চেষ্টার দৃশ্য

তিনি এই দ্বীপে এসেই জাহাজ নোঙর করলেন আবার।

এখানে এসে তার আরেকটি ঘটনাও ঘটলো। এই দ্বীপে এসেই দেখা গেলো অপর তিন ব্যক্তির সাথে। এরাও এসেছিলেন উত্তর মেরু অভিযানে।

এই তিনজন অভিযাত্রীরা হলেন—সুইডেনের সলোমন অগাষ্ট, ডাক্তার একহোম এবং স্ট্রিণ্ডবার্গ।

তবে মজার ব্যাপার হলো—এরা কোনো জাহাজ নিয়ে আসেননি। এরা এসেছিলেন বেলুনে চড়ে। তাদের ধারণা ছিলো উত্তর মেরুতে পৌছোবেন।

কিন্তু ন্যানসনের বিশ্বাস হলো না ঘটনাটি। বেলুনে চড়ে মেরু বিজয় করা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু সলোমন আগস্ট শুনলেন না ন্যানসেনের কথা। তিনি বরং খানিকটা গোস্যা হয়েই বললেন, –তোমার চেয়ে তো আমি কম বুঝিনে ন্যানসন।

–কিন্তু বেশী বুদ্ধির অনেক বিপদও আছে। ন্যানসন হেসে জবাব দিলেন।

–ঠাট্টা করছো?

—না। তা করবো কেনো?

—তাহলে?

—তোমার পরিকল্পনা আমার কাছে খুব উদ্ভট বলে মনে হচ্ছেতো তাই।

সলোমন বললেন– কিন্তু তোমার মতো জাহাজে চড়ে বরফের চাঁইয়ের সাথে আটকে থেকে বছরের পর বছর নিষ্ক্রিয় ভেসে বেড়ানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

–তা ঠিক।

–আমি চাই ঝটপট কাজ। আমার বিশ্বাস মেরু বিজয়ের এটাই হবে সহজ ও দ্রুততম পথ।

–বেশ তোমার যথা বুদ্ধি তাই করো। ন্যানসন বললেন।

–তাহলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখো, আমি কেমন করে তোমার চোখের সামনে দিয়েই তোমার আগেই মেরু বিজয় করে ফিরে আসছি।

তারপর সত্যি সত্যি তাই তাহলো। সলোমন আগস্ট তার অপর দু'জন সাথীকে নিয়ে বেলুন ওড়ালেন আকাশে, সেই শেষ। তারপর সলোমন তার প্রকাণ্ড বেলুন নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন তার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না।

হয়তো কোনো নিবিড় প্রান্তরে ভেঙে পড়েছিলো তাদের বেলুন। নিজের গোঁয়ার্তুমি আর বোকামীর জন্য দিয়েছিলেন নিজেদের অমূল্য প্রাণ।

যাক সলোমনের যা হবার তাই হলো। এবার ন্যানসন সাহেব নিজে কি করবেন তাই ভাবতেলাগলেন।

কিন্তু তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস হলো এভাবে বরফের চাঁইয়ের সাথে জাহাজ ভাসিয়ে উত্তর মেরুতে পৌঁছোনো যাবেনা। মেরু বিজয় করতে হলে তাঁকে অবশ্যই অন্য পথ দেখতে হবে।

সলোমন অগাস্টের মতো বেলুনে উড়ে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তবে ভিন্ন পথ যে একটি খুঁজে বের করতে হবে তা তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন। তাছাড়া এদিকে তাঁর জাহাজের খাবারের মজুতও কমে আসছিলো, এভাবে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে বেশিদিন থাকাও সম্ভব নয়। যা কিছু করতে হয় শীঘ্রই কিছু একটা করতে হবে।

অতপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন জাহাজে করে আর নয়। এবার স্থল পথেই এগুতে হববে। তাই তিনি একজন সাথী নিয়ে নেমে পড়লেন জাহাজ থেকে। ন্যানসনের সাথী বন্ধুটির নাম ছিলো ফ্রেডরিক হ্যালমার জোহানসেন। এই জোহানসেনও ছিলেন খুব সাহসী মানুষ।

সাথে নিলেন কিছু খাবার আর একটি স্লেজগাড়ি। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি। চারদিকে জনমানবশূন্য বিশাল তুষার প্রান্তর। যেদিকে তাকানো যায় শুধু বরফ আর বরফ। যেনো সে এক বিশাল ধূ-ধূ মৃত প্রান্তর।

তারা দুজনে এগিয়ে চলছেনতো চলছেনই। যেনো এ পথের আর শেষ নেই। দিনের পর দিন তারা এগিয়েই চলছেন সামনের দিকে। পথ আর শেষ হয় না।

জাহাজ ছেড়ে তারা চলেও এসেছেন অনেক পথ, ইতিমধ্যে কেটে গেছে আরো প্রায় দেড় বছর। এই দেড়বছরই তারা ছিলেন স্লেজগাড়ীতে আর বিজন তুষার প্রান্তরে।

কতখানি দৃঢ়মনের অধিকারী হলে একজন মানুষ এমনি ভয়ংকর প্রান্তরে এতো দীর্ঘকাল কাটাতে পারেন। ন্যানসনের এমনি অবিশ্বাস্য ছিলো মনোবল। তারা শুধু স্লেজ



www.nagorikpathagar.org

গাড়ি নয়, হয়তো কোনো কোনো সময় খোলা সাগরও পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তাই স্লেজের সাথে অতিরিক্ত একটি কোয়াক নৌকাও নিয়ে এসেছিলেন।

'কোয়াক' হলো চামড়ার তৈরি এস্কিমোদের এক বিশেষ ধরনের ছোটো ডিঙি নৌকা বিশেষ।

বরফ প্রান্তরের এই যাত্রা যে তাদের শুধু নিঃসঙ্গ এবং দীর্ঘ ছিলো তাই নয়, বিপদসংকুলও ছিলো। অনেক সময়েই তাদেরকে পড়তে হয়েছিলো নানা রকম বিপদ আপদে।

একবার পড়েছিলেন একদল হিংস্র শ্বেত ভাল্লুকের সামনে। কিন্তু এর চেয়েও তাদের কাছে বেশি বিপদজনক ছিলো সিন্ধু ঘোটকের আক্রমণ।

এই অতিকায় জলচর জীবগুলো ভয়ানক বদমেজাজী। অপরিচিত কাউকে দেখলেই রুখে আসতো। যেনো এই সাম্রাজ্যে ওরা বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দিতেই রাজী নয়।

একবারতো ওরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসেছিলো। গোটা তিনেক মস্ত বড় বড় দাঁতঅলা সিন্ধুঘোটক রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্লেজ গাড়ীর উপর।

এমন প্রচণ্ড আক্রমণ যে, ন্যানসন সাহব আপ্রাণ চেষ্টা করেও হিংস্র সিন্ধুঘোটক দুটোকে ঠেকাতে পারলেন না।

ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো গাড়ির উপর। তারপর গাড়ির উপরে রাখা দুটো কোয়াক দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে একাকার করে দিলো।

তখন ন্যানসেন আর জোহানসেন আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন পাশের এক বরফের পাহাড়ের উপর।

অনেকক্ষণ ধরে রাগে আর আক্রোশে সব কিছু তছনছ করে যখন হিংস্র জানোয়ার দুটো চলে গেলো তখন ওরা নেমে এলেন পাহাড় থেকে।

অবশ্য মাঝে মাঝে এর উল্টো ঘটনাও ঘটে। বাগে পেলে ন্যানসন আর জোহানসেন মিলে কাবু করে ফেলতেন কোনো সিন্ধু ঘোটক বা সীলকে। তারপর তার মাংস খেয়ে উদর পুর্তি করতেন। এভাবে তাদের খাদ্যের অভাব দূর হতো। একবার বড় সাইজের একটা সীল, ভালুক কিংবা সিন্ধু ঘোটক শিকার করতে পারলেই ওদের চলে যেতো বেশ কয়েকদিন।

শুধু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ নয়। এই যে বরফের বিস্তীর্ণ মাঠ। এতো শুধু মাঠ নয়, এর যে কোনো খানে ওৎ পেতে থাকতে পারে বিপদ।

একবার ন্যানসেন সাহেব সত্যি সত্যি পড়ে গেলেন সেই মরণ ফাঁদে। তিনি সহসা পড়ে গেলেন এক বরফের খাদে। উপর থেকে কিছুই বোঝার কায়দা ছিলোনা। সহসা উপরের বরফের স্তর ভেঙে তিনি পড়ে গেলেন খাদে।

অবশ্য মারা পড়লেন না। কোনো মতে জোহানসেনের সহায়তায় উঠে এলেন খাদ থেকে। তবু যে কয়েক ঘন্টা আটকে পড়েছিলেন ওতেই অসুবিধা হয়ে পড়লো তার।

কয়েক ঘন্টা বরফে জমে থেকে ন্যানসেনের গেঁটে বাতে ধরে বসলো। তবু তিনি পথ চলা বন্ধ করলেন না। পথে আবার শুরু হলো খাদ্যের অভাব। এটা এমনিই এক দুর্গম অঞ্চল যে এখানে না পাওয়া যাচ্ছে সীল, সিন্ধু ঘোটক ভালুক, না অন্য কোন খাবার। এদিকে সাথের খাবারও এলো ফুরিয়ে।

অবশেষে আর কি করবেন? স্লেজ গাড়ীর কুকুর হত্যা করে তার মাংস খেয়েই ওরা প্রাণবাঁচাতে লাগলেন।

কিন্তু এর মধ্যে হলো আরেক বিপদ। এই সীমাহীন, পথ ঘাট বিহীন, তুষার প্রান্তরে চলতে চলতে এক সময় দিক হারিয়ে ফেললেন।

তারা আসলে যাচ্ছিলেন দক্ষিণ দিকে। ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ডের দিকে। কিন্তু দিকভ্রম



www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়ায় চলে এলেন অন্যদিকে। কিন্তু কোন্ দিকে যে এলেন তাও বলতে পারছিলেন না।

এরপর হলো আরেক বিপদ। সাথে করে আনা দিকনির্ণয় যন্ত্রসহ সব যন্ত্রপাতিই বিকল হয়ে গেলো। তারা তখন পড়ে গেলেন মহাবিপদে। তবু এগুতে লাগলেন সামনের দিকে।

এদিকে অনাহারে অনিদ্রায় দু'জনেরই শরীর দুর্বল হয়ে আসতে লাগলো। তদুপরি ন্যানসেনের ছিলো গেঁটে বাত। তিনি আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়লেন। জোহানসেনের বয়স ছিলো কম। শরীরটাও বেশি শক্ত আর মজবুত। তিনিই তখন ন্যানসেনকে সাহায্য করতে লাগলেন।

অন্ধের মতো কিছুদূর আসার পর তারা এক জায়গায় এসে পড়লেন। জায়গাটা কোথায় তা অবশ্য তারা বলতে পারলেন না। কিন্তু দেখলেন এখানে চারদিকে আনাগোনা করছে প্রচুর শ্বেত ভালুক।

শ্বেত ভালুক অবশ্য তাদের জন্য বিপজ্জনক ছিলো। এরা খুব হিংস্র। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে বসে।

তবে ওরাওতো নিরস্ত ছিলেন না। হাতে ছিলো গুলীভরা বন্দুক। তাই ভয়ের কারণ ছিলো না।

ওরা বরং এতো ভালুক দেখে খুশিই হলেন। শিকার করতে লাগলেন মোটা তাজা ভালুক। শ্বেত ভালুকের মাংস খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।

তাই অনেক দুঃখের পর এবার শ্বেত ভালুকের মাংস দিয়ে দৈনিক দিতে লাগলেন বড় বড় ভোজ। অনাহারে থেকে যে স্বাস্থ্যহানী হয়েছিলো এবার শ্বেতভালুকের মাংস খেয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করতে লাগলেন।

ফলও ভালোই হলো। দিন কয়েকের মধ্যেই ন্যানসেন সাহেবের স্বাস্থ্য ফিরে গেলো। বাতের ব্যথাও কমে গেলো। গায়ে ফিরে এলো শক্তি।

এরপর শীতকাল চলে গেলো। শুরু হলো বসন্তকাল। চারদিকে জমাট বাঁধা বরফ কিছু কিছু স্থানে গলে যেতে লাগলো।

তারাও আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন যাত্রা। এবারও তারা প্রতি মুহূর্তে পড়তে লাগলেন নানা রকমের বিপদে।

এই সময়ে সহসা একটি ঘটনা ঘটলো। সহসাই তারা এই তুষার প্রান্তরে শুনতে পেলেন কুকুরের ডাক।

কুকুরের ডাক শুনেতো অবাক। এখানে কুকুরের ডাক আসবে কোথা থেকে? আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, এতো কোনো বুনো কুকুরের ডাক নয়। রীতিমতো পোষা কুকুরের ডাক।

কিন্তু পোষা কুকুর এই তুষার প্রান্তরে আসবে কোথা থেকে? যাই হোক অতঃপর তারা কুকুরের ডাক লক্ষ্য করেই এগুতে লাগলেন. সামনের দিকে। তারপর কিছুদূর গিয়েই সবিস্ময়ে দেখলেন—শুধু কুকর নয়। সাথে একজন লোকও আছে।

তাই তারাও দ্রুত এগিয়ে গেলেন কাছে। কাছে গিয়ে ন্যানসনতো আরো অবাক। এ যে তাদেরই লোক। তারই জাহাজের অন্যতম নাবিক জ্যাকসন। সেই একপাশে কুকুর আর গোটা দুই স্লেজগাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

তারপর এই জ্যাকসনের মুখেই তিনি শুনলেন ঘটনা। হয়েছে কি? ন্যানসন আর জোহানসেন সেই যে বছর দেড়েক আগে জাহাজ থেকে বের হয়ে এসেছেন, তারপর আর তাদের কোনো খবরই নেই।

তারা কি বেঁচে আছে না মরে গেছে তারও কোনো খবর জাহাজের লোকেরা জানে



www.nagorikpathagar.org

না। তাই ন্যানসেনের সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছে জ্যাকসনকে।

জ্যাকসন যে বের হয়েছে তাও তো মাস তিনেক হয়। এই পথহীন, ঠিকানাবিহীন তুষার প্রান্তরে স্লেজগাড়ি নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মনিবের খোঁজে।

চলতে চলতে তারও অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছিলো। তারপরই আজ হয়ে গেলো দেখা। জ্যাকসন দেখলো তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে তারই সামনে। যেনো বিস্ময়কর ব্যাপার।

তারপর জ্যাকসন ওদের দুজনকে নিয়ে ফিরে এলো তার নিজের তাঁবুতে। এই বছরই আবার দেশ থেকে এলো প্রচুর খাদ্যসম্ভার নিয়ে নতুন জাহাজ, জ্যাকসন অবশ্য গেলোনা। অভিযান চালাবার জন্য রয়ে গেলো জাহাজে।

কিন্তু ন্যালসনের শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিলো বলে খাদ্য সরবরাহের জাহাজে করেই ফিরে এলেন সভ্য জগতে।

এই সুদীর্ঘ পথের অভিযানেও অবশ্য ন্যানসন সফলতা লাভ করতে পারেননি। তার মূল লক্ষ্য ছিলো মেরু বিজয়, তা তিনি পারেননি। কিন্তু তিনি মেরু অঞ্চল সম্পর্কে সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর তথ্য। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তিনি পরবর্তী সময়ে রচনা করেছিলেন একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

## রবার্ট এডউইন পিয়েরী

ন্যানসেনের মতোই আরেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ছিলেন এ্যাডমিরাল রবার্ট এডউইন পিয়ারী (Admiral Robert Edwin Peary -১৮৫৬-১৯২০)

পিয়েরীর বাড়ী ছিলো পেনিসালভেনিয়াতে।

তিনি যেমন ছিলেন শক্তসমর্থ আর শক্তিশালী দেহের অধিকারী তেমনি মনটাও ছিলো শক্ত।

এই পিয়েরী অবশেষে করেছিলেন সেই অসাধ্য সাধন। জয় করেছিলেন উত্তর মেরু বিজয়ের গৌরব মুকুট।

পিয়েরী কিন্তু সহসাই একেবারে ঝোঁকের মাথায় অভিযানে নামেননি। তারও প্রস্তুতি ছিলো দীর্ঘদিনের। বহুদিন থেকেই তিনি উত্তর মেরু অঞ্চলের পরিবেশ পথ-ঘাট আবহাওয়া এবং সেখানকার অধিবাসী এস্কিমোদের জীবনযাত্রা আদবকায়দা সম্পর্কে পড়াশোনা করতে ছিলেন।

তিনি ছিলেন নৌ বাহিনীর লোক। সেনাবাহিনীর কাজেই তাকে অনেক সময় আককিট সাগরের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই সময়েই তিনি উত্তর মেরুর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নানা দিক ও বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

তখন থেকেই তার মনে বাসনা জেগেছিল উত্তর মেরুতে অভিযান চালাবার। তিনি উত্তর মেরুতে অভিযান চালিয়েও ছিলেন বেশ কয়েকবার। প্রায় আট বারের মতো। কিন্তু সফলতা খুব সহজে আসেনি। তাকেও বার বার ফিরে আসতে হয়েছে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে।

কিন্তু প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী, যিনি সাধারণের কাছে লৌহমানব বলে খ্যাত ছিলেন, তিনি কখনো ভেঙে পড়েননি। যতোবার তার পরাজয় হয়েছে ততবার তিনি নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে।

অবশ্য তার এই বার বার ব্যর্থতায় অন্য একটি লাভ হয়েছিলো, অভিজ্ঞতা বাড়ছিলো দিনে দিনে। পথ-ঘাট এবং এস্কিমোদের সম্পর্কে জানা হচ্ছিল তার প্রচুর।



www.nagorikpathagar.org

উত্তর মেরু বিজয়ী পিয়েরী

বলতে গেলে এই অভিজ্ঞতাই তাকে পরবর্তী সময়ে এনে দিয়েছিলো সফলতা। আগের এতো অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো বিজয়মালা তার পক্ষেও ছিনিয়ে আনা সম্ভব ছিলো না।

১৯০৮ সালে তিনি শুরু করেন তার সর্বশেষ এবং সার্থক মেরু অভিযান। এই অভিযানে তার দলে ছিলো উনিশটি স্লেজ গাড়ি, একশো তেত্রিশটি কুকুর, পনেরো জন এস্কিমো, একজন নিগ্রো চাকর। এ ছাড়া তার আরো ছিলো সাতজন ইংরেজ সহযোগী অভিযাত্রী। তিনি যে জাহাজটি নিয়ে বের হয়েছিলেন তার নাম ছিলো রুজভেল্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নামে নাম।

তারা দেশ থেকে রওনা দিয়েছিলো জুলাই মাসে (১৯০৮)। এরপর একটানা চললো জাহাজ। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভালোই চললো।

তারপরই জাহাজ এসে প্রবেশ করলো বরফের রাজ্যে। আর জাহাজ চালানো যাচ্ছেনা। ঘন বরফের চাঁই ঘিরে আছে চারপাশে। এই ঘন বরফের খন্ড ঠেলে জাহাজ নিয়ে আর এগুনো সম্ভব নয়।

অতঃপর পিয়েরী সিদ্ধান্ত নিলেন জাহাজ নিয়ে এগোনো যাবে না। এবার তাদেরকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করতে হবে। এবার থেকেই তাদের শুরু হবে সত্যিকার অভিযান।



www.nagorikpathagar.org

উত্তর মেরু বিজয় শেষে পিয়েরী। সাথে তার একমাত্র সাথী কুকুর।





www.nagorikpathagar.org

এই যে সময়টা তারা জাহাজ থেকে নেমে বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন এই সময়টা ছিলো রাত্রিকালীন সময়।

বলা বাহুল্য মেরু অঞ্চলেতো ছ'মাস রাত আর ছ'মাস দিন। এই সময়টা ছিলো রাত্রি। তাই আকাশে ছিলোনা সূর্য। চারদিকে ছিলো আবছা অন্ধকার।

এই সময়ে শীতটাও পড়ে বেশি। তবু দমলেন না পিয়েরী। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই রওনা দিলেন। প্রায় মাসখানেক ধরে তারা হেঁটেই চললেন।

এলো মার্চ। এবার আকাশে দেখা দিলো সূর্য। মেরুর রাত্রিকালীন সময় পার হয়ে শুরু হলো দিনের পালা। আকাশে দেখা দিয়েছে থালার মতো রক্তিম সূর্য।

এবার আর ভয় নেই। একবার যখন সূর্য উঠেছে তখন ছ মাসের আগে আর রাত নামবেনা।

দিন শুরু হওয়ার পরই পিয়েরী তাঁর অভিযান পরিকল্পনারও কিছু পরিবর্তন সাধন করলেন।

তিনি সবাইকে ডেকে বললেন—আমার মনে হয় এতোবড় বহর নিয়ে এগোনো আর ঠিকহবেনা।

–তা হলে?

–আমি দলের লোকসংখ্যা কমিয়ে ফেলতে চাই।

–কেমন করে?

–আমার সাথে সবাই যাবার দরকার নেই। তোমরা বরং ফিরে যাও।

–বেশ আপনি যা বলবেন তাই হবে।

–তোমরা ফিরে যাও এবং ফেরার পথে মাঝে মাঝে তাঁবু গেড়ে সেখানে খাবার এবং রসদ রেখে যাবে, যাতে আমাদের ফেরার পথে সেগুলো প্রয়োজনে আসে।

অতঃপর তাই হলো। দলনেতা পিয়েরীর নির্দেশ মতো সবাই ফিরে চললো জাহাজের দিকে।

পিয়েরীর সাথে রইলো শুধু তার বিশ্বস্ত নিগ্রো সহচর হ্যানসন এবং একটি স্লেজ গাড়ী।

এই সামান্য আয়োজন নিয়ে পিয়েরী শুরু করলেন তাঁর মূল অভিযান।

পথে এলো হাজারো বিপদ। দু'জনেই ছিলেন চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু পথকষ্ট তবু সহ্য হলোনা তাদের। শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো।

কিন্তু শরীর ভেঙে পড়লেও মন ভাংলোনা। তারা এগিয়েই চললেন দৃঢ় পদক্ষেপে।

অবশেষে সত্যি সত্যি তারা পৌঁছেতে সক্ষম হলেন পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দুতে।

সেদিন ছিলো ১৯০৯ সালের ৬ ই এপ্রিল তারিখ। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

পিয়েরী নিজ হাতে মেরুবিন্দুতে পুঁতে দিলেন বিজয় পতাকা। তারপর সশ্রদ্ধচিত্তে অদূরে দাঁড়িয়ে নিজ দেশের জাতীয় পতাকাটিকে হাত তুলে জানালেন সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

মেরুবিজয় শেষে মনে প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে আবার ফিরতি পথে হাঁটতে লাগলেন পিয়েরী এবং হ্যানসেন।

তার এই মেরু বিজয়ের খবর সর্বপ্রথম প্রচারিত হলো কানাডার নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ডের লাব্রাডরের ইণ্ডিয়ান হারবার বেতার থেকে।

১৯১০ সালের মে মাস নাগাদ বিজয় অভিযান শেষ করে পিয়েরী লণ্ডনে ফিরলেন। তাঁকে জানানো হলো আন্তরিক অভিনন্দন। দেয়া হলো বীরের মর্যাদা।

উত্তর মেরু বিজয়ী বলে এমনি করে পিয়েরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকলো চিরদিনের জন্য।



www.nagorikpathagar.org

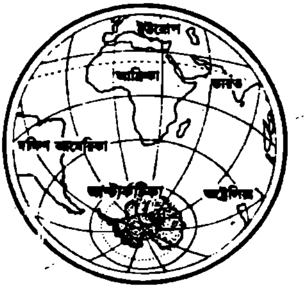

# দক্ষিণ মেরু অভিযান

দক্ষিণ মেরুর তুষারে ঢাকা আজব দেশটিকে নিয়েও কিন্তু মানুষের কৌতূহল আজকের নয়। এর ভেতরে যে রহস্য আছে তা জানার জন্য মানুষের চেষ্টারও কোনো ত্রুটি নেই। সর্বপ্রথম কে এই মহাদেশটি একদিন সহসা কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করে ফেলেছিলো তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে এর অস্তিত্বের কথা সেই আদিযুগ থেকেই প্রচারিত ছিলো রূপকথার মতো।

সম্ভবত দ্বিতীয় শতক থেকেই উত্তরের ডাঙ্গা ভুমির সম্পর্ক প্রাচীন মানুষের মনে ধারণা ছিলো। তারা মনে করতেন হয়তো দক্ষিণ দিকেও এমনি একটি বিশাল মহাদেশ আছে। যদিও সেই কল্পনার মহাদেশে মানুষের পদচিন্হ এঁকে দিতে সময় লেগেছিলো আরো প্রায় দুহাজার বছর।

গ্রীকরা সেই টলেমি যুগেই বিশ্বাস করতো উওর গোলার্ধের মহাদেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই দক্ষিণ সাগরেও একটি বিশাল মহাদেশ রয়েছে।

গ্রীকদের মতো পলেনেশিয়ানরাও তাই ভাবতো এবং দক্ষিণ দিকেও এরাই প্রথম অভিযান চালিয়েছিলো। পলেনেশিয়ানদের বারোটঙ্গন বলে একটি প্রাচীন গ্রন্হ আছে।

এই গ্রন্হের প্রাচীন রূপকাহিনীতে আছে তাদের দেশে উইতে ররান রিগয়েরা নামে এক দুঃসাহসিক রাজপুত্র ছিলেন। তিনি ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তার একদল সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তে- ইভি-ও আতিয়া নামে একটি পালতোলা জাহাজে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ সাগর।

তিনি দক্ষিণ সাগরের কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তার অবশ্য বর্ণনা নেই। তবে তিনি যে সাগরে বরফের পাহাড় দেখেছিলেন তার বর্ণনা আছে।

এই কাহিনী থেকে অনেকে অনুমান করে পলেনেশিয়ান রাজপুত্র হয়তো মূল এন্টার্কটিকা পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে পারেননি। তিনি যে বরফের পাহাড়ের কথা বলেছেন ওটা হয়তো সাগরে ভাসমান বিশাল হিমশৈল হবে। এই প্রকান্ড উঁচু হিমশৈলকেই পাহাড় বলেছেন।

এরপর থেকে যারা এরই মহাদেশ নিয়ে গবেষণা করেছেন কিংবা অভিযানে গেছেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। এই ইউরোপীয় অভিযাত্রীরাই প্রথম এই রহস্যময় দেশটি সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে জানা যায় এন্টার্কটিকাকে আগে যতো বড় বলে অনুমান করা হচ্ছিলো আসলে ওটা ততো বড় না।

যেমন টলেমি যুগে অনুমান করা হতো এই অজানা দেশটি হয়তো বিশাল একটি মহাদেশ। যার বিস্তৃতি দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা এবং মালয় দ্বীপ পর্যন্ত। কিন্তু এদের অভিযানের পরেই জানা গেলো হয়তো দেশটা আসলে ততো বড় নয়।



www.nagorikpathagar.org

১৫৩১ সালে ওরোনটিয়াস নামে এক পন্ডিত এই অজানা দেশ এন্টার্কটিকার একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। এই মানচিত্র বর্তমান মানচিত্রের সাথে অনেক মিল আছে। কিন্তু আকৃতি ছিলো অনেক বড়। প্রায় তিনগুণ বড়

এরপর থেকে আস্তে আস্তে এই মহাদেশটি সম্পর্কে মানুষের ধারণা পালটাতে শুরু করে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা-গামা আবিষ্কার করেন দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ। ১৫৭৮ সালে ফ্রান্সিস ড্রেক আবিষ্কার করেন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম অংশ এবং ১৬৪২ সালে আবেল টানমান আবিষ্কার করেন নিউজিল্যান্ড ও সালমান দ্বীপপুঞ্জ। আর এই সালে অভিযান থেকেই দক্ষিণের দেশটি সম্পর্কে মানুষের সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে থাকে।

তবে ১৭৫০ সালের আগ পর্যন্ত ৫০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে কেউ যেতে পারেননি। অবশ্য ১৭৩৯ সালে ফরাসী নৌবাহিনী বিখ্যাত নাবিক বুভ্রেদা ল্যাজিয়াব আবিষ্কার করেন দক্ষিণ সমুদ্রের বেশ কয়েকটি দ্বীপ। এগুলো হলো কারগুলী দ্বীপ, বুভে দ্বীপ, এবং দুর্ফেশ দ্বীপ, কিন্তু তা সত্বেও তিনি কুমেরু বৃত্তে দক্ষিণে যেতে সক্ষম হননি।

কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে যাবার প্রথম গৌরব যিনি অর্জন করেন তিনি হলেন বিখ্যাত নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে গিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

ক্যাপ্টেন কুক প্রথম দক্ষিণ সমুদ্র যাত্রার চেষ্টা করেছিলেন ১৭৭২ সালে। কিন্তু দুস্তর বরফের বাধা অতিক্রম করে বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি পৌছতে পারেননি এন্টার্কটিকায়। এরপর তিনিও ১৭৭২ সালে থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে বার তিনেক গিয়েছিলেন এই অভিযানে। এর মধ্যে তিনি ১৭৭৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পৌছেছিলেন দক্ষিণের প্রায় সর্বশেষ সীমানায়। তিনি ৭১-১০ দক্ষিণে অংশে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই স্থানটি এমনই দুর্গম যে আজো এখানে পৌছতে আইস ব্রেকারকে পর্যন্ত হিমশিম খেতে হয়।

তবু এতো চেষ্টা করেও তিনি এন্টার্কটিকার মূল ভূখন্ড পৌছতে পারেননি। এর আগেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিলো।

ক্যাপ্টেন জেমস কুক তার দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি চমৎকার বইও লিখেছেন। এ ভয়েজ টুওয়ার্ডস দি সাউথ (A voyage Towards the South) নামক বই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন তার নিজের ভ্রমণের কথা।

বরফের কাছাকাছি এসে পেঙ্গুইনের ডাক শুনতে পেলাম, কিন্ত কোনো পেঙ্গুইন চোখে পড়লো না। আর এমন একটি পাখি বা কোনো কিছু দেখলাম না, যাতে ভাবতে পারি কাছেই ডাঙা আছে। সমুদ্রের মোট ১৯ টি অভিযান হয়েছে। এর মধ্যে দশটি চালিয়েছে মার্কিন কোম্পানী, ৯টি বৃটিশ কোম্পানী এবং একটি অস্ট্রেলিয়া কোম্পানী। চির তুষারের দেশের সম্পদই তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিলো এই ভয়ানক স্থানে। তাইতো জীবনকে বাজী রেখে দুঃসাহসিক নাবিকরা এসে পা রেখেছিলেন এই বরফেরদেশে।

জনমনুষ্যহীন এই দেশে টাকা পয়সা, ধন-দৌলত, সোনা-দানা পাওয়া না পাওয়া গেলেও পাওয়া যায় এর তীরে প্রচুর পরিমাণ তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক আর পেঙ্গুইন পাখি। এদের জন্যই হয়তো দুঃসাহসিক নাবিকরা দলে দলে একদা ছুটে আসতো এদেশে।

শেষে আরো একটি মূল্যবান সম্পদ আবিষ্কৃত হলো এখানে। সে হলো—কয়লা। এই হাজার হাজার ফুট পুরু বরফের স্তরের নীচ থেকে মানুষ খুঁজে পেলো মূল্যবান



www.nagorikpathagar.org

কয়লা।

কয়লা আবিষ্কার শুধু নাবিকদের নয় এবার বিজ্ঞানীদেরকেও কৌতূহলী করে তুললো এদেশ সম্পর্কে। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন নতুন করে।

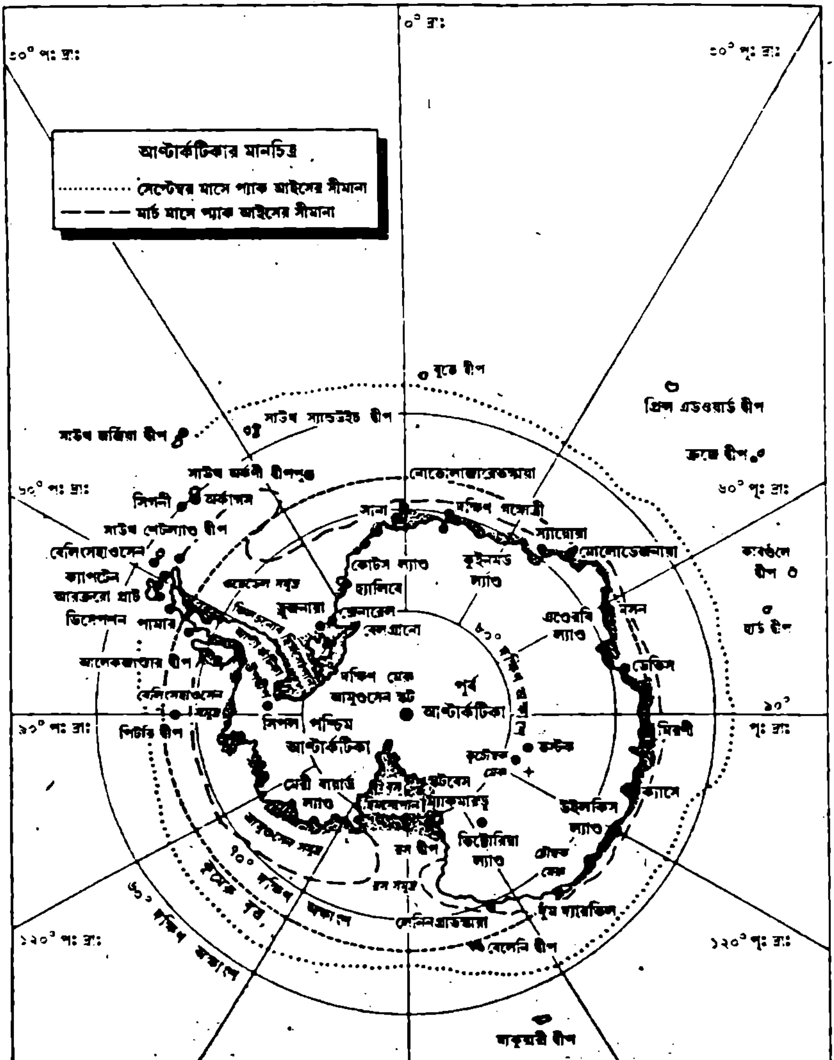




www.nagorikpathagar.org

কয়লার জন্মতো হয় গাছপালা থেকে। এই যে সুবিশাল মহাদেশ যেখানে শুধু বরফ আর বরফ। হাড় কাঁপানো কনকনে শীত। কিন্তু সেখানে গাছ জন্মালো কেমন করে? তাহলে কি এই মহাদেশের চেহারা আগে এমন ছিলো না?

অর্থাৎ পৃথিবীর আর ছয়টি মহাদেশের মতো এখানেও কি নিয়মিত সূর্য্য উঠতো? বিরাট বিরাট সেই গাছগুলোই হয়তো কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নিচে থেকে এই কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে।

নিশ্চয়ই হয়তো তাই হয়েছে। নইলে কয়লা এলো কোথেকে? হয়তো কোটি কোটি বছর আগে এদেশের আবহাওয়া এমনি ছিলো না। এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনা চিন্তা আরো অব্যাহত রয়েছে?

তবে সবাই যে শুধু তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটকের তেল আর কয়লার লোভে এসেছিলেন তা নয়। এদের মধ্যে সত্যিকারের কৌতূহলী অভিযাত্রীরাও ছিলেন।

আর বাইরের দুনিয়ার এমন এক আজব আর বিশাল দেশের খবর ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই সারা পৃথিবী জুড়ে সাড়া পড়ে গেলো। শুরু হলো এদেশের ভূ-খণ্ড দখল করার প্রতিযোগিতা। কোন দেশের সরকার আগে অভিযাত্রী পাঠিয়ে কতো বেশি জায়গা দখল করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতায় এরপর থেকেই অংশ নিয়েছিলো পর্তুগীজ, গ্রীস, নরওয়ে, রাশিয়া প্রভৃতি কতোকগুলো উন্নত আর শক্তিশালী দেশ। এই দেশগুলোর সরকারের সহযোগিতা আর সাহায্যেই একের পর এক জাহাজ এসে নোঙর করতে লাগলো এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফঘেরা তীরে। নীরব আর চিরশীতল ভূমি এবার সভ্য মানুষের পদাঘাতে বিক্ষত হতে লাগলো।

এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মধ্যে যাদের নাম আজো স্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁরা হলেন, বিসকো, জেমস ওয়েডেন, ক্যাপ্টেন ভনবেলিং হাউসেন, স্যার জেমস ক্লার্ক রস, রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন, নিকোলাই হ্যানসন, রবার্ট ফকন স্কট, আর্নেষ্ট হেনরি শ্যাকলটন্, ডাক্তার স্কটলস মাশন, বাওয়ার্শ, ওটস, এডগার ও ইভানা সহ আরো অনেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এদের জীবনের বিনিময়েই আজ সভ্য জগতের মানুষ এই আজব দেশটির অনেক কথা জানতে পেরেছে। এরাই মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অসীম সাহসে ভর করে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন এই রহস্যময় দেশের। তাইতো ইতিহাস আজো এদের স্মরণ করে।

এই অভিযানের পথ ছিলো যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসংকুল আর রোমাঞ্চকর। তবু এই বিপদকে দু'পায়ে দলে কেমন করে এরা সামনের দিকে দীপ্ত সাহসে ভর করে পা বাড়িয়েছিলেন তা শুনলে আজো মানুষ অবাক হয়। আর এই অসীম সাহসী বীর অভিযাত্রীদের প্রতি মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় ভরে আসে।

## ক্যাপ্টেন বেলিং হাউসেন

এই অভিযাত্রীদের কথা বলতে গেলে যার কথা প্রথমে মনে আসে তিনি হলেন ক্যাপ্টেন ভনবেলিং হাউসেন। তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসিক নাবিক। সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ানো ছিলো তার নেশা পেশা দুটোই। বাইরের কূলহীন, কিনারাহীন সাগরের বুকে পালতোলা জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে তিনি পাড়ি জমাতেন কোন নিরুদ্দেশের পথে। কতো নাম জানা আর অজানা দেশে গিয়ে ভিড়তো তাঁর জাহাজ।

এমনি করে সাগরের বুকে ভাসিয়ে, নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে ভাস্টক ও মিরনী নামে দুটো জাহাজ নিয়ে তিনি ১৮০৩ সালে সারা পৃথিবী ঘুরে আসেন। জাহাজ নিয়ে যারা বিশ্ব পরিক্রম করেছেন, তিনিও নাম লেখান তাদেরই দলে।



www.nagorikpathagar.org

এরপরই তাঁর কানে এলো এই চির তুশারের আজব দেশ এ্যান্টার্কটিকার কথা। লোকের কাছে শুনতে পেলেন এর রোমাঞ্চকর সব গল্প কাহিনী। মনে তার কৌতূহল দানা বেঁধে উঠলো।

এই অভিযানে তিনি একটি মস্তবড় সাগর আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নিজের নাম অনুসারে এর নাম রাখেন – ওয়েডেল সী বা ওয়েডেল সাগর। এই সাগরেই আজকের বৃটিশ স্টেশন হ্যালি বে' অবস্থিত।

এ্যান্টার্কটিকা অভিযানের আরেক নায়ক জন বিস্‌কোরও কয়েকটি অবদান রয়েছে তাঁর সবচেয়ে বড় নজির হলো বিসকো দ্বীপপুঞ্জক ও এ্যাডেলেড দ্বীপ

১৮৩৩ সালে এণ্ডেরবি হোয়েলিং ফার্মের আরেক অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন ফীটার ক্যাম্প আবিষ্কার করেন গ্রাহাম ল্যাণ্ড, ক্যাম্প কোস্ট ও হার্ড দ্বীপ।

এরপরও জন ব্যালনী এবং ফরাসী নাবিক দ্যা মাঁ ডউর ভিল নামে দু'জন নাবিক এসে নামেন এ্যান্টার্কটিকার বুকে। আবিষ্কার করেন অনেক অজানা আর দুর্গম স্থান। অধিকার কায়েম করেন নিজ নিজ সরকারের পক্ষ থেকে।

ডউর ভিলের জাহাজ দুটোর নাম ছিলো এ্যাস্ট্রোলোর আর 'জিলি'। তিনি চৌম্বক মেরুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৪০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আবিষ্কার করেছিলেন এ্যান্টার্কটিকার একটি অংশ। তিনি এই স্থানটির নাম করণ করেন নিজের স্ত্রীর নামানুসারে 'ডের এ্যাডেল'।

পরে ফ্রান্স এখানেই একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে এবং দাউর ভিলের নামেই নামকরণ করেন–'দুমে দাউর ভিল'।

দাউর ভিল এখানে এক বিশেষ জাতের পেঙ্গুইন পাখিও আবিষ্কার করেন এবং স্ত্রীর নামে নাম রাখেন 'এ্যাডেলি পেঙ্গুইন'।

## জেমস ক্লার্ক রস

১৮৩৯ সালে এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অভিযান পরিচালনা করতে আসেন স্যার জেমস ক্লার্ক রস। সাথে আরেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এই ভদ্রলোকের বাড়ি ছিলো আমেরিকায়। চাকরি করতেন আমেরিকার নৌবিভাগে।

যেমন ছিলেন সাহসী, তেমনি অজানা অচেনা পথের সন্ধান জানার বিষয়ে আগ্রহী। অবেশেষে সরকার তাঁকেই এ্যান্টার্কটিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কথা হলো তিনি মহাদেশের দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যাবেন।

এ পর্যন্ত কোনো অভিযাত্রী কুমেরু বিন্দু আবিষ্কার করার সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। এটা যদি করতে পারেন, তবে একটা কাজের মতো কাজ হবে। এটা যেমন আমেরিকার জন্য গৌরব তেমনি তাঁর নিজের পক্ষেও। কাজটা করতে পারলে তিনি নিজেও কুমেরু বিন্দু বিজয়ের সম্মান নিয়ে ইতিহাসে চির অমর হয়ে থাকবেন। নাম হবে সারা বিশ্ব জুড়ে।

অতঃপর তাঁর যাত্রার আয়োজন করা হলো। তাঁকে দু'টো বড় বড় জাহাজ দেয়া হলো। জাহাজ দু'টোর নাম টেরর (Terror) এবং এরেবাস (Arebus)। আরো দেয়া হলো অভিযানের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। সংগে রইলো আরেক দুঃসাহসিক নাবিক নাম তার ক্রোজিরিয়ার।

তারপর একদিন তাঁর জাহাজ দু'টো ভাসলো মহাসাগরের বুকে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে, বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে অবশেষে ভিড়লো এসে বরফের দেশে।

কিন্তু এতো যে আয়োজন, তারএতো যে উৎসাহ তা সত্ত্বেও কিন্তু রস তাঁর অভিযানর মূল উদ্দেশ্যই সফল করতে পারেননি। কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত যাওয়া তাঁর



www.nagorikpathagar.org

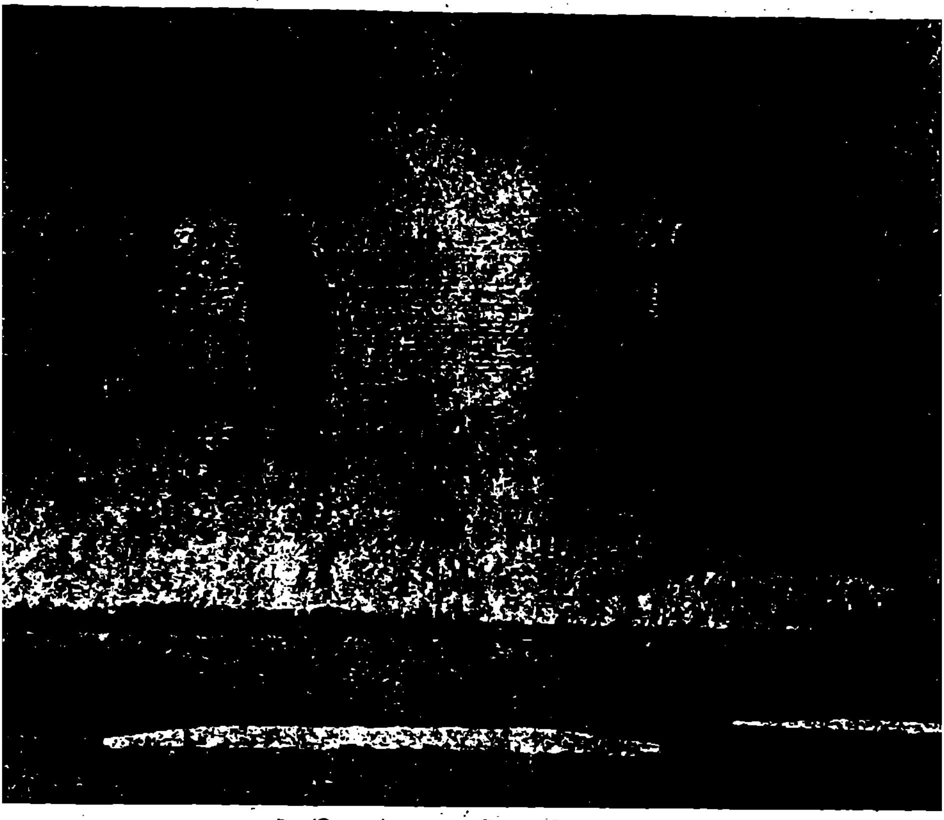

এ্যান্টার্কটিকার উপকূলের বিশাল হিমশৈলের একাংশ

পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবে একেবারেই যে এই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিলো তাও বলা যায় না। এই অভিযানে এসে হাজারো বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তা হলেতো একবার দেশটা ঘুরেই আসতে হয়। কেমন দেশটা? এতো সাগর পাড়ি দিয়ে এতো ঘুরেও যদি এমন একটি দেশই না দেখা হলো, তবে যে গোটা সে সফরটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঠিক এই সময়েই রাশিয়া সরকারের তরফ থেকেও এই অভিযানে প্রেরণ করার জন্য তাকেই আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি সানন্দচিত্তে সরকারের এই অনুরোধ গ্রহণ করলেন। এমনিতে যাবার জন্য মনটা ছটফট কচ্ছিলো, তার উপর আবার নেমন্তন্য।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন মস্ত বড় এক অভিযাত্রী দল নিয়ে নানারকম সাজ সরঞ্জাম নিয়ে পাড়ি ধরলেন এ্যান্টার্কটিকার পথে। তার বহুদিনের স্বপ্নের দেশে।

তিনি এই বরফের দেশে প্রায় তিন বছর ছিলেন। ১৮১৯ সালে পর্যন্ত এই দীর্ঘ তিন



www.nagorikpathagar.org

তিনটি বছরই তিনি তাঁর অভিযাত্রী দল নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এই বরফের দেশে। ভোগ করেছেন অশেষ নির্যাতন। বিপদে পড়েছেন অনেক বার। প্রতি মূহুর্তে তবু মৃত্যুর সাথে পাল্লা লড়ে তিনি এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তার মতো সাহসী লোকের কাছে ভয় ডর বলেতে কিছু ছিলো না।

এই ভাবেই সাহসে ভর করে কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ীতে চড়ে তিনি এগিয়ে গেছেন হিমশীতল পথ বেয়ে দক্ষিণ দিকে। তিনি প্রায় ৭০০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রী তিনি যে দু'টি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন তা হলো, দু'টি নতুন দ্বীপ আবিষ্কার। দ্বীপ দু'টি হলো '—আলেকজাণ্ডার দি ফার্ষ্ট ও পীটার দি ফার্ষ্ট আইল্যাণ্ড।' তিনি জানতে পারেন যে, এই চিরতুষারের দেশের যে জমাট বাঁধা বরফ তা পেরিয়ে ৬০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ যেতে পারলেই খোলা সমুদ্র পাওয়া যাবে।

এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের জলবায়ু নিয়ে এতো দিনও মানুষের ভুল ধারণা ছিলো। এতোদিন লোকের ধারণা ছিলো বরফ ঢাকা মেরুঅঞ্চলে বা সুমেরু বৃত্তই বুঝি সবচেয়ে ঠাণ্ডার দেশ। কিন্তু এ্যান্টার্কটিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো।

অভিযাত্রীরা কুমেরু বৃত্তের হিম শীতলতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এযে সুমেরু বৃত্তের চেয়েও অনেক শীতল। এবার থেকে সবাই নিশ্চিত জানতে পারলেন যে এটাই পৃথিবীর শীতলতম স্থান।

গরম সময়ে যখন আকাশে সূর্য মাঝে মাঝে এক আধবার উকিঝুকি মারে, তখন শীতের তীব্রতা কিছুটা কম থাকে। তখন বরফের বাসিন্দা সীল, সিন্ধুঘোটকরা এসে সাগরের পাড়ে ঘোরাফেরা করে রোদ পোহায়।

কিন্তু শীতকাল পড়ার সংগে সংগে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তারপর এমন হিমশীতলতা নেমে আসে যে, ওই সব বরফের বাসিন্দা জীবজন্তুগুলোও ভয়ের চোটে কোথায় গিয়ে যে লুকায় তার পাত্তাই পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ তিন বছর এই বরফের দেশে কাটিয়ে ,অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন ভনবেলিং হাউসেন।

## জেমস ওয়েডেল ও জন বিস্কো

এরপর ১৮২৩ সালে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী জেমস ওয়েডেল ও জন বিস্কো এসে পা রাখেন এই বরফের দেশে। তাঁকে এই অভিযানে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনের এণ্ডেরার হোয়েলিংফার্ম।

এই জেমস ওয়েডেলও ছিলেন ভয়ানক সাহসী। তিনিও এখানে পর পর কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযান চালান। সমস্ত বাধা আর বিপদকে পায়ে দলে তিনি জেমস ও বোফয় নামে দুটো জাহাজ নিয়ে এই বরফ ভেংগে ভেংগেই প্রায় ৭৪ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

তিনি প্রায় ৭৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। বিপদসংকুল সমুদ্র পেরিয়ে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত একটি অন্তরীপ।

তিনি তাঁরই সংগীর নামানুসারে এর নাম রাখলেন ক্রোজারিয়ার অন্তরীপ। তিনি আরো আবিষ্কার করেন বিশাল একটি বরফ ঢাকা সমতল ভূমি। এটাই হলো বিখ্যাত সাউথ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড। (South Victoria Land)।

তারপরই রস আবিষ্কার করলেন আরেকটি মস্তবড় বরফের পাহাড় ঘেরা স্থান



www.nagorikpathagar.org

যেনো বরফের স্তূপ জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি আজব দুর্গ। যেমন বিচিত্র, তেমনি ভয়াবহ তার আকৃতি। রস অবাক হয়ে নাম দিলেন দি গ্রেট আইস ব্যারিয়ার (The great Ice Barriar)।

এই অভিযানে রসের সব চেয়ে বড় আবিষ্কার হলো দুটো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এই চির তুষারের রাজ্যের সে এক বিস্ময়কর বস্তু। এই চির তুষারের দেশেও যে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এটাই হলো বিস্ময়।

একদিন জেমস ক্লার্ক রস তাঁর সাথীদের নিয়ে কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ীতে চড়ে অভিযানে বের হয়েছেন। সাদা বরফের শীতল পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে।

তারপরই তাঁর চোখে পড়লো এই বিস্ময়কর দৃশ্য। কিন্তু তাঁরা বিস্মিত হলেন আরো খানিকটা তাকিয়ে থাকার পর। পর্বতের চূড়া থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া আর আগুন।

তা হলে নিশ্চয়ই এটা সাধারণ পর্বত নয়। আগ্নেয়গিরি হবে। তাও আবার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। চির তুষারের দেশে এই আগুনের খেলা দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন।

যে দু'টো আগ্নেগিরির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন এ দুটোই হলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

তিনি তাঁর দুই জাহাজের নামানুসারে এই আগ্নেয়গিরি দুটোর নামকরণ করলেন। একটির নাম দিলেন মাউন্ট এরেবাস এবং অপরটির নাম দিলেন মাউন্ট টেরর। এর মধ্যে এরেবাস আগ্নেগিরিটির উচ্চতা প্রায় ১৩,০০০ ফুট।

এই অভিযানে গিয়ে জেমস ক্লার্ক রস একবার মস্ত বড় এক বিপদেও পড়েছিলেন।

নীরব নিথর সেই মহাশূন্য প্রান্তর রহস্য একদিন কেঁপে উঠলো। শোঁ শোঁ শব্দে নেমে এলো ভয়ানক ঝড়। বাতাসের বেগ প্রচণ্ড। সেই সাথে বৃষ্টি। কিন্তু সেই বৃষ্টির ফোটা তরল জল নয়। প্রচণ্ড শীতে বৃষ্টির ফোটা জমে গিয়ে বরফ হয়ে গেছে। শিলা বৃষ্টি। অজস্র পাথরের টুকরো। এরই নাম হলো তুষার ঝড়। এই তুষারের কণাগুলোই প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় বিদ্যুৎ বেগে এসে ছিটকে পড়ছে।

এই ভয়ানক ঝড়ে চারদিক ওলট পালট হয়ে গেলো। লক্ষ লক্ষ টন ওজনের বরফের পিণ্ড গড়িয়ে পড়তে লাগলো পাহাড়ের মাথা থেকে। দ্বীপ সদৃশ্য হিমশৈল ভেঙে গেলো কোন্ দিকে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। যা চোখে না দেখলে বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

এই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও জেমস ক্লার্ক রস সাহস হারালেন না। তিনি প্রাণপণে তাঁর জাহাজ দুটোকে সোজা রাখার চেষ্টা করলেন। জাহাজের পাল মাস্তুল সব ভেংগে চুরমার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

কিন্তু তাও সম্পূর্ণ রক্ষা পেলেন না। এই প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় তাঁর জাহাজ দু'টো ভেসে যেতে লাগলো এক অজানা সমুদ্র স্রোতে। দীর্ঘ কয়েকদিন একটানা তাণ্ডব লীলা চলার পর অবশেষে ঝড় থামলো। আবার তুষার রাজ্য শান্ত হয়ে এলো।

জেমস ক্লার্ক রস যেখানে তাঁর জাহাজ ভিড়িয়ে ছিলেন এখন আর সেখানে নেই।

ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজ তার অনেক দূর এসে পড়েছে। কিন্তু এটা যে কোন জায়গা তা বুঝতেই পারলেন না তিনি। হয়তো এই কয়েক দিনের ঝড়ে তাঁদেরকে ঠেলে অনেক দূর এনে ফেলে দিয়েছে। এ এক অজানা অচেনা বরফের রাজ্য।

—তা দিক। তবু যে তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন এটাই ঈশ্বরের অপার করুণা।

ঝড় থামলে জেমস ক্লার্ক রস তাঁর জাহাজের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, সামনেই এক প্রাকাণ্ড সাদা ধবধবে বরফের পাহাড়।



www.nagorikpathagar.org

প্রায় হাজার দেড়েক ফুট উঁচু।

–কৈ এ পাহাড়, তো আগে তিনি কখনো দেখেন নি। তাহলে নিশ্চয়ই এটাও তাঁর নতুন আবিষ্কার। তখন তিনি এই পাহাড়ের নাম দিলেন মাউন্ট স্যাবীন।

এর পরেও তিনি আরো অভিযান চালিয়ে ছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো কুমেরু বিন্দুতে পৌঁছানো। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি অতোদূর পর্যন্ত যেতে সক্ষম হননি। অনেক চেষ্টা চালিয়ে তিনি প্রায় ৭৮ ডিগ্রী ৫০ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন। অবশ্য উনিশ শতকে দক্ষিণ মেরুর অভিযানের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো সর্বোচ্চ রেকর্ড।

জেমস ক্লার্ক রস তাঁর অভিযান কাহিনীর উপর লিখিত 'ভয়েজ টু দা সাউদার্ন' সীজ (Voyage to the southern seas) গ্রন্থে এই অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, অনুকূল বাতাস আর পরিষ্কার আবহাওয়া। আমরা দক্ষিণের দিকে দৌঁড়িয়েছিলাম, দুপুর থেকে যে ডাঙা দেখা যাচ্ছিলো তারই কাছে তখন ঐ ডাঙাকে আমরা বলতাম উঁচু দ্বীপ। পরে দেখা গেলো যে এটা সমুদ্রতল থেকে বারো হাজার ফুট উঁচু এক পর্বত মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে আগুন আর প্রচুর ধোঁয়া। ধোঁয়াকে প্রথমে মনে হচ্ছে তুষারের ঝড়, কিন্তু কাছে আসার পর এর আসল চরিত্রটা বোঝা গেলো --- আমি এর নাম দিলাম মাউন্ট এরেবাস আর এর দিকে আরেকটু কম উচ্চতার মৃত আগ্নেয়গিরির নাম দিলাম 'মাউন্ট টেরর'। এর উচ্চতা দশ হাজার নয়শো ফুট।'

তিনি আরেক জায়গায় লিখেছেন– ... ১৭ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতের একটু পরেই পূর্ব থেকে একটা বাতাস উঠলো আর আমরা ... পাল তুলে দক্ষিণে চললাম ভোরে চারটে পর্যন্ত, যদিও এক ঘন্টা আগেই মাউন্ট এরেবুসের সাথে মূল ভূ-খণ্ডের যোগ করা উপকূলের পাশ দিয়ে সম্পূর্ণ উপসাগরটাকে দেখে এসেছি। টেরর এর সিনিয়র লেফটে নেন্টের নামে আমি এর নাম রাখলাম ম্যাকধাডো বে। তাঁর উৎসাহ ও দক্ষতার জন্য এ প্রশংসা তার প্রাপ্য।

রসের এই অভিযানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নানা রকম ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ্যান্টার্কটিকা থেকে ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনি এই অভিযানে এসে এক চমৎকার প্রজাতির সীল দেখতে পান। এই পরিচিতি স্বভাবের শীলগুলো সুরেলা কণ্ঠে তার সংগীতকে ডাকে। তাই এগুলোকে বলা হয় গায়ক সীল। রস সাহেব তাঁর নিজের নামানুসারে এদের নাম রাখেন রস শীলা।

এই অভিযানে রসের সাথে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীও ছিলেন। জোসেপ হুকার। এই হুকার সাহেবই সংগ্রহ করেছিলেন এই সব নমুনা। এই নমুনা থেকেই জানা যায় যে এ্যান্টার্কটিকা ও তার আশেপাশে হাজার রকমের উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে পরিপূর্ণ।

## দ্যা গ্যারলাচি

এই উনিশ শতকে আরো দুতিন জন অভিযাত্রী এই দক্ষিণ মেরু বিজয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এরা হলেন উত্তর মেরু অভিযানে দুঃসাহসিক নাবিক পেয়ারস ও বেলজিয়ামের নাবিক এ্যাড্রিয়েন দ্যা গারল্যাচি। নরওয়ের রোনাল্ড এ্যাডমুন্ডসেন দ্যাগার নিচোলাই হ্যানসেন এবং আরো কয়েকজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী।

এর মধ্যে ১৮৭৪ সালে একটি শক্তিশালী বাষ্পীয় জাহাজে চড়ে চললেন এ্যান্টার্কটিকা। বলা বাহুল্য নেয়্যরস ই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি বাষ্পচালিত জাহাজে চড়ে এখানে এলেন। এর আগে সবাই এসেছিলেন পুরনো পালতোলা জাহাজে করে।

নেয়ারস হয়তো কুমেরু বিজয়ের একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েই এখানে এসেছিলেন। আর



www.nagorikpathagar.org

সেই জন্যই তিনি তাঁর জাহাজ খানার নাম রেখেছিলেন The Chalenger তা হলেও চ্যালেঞ্জ পূরণ করা তার সম্ভব হয় নি। এই অভিযানে তিনি অনেকগুলো নতুন স্থান, নতুন পাহাড় আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেও মেরু বিন্দু বিজয়ের চ্যালেঞ্জে তিনি হেরেই গিয়েছিলেন। হাজার চেষ্টা করেও বিন্দু পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া তার হয় নি। এর পর বেলজিকা (Belzica) নামে একটি জাহাজে চড়ে ১৮৯৭ সালে এসেছিলেন এ্যাড্রিয়েন দা গারল্যাটি। এরই অভিযানে এসে তিনি পড়েছিলেন এক ভয়ানক বিপদে। বরাতটা খারাপই বলতে হবে গ্যারল্যাটির। দক্ষিণ মেরুবিন্দু বিজয়তো দূরে থাকুক, কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে যে সক্ষম হয়েছিলেন এটাই তাঁর ভাগ্য। এটা অবশ্য গ্যালাচির কাপুরুষতা নয়, এক ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই তাকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিলো।

আগ্নেয়গিরির পাশে দাঁড়ানো জনৈক অভিযাত্রী



www.nagorikpathagar.org

এ্যান্টার্কটিকা মহাকাশ যারা অভিযানে আসেন তাঁরা প্রায় সবাই সময় দেখেই আসেন। সাধারণত সবাই বসন্তকালের দিকে আসেন। কারণ এই সময়টা এই হিমশীতল দেশে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম থাকে।

আকাশে সূর্য দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানের বরফ গলে দেখা পাওয়া যায়। আর তখন সমুদ্র জমাট বেঁধে যাওয়ার ভয় থাকে না।

আরো সুবিধা হলো এই সময়ে খাবার যোগাড়েরও বেশ সুবিধা হয়। এই সময়েই পাড়ে সীল, সিন্দুঘোটক দেখা যায়। বরফের বাসিন্দা শ্বেত ভালুক খেঁকশিয়াল আর পেঙ্গুইন পাখীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময়েই তিমি শিকারেরও সুবিধা হয়।

সুবিধা হয় চলাফেরার। অভিযান চালানোর মোট কথা এটাই উপযুক্ত সময়।

গ্যারলাচি এই দিক বিচার বিবেচনা করেই এই অভিযানে বের হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো না তার প্রতি।

গারল্যাচি এখানে নামার সংগে সংগে অকস্মাত যেনো বসন্তের ফরসা আকাশ ঢেকে গেলো। সাদা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেলো সূর্য। নেমে এলো ঘন অন্ধকার। আর সেই সংগে শুরু হলো কনকনে বাতাস। বাতাসের মধ্যে ভাসমান জলকণাগুলো জমে শক্ত হয়ে প্রচন্ড বেগে বরফ আকারে পড়তে লাগলো নিচে।

চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। শুধু মৃত্যুর মতো সাদা তুষার ঝড়ের তান্ডব লীলা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

গ্যারল্যাচি অভিযানে বের হওয়াতো দূরের কথা জাহাজ থেকেই নামতে পারলেন না। এ ভাবেই পুরো দশ বারো সপ্তাহ কেটে গেলো।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেলেন নাবিকেরা। কেউ কেউ অভিযানটাকে বড় সখের জিনিস ভেবে এতোদুর এসেছিলেন। ভেবেছিলেন সেই বরফের দেশে ঘুরে বেড়ানো কতোটাই মজার ব্যাপার হবে।

তারা এবার এর ভয়ংকর মূর্তি দেখে আঁতকে উঠলো।

ভয় পেলেন না শুধু গারল্যাচি নিজে আর তার সুযোগ্য সংগী রোয়াল্ড এ্যামুন্ডসেন। রোয়াল্ড এ্যামুন্ডসেন ছিলেন ভাইকিংদের বংশধর। তারতো অতো সহজে ভয় পাবার কথা নয়।

রুদ্ধশ্বাসে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন সূর্য উঠবে। কখন কুয়াশা কেটে যাবে। কখন বরফ পড়া থামবে। আর শেষ হবে এই হাড়কাঁপানো কনকনে শীত। আর যে সহ্য হয় না।

এরই মধ্যে প্রচন্ড শীতে দুচারজন মারাও পড়লো।

অবশেষে বহু আকাঙ্খিত সূর্য উঠলো। গাঢ় অন্ধকার এক সময় কেটে গেলো। ঝড় থামলো। কিন্তু কে জানতো এর পরেও তাদের জন্য আরো একটি মস্ত বড় বিস্ময় আর ভয়ংকর একটি অবস্থা অপেক্ষা করে আছে।

সূর্যের আলো ফুটফুটে, বরফ পড়া থামতেই তারা বাইরে বের হয়ে এলেন আর তখনি তারা সবিস্ময়ে দেখলেন যে সাগরে ভাসমান তাদের মস্ত বড় বেলজিকা নামের জাহাজটাই বরফে আটকা আছে।

অর্থাৎ কিনা জাহাজটা যেখানে ভাসছিলো এই কয় দিনের শীতে সেখানটা গোটা জমে বরফ হয়ে গেছে। আর জাহাজটাও আটকে গেছে সেই বরফে। বেলজিকা জাহাজের চারপাশে প্রায় মাইল খানেক জুড়ে জল জমে একখন্ড পাথর হয়ে গেছে।

তা হলে উপায়? এই বরফ থেকে জাহাজ বের করা যাবে কেমন করে? সবাই ঘাবড়ে গেলো।

গারল্যাচি বললেন – আমাদের জন্য উপায় দেখতে হবে। কারণ এই বরফ কবে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো দুমাস লাগতে পারে, দুশো বছরও লাগতে পারে।



www.nagorikpathagar.org

অথবা এমন হতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ বছরেও এই বরফ কোনো দিন গলবে না।

—তা হলে আমরা কি মারা যাবো ?

—মারা যাবো কিনা জানিনে, তবে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। গারল্যাচি সবাইকে সাহস দিয়ে বললেন।

জাহাজের সাধারণ নাবিকেরা তখন রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।

তবু তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। এই মস্তবড় সামুদ্রিক জাহাজ বেলজিকার সাথে গারল্যাচি একটি ছোটো ষ্টীমার বেঁধে এনেছিলেন।

আমাদের দেশের বড় বড় পানশি নৌকার পেছনে যেমন ছোটো খাটো কাজে যাতায়াত করার জন্য একটা করে ডিংগী নৌকা থাকে, তেমনি এই ছোটো একটি ষ্টীমারকেও তিনি নানা কাজে এদিক সেদিক যাবার জন্য জাহাজের লেজে বেঁধে টেনে এনেছিলেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন ওদের ছোটো ষ্টীমারটাকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিলো

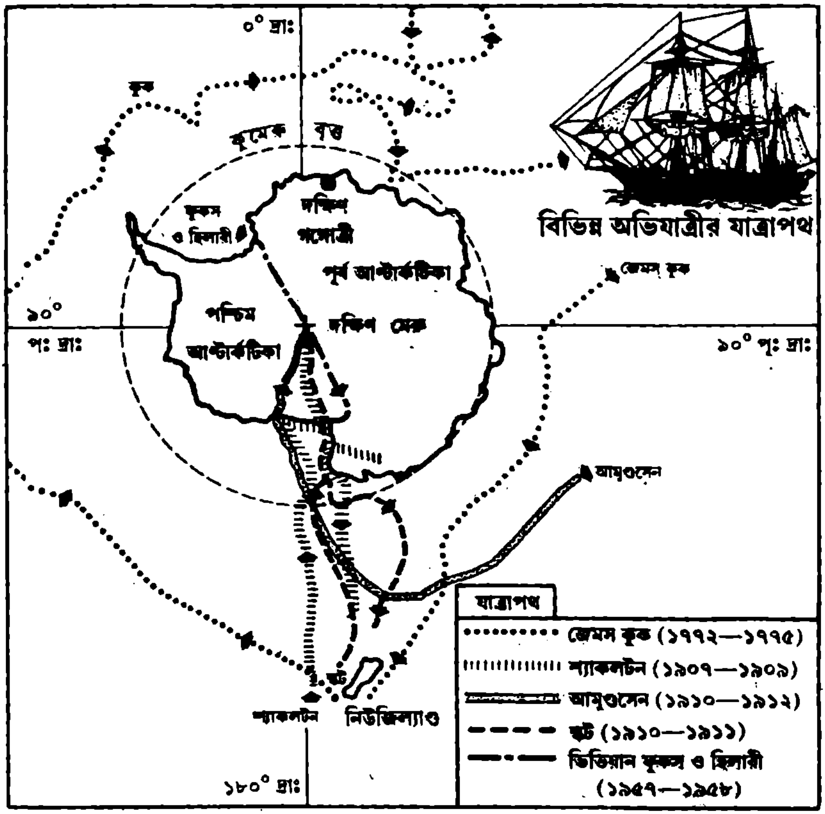

বিভিন্ন অভিযাত্রীর যাত্রাপথ



www.nagorikpathagar.org

ওখানকার জল তখনো জমে বরফ হয়ে যায় নি।

কিন্তু এই সামান্য ষ্টীমার করে বিশাল সাগর পাড়ি দেওয়া সে যে কি ভয়ানক কাজ তা কল্পনাও করা যায় না । কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় ছিলো না। এখানে ঠায় দাড়িয়ে মরার চেয়ে শেষ চেষ্টা করাই ভালো।

অভিযান আর হবে না, এবার ভালোয় ভালোয় পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে দেশে ফিরতে পারলেই রক্ষা। আর কাল বিলম্ব না করে যে কয়জন লোক জীবিত ছিলো, তাদের নিয়ে আর মাত্র কয়েকদিনের খাবার সাথে নিয়ে গারল্যাচি ফিরে চললেন সদেশের দিকে।

পেছনে পড়ে রইলো বিশাল চির তুষারের দেশ আর জাহাজ বেলজিকা। দঃখে সারাটা অন্তর ভরে গেলো গারল্যাচির। অবশেষে কোনো মতে সাবধানে জাহাজ চালিয়ে তিনি ঘরে ফিরতে পেরেছিলেন । তার মতো এতো বড় বিপদের সম্মুখীন আর কোনো অভিযাত্রী কখনো হননি।

এই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আরো একটি দল এ্যান্টার্কটিকায় অভিযান চালাতে আসেন। এরা সারাটা শীতকালই এ্যান্টার্কটিকার বরফ ঢাকা মাটিতেই ছিলেন। এরাই প্রথম দল যারা শীতকালেও এ্যান্টার্কটিকা মাটিতে তাঁবুতে ছিলেন। শীতকালে এখানে মাটিতে বাস করা সে যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তারা এই অসাধ্যই সাধন করেছিলেন। এই দলের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন নিকোলাইড হ্যানসন। তিনি এই শীতের প্রচন্ডতা সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন।

কিন্তু এবারই দেখা দিলো আসল সমস্যা।

হ্যানসন সাহেবতো মারা গেলেন। এবারতো তাকে কবর দিতে হয়। চার-পাঁচজন মিলে শুরু করলেন কবর খোঁড়ার কাজ। কিন্তু অবাক হবার কথা। জলজ্যান্ত চারপাঁচজন লোক ঝাড়া চার ঘন্টা সুরকি শাবল চালিয়েও চার পাঁচ ইঞ্চির বেশী গর্ত করতে পারলেন না। পরিশ্রমে এই শীতের দেশেও ঘেমে নেয়ে উঠলেন।

বরফ জমে এমনি শক্ত হয়ে গেছে যে, শাবল চালিয়েও গর্ত করা যাচ্ছে না। কে জানে কতো বছর ধরে এমনি করে জমে আছে এ বরফ। হতে পারে হয়তো কোটি কোটি বছর ধরে জমে আছে এগুলো। এগুলোতো এখন আর বরফ নেই। যেনো আস্ত পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

তা হলে এখন কি করা যায়? অবশেষে বুদ্ধি করে বরফের নিচে বসানো হলো ডিনামাইট। যে ডিনামাইট দিয়ে ভাংতে হয় মস্ত বড় বড় পাথর-পর্বত। সেই অস্ত্র দিয়েই কিনা করতে হচ্ছে একটি কবরের গর্ত।

বিকট শব্দে ডিনামাইট ফেটে যেতেই মস্ত বড় গর্ত হলো। আর সেই গর্তের নিচেই তারা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন একটি তুষার নদী।

জমাট বেঁধে আছে। কে জানে কতো বছর আগে এই নদী দিয়ে তুষারের শীতল ধারা বয়ে যেতো। বুকে ছিলো তার উথাল পাতাল অস্থিরতা। কিন্তু প্রকৃতির খেলায় আজ সে মৃত। কে বলতে পারবে। অতঃপর এই চির তুষার চিরশয্যায়ই এবার শুইয়ে দেয়া হলো দলনেতা নিকোলাই হ্যানসন সাহেবকে।

## কর্স্টেন বর্চ গ্রেভিংক

এ্যান্টার্কটিকার আরেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ছিলেন নরওয়ের এক তরুণ বিজ্ঞানী। তিনি চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে।

এখানেই হেনরিক বুল নামে এক নাবিকের সাথে তার পরিচয় হয়। অতঃপর তার সাথেই তিনি ১৮৯২ সালের এ্যান্টার্কটিকা নামে একটি জাহাজ নিয়ে এ্যান্টার্কটিকা অভিযানেআসেন।



www.nagorikpathagar.org

তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ইচ্ছে ছিলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এ্যান্টার্কটিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যেই বুল সাহেবের জাহাজে আসা।

জাহাজে ক্যাপ্টেন বুলের কোনো বৈজ্ঞানিক নেবার নিয়ম ছিলো না। অতঃপর তিনি একজন সাধারণ নাবিক হিসেবেই গেলেন ওদের সাথে। এ্যান্টার্কটিকায় এসে তিনি বহু দুর্লভ প্রজাতির পেঙ্গুইন পাখি, পাথর এবং মস (Moss) সংগ্রহকরেছিলেন।

১৮৯৫ সালে বর্চ গ্রেভিংক ফিরে আসেন এ্যান্টার্কটিকা থেকে। এখান থেকে ফিরেই তিনি যোগ দিলেন আন্তর্জাতিক জিওগ্রাফি কংগ্রেসে। তিনি এই সম্মেলনে এ্যান্টার্কটিকায় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জানালেন এবং দক্ষিণ মেরুতে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানোর উপর জোর দিলেন।

আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেস বর্চ গ্রেভিং-এর কথার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেও সেই মুহূর্তে কোনো অভিযানের আয়োজন করতে সক্ষম হননি।

এদিকে বর্চ গ্রেভিংক সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। অনেক চেষ্টায় তিনি অবশেষে স্যার নিউনেস নামে একজন কোটিপতিকে রাজি করাতে সক্ষম হলেন। স্যার জর্জ নিউনেস ছিলেন বৃটেনের তৎকালীন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মস্তবড় ব্যক্তিত্ব।

স্যার জর্জের অর্থানুকূল্যেই তিনি ১৮৯৯ সালে সাউদার্ন ক্রস (Southern Cross) নামে একটি জাহাজ নিয়ে রওনা দিলেন এ্যান্টার্কটিকার উদ্দেশ্যে।

তিনি রওনা দিলেন শীতকালে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো শীতকাল থেকেই তিনি সেখানে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন।

এই অভিযানে বর্চ গ্রেভিংকর সাথে আরো চারজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ছিলো তাঁরা যতোটা সম্ভব এ্যান্টার্কটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন।

এই উদ্দেশ্যেই তারা সাথে নিয়েছিলেন ৯৫টি সাইবেরিয়ান কুকুর।

১৮৯৯ সালে জাহাজে করে ৯ জন সংগীসহ বর্চ গ্রেভিংককে নামিয়ে দিয়ে আসা হয় এ্যন্টার্কটিকার বুকে। এরা প্রথমে স্থাপন করলেন মূল শিবির। তারপর সেখান থেকে শুরু করবেন অভিযান।

তারা শীতকালটা মূল শিবিরেই কাটিয়ে দিলেন। কারণ শীতকালটার পুরোটাইতো এন্টার্কটিকার রাত্রিকালীন সময়। এই সময়ে কারো সাধ্য নেই বাইরে বের হয়। সারাক্ষণ বইতে থাকে তুষার ঝড়।

শীতকাল শেষে যেই আকাশে দিনের আলো ফুটলো অমনি বর্চ গ্রেভিংকই তাঁর সংগীদের নিয়ে কুকুরে টানা স্লেজগাড়ীতে চড়ে বের হলেন অভিযানে। তারপর সারা গ্রীষ্মকাল ধরে তারা এ্যান্টার্কটিকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালালেন এবং সংগ্রহ করেন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য। তারপর গ্রীষ্মকাল শেষ হলে আবার জাহাজ এসে তুলে নিয়ে যায় তাদেরকে।

বর্চ গ্রেভিংকের এই অভিযানটি ভয়ানক রোমঞ্চকর না হলেও অন্য দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ্যান্টার্কটিকায় এটাই ছিলো প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযান, এবং এর পর থেকেই শুরু হয় বৈজ্ঞানিক অভিযান।

## রবার্ট ফকন স্কট

এরপর যারা এ্যান্টার্কটিকায় অভিযানে এসেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হলেন দুঃসাহসিক নাবিক রবার্ট ফকন স্কট। তিনি ১৮৬৮ সালে ডিভল পোর্ট নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন খুবই রোগা। তখন তাঁকে দেখে সবাই ভাবতো এই রোগা



www.nagorikpathagar.org

আধমরা ছেলেটাকে দিয়ে দুনিয়ার কিছু হবে না। কোন দিন যেনো ও নিজেই ধুঁকতে ধুঁকতে অক্কা পেয়ে যাবে।

তখন কারো ধারণাই হয়নি যে এককালের রোগা আধমরা ছেলেটাই দুনিয়াসুদ্ধ লোককে তাক লাগিয়ে দেবে। তাঁর সাহসিকতা দেখে সারা দুনিয়ার লোক অবাক হয়ে যাবে।

কিন্তু দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই তাই হয়, পৃথিবীর অনেক অবহেলিত লোকেরাই নিজের চেষ্টা আর মনের জোরে একদিন জ্যান্ত সিং হয়ে ওঠে। বরার্ট ফকন স্কটের জীবনই তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

বিশাল বরফের পাহাড়ের পাশে 'টেরানোভা' জাহাজ

রোগা পটকা হলে কি হবে ? মনে ছিলো দারুণ সাহস। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি নৌবাহিনীর চাকরীতে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টা আর সাহসিকতায় ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। আর এই সময়ের মধ্যেই তার রোগা পটকা চেহারাটাও তাগড়া হয়ে উঠেছে।

তারপর ১৯০১ সালে তিনি এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে অভিযান চালানোর জন্য দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। তিনি ইংল্যান্ডের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে চললো এইঅভিযান।

এই অভিযানে তার সাথে আরো যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - স্যার আর্নেষ্ট হেনরি শ্যাকলটন - যিনি পরবর্তী কালে নিজেই নেতা হয়ে দক্ষিণ মেরু অভিযানে আসেন। যার কথা আমরা পরের পরিচ্ছেদে জানতে পারবো। আর অপর জন ছিলেন ডাক্তার ই, এ, উইলিয়ন।

স্কট যে জাহাজটিতে চড়ে দক্ষিণ মেরু অভিযানে রওনা হলেন তার নামটিও ভারী মজাদার। যেহেতু তিনি নতুন দেশ, নতুন কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন - তাই তার জাহাজখানার নামও রাখা হলো ডিসকোভারী-(Discovery)।

লণ্ডন থেকে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে একটানা সাগর পাড়ি দিয়ে এসে নোঙর করলেন এই বরফের দেশে।



www.nagorikpathagar.org

এ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছে তিনি জাহাজ ভেড়ালেন রস দ্বীপে। এখানেই হলো সেই বিখ্যাত আগ্নেয়গিরিটি। ইতিপূর্বে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্যার জেম্স ক্লার্ক রস যার নাম রেখেছিলেন টেরর। স্কট এই টেরর পাহাড়ের কাছেই জাহাজ থেকে নেমে তাঁবু খাটালেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন চারদিকে। ঠিক করলেন কোন্ দিকে তারপর শুরু হবে তাঁর যাত্রা। এখান থেকে দক্ষিণ মেরুবিন্দু কতো দূর।

দিক ঠিক হলো। আবার তিনি জাহাজ ছাড়লেন। এগিয়ে চললেন রসের আবিষ্কৃত 'দি গ্রেট আইস বেরিয়ার' এর পাশ ধরে সোজা পূর্ব দিকে।

কিছুদূর যাবার পরই তিনি সন্ধান পেলেন একটি ভূ-খণ্ডের। তখনি তিনি এটিকে তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে দখল করে নিলেন এবং নাম দিলেন কিং এডওয়ার্ড দি সেভেনথ ল্যাণ্ড। (King Adward the seventh Land) এখানে এটাই তাঁর প্রথম আবিষ্কার।

কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দিন পার হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে শীতকাল এসে গেলো। শীতকালে এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের মাটিতে পা রাখতে পারে এমন সাধ্য কজনের আছে, এমনিতেই যেখানে সাগরের জল পর্যন্ত জমে গিয়ে পাথর হয়ে যায়। রাতদিন আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বরফ ঝরতে থাকে, সেখানে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিন্তাই করা যায় না।

রবার্ট ফকন স্কট এই রোমাঞ্চকর অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ভয়েজ অফ দি ডিসকভারি (Voyage of the Discovery) গ্রন্থে লিখছেন—

'এতো চমৎকার দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। আমাদের পেছনে দিগন্তের ওপারে সূর্য, সামনে বরফের চাদরের ওপরটা তীব্র সাদা আর এর পটভূমি দূরের সমুদ্র ও বরফের ফাঁকগুলো দেখাচ্ছিলো প্রায় কালো। বাতাস পড়ে গেছে আর একটি শব্দও আমাদের চারপাশের মৌনকে ভঙ্গ করছে না।

তবু এই শান্তিময় নৈঃশব্দের অন্তঃস্থলে এক অদৃশ্য ভয়ংকর শক্তি কাজ করছিলো যা এই বিশাল বরফের পর্বতটাকে সব থেকে পাতলা কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলেছিলো। আমাদের এই বন্দীশালার গরাদগুলো কেমন সেটা এত দিনে আমরা জেনে গেছি। বার বার চেষ্টা করে দীর্ঘ একঘেঁয়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এই বরফের মধ্য দিয়ে কোনোমতে যেতে যেতে আমরা তো মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম যে হিমপ্রবাহের কি প্রচণ্ড শক্তি। আমরা জানতাম যে সব থেকে শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজও এই বাধার বিরুদ্ধে নিষ্ফল যুদ্ধ করে চূর্ণ হয়ে যেতো, আর আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে এক মিলিয়ন টন ওজনের হিমশৈলও এই বাধার মুখে গিয়ে আটকে পড়ে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই দুর্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়েছি—আর এখন কোনো বাক্য ব্যয় নেই, কোনো শক্তি ক্ষয় নেই, সব কিছু গলে যেতে শুরু করলো। তখনই জানলাম যে আর দু' এক ঘন্টার মধ্যেই এ বরফের কোনো চিহ্নই থাকবেনা, মুক্ত সমুদ্র ঢেউ তুলবে হাটপয়েন্ট -এ কালো পাথরেরগায়ে।

শীতকালে নেমে আসার পর অতঃপর আপাততঃ অভিযান স্থগিত রেখে বসন্তকাল আগমনের আশায় বসে রইলেন তিনি। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। এখানে কোনো রকম হটকারিতা করতে যাওয়া মানেই মৃত্যু।

অতঃপর সেখানেই তিনি তাঁর সংগীসাথীদের নিয়ে ম্যাকমার্ডো সাউথ নামক স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বসন্তকাল এলো। চারদিকে ঘন কুয়াশা কাটতে শুর করলো। দেখা দিলো সূর্যি মামার সোনা মুখের হাসি।

আর সেই সংগে স্কটের জাহাজেও সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। সাজানো হলো স্লেজ গাড়ী। বাঁধা হলো শিকারী কুকুর। গাড়িতে ওঠানো হলো খাবার দাবার, সাজ-সরঞ্জাম, ঔষধ পত্তর আরো কতো কি।



www.nagorikpathagar.org

পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসছে হিমবাহ।

এই অভিযানে তাঁর প্রধান সংগী হলেন উইলসন শ্যাকলটন। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি। বরফের উচুঁ নীচু পথ। এই কষ্টকর পথ ধরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগলেনতারা।

এখানে একটা কথা বলে রাখি,- ওরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেটা কিন্তু স্থল ভাগ বা ভু-খণ্ড ছিলো না। সে ছিলো সাগর। তবে জল নয়। কারণ গোটা সাগরের জলইতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে শক্ত পাথরের মতো হয়ে আছে। ওরা সেই বরফের উপর দিয়েই স্লেজ গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ওদের লক্ষ্যস্থল দক্ষিণ মেরুর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলেও কিন্তু ওরা সেই বরফের সাগর আর শেষ করতে পারলেন না। প্রায় পৌনে চারশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেও তাঁরা ডাঙার সন্ধান পেলেননা।

এদিকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন স্কটের সংগী-সাথীরা। সংগে যা খাবার এনেছিলেন তা শেষ হয়ে গেলো । না আছে নিজেদের খাবার না আছে কুকুরের খাবার। খাবার না পেয়ে কুকুরগুলো একে একে মারা পড়তে লাগলো।

তবু দমলেন না স্কট । তিনি সমস্ত বাধা বিপদকে ঠেলে শুধু মনের জোরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনে তাঁর মেরু বিজয়ের দুর্দমনীয় আশা, চোখে তার সাদা



www.nagorikpathagar.org

বরফের পাহাড়ের স্বপ্ন।

কিন্তু তবু আর এগোনো সম্ভব হলো তার পক্ষে। এবার ভেংগে পড়লেন তাঁর প্রধান সহকারী হেনরি শ্যাকলটন সাহেব নিজেই।

প্রচন্ড শীতে শ্যাকলটন স্কার্ভি নামে এক বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই রোগে হয় সি ভিটামিনের অভাবে।

এই ভয়ানক রোগে অবশেষে শ্যাকলটনের জীবন সংশয় দেখা দিলো। তখন বাধ্য হয়েই স্কট অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অভিযান স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। এই অভিযানে পিছু ফিরবার আগ মুহূর্তে তাঁরা প্রায় ৮২ ডিগ্রী ১৭ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এর পরই স্থগিত রেখে তারা আবার ফিরতে লাগলেন।

এখান থেকে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসতে তাদের প্রায় দুমাসের মতো সময় লেগেছিলো। এই ফেরার পথেও তাঁদের কম কষ্ট হয়নি। বেশি হয়েছিলো খাবারের কষ্ট।

একে একে সবগুলো কুকুরই যখন মারা পড়লো তখন নিজেরাই পালা করে স্লেজ গাড়ি টানতে লাগলেন। ওদিকে আবার শ্যাকলটন ভয়ানক অসুস্থ। তিনি না পারছেন চলতে, না পারছেন কিছু সাহায্য করতে।

দীর্ঘ দু'মাস তাঁরা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মূল তাঁবুতে ফিরে এলেন।

এই অভিযান যে তাঁদের একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলো একথা বলা যায় না। মূল লক্ষ্য দক্ষিণ মেরু বিন্দুতে পৌঁছাতে না পারলেও দক্ষিণ মেরু যাবার পথটি তাঁরা খুঁজে বের করলেন। এটাই বা কম কৃতিত্ব কি?

পরের বছর তাঁরা আবার দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর না হয়ে সাউথ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকে অভিযান চালালেন। এই পশ্চিম দিকে তাঁরা প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন অনেক অজানা ভূখণ্ড। এরপর ১৯০৪ সালে স্কট তাঁর জাহাজ নিয়ে স্বদেশের পথে রওনা হলেন।

এরপর কেটে গেলো প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর। কিন্তু এই ক'বছরে একদিনের জন্যও তিনি তাঁর ব্যর্থ অভিযানের কথা ভুলতে পারলেন না। মনের ভেতরে এই পরাজয়ের গ্লানিটা তাঁকে অহরহ যন্ত্রণা দিতে লাগলো।

বিশেষ করে ১৯০৮ সালে তারই সহকারী হেনরি শ্যাকলটন যখন নিজেই দলপতি হয়ে এ্যান্টার্কটিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন রীতিমতো অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি।

যেমন করেই হোক তাঁকে যেতেই হবে এ্যান্টার্কটিকায়। দক্ষিণ মেরু জয়ের বিজয় মুকুট তাঁর চাই-ই। ব্যর্থ হয়ে বসে থাকলে তাঁর চলবে না।

তাই আবার শুরু হলো তাঁর আয়োজন। সরকারের সাথে আলোচনা, জাহাজ সংগ্রহ, লোকজন যোগাড় আয়োজন করতে করতেই তাই আরো দেড় দু'বছর পার হয়ে গেলো।

অবশেষে ১৯১০ সালে টেরানোভা নামে একটি জাহাজ নিয়ে রবার্ট ফকন স্কট আবার পাড়ি জমালেন তার বহু আকাংক্ষিত এ্যান্টার্কটিকার পথে।

এবারও জাহাজ এসে ঘাটে ভিড়তেই শীত এসে গেলো। বাধ্য হয়ে তাদের অপেক্ষা করতে হলো বসন্তকালের জন্য। এই শীতকালটা তাঁরা রস আইল্যান্ডে কাটিয়ে দিলেন। এ সময় আর কিছু করার ছিলো না।

এরপর বসন্তের আমেজ পড়তে তাঁরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। এই যাত্রা কিন্তু খুব শুভ হলো না স্কটের। এবারেও তাঁকে বড় বড় বিপদে পড়তে হলো।

এবারের অভিযানে তার সংগে আর যারা ছিলেন তারা হলেন এ্যাডগার ইভান্স, ডাক্তার উইলসন এবং ওটস।

এবার তার অভিযানে খাবারের অভাব, অসুস্থ এবং নানা ধরনের বিপদ লেগেই রইলো।



www.nagorikpathagar.org

কখনো শত শত ফুট বরফের সাদা পাহাড় । কখনো তুষার নদী। কিলোমিটার পর কিলোমিটার সীমাহীন ধু-ধু পথ। শুধু বরফ আর বরফ। তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।সামনে পা ফেলতে গিয়ে কখনো পা হাঁটু অবধি বরফে গেঁথে যায়।

কে জানে কোথায় বরফের খাদ লুকিয়ে আছে কিনা। তবেতো নির্ঘাৎ মৃত্যু। তাই সাবধানে পা ফেলতে হয় প্রতি মুহূর্তে । প্রতি মুহূর্তে এড়িয়ে চলতে হয় মৃত্যুকে।

অবশেষে প্রায় মেরু বিন্দুর কাছাকাছি চলে এলেন তাঁরা। আর কিছু দুর যেতে পারলেই মেরু বিন্দু। তাদের বহু আকাংক্ষিত স্থান।

হয়তো পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর বিজয়ী বলে তার নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। সারা দুনিয়া জোড়া তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। লোকে ধন্য ধন্য করবে।

হাজারো মৃত্যু ভয় , তৃষ্ণা , আর ক্লান্তির মাঝেও স্কটের চোঁখে রঙ্গীন স্বপ্ন। তার বহুদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার স্বপ্ন। সুতরাং কোনো বাধাই তাকে দমাতে পারছে না।

অতঃপর ১৯১২ সালের ৪টা জানুয়ারী তারিখে তারা মেরু বিজয়ের শেষ ঘাঁটি থেকে বের হলেন। তারপর ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তারা একটানা পথ হেঁটে চললেন।

অবশেষে ১৮ই জানুয়ারী ১৯১২ তারিখে রবাট ফকন স্কট তার কাংক্ষিত স্থানে পৌছতে সক্ষমও হলেন। তিনি পৌছে গেলেন মেরুবিন্দুতে ।

কিন্তু একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। বিজয় লাভ করেও বিজয়ের গৌরব তার কপালে জুটলো না। কারণ সেখানে তার জন্য লুকিয়েছিলো এক বিরাট ব্যর্থতা। তারা যখন দক্ষিণ মেরুর খুব কাছাকাছি এসে পৌছেছিলেন তখন তাদের সামনে সাদার মধ্যে একটা বড় রকমের কালো চিহ্ন ভেসে ওঠে ।

ব্যাপারটা প্রথমে বাওয়ার্সের নজরে পড়ে ।সে আরো ভালো করে লক্ষ্য করে বলে— ওটা নি চয়ই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরাট আকৃতির একটি পতাকা।

তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। এরপর তারা যতোই সামনের দিকে এগুতে থাকেন জিনিসটাও ততই তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে। তারা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে বওয়ার্সের কথাটা ঠিক।

জিনিসটি নড়ছে। হিমেল হাওয়ায় একটি কালো পতাকা উড়ছে। তাদের যেনো মনে হলো এই কালো পতাকা যেনো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের অনুভূতিতে এই কালো পতাকা অভিযানের মোহমুক্তি ঘটালো।

অবশেষে তারা দেখতে পেলেন আরো একটি পরিষ্কার চিহ্ন। দেখলেন আশেপাশে ছড়িয়ে আছে কুকুরের পায়খানা এবং নখের আঁচড়। এই দেখেই তারা বুঝতে পারলে এই পত পত করে পতাকা ওড়ার অর্থ কি।

এবার দয়াহীন হিমেল হাওয়ার ঝাপটা যেনো তাদের কাছে কিছুক্ষণ আগের চেয়েও বেশি অসহনীয় হয়ে উঠলো।

মনক্ষুন্ন ওয়েটার তার ডায়েরীতে লিখলেন-আজকের রাত আমাদের জন্য বিষন্নের রাত।

দক্ষিণ মেরুর শেষ আকাংক্ষিত বিন্দুতে এসে তাদের তখন মোহমুক্তি ঘটবে তা কি তারাভেবেছিলেন?

যে আবিষ্কারের নেশায় তারা সাফল্যের প্রত্যাশী হয়ে পথের সমস্ত কষ্টকে উপেক্ষা করে মেরুর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন তার অপমৃত্যুতে তারা আরো ভেঙে পড়লেন। নিদারুণ এক ব্যর্থতায় আর হতাশায় তারা ঘুমাতে পর্যন্ত পারেনি।

অভিযাত্রীদলের অন্যান্য সদস্যারা ভেবেছিলেন এই পরাজয়ে হয়তো তাদের দলপতিই সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়বেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্কট ততটা ভাঙলেন না।



www.nagorikpathagar.org

এই সময়ে ওটস তার ডায়েরীতে লিখলো—আমণ্ড সেনের মাথার স্ক্রু ঠিক ছিলো। তাই নরওয়ে দলের অভিযান খুব সুফলদায়ক হয়েছে। তারা এসেছিলো কুকুরটানা শ্লেজ গাড়ী নিয়ে, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মতো মানুষে টানার চেয়ে ভিন্নতর ছিলো।

কিন্তু ব্রুতযান লিখলো, এটা অবশ্য খুবই দুঃখজনক যে, নরওয়েজিয়ানরা আমাদের পরিকল্পিত কাজ আমাদের আগেই সমাধা করে ফেলেছে। তবে আমি এই ভেবে খুশী যে, আমরা এ আবিষ্কার কাজ সত্যিকারভাবে বৃটিশদের মতোই করেছি। নিজেদের মাল নিজেরা বহন করে মেরু বিন্দুতে পৌঁছেছি। বৃটিশদের শ্লেজিং-এর একটা ঐতিহ্য। তাছাড়া মানুষের টানা শ্লেজ নিয়ে এই পৃথিবীতে অভিযাত্রা এতো দীর্ঘপথ এভাবে কেউ পাড়ি দেয়নি।

তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যতো ব্যর্থ হলো। এতো পরিশ্রম আর কষ্ট সহ্য সবই অনর্থক হলো।

পরদিন অবশেষে তারা তাঁবু গুটিয়ে শ্লেজে বেঁধে নিলো। শ্লেজ টেনে টেনে কালো পতাকাকে পেছনে ফেলে বাকী কয়েক কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলো।

তারপর এক সময় পৌঁছে গেলো দক্ষিণ মেরুতে। মেরুবিন্দুত পা দিয়ে যে আনন্দের পর সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে বলে তারা মনে করেছিলো, তা হলো না। এ যেনো শুধুই আনন্দ—জয়ের কোনো আনন্দ নেই। দলের সবার মনেই এখন হতাশার কালো ছায়া।

মেরুকেন্দ্রে নরওয়েজিয়ানদের পরিত্যক্ত তাঁবুতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো আরো এক বড় বিস্ময়। সেখানে পাওয়া গেলো আমুণ্ডসেনের চিঠি।

দুটো চিঠি। এর একটি লেখা হয়েছে নরওয়ের রাজা হাকনকে। আর একটি লেখা হয়েছে স্বয়ং স্কটকেই উদ্দেশ্যে করে।

যেনো আমুণ্ডসেন জানতেন স্কট আসবেন। তাই তাকে কিছু কাজের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে রেখে গেছেন মেরুবিজয়ী আমুণ্ডসেন।

স্কটকে উদ্দেশ্য করে লেখা আমুণ্ডসেনের পত্রটি ছিলো—

প্রিয় ক্যাপ্টেন স্কট,

আমাদের পর এখানে আপনিই প্রথম আসবেন আশা করে অনুরোধ করছি যে, রাজা হাকন সপ্তমকে উক্ত চিঠিখানা পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করবেন। এই তাঁবুতে রেখে যাওয়া কোনো দ্রব্য যদি আপনাদের ব্যবহারে লাগে, তবে দয়া করে তা ব্যবহার করতে কোনো রকম দ্বিধা করবেন না। পরম শ্রদ্ধার সাথে আপনার বিপদমুক্ত প্রত্যাগমন কামনা করছি।

আপনারই একান্ত
রোনাল্ড আমুণ্ডসেন

আমুণ্ডসেনের এই পত্র ক্যাপ্টেন স্কটের বৃটিশ আভিজাত্যে দারুণ আঘাত করলো। তিনি ডায়েরীতে লিখে গেছেন-'এতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি'।

স্কটের এই কথা থেকেই অনুমান করা যায় —তার সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো। অথচ তিনি বুঝতেই চাইলেন না এটা আমুণ্ডসেনের কোনো অহংকার নয়। তাকে অপমান করার কোনো ইচ্ছেও তার ছিলো না।

আমুণ্ডসেনের হয়তো ধারণা হয়েছিলো—ফেরার পথে তার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তিনি যদি তার এই বিজয়ের বার্তা নিয়ে স্বদেশে সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করতে না পারেন, যদি তার মৃত্যু হয় এই বিজন দেশের নির্জন পাথরে, তাহলে দেশের মানুষেরা তার সাফল্যের কথা কেমন করে জানবে?

তাই তিনি তাঁর নিজের কথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন অমন করে। তার ইচ্ছে ছিলো তিনি যদি নাও পারেন, তবু এর পরবর্তী অভিযাত্রী যিনি, সম্ভবতঃ স্কট হতে পারেন, তাকেই অনুরোধ করেছিলেন এই বার্তা বহন করার জন্য।



www.nagorikpathagar.org

মনের প্রতিক্রিয়া যাই হোক, এটা তার জন্য যতোই মনোকষ্টের হোক—তবু তিনি আমুণ্ডসেনের বার্তাটি তুলে নিলেন নিজের হাতে।

## এবার ফেরার পালা

ক্লান্তি আর হতাশায় ভেঙে পড়েছে সকলের মন। সবার শরীরেই ছিলো তুষার-ক্ষত। এর মধ্যে ইভান্সের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। ওটসের পা তুষারাঘাতে মারাত্মক জখম। উইলসনের চোখে ভয়ানক যন্ত্রণা। ক্রমাগতই তুষার অন্ধত্বে ভুগছে।

তবু এই অবস্থাতেই ফিরতে হবে।

ফেরার সময়ের আবহাওয়াটা ভালোই ছিলো। শ্লেজে পাল তুলে দিলেন স্কট। তরতর করে শ্লেজ মেরু উপত্যকার বরফের বুক চিরে নিচে নেমে যেতে লাগলো। এভাবে প্রথম তিন সপ্তাহে তারা গড়ে প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার করে পথ পাড়ি দিলো।

ফেরার পথের শুরুটা ভালো হলেও সহসাই ঘনিয়ে আসতে লাগলো বিপদ। পথের মাঝে সব্‌গুলো ডিপো খুঁজে পাওয়া মুশকিল হতে লাগলো।

এর মধ্যেই তারা দু'বার করে মুখোমুখি হলেন তুষার ঝড়ের। তখন বাধ্য হয়েই যাত্রা বিরতি করতে হলো। কারণ প্রচণ্ড বাতাসে শ্লেজের পাল নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছিলো।

ফিরতি পথে তাদের প্রথম বড় বিপদ দেখা দিলো ২৫শে জানুয়ারী তারিখে। তারা ৮৮ ডিগ্রীতে অবস্থিত, তাদের ডিপো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাদের সাথে মাত্র তিনদিনের খাবার ছিলো। যদি ডিপো খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে নির্ঘাৎ বিপদে পড়তে হবে।

বাওয়ার্স ছিলেন খাদ্য মালামালের দায়িত্বে। স্কট প্রথম থেকেই খাদ্য গ্রহণের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে চলছিলেন। কোনো মতেই খাবার বেশি খরচ করা চলবেনা। অল্প খাবারে যতো বেশীদিন চালানো যায় তাতেই লাভ।

অবশ্য তার প্রয়োজনও ছিলো।

দলের সদস্যদের মধ্যে ইভান্সের অবস্থাই ছিলো সবচেয়ে বেশি খারাপ। সেই প্রথমে ভেঙেপড়লো।

দলের অন্যসব সদস্যের মধ্যে ইভান্সই ছিলেন দেখতে বড়। বিশাল ছিলো তার শরীরের মাপ।

কিন্তু শরীরের তুলনায় তার খাবার কম পাচ্ছিলেন। তাই পর্যাপ্ত আহারের অভাবে শীঘ্রই তার শরীর ভেঙে পড়লো।

ইভান্সের এই সময়কার পরিচয় পাওয়া যায় স্কটের ডায়েরী থেকে। স্কট লিখেছেন –'তার হাতের অবস্থা সত্যি খারাপ। দুটি নখ উঠে গেছে। অবাক হচ্ছি যে, এর জন্যই সে মরে যাবার নমুনা দেখাচ্ছে। এ ব্যাপারটা ওর প্রতি আমাকে বেশ নিরাশ করে তুলছে।'

সকলেই দিনে দিনে রোগা হয়ে যাচ্ছিলো। তবে এর মধ্যে ইভান্স একটু বেশি। তার হাতের ক্ষত কিছুতেই ভরাট হচ্ছিলো না। ফলে, জানুয়ারীর শেষের দিকে ক্যাম্পের কোনো কাজেই আর সে সাহায্য করতে পারছিলো না।

দলের মধ্যে একাকী কর্মক্ষমতা হারিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে খুব পীড়াদায়ক বলে অনুভব করছিলো। এটাই হয়তো তার ভেঙে পড়ার আরো বড় কারণ ছিলো।

কথায় বলে, ভাঙা পা-ই গর্তে পড়ে বেশি। ইভান্সের বেলাতেও তাই হলো।

ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে হিমবাহ থেকে নামার সময় স্কট ও ইভান্স হিমবাহের ফাটলে পড়ে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেলেন।

ইভান্স তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে এমনি ফাটলে পড়লেন দু'বার। অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হলো ফাটল থেকে। কিন্তু তাতে তিনি বেশ চোট পেলেন। তার দুর্বল শরীর



www.nagorikpathagar.org

আরো দুর্বল হয়ে পড়লো।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে আবার পাহাড়ের সাথেও ধাক্কা খেলেন। আসলে তিনি চলছিলেন অনেকটা বেসামাল অবস্থায়। নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই অবস্থা দেখে দলনেতা স্কট বুঝতে পেরেছিলেন ইভান্স ক্রমশঃ বোকা এবং অক্ষম হয়ে পড়ছেন।

ইভান্সের শরীরের ক্ষতস্থান ভরাট না হয়ে আরো পেকে উঠলো। পুঁজ বের হতে লাগলো। অপরদিকে নাক দিয়েও পড়তে লাগলো রক্ত।

বোঝা যাচ্ছিলো –ইভান্স মেরুকেন্দ্র ছেড়ে আসার পর বেশি পরিমাণে ভিটামিন-সির অভাবে ভুগছে। হয়তো স্কার্ভি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এ রোগের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম হলো দেহের রক্তনালী সমূহকে দুর্বল করে দেয়া।

এই সংকট ঘনিয়ে এলো ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই দিন বিকেলের দিকেই ইভান্সের অসুস্থতা ও অস্থিরতা প্রচণ্ড বেড়ে গেলো।

এ অবস্থায় তাকে শ্লেজটানা থেকে অব্যাহতি দিয়ে গাড়ি ধরে ধরে হাঁটতে বলা হয়। কিছু সময় পরই সে হাঁটতেও পারছেন না বলে জানায়। গাড়ি ধরে হাঁটাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না।

এই সময় ওটস তার ডায়েরীতে লিখেছেন–

আগামীকালও যদি চলতে না পারে তবে ঈশ্বর জানেন আমরা কিভাবে তাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাবো। আমরা তাকে কিছুতেই শ্লেজের ওপর তুলতে পারবোনা।

পরদিন ইভান্স অবশ্য একটু সুস্থবোধ করলেন। শ্লেজ টানার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু টানতে পারলেন না।

কিন্তু তার সাথীরা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি আবার পরের ডিপোতে পৌঁছতে হবে। খাবার শেষ হবার পথে।

নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই।

এর মধ্যেই আবার ইভান্সের পায়ের জুতোতে অসুবিধে দেখা দিলো। অগত্যা তাকে পেছনে ফেলেই সাথীরা এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। তাকে বলে গেলো জুতো ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসতে।

ওটস লিখেছেন 'দুপুরের খাওয়ার সময়ও যখন ইভান্স এলো না, তখন আমি আর স্কট স্কি করে আবার পেছন দিকে গেলাম। আমরা তাকে হাত ও হাঁটুর ওপর ভর করে বরফের ওপর অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থানে দেখতে পেলাম। সে হাঁটতে পারছেনা। একটা খালি শ্লেজ এনে তাকে তাঁবুতে নিয়ে এলাম।'

তখন ইভান্স ছিলেন প্রায় বেহুঁশ অবস্থায়।কিন্তু সেই জ্ঞান আর ফিরে আসেনি তার। সেই রাতেই ইভান্স তার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

ইভান্সতোমারাগেলেন।

কিন্তু দলের অন্যসব সদস্যের অবস্থাও ভালো নয়। অন্যরাও অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে চলতে লাগলো। বেশি দ্রুত চলা সম্ভব হচ্ছে না কারো পক্ষেই। দিনে মাত্র আট/নয় কিলোমিটার করে তারা এগোতে পারছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে তারা এসে পৌঁছোলেন দক্ষিণ বেরিয়েট ডিপোতে। কিন্তু সেখানেও পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানী ছিলোনা। তাহলে উপায়?

অতঃপর এখানে আর বেশি বিলম্ব না করে তারা ছুটলেন পরের ডিপোর দিকে। সেখানে যদি জ্বালানী পাওয়া যায়। অভিযাত্রীরা তাই প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন।

মুখে না বললেও তখন থেকেই স্কটের মনও ভেঙে পড়তে শুরু করেছিলো, তিনি স্পষ্ট অনুভব করছিলেন তাদেরও দিন শেষ হয়ে আসছে। হয়তো তাদেরও শীঘ্রই



www.nagorikpathagar.org

দুর্বার তুষার ঝড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন স্কট

ইভান্সের পথ অনুসরণ করতে হবে।

অনেক আশা নিয়ে তারা পরের ডিপোতে এসে পৌঁছোলেন ১লা মার্চ তারিখে। কিন্তু এখানেও অবস্থা একই রকম। এখানেও কোনো জ্বালানী নেই।

অন্ততঃ এক গ্যালন জ্বালানীর আশা তারা করেছিলেন। কিন্তু যা আশা করেছিলেন পাওয়া গেলো তার চার ভাগের মাত্র একভাগ।

কিন্তু এখান থেকে পরের ডিপোর দূরত্ব হলো ২৪০ কিলোমিটার। এটুকু জ্বালানী দিয়েই তাদের পাড়ি দিতে হবে এই দীর্ঘ পথ।

এদিকে দীর্ঘদিন বরফের মধ্যে থাকাতে সকলেরই শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসছিলো।

ওটস-এর অবস্থা হলো সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। ওটস্-এর পায়ে ঘা হয়েছিলো বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু সেই ঘা আর শুকোচ্ছেনা। বরং আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে লাগলো ক্রমে।

এতোদিন সে এই ঘায়ের কথা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ২রা মার্চ তারিখে এই ঘায়ের ব্যথা প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়া আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হলোনা।

বেদনায় বিবর্ণ সাথীদের দিকে তাকিয়ে দলনেতা স্কট নিজেও দারুণ কষ্ট পেলেন।

তিনদিন পরে দলনেতা স্কট তার ডায়েরীতে লিখলেন—

'এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এ নীরব সৈনিকটির জন্যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। --- তাপমাত্রা হঠাৎ করে এমন ভয়াবহভাবে নিচে নেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি।



www.nagorikpathagar.org

এদিকে হয়েছিলো আরেক কাণ্ড। মেরু অভিযাত্রীদের কিছু বিপদ আপদ হয়েছে কিনা তা জানার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সাহয্যের জন্য ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মূল ঘাঁটি কেনা ইভান্স থেকে চেরী নামক এক ব্যক্তির পরিচালনায় কুকুর টানা শ্লেজগাড়িসহ একটা দল পাঠানোহয়।

এদের মধ্যে একজন রাশিয়ান কুকুরের টানা শ্লেজচালকও ছিলেন। তবে বলা হয়ে থাকে যে, চেরী এ কাজের উপযুক্ত ছিলোনা।

কুকুরে টানা শ্লেজ পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতার এবং অভিযান সম্পর্কে প্রখর দৃষ্টিশক্তির অভাবও তার ছিলো।

চেরী এটাকে গ্রহণ করেছিলো একটি মজার খেলা হিসেবে। ৪টা মার্চ তারিখে সে একটা ক্যাম্পে পৌছেও যায়। পথে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। সে গড়ে দৈনিক ৩২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলো।

কিন্তু ক্যাম্পে পৌঁছে স্কটের কোনো সন্ধান পেলো না। ওরা ক্যাম্পে এসে পৌছায় নি।

ওরা হয়তো অভিযাত্রীদের সন্ধানে আরো কিছুটা পথ সামনে এগিয়ে যেতেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না।

এরই মধ্যে শুরু হলো আরেক বিপদ। শুরু হলো প্রচন্ড তুষারের ঝড়। এই তীব্র ঝড় পুরো চারদিন অব্যাহত থাকলো।। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তারা আর সামনে এগোতে পারলোনা।

এছাড়া এই প্রচন্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনভিজ্ঞ ও নতুন মানুষ চেরীও খুব ভেঙে পড়ে। মন তার দমে যায় দারুণ রকম।

তার সাথে অবশ্য একজন অভিজ্ঞ শ্লেজ গাড়িচালক ছিলেন। কিন্তু তিনিও এই দুর্যোগের মধ্যে বের হতে রাজী হলেন না।

অতঃপর চেরী সেই ক্যাম্পেই আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে লাগলেন। যদি অভিযাত্রীরা এসে পৌছায়। কিন্তু দীর্ঘ ছয় দিন প্রতীক্ষা করার পরও যখন গেলো না তখন চেরী অধৈর্য হয়ে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। চেরী ক্যাম্প থেকে ফিরে চললেন ১০ই মার্চ তারিখে। তখনো তারা অভিযাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটে চলেছে কিছুই জানে না। চেরী যখন ক্যাম্প থেকে ফিরে যায় তখন ওদিকে ওটসের অবস্থা চরমে পৌছেছে।

স্কট তখন উইলসনকে তার আফিমের গুলী সকলকে ভাগ করে দিতে বললো। এই আফিমের নেশার গুণে দৈহিক যন্ত্রণা যদি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যায়। এ এক আজব কৌশল।

১৪/১৫ তারিখ থেকে অভিযাত্রী দল দৈনিক যে পথ অতিক্রম করার কথা তা থেকে পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো।

পায়ে ঘায়ের ব্যথা। ক্ষুধার যন্ত্রণায় এবং প্রচন্ড শীতে ওটস এবার একেবারেই চলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন।

রাতে তাঁবুতে সে উইলসনের কাছে তার ডায়েরীটি দিয়ে বললো এটি আমার মায়ের কাছে পৌছে দিও।

পরদিন খুব ভোরের দিকে ওটস খুব কষ্ট করে ছেঁড়া এবং স্যাঁতস্যাঁতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। তারপর সাথীদের পায়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর অন্য প্রান্তে পৌছলেন। শেষবারের মতো সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

তখন বাইরে চলছে প্রচন্ড তুষার ঝড়। ওটস তার সাথীদের বললো—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।

এটাই তার শেষ যাত্রা। বাইরে ঝড়ের মধ্যে তিনি হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে। ওটস তার সাথীদের বোঝা হয়ে থাকবে তার চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নেয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তার জন্যই এই মর্মান্তিক আত্মহত্যা।



www.nagorikpathagar.org

উইলসন ওটসয়ের মাকে উদ্দেশ্য করে তার ডায়েরীতে লিখলেন—

আপনার ছেলে যে অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছে এমন আর আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি। সে মরেছে মানুষের মতো সৈনিকের মতো, কোনো রকম নালিশ ছাড়াই মরেছে।

এ প্রসঙ্গে স্কট তার ডায়েরীতে লিখেছেন—

ওটস তাঁবু ছেড়ে যাবার সময় বলেছিলো, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। এক্ষুনি ফিরে আসবো। কিন্তু সে এলো না। কি অপূর্ব দৃঢ়তা। আমার ভাবতেও গর্ব বোধ হচ্ছে যে, আমার দলের লোকেরা সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকে আহবান করে নিচ্ছে। আমরা জানি, ওটস তার মৃত্যুর পথে হেঁটে চলে গেছে। এবং আমরা জানি তা শুধু একজন সাহসী ইংরেজের দ্বারাই সম্ভব।

আবহাওয়া আবার কয়েকদিনের জন্য কিছুটা ভালো হলো। স্কট, উইলসন এবং বাওয়ার্স সামনে এগিয়ে চলার ও বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে চলে তারা ২১শে মার্চ একটা ক্যাম্পের ১৮ কিলোমিটারের মাথায় এসে তাঁবু ফেললেন। তখন তাদের খাবার ও জ্বালানী বলতে গেলে একদম শেষ।

সে রাতেই আবার তুষার ঝড় শুরু হলো। প্রবল সে ঝড় এবার এলো দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে। এদিকে বরফে খেয়ে ফেলার ফলে স্কটের পাও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আর হাঁটতে পারছেন না। চলার শক্তিহীন স্কট তখন যেনো নিজেই দলের বোঝা।

উইলসন ও বাওয়ার্সের অবস্থা তখনো কিছুটা ভালো। তারা ঠিক করেছিলো দুজনে একটা ক্যাম্পে এগিয়ে গিয়ে খাওয়া ও জ্বালানী নিয়ে আসবে।

কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে তা তারা যায়নি। অথচ বাওয়ার্স একাজ করার লোক ছিলেন না। সামান্যতম সুযোগ থাকলেও তিনি কাজ করা থেকে বিরত থাকার লোক নন। তবু আশ্চর্য তিনি এবং উইলসন অজ্ঞাত কারণে যাননি। অথচ বাওয়ার্স একাজ করার লোক ছিলো না। সামান্যতম সুযোগ থাকলেও এ কাজ করা থেকে সে এবং উইলসন অজ্ঞাত কোনো প্ররোচনায় শুয়েই রইলেন।

শুয়ে শুয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকলেন।

প্রায় ৯ দিন তারা এভাবে স্কটসহ নিজেদের স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়ে থাকলেন। এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেলো তাদের খাবার। জ্বালানী এবং শেষ হয়ে গেলো তিনটি জীবনের দীপশিখা।

উইলসন এবং বাওয়ার্স তাদের ডায়েরীতে এলোমেলো ভাবে শেষের দিকে যা লিখে রেখে গেছেন তা থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই স্কট বিদায় নেবার চিন্তা করছিলেন।

১৬ই মার্চের দিকেই সে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। কেউ কেউ মনে করেন, তাদের তিনজনের মৃত্যুর জন্যে স্কট নিজেই দায়ী। কারণ তিনি নিজের জীবন বাঁচাবার আশায় অন্য দু'জনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাননি।

মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের অনুভবের অপেক্ষায় শুয়ে থেকে স্কট বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন, দক্ষিণ মেরু অভিযানে কোষাধ্যক্ষ স্যার এডগার স্পেয়ারকে লিখেছেন,-

'আমরা শান্তভাবে মারা যাবো-- আমি মনে করি, এ মৃত্যু দেখিয়ে দেবে যে, তেজ ও শক্তি আমাদের দেখিয়ে দেবে চেতনা থেকে এখনো হারায়নি।'

তিনি উইলসনের স্ত্রীকে লিখেছিলেন— যদি আপনি কোনোদিন এ চিঠি পান, তবে জানবেন যে আমি আর বিল (উইলসনের ডাক নাম) একই সাথে যাত্রা শেষ করেছি, আমরা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনাকে জানাতে চাই শেষ দিন অবধি কি অপূর্ব ও ছিলো, চিরন্তন আনন্দময়, অন্যের দরকারে নিজেকে উৎসর্গ করতে সদা অগ্রণী। এই মর্মান্তিক পরিণতিতে ঠেলে দেবার জন্যে কখনো একটি কথা বলেও আমাকে



www.nagorikpathagar.org

দোষ দেয়নি। ভাগ্যক্রমে তাকে খুব বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি।

তার চোখে রয়েছে প্রশান্ত নীল আশার দৃষ্টি, তার মন শান্তিময় এই অটুট বিশ্বাসে যে ঈশ্বরের বিরাট পরিকল্পনার সে শুধু অংশবিশেষ মাত্র। আপনাকে আর কিছু বলে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, শুধু এইটুকু বলতে পারি ও জীবনে যেমন ছিলো সাহসী, খাঁটি মানুষ, মৃত্যুতেও তাই—বন্ধুর সেরা বন্ধু, বিশ্বস্ততম সাথী।'

স্কট তার অপর সহযোগী বাওয়ার্সের মাকে উদ্দেশ্য করে লেখলেন,– আমার ভয় আপনি যখন এই চিঠি পাবেন তখন আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন আঘাতটি পেয়েছেন। এই চিঠি আপনাকে লিখছি যখন আমাদের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এযাত্রা আমি শেষ করছি দু'জন বীর মহৎ মানুষের সাথে। তার মধ্যে একজন আপনার পুত্র। সে আমার ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলো এবং আমি তার উন্নত চরিত্র, কর্মদক্ষতা এবং শক্তিকে শ্রদ্ধা করি। কঠিন বিপর্যয়ের মুখে তার নির্ভীক আত্মা যেনো উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তিমান হতো, শেষ অবধি সে ছিলো আশাবাদী প্রফুল্ল আর অপরাজেয়------।

যে ব্যক্তির উদ্যোগে স্কট তার জীবনের এ সুযোগ পেয়েছিলেন, সে ব্যক্তি হলেন স্যার ক্লিমেন্টসমার্কহাম।

কিন্তু তার কাছে স্কট এক কলমও লেখেননি। তবে তিনি তার নিজের স্ত্রী ক্যাথারিনের কাছে লিখিত শেষ চিঠিতে তার কথা উল্লেখ করেছেন।

'স্যার ক্লিমেন্টেসের কাছে লেখার সময় হলোনা। তাঁকে বলবে আমি তাঁর কথা সব সময় খুব মনে করছি–আমাকে এ আবিষ্কারের জন্য দলীয় নেতা নির্বাচনে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।'

স্কট স্ত্রীর কাছে তার ছেলে মেয়ের কথাও বলেছিলেন। তিনি যখন অভিযানে আসেন তখন তার ছেলের বয়স ছিলো মাত্র এক বছর। তিনি স্ত্রীকে পুত্র সম্পর্কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—তাদের ছেলেকে যেনো প্রকৃতিবিজ্ঞানী করে তোলা হয়।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে তার এই ইচ্ছে পূরণ হয়েছিলো। স্কটের পুত্র বড় হয়ে হয়েছিলেন স্বনামধন্য পক্ষী বিশারদ ও চিত্রকর স্যার পিটার স্কট।

স্কটের স্ত্রী ক্যাথরিন স্কট ছিলেন একজন স্বনামধন্যা ভাস্কর।

স্কট তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যেও একটি বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

'এ দুর্ঘটনা মেরু আবিষ্কারের অভিযান সংগঠনের কোনো প্রকার ভুল ত্রুটির জন্য হয়নি। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। এতে বিপদের অনক ঝুঁকিতো ছিলোই বটে। আমার মনে হয় না, আমরা যে সময়ে এ অভিযানে এসেছি, এমন আবহাওয়ায় কোনো মানুষ কখনো এ পথে এসেছে----। কিন্তু এর মাঝেই আমরা আমাদের অভিযান চালিয়েছি ---। এ অভিযান সম্পর্কে আমার কোনো আক্ষেপ নেই, বরঞ্চ ইংরেজরা যে কেমন কঠিন পরিশ্রমী, সাহসী এবং একে অন্যকে সাহায্য করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে তা ভেবেই আমি আনন্দ পাচ্ছি।

তিনি জাতির উদ্দেশ্যে লিখিত এই পত্রে সমগ্র অভিযানের চিত্র তুলে ধরে শেষে লিখেছেন—

'কোনো আফশোস নেই--- আমরা জেনেশুনেই ঝুঁকি নিয়েছি আর সব কিছুই আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। তার জন্য কোনো অভিযোগ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমরা মেনে নিলাম নতশিরে এবং শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা যথাসাধ্য করে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। -- যদি বেঁচে থাকতাম তবে শোনাতে পারতাম সঙ্গীদের কষ্ট সহিষ্ণুতার, ধৈর্যের এবং বীরত্বের কাহিনী, যা প্রত্যেকটি ইংরেজের হৃদয় মথিত করতো। এই অমার্জিত লেখা আর আমাদের মৃতদেহই সেই কাহিনী বলবে।----

স্কট তাঁর ডায়েরীতে শেষ লেখা লিখেছিলেন ২৯ শে মার্চ। তাঁর শেষ কথা ছিলো – For gods sake look after our people.



www.nagorikpathagar.org

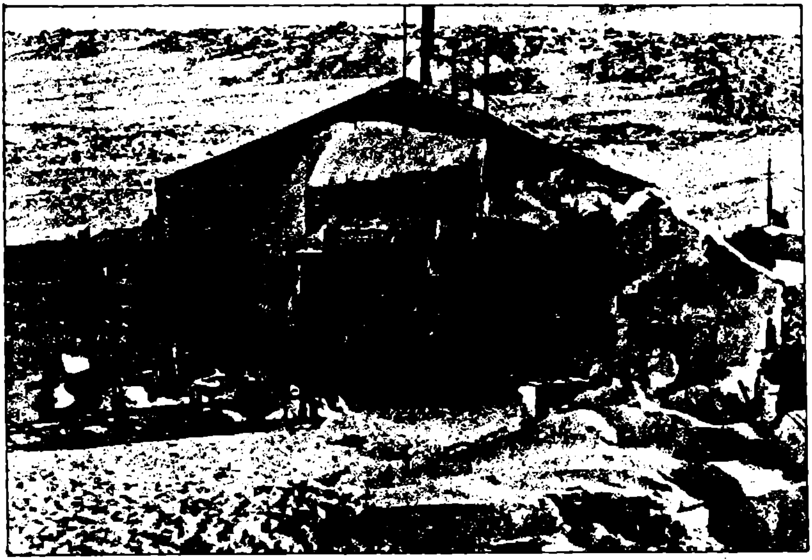

স্কটের শেষ ঘাটি।

এমনি করেই দক্ষিণ মেরু অভিযানের সবচেয়ে আলোচিত এবং সবচেয়ে হতভাগ্য অভিযাত্রী রবার্ট ফকন স্কটের জীবনের দীপ নিভে গেলো। স্বদেশ থেকে বহু দূরে, স্বজনহারা ভয়ংকর এক তুষার প্রান্তরে। আমুণ্ডসেনের বিজয়বার্তা বয়ে আনার দায়িত্ব আর তার পালন করা হলোনা। সব শেষ হয়ে গেলো এখানেই।

এর প্রায় আট মাস পরে নতুন অভিযাত্রীরা নতুন অভিযানে গিয়ে তুষার রাজ্যের সেই নিথর প্রান্তরের এক পরিত্যক্ত তাঁবু থেকে ফকন স্কটের ডায়েরী, ডায়েরীর ভিতর মেরু বিজয়ী আমুণ্ডসেনের চিঠি উদ্ধার করে আনলেন।

নতুন অভিযাত্রীরা বরফ খুঁড়ে তাঁবুর ভেতর আবিষ্কার করলেন তিনজনের মৃতদেহ। তিনজনেই অনন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে ছিলেন স্লিপিং ব্যাগের ভিতর।

অভিযাত্রীরা সবিস্ময়ে দেখলেন দলনেতা স্কটের একটি হাত বাড়ানো আছে তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী উইলসনের উপর।

এই দেখে অনুমান করা হয় তিনজন অভিযাত্রীর মধ্যে তিনিই সম্ভবত সর্বশেষে মারা গিয়েছিলেন, তার চরিত্রের দৃঢ়তার মতো হয়তো শারীরিক সামর্থও তুলনামূলকভাবে বেশি ছিলো।

তাঁবুটি ছিলো নিখুঁতভাবে লাগানো। এই দীর্ঘ আটমাসেও তার ভিতরে কোনো বরফ ঢোকেনি। অভিযাত্রীদের ডায়েরী, আবহাওয়ার লকবুক, ভূ-তত্ত্ব এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের রেকর্ড এবং চিঠিপত্র সব কিছুই অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

স্কটের প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন। টেনিসনের একটি কবিতার বইও তাঁর সাথে ছিলো।

নতুন অভিযাত্রীরা মৃতদেহগুলোকে আর নাড়ায়নি। সেই পরিত্যক্ত তাঁবু দিয়েই তাদের দেহগুলো আবার নতুন করে ঢেকে দেয়া হয়। এই কবরের উপর তৈরি করা হয় বিশাল বরফের স্তূপ। তারপর একটি স্কির লাঠি দিয়ে কবরের উপর ক্রসও তৈরি করা হয়। অপূর্ব



www.nagorikpathagar.org

সে রাজকীয় সমাধি।

তারপর স্কটের প্রিয় কবি টেনিসনের ইউলিসিস কবিতার সেই বিখ্যাত পঙক্তি–"To strive" to seek, to find, and not to yield." একটি কাঠের ক্রুসে লিখে দেয়া হয়।

## হেনরী শ্যাকলটন

রবার্ট ফকন স্কট প্রথমবার এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে যখন অভিযান চালাতে গিয়েছিলেন, তখন তার সহকারী ছিলেন আর্নেষ্ট হেনরী শ্যাকলটন।

প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে তিনিও বার বার ভাবছিলেন তাঁদের অভিযানের কথা। প্রথমবারের ব্যর্থতা তার মনেও বেজেছিলো। সুতরাং তিনি আবার গিয়ে তার অভিযানকে সফল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তবে এবার আর কারো সহকারী হিসেবে নয়। জাহাজ যোগাড় করে এবার নিজেই যাবেন অভিযানে।

সত্যি সত্যিই তাই করলেন। নিমরড নামে একটি জাহাজ যোগাড় করে তিনি ১৯০৮ সালে পাড়ি জমালেন এ্যান্টার্কটিকার উদ্দেশ্যে।

এবার দলপতি হয়ে অভিযান এলেও তার কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যেনো শ্যাকলটন ছিলেন কিছুটা অধৈর্য প্রকৃতির মানুষ। সব কিছুতেই তার শুধু তাড়াহুড়া। কোনো কিছুতেই তর সয়না তার।

নইলে শ্যাকলটন যখন এ্যান্টার্কটিকাতে এসে পৌঁছলেন তখনই প্রায় শীত পড়তে শুরু করেছে। এ হলো চির তুষারের দেশে বছরের দুর্যোগপূর্ণ সময়। এই সময়ে বাইরে পা বাড়ানো বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু সামনের এরই দুর্যোগ দেখেও দমলেন না শ্যাকলটন। যেনো এক্ষুনি জিততে না পারলে দক্ষিণ মেরু বিজয়ের সোনার মুকুট তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং ঘাটে জাহাজ ভিড়িয়েই তিনি চটপট তৈরি হতে লাগলেন।

কিন্তু ভেবেও দেখলেন না ইতিমধ্যে কিং এডওয়ার্ড দি সেভেনথ ল্যান্ডের উপর কী ভয়াবহ আকারে বরফ জমতে শুরু করেছে।

চলার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে পথে বের হওয়া কতো বিপজ্জনক।

অবশ্য শ্যাকলটনের এই তাড়াহুড়ার পেছনে আরো কারণ একটা ছিলো। ইতিমধ্যেই তারা যে পরিমাণ কয়লা নিয়ে এসেছিলেন তাতে টান পড়তে শুরু করেছে।

গোটা শীতের সময়টাতে চুল্লীর আগুন জ্বেলে রাখতে হবে। আগুনের তাপে না থাকলে নিজেই জমে হিম হয়ে যাবে।

তাই তিনি ভেবেছিলেন শীত জাঁকিয়ে আসতে যে কটা দিন সময় আছে এরই মধ্যে অভিযানটা শেষ করে শীত পড়তেই ফিরে যাবেন স্বদেশে। শীতকালটা আর এখানে কাটাতে হবে না। আর এই জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তখনো তিনি বুঝতে পারেন নি এদেশের শীতকালটা সত্যি কত ভয়ংকর। প্রথম দিনেই তিনি তার কিছুটা পরিচয় পেলেন এবং এই প্রথম পরিচয়েই তাকে দিতেও হলো বিরাট খেসারত। যাকে বলে ভুলের মাশুল।

শ্যাকলটন সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রার আয়োজন করছিলেন, সেখানেই ঘটলো এক মারাত্মক দুর্ঘটনা।

স্লেজগাড়িতে মাল তোলা হয়েছে, বোঝাই করা হয়েছে তাঁবু, খাদ্য, সাজ–সরঞ্জামসহ



www.nagorikpathagar.org

শ্যাকলটন

আরো নানা দরকারী জিনিস। গাড়িতে ঘোড়াও জোতা রয়েছে আর একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে।

কিন্তু এমনি সময়েই কি হলো, একটা বিকট শব্দে গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই বরফের মাঝে এক মস্ত ফাটল দেখা দিলো। বরফের চাঁই ফেটে সৃষ্টি হয়ে গেলো বিরাট খাদের।

আর সেই খাদে পড়বিতো পড় স্লেজ গাড়ি সহ সবকটা ঘোড়াই হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার।

মুহূর্তে প্রায় গোটা আটেক জলজ্যান্ত টাট্টু ঘোড়াসহ অতগুলো মালপত্তর নিয়ে গাড়িটা সেই খাদের নীচে পড়ে হারিয়ে গেলো। একটু চিৎকার দেবার ফুরসতও পেলো না কেউ। একেবারে ভেলকি বাজির মতো ঘটে গেলো ঘটনাটা।

শ্যাকলটন ভাগ্যিস খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নইলে হয়তো তিনিও গাড়ির



www.nagorikpathagar.org

সাথেই ডুবে যেতেন ওই অতল তলে। ভাগ্যের জোরেই তিনি বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।

এটা যা হবার তাতো হলোই। কিন্তু বিপদ এলো এর পরেও। পরদিনই আবার শুরু হলো তুষার ঝড়।

অবশ্য শীতকালে এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে এ সবই নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রচণ্ড ঝড়ে এমন হলো যে, যেখানে যে জলকণাটুকু এসে পড়লো সেখানেই ওটা জমে বরফ হয়ে আটকে যেতে লাগলো। সংগে সংগে জমে বরফে পরিণত হতে লাগলো।

এই ঝড়ের গতিবেগ ছিলো প্রায় ঘন্টায় দেড়শো কিলোমিটার। অল্পক্ষণের মধ্যে ঝড়ের প্রচণ্ডতায় গোটা জাহাজটাই অকেজো হয়ে যাবার যোগাড় হলো।

দীর্ঘ কয়েকদিন একটানা বাতাস বয়ে যাওয়ার পর আকাশ আবার খানিকটা শান্ত হলো। বরফ পড়াও কিছুটা কমলো।

তখন শ্যাকলটন আবার নতুন উদ্যমে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

শ্যাকলটন যেমনি ছিলেন অস্থির প্রকৃতির, তেমনি ছিলেন দুর্দান্ত সাহসীও। একটার পর একটা এতো ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও তিনি দমলেন না, ভয় পেলেন না। যাত্রার আয়োজন চলতেই লাগলো।

ইতিপূর্বে তিনি রবার্ট ফকন স্কটের সংগী হয়ে অভিযানে এসেছিলেন। পথঘাট কিছুটা চেনা ছিলো। সুতরাং নতুন পথে যাবার ঝুঁকি না নিয়ে তিনি স্কটের পথই অনুসরণ করলেন।

কিন্তু এবারও তিনি একটা ভুল করে বসলেন। বরফের উপর দিয়ে স্লেজ গাড়ি টানাতে কুকুরই হলো সবচেয়ে ভালো বাহন, কিংবা বলগা হরিণ। কিন্তু তিনি নিলেন টাট্টু ঘোড়া।

অবশ্য আপাতঃ দৃষ্টিতে ঘোড়া কুকুর আর হরিণের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। ঘোড়া খুব দ্রুত গাড়িও টানতে পারবে। তিনি ভেবেছিলেন, তাতে খুব অল্প সময়ে বেশি পাড়ি দেয়া যাবে।

কিন্তু এখানে একটা বিপদও আছে। ঘোড়া লবণ খেতে অভ্যস্ত। ঘোড়ার এই লবণ খাবারের নেশাই বিপদ ডেকে আনলো। সমুদ্রের বুকে থেকে ঝড়ের তাণ্ডবে যে প্লাবন বা বন্যা এসে ডাংগায় ওঠে, কিন্তু আর ফিরে যেতে পারে না। শীতের তীব্রতায় এখানেই জমাট বেঁধে বরফে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সেই বরফগুলো থাকে লোনা। কারণ সাগরের জলতো লবণাক্ত।

শ্যাকলটনের ঘোড়াগুলো সেই লবণের সন্ধান পেয়ে মুঠি মুঠি বরফের ধুলা খেতে লাগলো। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে শীঘ্রই ঘোড়াগুলো অসুস্থ হয়ে পড়লো।

দেখতে দেখতে দু'দিনের মধ্যে চার চারটি ঘোড়া মারা পড়লো। আটটি ঘোড়ার চারটি মারা যাওয়ার ফলে অসুবিধা দেখা দিলো। আটটির বোঝা কোনো মতোই চারটি ঘোড়ার টেনে নিতে পারছিলো না। সুতরাং তারা খুব ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

কিন্তু সাহস হারালেন না শ্যাকলটন। এমনি করেই চলতে চলতে ১৯০৯ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে তারা কিং এডওয়ার্ড সেভেনথ মালভূমিতে পৌঁছে গেলো। এখান থেকে কুমেরু বিন্দু আর বেশি দূরে নয়। আর মাত্র ১৫৫ কিলোমিটার ৯৭ মাইল পথ যেতে পারলেই মেরুবিন্দু।

এতো বিপদ, এতো বাধা পার হয়েও শ্যাকলটন যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, ততো দূর দক্ষিণে আর কোনো অভিযাত্রীই যেতে পারেনি তখনো পর্যন্ত।

মনে মনে দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠলেন শ্যাকলটন। হয়তো বিজয়ের মুকুট তিনিই পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতিও সুপ্রসন্ন ছিলো না।

বিজয়ের দ্বার প্রান্তে এসে মনে পরম উল্লাসে যখন শ্যাকলটন তাঁর শেষ ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করলেন তখনি আবার নেমে এলো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ।



www.nagorikpathagar.org

শুরু হলো তুষার ঝড়। এমনিতেই দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি, অনাহার, অনিদ্রা এবং নানা অসুখে তাঁর সাথীরা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর নতুন করে শুরু হলো এই ঝড়।

এই নতুন বিপদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি বা সাহস তখন কারো আর অবশিষ্ট ছিলো না। দলের শেষ ঘোড়াটাও অবশেষে মারা পড়লো।

দীর্ঘ ষাট ঘন্টা ধরে চললো প্রচণ্ড তুষার ঝড়। চারদিক কাঁপিয়ে আকাশ বাতাস মথিত করে চললো এই তাণ্ডব লীলা। ডুবে গেলো চার পাশ ঘন অন্ধকারে।

সুতরাং মনে যতোই জোর থাক, কিংবা আশাভংগের যতোই কারণ হোক, শ্যাকলটন আর অধিক দূর অগ্রসর হবার সাহস করলেন না।

বিজয় মুকুট একেবারে হাতের কাছে রেখেও শুধু নিছক প্রাণের মমতায় তাঁকে পিছু হটতে হলো। প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি আর অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে অবশেষে ফিরে এলেন শ্যাকলটন।

তারপর স্বদেশে ফিরে এলেন তিনি। মেরু বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে না পারলেও এই সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

উল্লেখ্য যে, আর্নেষ্ট হেনরি শ্যাকলটন এর পরেও আরো একবার এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অভিযানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেই রোয়ান্ড আমমুণ্ডসেন মেরু বিজয় শেষ করে ফেলেছেন।

এই তৃতীয় বারে তিনি যাত্রা করেছিলেন ১৯১৪ সালে। তাঁর আশা ছিলো রোয়ান্ড আমণ্ডসেন তো মেরু বিজয় করেই ফেলেছেন। দেখা যাক তাঁর উপরেও টেক্কা দেয়া যায় কিনা।

তিনি আশা করছিলেন এবারের অভিযানে তিনি কুমেরু বিন্দু পার হয়ে আরো দক্ষিণে চলে যাবেন। একেবারে যাকে বলে এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের এ মাথা থেকে শেষ মাথা পর্যন্ত পাড়ি দেবেন।

কাজটা এখনও পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি। তিনি যদি কাজটা করতে পারেন তবে একটা বাহাদুরী নিশ্চয়ই পাবেন। এও কি কম গৌরবের কথা হবে?

এই আশাতে ভর করেই তিনি এণ্ডুরেন্স নামে একটি জাহাজ নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য এ্যান্টার্কটিকার পথে পাড়ি ধরলেন।

বলা বাহুল্য এই তৃতীয় অভিযানও তাঁর সফল হয়নি। অর্থাৎ তিনি এবারও তাঁর অভিযান পূর্ণ করতে পারেন নি।

এই অভিযান শুরু হয়েছিলো আরো অনেক পরে। সে ১৯৫৮ সালের কথা।

এই বছরই আন্তর্জাতিক উদ্যোগে প্রেরিত একদল অভিযাত্রী এই কার্যটি সম্পাদন করেন। এই দলের নেতা ছিলেন ফচ নামে জনৈক নাবিক। তিনি সাউথ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে মেরু পার হয়ে দক্ষিণের কোটস ল্যাণ্ড তীরে বৃটিশ শাসনাধীন ও ওয়েডেল সাগরের পাড়ে উপস্থিত হন।

## আমুণ্ডসেনের কুমেরু বিজয়

দক্ষিণ মেরু বিজয়ের অভিযাত্রীদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রোয়ান্ড আমুণ্ড সেন (১৮৭৮-১৯২৮) সর্ব প্রথম মেরু বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আমুণ্ডসেনের পূর্ব পুরুষগণ ছিলো ভাইকিং নামে সেকালের জগৎবিখ্যাত জলদস্যুদের বংশধর। যারা একদা পাল তোলা জাহাজ নিয়ে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতো। আমুণ্ডসেনের রক্তেও ছিলো এমনি এক দুর্দান্ততার নেশা।



www.nagorikpathagar.org

রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের আগে তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন উত্তর মেরুতে কিন্তু উত্তর মেরু বিন্দু আবিষ্কারের গৌরব তিনি অর্জন করতে পারেন নি।

কারণ তাঁর আগেই বিখ্যাত নাবিক এ্যাডমিরাল রবার্ট এডউইন পিয়েরি (১৮৫৬-১৯২০) ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল উত্তর মেরু বিজয়ের সম্মান লাভ করেন।

সুতরাং সেদিকে খ্যাতি অর্জনের আশা নেই দেখেই তিনি দক্ষিণ মেরুর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। এর আগেও তিনি একবার গিয়েছিলেন এ্যান্টার্কটিকাতে। তখন গিয়েছিলেন স্যার জর্জ নেয়ারস (১৮৩১-১৯১৫) এর সহকারী হিসেবে।

আগেই বলেছি-তিনি খুব সাহসী ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতে রাজী ছিলেন না। যাই কিছু করেন না কেনো, আগে থেকে সব কিছু জেনেশুনে, ভেবে-চিন্তে তবেই তিনি পা বাড়াতেন।

তাই দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেয়ার সাথে সাথেই তিনি এ্যাটর্কটিকা মহাদেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে এর আগে যে অভিযাত্রী এখানে এসেছিলেন তাদের বিবরণগুলো মনযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। কেনো তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন, কোথায় তারা ভুল করেছিলেন এবং সেখানে কি কি ধরনের বিপদের সমুখীন হয়েছিলেন তার প্রতিটি বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি।

পরিকল্পনা করতে লাগলেন, কোন দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করবেন। কি কি ধরনের বিপদের জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে সব জেনে নিলেন।

তারপর প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে ১৯১১ সালের অকটোবর মাস নাগাদ তিনি এলেন জাহাজ ভেড়ানোর এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের তীরে। তিনি বে অব হোয়েল উপসাগরে



www.nagorikpathagar.org

পাড়ি দিয়ে এসে তীরে জাহাজ ভিড়ালেন। সামনেই রয়েছে সেই বিখ্যাত বরফের পাহাড় , গ্রেট আইস বেরিয়ার।

তিনি এখানে এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন শীতকাল থাকতে থাকতেই। সুতরাং শীতকালটা অপেক্ষা করতেই হবে।

এরপর শীতকাল কেটে যেতেই তিনি ১৯১১ সালের ২০শে অকটোবর তারিখে তার অভিযানে যাত্রা করলেন। এই অভিযানে তার সহকারীদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন মেলমান হ্যানসেন ও উইষ্টিং। গাড়ি টানার জন্য কুকুর সংগে আনা হয়েছিলো ৫২টি।

এতো সাবধান আর এতো হিসেব করে যাত্রা করলেও কিন্তু বিপদ থেকে রেহাই পেলেন না তিনি। অভিযানে বের হওয়ার দিন দুয়েক পরেই নেমে এলো তুষার ঝড়। ফরসা আকাশ মুহূর্তে কালো অন্ধকারে ঢেকে গেলো। অবিরাম ঝরতে লাগলো বরফের কণা। নিজেদের ওভারকোট স্লেজ গাড়িতে রাখা মাল পত্তর এমনকি কুকুরের শরীরে পর্যন্ত পুরু হয়ে বরফ জমতে লাগলো।

তুষার প্রান্তরে একাকী - এগিয়ে যাচ্ছে অ্যামুন্ডসেন,



www.nagorikpathagar.org

তিনি আর এগুতে সাহস করলেন না। তাঁবু খাটালেন সেখানে। পুরো একদিন ধরে প্রচন্ড বেগে ঝড় বইলো। তিনি সাথীদের নিয়ে তাঁবুতে বসে কোনো মতে আত্মরক্ষা করলেন।

ঝড় থামলে আবার যাত্রা শুরু হলো। প্রতি মুহূর্তে সাবধানে পা ফেলতে হবে। কে জানে কোথায় চোরা খাদ লুকিয়ে আছে। বাইরে দেখেতো কিছু অনুমান করা যায় না। সমতল হয়েই বরফ জমে আছে। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা যাবে পায়ের সামান্য চাপেই উপরের পাতলা স্তর ভেঙে নিচের দিকে বসে গেছে। হতে পারে হয়তো গোটা মানুষটাই মুহূর্তে বরফের তলায় হারিয়ে গেছে। সে এক মরণ ফাঁদ আর কি।

এমনি এক ভয়ংকর মরণ ফাঁদে পড়েছিলেন রোয়ান্ড আমুন্ডসেনের দলও।

আগে পিছে করে কয়েকটা স্লেজ গাড়ি চলছিলো। ৫২টা কুকুরকে কয়েকটা দলে ভাগ করে গাড়ির সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

অ্যামুণ্ডসেনের দলের হ্যানসেনের গাড়িটি ছিলো সর্বশেষে। তার ডান পাশেই ছিলো মস্ত বড় খাদ। অকস্মাৎ চলতে গিয়েই তিনি গাড়ি সুদ্ধ পড়বিতো পড় একেবারে খাদের মধ্যে। একেবারে বিশ পঁচিশ ফুট নিচে।

অবশ্য স্লেজ গাড়িগুলো একটার সাথে অন্যটি শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা ছিলো। এটা অবশ্য একটা নিয়ম। যারা পর্বত আরোহণ করতে যান তাদেরও মোটা আর শক্ত রশি দিয়ে একজনের সাথে আরেকজনের কোমরে বাঁধা থাকে। যাতে একজন পা পিছলে পড়ে গেলে একেবারে হাজার হাজার ফুট নিচে পড়ে মারা না যায়। রশিতে বাঁধা থাকালে পড়ে গিয়েও সে ঝুলতে থাকে। তখনই তার অন্য সাথীরা রশি টেনে তাকে তুলে আনতে পারে।

এখানেও হ্যানসেনও পড়ে গিয়ে খাদের বিশ পঁচিশ ফুট নিচে গাড়ি সুদ্ধ রশিতে ঝুলতে লাগলেন। খাদে পড়ে গিয়েই তিনি ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। কুকুরগুলোও চেঁচাতে লাগলো।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় গোটা দলটাই সহসা থমকে গেলো। সবাই ভয় পেয়ে গেলো। একটা মানুষতো রশি ধরে টেনে তোলা যায় কিন্তু চার পাঁচটা কুকুর জোড়া গাড়ি সুদ্ধ হ্যানসনকে টেনে তোলাতো চাট্টি খানি কথা নয়।

আর তাছাড়া তারা খাদের যে পাশে ছিলেন সে পাশের অংশ খুব খাড়া। কে জানে বেশি শক্তি খাটাতে গেলে আরেকটা চাঁই ভেঙে পড়বে কিনা।

তাহলেতো সবাইকে একেবারে তুষার সমাধিই হতে হেব। তা'হলে উপায়টা কি? নীচে থেকে হেলমার হ্যনসেনের অবিরাম চিৎকার কানে আসছে,—প্লিজ রশি কেটে দিও না। তা'হলে আমি আরো অনেক নীচে পড়ে যাবো। আমি মরে যাবো। দোহাই তোমাদের, আমার রশি কেটে দিও না।

উপর থেকে অ্যামুণ্ডসেন তাকে অভয় দিতে লাগলেন, তুমি ঘাবড়ে যেওনা হ্যানসেন। তোমাকে ফেলে আমরা যাবো না।

হ্যানসেন আরো জোরে চিৎকার দিতে লাগলেন—তোমাদের দোহাই ঈশ্বরের, আমাকে বাঁচাও।

অ্যামুণ্ডসেন বললেন, – তুমি আর একটু ধৈর্য্য ধরে স্লেজ গাড়ি আঁকড়ে থাকো। তোমাকে টেনে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বললেন তো টেনে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু কেমন করে করবেন। ভেবে পাচ্ছেন না।

অবশেষে এগিয়ে এলেন উইস্টিং। তিনি ছিলেন যেমন শক্তিশালী তেমনি দুর্দান্ত সাহসী।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন,–দেখা যাক। হ্যানসেনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করা যায় কিনা।



www.nagorikpathagar.org

—কিন্তু কেমন করে? যদি খাদের ওপারে যাওয়া যায় তবে অপেক্ষাকৃত কম খাড়া পাড় থেকে টেনে তোলা সহজ হবে। উইষ্টিং হেসে বললেন, —স্কুল জীবনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় লং জ্যাম্পে একবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। দেখা যাক বিদ্যেটা আয়ত্বে আছে কিনা।

সত্যি সত্যি সকলের বিস্মিত চোখের সামনেই তিনি জাম্প করে ছয় সাত ফুট চওড়া খাদটা অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেলেন।

তারপর রশি ফেলে হ্যানসেনকে টেনে তুললেন। হ্যানসেনের জীবন রক্ষা পেয়ে গেলো এ যাত্রা। এছাড়াও আরো বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। দেখা দিলো খাবারের অভাব। অবশেষে কুকুরগুলোকে স্লেজ গাড়ি টানার জন্য সংগে আনা হয়েছিলো সেগুলোকে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হলো। দেখতে দেখতে এক এক করে ২৪টি কুকুরই অভিযাত্রীদের পেটে চালান হয়ে গেলো।

অবশেষে মাত্র আঠারোটি কুকুরই গাড়ি টেনে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

পথে তাঁদের প্রায় দশ হাজার ফুট উর্দ্ধে একটা পর্বত অতিক্রম করতে হয়েছিলো। সে যে কি ভয়ানক কাজ। মেরু আবিষ্কার করতে গিয়ে পর্বত আরোহণ। তবু অসীম সাহসে ভর করে এগিয়ে চললেন তারা।

কুকুরগুলোই এই পর্বতের গা বেয়ে ভারী মালসহ স্লেজ গাড়ি টেনে তুললো পর্বতের চূড়ায়। এর পরে তাদের একটি ভয়ানক তুষার নদীও পার হতে হয়েছিলো। পাড়ি দিতে হয়েছিলো প্রায় একশো নিরানব্বই কিলোমিটার লম্বা এক মালভূমি।

অবশেষে অনেক বাধা আর বিপদকে ঠেলে তারা গিয়ে মেরু বিন্দুতে পৌঁছিতে সক্ষম হলেন। এই বিজয়ের কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই সংগে লেখা থাকবে দুঃসাহসী অভিযাত্রী রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেনের নাম। তাঁর অভিযানের বিচিত্র কথা। মেরু বিন্দুতে পৌঁছে বিজয়ী এ্যামুণ্ডেসেন সগর্বে দাড়ালেন বুকটান করে। বুক ভরে টেনে নিলেন চির তুষার দেশের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। আনন্দে বুকটা ফুলে উঠলো তাঁর।

থলে থেকে বের করলেন নরওয়ের জাতীয় পতাকা। বরফের উপর পুঁতে দিয়ে সকলে ঘিরে দাঁড়ালেন জাতীয় পতাকাকে। সকলে অভিনন্দন জানালেন। আজ তাঁদের কি আনন্দ! আজ তাঁরা বিজয়ী। এ গর্ব তো অ্যামুণ্ডসেনের নিজের, তাঁর দেশের, এমন কি সারা পৃথিবীর মানুষের।

বিজয় শেষে এবার ফেরার পালা, ফেরার পথেও তাঁদের আরো অনেক কষ্ট করতে হয়েছিলো। বাহান্নটি কুকুরের মধ্যে ২৪ টি তো তাঁদের খেয়েই ফেলতে হয়েছিলো।

আসার পথেও আরো চার পাঁচটি তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হলো। অবশেষে অনেক কষ্টে মাত্র বারোটি কুকুর অনেক কষ্টে তাঁদের টেনে এনে পৌঁছে দিলো মূল ঘাঁটিতে।

স্কটের তুলনায় অ্যামুণ্ডসেনের অভিযান ছিলো অনেকখানি নিখুঁত। ছিলো সুষ্ঠু পরিকল্পনারনমুনা।

১

স্কটের সাথে অ্যামুণ্ডসেনের আরেকটা মৌলিক পার্থক্য ছিলো—স্কটের অভিযানের লক্ষ্য ছিলো একই সাথে দুটো।

স্কটের প্রধান লক্ষ্য ছিলো মেরু বিজয় আর সেই সাথে ছিলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো, নমুনা সংগ্রহ করা। তিনি এই দুটো একসাথে করতে গিয়ে শক্তি ব্যয় করেছেন বেশী। যার ফলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে হয়নি।

কিন্তু অপরদিকে অ্যামুণ্ডসেনের লক্ষ্য ছিলো একমাত্র মেরু বিজয়। যার ফলে পথে তিনি আর কোনোদিকে তাকাননি। সোজা দ্রুত ছুটে গেছেন লক্ষ্য অর্জনের দিকে। ফলে



www.nagorikpathagar.org

অর্জিত হয়েছে বিজয়।

এছাড়া মেরু অভিযাত্রী হিসেবেও অ্যামুণ্ডসেন স্কটের তুলনায় ছিলেন অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও কর্মঠ। তার দলের অন্যান্য সদস্যরাও ছিলো অপেক্ষাকৃত বেশী পারদর্শী। তিনি স্কিয়িং এবং কুকুরের স্লেজ গাড়ী সম্পর্কেও অনেক বেশী বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন।

অ্যামুণ্ডসেন তাঁর অভিযান শুরু করেছিলেন 'বে অব হোয়েলস্' থেকে। তবে যে পথ দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন সে পথটা ছিলো স্কটের চেয়েও ৯৬ কিলোমিটার কম। তাছাড়া তারা কেউই স্কটের দলের মতো ভারী ভারী মালপত্র বোঝাই স্লেজ টেনে শক্তি ব্যয় করেননি। এমনকি তারা পায়ও হাঁটেননি কখনো। গোটা পথটাই গেছেন স্লেজ গাড়ীতে চড়ে।

অ্যামুণ্ডসেনের দলে ছিলেন ৪ জন সঙ্গী এবং বাহান্নটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। পথে অবশ্য কিছু কুকুরকে মেরে তাদের মাংসকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয়েছিলো।

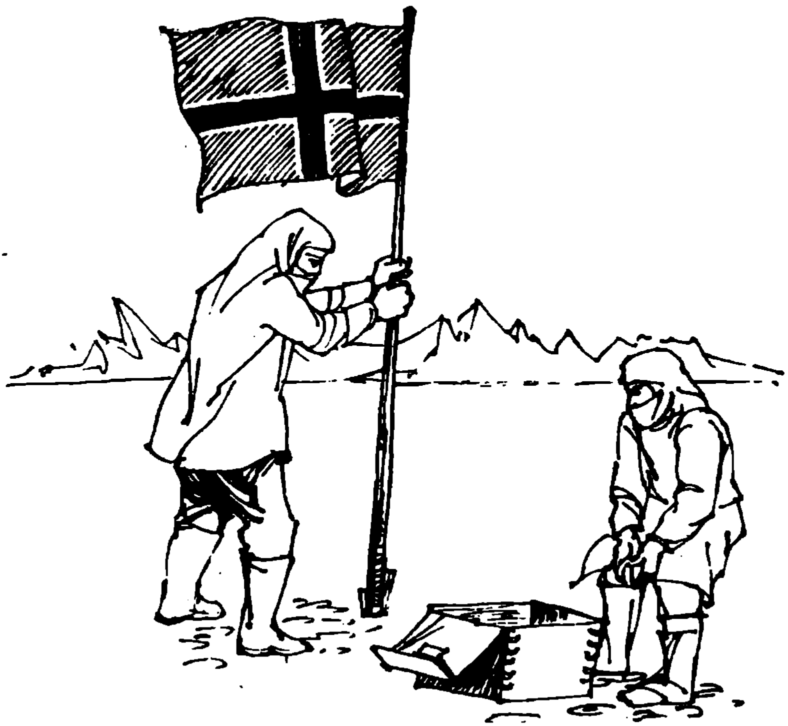

দক্ষিণ মেরুতে বিজয় পতাকা পুঁতছেন অ্যামুণ্ডসেন



www.nagorikpathagar.org

অ্যামুণ্ডসেন যে পথে গিয়েছিলেন সে পথ ছিলো এ্যাক্সেল হাইবার্গ হিমবাহ ধার। এপথে এর আগে আর কেউ মেরুতে যাবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তিনিই প্রমাণ করলেন এটা অনেক সহজ পথ। আর দৈর্ঘ্যেও অনেক কম।

এই পথে গিয়েই তিনি ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে পৌঁছতে সক্ষম হন তাঁর লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে।

তিনি মেরু বিন্দুতে উড়িয়ে দেন জয়ের পতাকা। সংলগ্ন এলাকার নাম দেন নরওয়ের রাজা হোকানের নামে। শেষ তাঁবুতে রাজার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে তিনি স্কটকে অনুরোধ করেছিলেন—যদি পথে কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়, তবে তিনি যেনো তার এই সংবাদ রাজার কাছে পৌঁছে দেন।

দক্ষিণ মেরু থেকে ফিরতে অ্যামুণ্ডসেনের সময় লেগেছিলো মোট ৩৮দিন। মোট ৮৩ দিনের এই অভিযানে ১২টি কুকুর এবং প্রচুর বাড়তি খাবার নিয়ে তিনি নিরাপদে ফিরে আসেন মূল ঘাটিতে।

এর পরেও তিনি এলসওয়ার্থের সাথে সর্ব প্রথম বিমানে করে দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুও হয়েছিলো বীরের মতো। ১৯২৮ সালে 'ইটলিয়া' নামে একটি অভিযাত্রী বিমান ফেরার পথে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি দুর্ঘটনায় পড়ে। এই দুর্ঘটনার পতিত বিমানের অভিযাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে ছিলেন অ্যামুণ্ডসেন।

এখান থেকে ফেরার পথেই তিনি আরেক দুর্ঘটনায় পড়ে বীরের মতো প্রাণ দেন।

## ডগলাস ম্যাসন

দক্ষিণ মেরুর অভিযানের আরেক দুঃসাহসী অভিযাত্রী ছিলেন ডাক্তার ডগলাস ম্যাসন (১৮৮২-১৮৫৮। এই ডাক্তার ম্যাসনের অভিযান-কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর।

ডাক্তার ম্যাসন তাঁর অভিযান শুরু করেছিলেন ১৯০৯ সাল থেকে। এই অভিযানে তাঁর বিশিষ্ট সাথীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডেভিড ও ডাক্তার ম্যাকে।

তিনি অসীম সাহসে ভর করে তাঁর সাথীদের নিয়ে বরফে ঢাকা প্রান্তরের উপর দিয়ে হেঁটেই দক্ষিণ দিকে রওনা দিলেন।

অবশেষে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে তাঁরা ম্যাগনেটিক গোল নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। এই জায়গাটার অবস্থান হলো– ৭২ ডিগ্রী ২৫ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশে।

এই অভিযানে ডাক্তার ম্যাসনও ভয়ানক বিপদের সম্মুখী হয়েছিলেন। বলতে গেলে প্রতি মুহূর্তেই বিপদ এসে সামনে দাঁড়াতে লাগলো তার।

কখনো সামনে বরফের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, কখনো চোখ ধাঁধাঁনো খাদ। কোনো কোনো স্থানে আবার চোরা খাদও আছে। উপরটা দেখলে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

বরফ জমে সমান হয়ে আছে। কিন্তু পায়ের সামান্য চাপ পড়লেই, পাতলা আবরণ ভেংগে একেবারে খাদে পড়ে যেতে হবে। সেও আবার যে সে খাদ নয়: কোনো কোনো খাদ দেড়শো থেকে হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর। সেখানে পড়লে আর রক্ষে নাই।

ডাক্তার ম্যাসন একবার একটা ভয়ানক বিপদে পড়েছিলেন।

সঙ্গীদের সাথে হেঁটে চলেছেন, এমনি সময় তাঁর ডান পায়ের নিচেকার বরফের একটা চাঁই ভেঙো গেলো। আর তিনি নিজের তাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজী খেয়ে



www.nagorikpathagar.org

পড়ে গেলেন খাদে। একেবারে দশ বারো ফুট নিচে।

পড়বার সময় তিনি চট করে শ্লেজ গাড়ীর রশিটা ধরে ফেললেন। সুতরাং সেই রশি ধরেই ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু অবাক হবার কাণ্ড। অন্যসব লোক হলে রীতিমত ঘাবড়ে যেতেন। দুঃসাহসী ম্যাসন মোটেও ঘাবড়ালেননা। বরং তিনি আরো অবাক কাণ্ডকারখানা করতে শুরু করে দিলেন।

খাদে পড়ে গিয়ে, সেই রশি ধরে ঝুলতে ঝুলতেই ম্যাসন লক্ষ্য করলেন যে নীচের বরফের জমাট-বাঁধা স্তরে স্তরে কিসব অদ্ভুত পাথর।

তিনি নিজের বিপদ ভুলে গিয়ে সেই ভয়ানক অবস্থাতেই নমুনা সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং সেগুলো সংগ্রহ করে খাদের তীরে দাঁড়ানো তাঁর সাথীদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

এগুলো পরে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। সংগীরা দলনেতার কীর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পরে অবশ্য অনেক কষ্টে তাঁকে টেনে তোলা হলো।

এরপর ১৯১২ সালে তিনি দু'দল কুকুর সাথে নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন দ্বিতীয়বারের অভিযানে। এই অভিযানে তাঁর সাথী ছিলেন জেভিয়ার মার্জ এবং লেফটেন্যান্ট নিনিস।

এই অভিযানই ছিলো তাঁর সব চেয়ে বিপদসংকুল ও রোমাঞ্চকর।

ম্যাসন তাঁর সাথীদের নিয়ে যখন অভিযানে পা বাড়ালেন, তখনি ছিলো পথে পথে জমাট বাঁধা বরফ। কোথাও বা তুষারের পাহাড় জমে আছে। হয়তো প্রচণ্ড ঝড়ে এই তুষারের ধুলোকে এক স্থানে সুপ্ত করে রেখেছে।

এরই মধ্যে মধ্যে চোরা খাদ। মরণ ফাঁদ। খুব সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে তাঁদের এমনি সাবধানে পথ চলতে চলতে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ দিনে তাঁরা মাত্র তিনশো পনেরো মাইল অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এতো সাবধানে পথ চলেও তাঁরা বিপদকে এড়াতে পারলেন না। অকস্মাৎ বিপদ ঘনিয়ে এলো ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে। দলের অন্যতম সংগী লেফটেন্যান্ট নিনিস স্লেজ গাড়ীতে যাবতীয় মালামাল বোঝাই করে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু সহসা ওই গাড়ীসুদ্ধ পড়ে গেলেন বিরাট খাদে।

একেবারে একশো দেড়শো ফুট নিচে পড়ে গেছে। নিচে রশি নামিয়ে দিয়ে যে নিনিস'কে বাঁচাবেন তারও কোনো উপায় নেই। এতো লম্বা রশিই তাঁদের সাথে নেই।

তবু ম্যাসন তাঁর সংগী জেভিয়ার্স মার্জকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কোনো মতে নিনিসকে বাঁচানো যায় কিনা। কিন্তু প্রায় সারা দিন চেষ্টা চালিয়েও কোনো ফল হলো না।

দুপুর নাগাদ প্রায় শ দেড়েক ফুট নিচে মাঝে মাঝে কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেলো। তারপর দুপুর গড়িয়ে পড়তেই তাও শোনা গেলো না। হয়তো ততক্ষণে তুষার সমাধি হয়ে গেছে।

এমনি করে নিনিসের মতো একজন দুঃসাহসী সাথী চিরদিনের জন্য তুষারের রাজ্যে হারিয়ে গেলো।

এই দুর্ঘটনায় তাঁরা যে শুধু নিনিসের মতো একজন সাথীকেই হারালেন তাই নয় অন্যদিক দিয়েও দারুণ ক্ষতি হলো।

হারিয়ে যাওয়া এই গাড়ীটাতেই বোঝাই করা ছিলো অভিযানের প্রায় যাবতীয় মালপত্র, খাবার দাবার, তাঁবু, তাঁবুর খুঁটি, রান্না করার সাজ-সরঞ্জাম এবং আরো



www.nagorikpathagar.org

রাস্তা তৈরি করছেন ম্যাসন

খুটিনাটি অনেককিছু।

এই গাড়ীটা একটু ভারী বলে দলের সেরা-সেরা কুকুরগুলোকেও এই গাড়ীটার সাথেই বাঁধা হয়েছিলো।

কিন্তু এখন সবাইতো নিনিসের সাথে তুষার সমাধি হয়ে গেলো।

কিন্তু এতো বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও তাঁর ম্যাসন যাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করলেন না। যা অবশিষ্ট ছিলো তাই নিয়েই আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করলেন।

কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই কুকুরগুলো একে একে মারা পড়তে লাগলো। কুকুরগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর গোটা শ্লেজ গাড়ীটাকেও ফেলে দিতে হলো। তাছাড়া আর উপায় কি? টানবে কে গাড়ী? ম্যাসন আর সাথী জেভিয়ার্স মার্জ দু'জনে হেটেই চলতে শুরু করলেন। এই বরফের রাজ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এই কষ্ট সহ্য হলো না মার্জের। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখ তার ক্রমে বাড়তেই লাগলো। ওষুধ নেই, খাবার নেই। এই অবস্থাতে প্রায় দুদিন ধুকে-ধুকে অবশেষে তৃতীয় দিনের মাথায় মার্জ বরফের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেলেন।



www.nagorikpathagar.org

এবার শুধু রইলেন ম্যাসন একা। বিজন মহাদেশের হিমশীতল ধু-ধু বরফের প্রান্তরে সহায়হীন সম্বলহীন একটি মানুষ।

এমনি অবস্থাতেও অসীম সাহসী ম্যাসন কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর ভয় ধরে গেলো। হয়তো তাঁকেও সাথীদের মতোই হতে হবে। হয়তো আর সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

অতঃপর পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যাসন। তিনি যখন ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর হাতে সম্বল শুধু গোটা কয়েক কিসমিস আর একটি কুকুরের মৃতদেহ।

হয়তো এই মৃত কুকুরের মাংস খেয়েই তাঁকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। নিজের প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টার কি ভয়ানক মূর্তি, শুনলেও গা শিউরে উঠে।

পিছু ফিরে অনেক দূর আসার পর তাঁর ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হলো। সামনেই চোখে পড়লো একটি পরিত্যক্ত তাঁবু। হয়তো কোনো অভিযাত্রীরা এদিকে এসেছিলেন। ওরা তাঁবু ফেলেই কোনদিকে চলে গেছেন। তিনি এই পরিত্যক্ত তাঁবুতে এস আশ্রয় নিলেন। সেখানে কিছু খাদ্য, কিছু রসদও পেলেন।

বলতে গেলে এই পরিত্যক্ত তাঁবুই তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলো। এখানে এ সময় যদি অশ্রয় না পেতেন তবে হয়তো আর জীবন নিয়ে স্বদেশে ফেরা তাঁর ভাগ্যে ঘটে উঠতোনা।

অবশেষে বহুকষ্টে, বহু বিপদ অতিক্রম করে ম্যাসন তাঁর ঘাঁটিতে ফিরে এলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো আরেক বিপদ, আরেক বিস্ময়।

তিনি ঘাঁটিতে এসেই শুনলেন তাঁর জাহাজ তাঁকে ফেলেই স্বদেশে ফিরে গেছে। জাহাজে, অবস্থানকারী লোকদের ধারণা হয়েছিলো, হয়তো প্রেরিত অভিযাত্রীদল আর জীবিত নেই। সুতরাং তাদের জন্য বসে বসে খাদ্য নিঃশেষ করার কোনো মানে হয় না।

তবে তারা একেবারে আশা ত্যাগ করে যায় নি। এখানে রেখে গেছে পাঁচজন লোক। আর কিছু পরিমাণ খাবার।

ম্যাসন বুঝলেন অভিযানে বের হয়ে ফিরতে তাঁদের অকে বেশী দেরী হয়ে যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অতঃপর তিনি গোটা শীতের সময়টা তাঁবুতেই কাটিয়ে দিলেন।

জাহাজ আবার খাদ্য সামগ্রী বোঝাই করে ফিরে এলো ১৯১৪ সালের বসন্তকালে। এই জাহাজেই ফিরে এলেন ম্যাসন। পেছনে পড়ে রইলো তাঁর প্রিয় সহযাত্রী। যারা আর কোনোদিন সভ্যজগতের আলো দেখতে পাবে না।

ম্যাসনের এই যাত্রা সফল না হলেও তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ কর এনেছিলেন। বলতে গেলে তাঁর মতো এতো বেশী আর এতো মূল্যবান তথ্য এর আগে কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি।

তারপর কেটে গেছে কতো যুগ। এর পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অভিযাত্রীরা যান্ত্রিক বলে বলীয়ান হয়ে দক্ষিণ মেরু বিন্দুর সেই দুর্গম স্থানে পদচারণা করেছেন বহুবার। আবিষ্কার করেছেন আরো কতো অজানা বিচিত্র রহস্যময় স্থান।

তবুও এ্যান্টর্কটিকা মহাদেশের অভিযানের কাহিনী আজো শেষ হয়নি, আজো মানুষ এই রহস্যময় দেশটিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। আজো চেষ্টা চলছে এর প্রতিটি প্রান্তর, প্রতিটি রহস্য সম্পর্কে জানবার। চেষ্টা চলছে এর সম্পদ, এর মাটিকে সভ্য



www.nagorikpathagar.org

মানুষের কাজে লাগাবার।

কে জানে এর রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে হয়তো বিজ্ঞানেরও অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান মিলতে পারে। ইতিমধ্যেই এ ধরনের কিছু কিছু প্রশ্নের সমাধান নিয়ে গবেষণাও চলছে।

## ভূ–তাত্ত্বিক পরীক্ষা অভিযান

এ্যান্টার্কটিকায় এসব বীরত্বপূর্ণ অভিযানের প্রায় শেষের দিক থেকেই শুরু হয় আরেক ধরনের অভিযান, এসব অভিযানের উদ্দেশ্য যেমন ছিলো ভিন্নতর, পদ্ধতি এবং

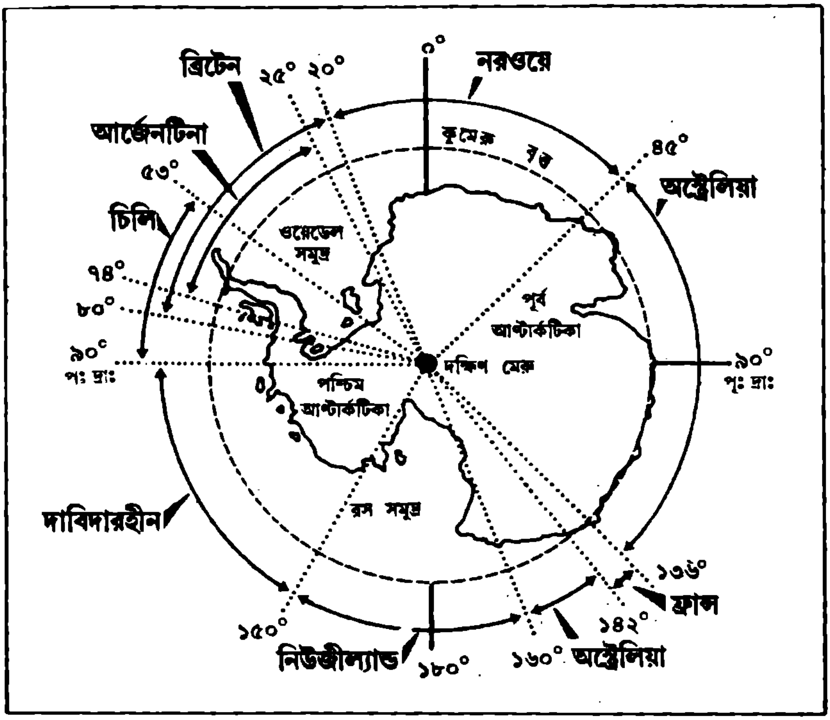

আণ্টার্কটিকা চুক্তির আগে বিভিন্ন দেশের দাবী আণ্টার্কটিকার জমি দখল করার উদ্দেশ্যে

উপকরণও ছিলো উন্নততর এবং অধুনিক। বলতে গেলে এ্যান্টার্কটিকা অভিযানের এখান থেকেই আধুনিক যুগের শুরু।

এই আধুনিক যুগের অভিযানগুলোর মূল লক্ষ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার অভিযানের নেতাদের কারো মেরু বিজয়ের দুর্দমনীয় আকাংক্ষা নেই। অভিযানের দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বিশ্ব জুড়ে বাহবা কুড়াবার বাসনাও নেই।



www.nagorikpathagar.org

এসব অভিযানের লক্ষ্য হলো এ্যান্টার্কটিকায় ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চালানো আর না হয় এর অভ্যন্তরে লুকানো সম্পদের অন্বেষণ।

এসব অভিযানে শুরু থেকেই যেসব দেশ অংশ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া ও নরওয়ে প্রভৃতি।

বৃটেন ১৯২৫ সালে এই এ্যান্টার্কটিকায় বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে স্থাপন করে একটি কমিটি। যার নাম দেয়া হয়েছে ডিসকভারি কমিটি (Discovery Committee)।

বৃটেন তার এই ডিসকভারি কমিটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোটে ১৩টি বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়েছে।

সর্বপ্রথম বিমান নিয়ে যিনি অভিযান পরিচালনা করেন তিনি হলেন অষ্ট্রেলিয়ার জর্জ হ্যবার্ট উইলকিন্স। তিনি এই অভিযান চালিয়েছিলেন-- ১৯২৮-২৯ সালে। তিনি এই অভিযানে গিয়ে বিমানে এ্যান্টার্কটিকার অনেক দুর্গম অঞ্চলের ছবিও তুলে এনেছিলেন।

কিন্তু বিমান নিয়ে যিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরু ঘুরে আসার অর্থাৎ মেরু বিজয় করার গৌরব অর্জন করেন তিনি হলেন আমেরিকার বিখ্যাত বৈমানিক রিচার্ড বায়ার্ড। তিনি এই অভিযান পরিচানা করেছিলন ১৯২৯ সালে।

শুধু মেরু বিজয়ই নয়, তিনি তারপরও বিমানে করে আরো অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আমেরিকা পশ্চিম এ্যান্টর্কটিকার বে অব হোয়েলস এর কাছে স্থাপন করেছে একটি অভিযান মূল কেন্দ্র।

বায়ার্ড এই কেন্দ্রে ছিলেন তিন বছর। এই কেন্দ্র থেকে তিনি বহুবার বিমানে করে অভিযান চালিয়ে ছিলেন এ্যান্টার্কটিকার সারা পশ্চিম অঞ্চলে।

বলতে গেলে এই দুর্গম অঞ্চলটি তাঁরই আবিষ্কার। তাই তিনি এই এলাকাটির নাম রাখেন তার স্ত্রীর নামানুসারে মেরী বায়ার্ড ল্যাণ্ড (Marry Bayard Land)

এই বায়ার্ড সাহেব অমেরিকার একটি মস্তবড় সমীক্ষা দলের নেতা হয়ে আবার ১৯৩৩ সালে এ্যান্টর্কটিকাতে আসেন এবং এই অভিযানে এসে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত একটানা বাস করেন।

এ সময় এ্যান্টর্কটিকার আবহাওয়া, ভূ-তত্ব, ভূ-চৌম্বকত্ব এবং অরোরার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করেন।

এই দলের অন্যতম খ্যাতনামা ভূ-তত্ত্ববিদ লরেন্স গোল্ডের (Larance gold) নেতৃত্বে একটি উপদল ট্রান্স এ্যান্টার্কটিক পর্বতমালায় চালান সমীক্ষা। তারা এখানকার পাথর, কয়লা এবং ফসিলের অনেক মূল্যবান নমুনা গ্রহণ করেন।

তারা রস সাগরেও সমীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন।

সেই সময় আমেরিকার দাবীকৃত এ্যান্টর্কটিকার অঞ্চলে লিটল আমেরিকা থেকে একশ ষাট কিলোমিটার দূরে খোলা হয় একটি আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র। এর অবস্থান ছিলে ৮০$^{\circ}$ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে। নাম দেয়া হয়েছিল বলিং।

বলিং কেন্দ্রে এসে সমীক্ষা চালান স্বয়ং বায়ার্ড সাহেব। তিনি গোটা শীতকালটা অবস্থান করেছেন এই বলিং কেন্দ্রে। এটা ছিলো সত্যি এক দুঃসাহসিক এবং বিপজ্জকক কাজ।

শীতকালটা এখানে থাকে আবহা অন্ধকার। সূর্যের আলো নেই। তদুপরি অবিশ্বাস্য



www.nagorikpathagar.org

রকম শীতলতা। সেযে সত্যি কী ভয়াবহ পরিবেশ তা এই স্বাভাবিক আবহাওয়ায় থেকে আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

এই ভয়ংকর অবস্থায়ও বায়ার্ড সাহেব এ কেন্দ্রে দীর্ঘ পাঁচ মাস সম্পূর্ণ একা অবস্থান করেছিলেন।

এজন্য তাকে অনেকবার চরম বিপদেও পড়তে হয়েছিলো। একবারতো মনোক্সাইড বিষয়ের ক্রিয়ায় তিনি প্রায় মরতেই বসেছিলেন।

তিনি ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অসুস্থতার কথা মূল শিবিরকে জানাননি।

মূল শিবিরের সাথে যোগাযোগ হতো একমাত্র বেতারের মাধ্যমে। এ সময়েই মূল শিবির থেকে তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারেন যে তিনি প্রকৃতিস্থ নেই। নিশ্চয়ই তার অঘটন একটা কিছু ঘটেছে। তখন মূল শিবির থেকে একটি উদ্ধারকারী দল এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দীর্ঘ কয়েকমাস হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, তার চিকিৎসকগণ বলেছিলেন—তাকে যদি আর মাত্র দিন কয়েক পরে আনা হতো তা হলে আর জীবনের আশা ছিলোনা।

তারপর নরওয়েও বেশ কয়েকবার বিজ্ঞান ভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এ্যান্টার্কটিকাতে। এইসব অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে।

নরওয়ের অভিযাত্রীরা ভূ-তাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনার সাথে সাথে বেশ কয়েকটি অঞ্চলও আবিষ্কার করেছিলেন।

তবে নরওয়ের এই অভিযানগুলোর সবগুলোই পরিচালিত হয়েছিলো ব্যাক্তিগত উদ্যোগে। অভিযানগুলো চালিয়ে ছিলেন বিখ্যাত তিমি ব্যবসায়ী লারস ক্রিষ্টেনশন।

এসব অভিযানের অন্যতম দলনেতা ছিলেন রিজার লারসন। লারসন ছিলেন দক্ষিণ মেরুজয়ী অভিযাত্রী অ্যামুণ্ডসেনের একজন সহযোগী।

নরওয়ের অভিযানের একটি মস্তবড় রেকর্ড হলো ১৯৩৫ সালে এই নরওয়েরই একটি দলে সর্বপ্রথম চারজন মহিলা সদস্য নেয়া হয়। এ্যান্টার্কটিকায় এটাই প্রথম মহিলার পদার্পণ।

এখানে একটা কথা হলো এপর্যন্ত যেসব বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলোর সীমারেখাই ছিলো সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। তারা কেউ দেশটির অভ্যন্তরভাগে যেতে পারেননি।

তাই আমেরিকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রী লিংকন এলসওয়ার্থ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজের চেষ্টাতেই এবার এ্যান্টর্কটিকার অভ্যন্তরে অভিযান চালাবেন। তিনি আরো সিদ্ধান্ত নিলেন এর জন্য কোনো সরকারী সাহায্য নেবেন না। সম্পূর্ণ নিজের খরচে নিজেই যাবেন অভিযানে।

অতপর তাই হলো। তিনি নিজের উদ্যোগেই একজন মাত্র সংগী নিয়ে বিমানে করে চললেন দুর্গম অঞ্চলে অভিযানে। তিনি বিমানে এ্যান্টর্কটিকা উপদ্বীপ থেকে উড়ে মহাদেশটির অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিলেন। এটাই বিমানে চড়ে একটানা এ্যান্টর্কটিকা



www.nagorikpathagar.org

পাড়ি দেওয়ার প্রথম রেকর্ড।

এই অভিযানে তিনি মহাদেশটির অন্যপ্রান্তে একটি অজ্ঞাত পর্বতমালাও আবিষ্কার করেন। নিজের পিতার নামানুসারে এর নাম রাখেন এলসওয়ার্থ ল্যাণ্ড।

উল্লেখ্য যে, এর পাশেই রয়েছে এ্যান্টার্কটিকার উচ্চতম পর্বতমালা সেন্টিনেল রেঞ্জ (১৬ হাজার ৮০০ ফুট)। এই অভিযানে তিনি বহুবার বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য মারত্মক ঝুঁকি নিয়েও বিমান অবতরণ করাতে হয়েছিলো। তিনি এমন সব দুর্গম অঞ্চলে বিমান নামিয়েছিলেন যেখানে যেতে আধুনিক মানের উচ্চ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বৈমানিকরাও সাহস করেননা।

এ সময় আরো কয়েকটি দলও অভিযানে এসেছিলেন এখানে। তাদের মধ্যে ছিলেন বৃটিশ, জার্মান ও আমেরিকার কয়েকটি দল।

এরপরই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক কারণেই অভিযান চালানোর ব্যাপারে মন্থরতা আসে।

অভিযান চালানো থেমে গেলেও কিন্তু এ্যান্টার্কটিকার বুক নীরব হয়ে যায়নি। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রেশ সেই সুদূর এবং নির্জন চিরতুষারের দেশে পর্যন্ত এসে পৌছে। এর আশেপাশেও শুরু হয়ে যায় যুদ্ধের তোড়জোড়।

জার্মান এই চিরতুষারের দেশেই স্থাপন করে একটি নৌঘাটি। তারা এখানে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে। এই ঘাটি থেকে অভিযান চালিয়েই হিটলার বাহিনী নরওয়ে এবং মিত্রবাহিনীর বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে বৃটিশ বাহিনীও জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজ পেঙ্গুইনকে ডুবিয়ে দেয় ১৯৪১ সালের মে মাসে।

শুধু তাই নয়, জার্মান বাহিনী যখন নরওয়ে দখল করে তখন হিটলার এই এ্যান্টার্কটিকারও সম্পূর্ণ মালিকানা দাবী করে বসেন। তার যুক্তি ছিলো যেহেতু নরওয়ের অধিবাসী অ্যামুণ্ডসেনই দক্ষিণ মেরুবিন্দু বিজয় করেছেন, তাই এ্যান্টার্কটিকার সম্পূর্ণ দাবীদারও নরওয়ে। আর এখন যখন নরওয়ে জার্মানীরই উপনিবেশ, তাই এ্যান্টার্কটিকার মালিকও জার্মান। যুক্তিটা কৌতূহলোদ্দীপক নিঃসন্দেহে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে সারা পৃথিবী শান্ত হয়ে গেলে আবার সকলের চোখ পড়ে এ্যান্টার্কটিকার দিকে।

আবার শুরু হয় অভিযান একের পর এক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষের দিকে ১৯৪৩ সালে বৃটিশরাও ঘাটি স্থাপন করে এ্যান্টার্কটিকাতে। ঘাটি স্থাপিত হয়েছিলো মূলতঃ সামরিক উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য ছিলো নাৎসী বাহিনীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং এ্যান্টার্কটিকার অঞ্চল দখল করা।

অবশ্য এই সামরিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি একটা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাও ছিলো। এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অংশের নেতৃত্বে ছিলেন অভিযাত্রী শ্যাকলটনের সহযোগী ও ভূ-বিজ্ঞানী জেমস ওয়ার্ড। তিনিই সামরিক অভিযানের পাশাপাশি নিজের সুবিধামতো চালিয়েছিলেন। ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা। আর তারই কারণে পরবর্তী সময়ে এই সামরিক ঘাটিগুলো যুদ্ধের পরে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়।



www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ মেরু বিন্দুতে স্থাপিত আধুনিক গবেষনা কেন্দ্র

বৃটিশরা এমন দুটো কেন্দ্র খোলে লকবয় এবং ডিসেপ্‌শন্ দ্বীপে এবং পরের বছর (১৯৪৪ সাল) হোপ উপসাগরেও খোলে আর একটি অনুরূপ কেন্দ্র।

এই কেন্দ্রগুলোকেই পরবর্তী সময়ে ফকল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস ডিপেডেন্সী সার্ভে (Faklabd Island Survay Dependency) সংস্থা বলে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রকল্পের অধীনেই এ্যান্টার্কটিকায় চালানো হয় ভূ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং আবহাওয়াতত্ত্ব। আরো পরে এই সংস্থাটিই বৃটিশ এ্যান্টার্কটিক সার্ভে (British Antanrrktic) রূপে উন্নীত হয়। এই সংস্থাটি বৃটিশদের পক্ষে আজো এ্যান্টার্কটিকাতে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এ্যান্টার্কটিকাতে শুরু হয় ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা অভিযান। সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতায় চলে এসব বড় বড় অভিযান।

১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা করে সর্বকালের একটি বৃহত্তম অভিযান। এ অভিযানের কর্মীর সংখ্যাই ছিলো প্রায় ৪০০০ জন এবং জাহাজের সংখ্যা ছিলো ১৩টি। এতোবড়ো অভিযান এর আগে আর কখনো চালানো হয়নি। আর এই অভিযানের



www.nagorikpathagar.org

নেতা ছিলেন এ্যান্টার্কটিকার বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত মিঃ রিচার্ড বায়ার্ড।

বায়ার্ডের নেতৃত্বে সুযোগ্য কর্মী বাহিনী উড়োজাহাজ এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে এ্যান্টার্কটিকার বিভিন্ন দুর্গম ও এযাবৎকালের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন।

এই সময় শুধু সরকারী উদ্যোগে নয়, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারীদলও এসেছিলো এ্যান্টার্কটিকায়। দলটি এসেছিলো ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রধান নেতা ছিলেন ফিন রন।

এই বেসরকারী দলে দুজন মহিলা অভিযাত্রীও ছিলেন। তারা হলেন দলনেতা রনের স্ত্রী এডিথ রন এবং সহনেতা ডালিংটনের স্ত্রী জেনি ডালিংটন।

ওরা গোটা শীতকালটাই কাটিয়েছিলেন এ্যান্টার্কটিকাতে।

উল্লেখ্য যে, মেয়ে অভিযাত্রীদের মধ্যে ওরাই প্রথম শীতাকলে এ্যান্টার্কটিকায় কাটিয়েছিলেন।।

তারপর রিচার্ড বায়ার্ড আবার এ্যান্টার্কটিকাতে আসেন ১৯৫৫-৫৬ সালে। এই সময় তিনি অপারেশন ডিপফ্রীজ এর দলনেতা হয়ে এসেছিলেন।

তাই অভিযানে দলের সাহসী অভিযাত্রী মিঃ কনরাড শীন একটি স্কী বিমান নিয়ে মেরুবিন্দুতেও অবতরণ করেছিলেন। কনরাড সীনের এই স্কী বিমানটির নাম ছিলো ভারী মজার।

বিমানটির নামছিলো 'কে সেরা সেরা'। এর অর্থ হলো 'যা হবার তাই হবে'।

১৯১২ সালে অর্থাৎ আজ থেকে (১৯৫৬) চুয়াল্লিশ বছর আগে সেখানে এসে ভগ্নহৃদয় স্কট মেরুবিজয়ী অ্যামুণ্ডসেনের উড্ডীন পতাকা দেখতে পেয়েছিলেন। কনরাড সীন সাহেবকে দেখতে পেয়েছিলেন কনরাড সীন সাহেব তার বিমানটিও সেখানেই নামিয়েছিলেন।

এ্যান্টার্কটিকায় অভিযানের ইতিহাসে ১৯৫৭-৫৮ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এপর্যন্ত এ্যান্টার্কটিকাতে যে সমস্ত অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তার অধিকাংশ গুলোই কোনো না কোনো দেশের বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তির উদ্যোগে।

এসব অভিযানে সরকারী বা বেসরকারী যা-ই হোক সেখানে মাত্র একটি দেশই জড়িত ছিলো। এই ১৯৫৭-৫৮ সালেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে অনেকগুলো দেশের যৌথ সহযোগিতা ও উদ্যোগে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

এজন্য এই বছরকে বলা হয় 'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বছর'।

এ যৌথ অভিযানে প্রথম যে ১২টি দেশ অংশ নিয়েছিলো সেগুলো হলো — আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র।

ব্যাপকভিত্তিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলো এ্যান্টার্কটিকাতে মোট ৫৫টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থাপন করে ৮টি এবং যুক্তরাষ্ট্র ৮টি কেন্দ্র খোলে।

এই সময় বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা হাতে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে কাজ করেছেন প্রকৃতির এক বিস্ময়কর রাজ্যে।

এই সময়ে সবচেয়ে সাড়াজাগানো অভিযান চালিয়ে ছিলেন হিমালয়ের শৃঙ্গ বিজয়ী



www.nagorikpathagar.org

এডমণ্ড হিলারী এবং ভিভিয়ান ফক্স্। এরাই প্রথমে মাটি দিয়ে এ্যান্টার্কটিকার এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

এ্যান্টার্কটিকার এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাবার প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী শ্যাকলটন। শ্যাকল্টন ভেবেছিলেন তিনি পায়ে হেঁটেই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করবেন, কিন্তু তার সেই স্বপ্ন সেদিন সফল হয়নি।

এই ঘটনারই ৪৪ বছর পরে শ্যাকলটনের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিলেন এডমণ্ড হিলারী।

তবে হিলারী একেবারে পায়ে হেটে যাননি। এই দুর্গম পথ যাত্রায় তার সহায় ছিলো সর্বাধুনিক যানবাহন- স্নোটোক্টর।]

এই যাত্রায় শুধুমাত্র যানবাহন ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই সারা অনুসরণ করলেন শ্যাকলটনকে। শ্যাকল্টন তার যাত্রায় সেখান থেকে যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা করছিলেন ফুকস ও এই ওয়েডেল সাগরের দিক থেকেই শুরু করলেন যাত্রা।

এই অভিযানে তারা মূল শিবিরের নামও রাখলেন শ্যাকল্টন বেস।

অপর দিকে এডমণ্ড হিলারী যাত্রা করলেন রস সাগরের কেপ ইভাকন্স বা স্কটের মূল শিবির থেকে।

তারপর তারা দুজন দুদিক থেকে এসে মিলিত হলেন—ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে। অ্যামুণ্ডসেন স্কট কেন্দ্রে।

তারপর সবাই মিলে আবার ফিরে এলেন রস সাগারের স্কটের মূল শিবিরে।

উল্লেখ্য যে এই স্কটের মূল শিবিরেই বর্তমানে আমেরিকা স্থাপন করেছে তার মূল গবেষণা কেন্দ্র। এই স্থানটির নাম হলো—ম্যাকমার্ডো (Mackmardo)।

এডমণ্ড হিলারী আর ভিভিয়ান ফকস শুধু অভিযান চালাননি। এই অভিযানের সময় তারা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাও চালিয়েছিলেন। দুজনেই সংগ্রহ করেছিলেন অনেক ভূতাত্ত্বিক নমুনা। এদের এসব নমুনা ও তথ্য থেকে মহাদেশটির উপর প্রোথিত বরফের পুরুত্ব এবং এর অভ্যন্তরেরও একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

এই সম্মিলিত গবেষণায় কিন্তু সুফল পাওয়া গিয়েছিলো অনেক; পাওয়া গিয়েছিলো অনেকগুলো নতুন এবং মূল্যবান তথ্য।

এর ফলে সবার মধ্যেই একটা উৎসাহের সাড়া পাওয়া গেলো: তাই যাতে এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চালানো যায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু চুক্তিটি ছিলো মাত্র একবছরের।

যদি আবার যৌথ পরিকল্পনা নিতে হয়, তাহলে আবার নতুন করে চুক্তি করতে হবে।

অতঃপর এই পরিকল্পনা মতোই ১৯৬১ সালে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয় নতুন করে আর একটি চুক্তি।

এই চুক্তিতে প্রধান প্রধান যেসব শর্ত ছিলো সেগুলো হলো—

১. অংশ গ্রহণকারী কোনো দেশই এ্যান্টার্কটিকা কিংবা এর কোনো অংশের উপর মালিকানা দাবী করতে পারবে না।

২. এই গবেষণা বা গবেষণা কার্যক্রম থাকবো সম্পূর্ণ সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। এখানে সদস্য কোনো দেশই এমন কিছু করতে পারবে না যাতে এর পরিবেশ দূষিত হয়।



www.nagorikpathagar.org

৩. এখানে কোনো দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে পারবেনা। অর্থাৎ এমন কিছু করা যাবেনা যাতে এখানকার প্রাণী, উদ্ভিদ কিংবা পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়।

৪. এখানকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থাকাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রত্যেকটি গবেষণা কেন্দ্র থাকাবে সবার জন্য উন্মুক্ত।

৫. এই চুক্তির মেয়াদ হবে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত।

এই এ্যান্টার্কটিকার মালিকানার প্রশ্নটিই হলো বড় ব্যাপার। সেই আদিকাল থেকে অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত এর কোন্ অংশ কে দখল করবে এই নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা।

এই এ্যান্টার্কটিক চুক্তির প্রতিষ্ঠাতা ১২টি সদস্যদেশ হলো আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং যুক্তরাষ্ট্র।

পরে আরো ছ'টি দেশ যোগদান করে। এগুলো হলো- পোল্যাণ্ড, ভারত, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, চীন ও উরুগুয়ে।

ভারত এ্যান্টার্কটিকাতে প্রথম অভিযান পরিচালনা শুরু করে ১৯৮১ সাল থেকে। এই বছরই প্রথম দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাসাগর বিকাশ বিভাগ।

এই ১৯৮১ সনেই ভারত সর্বপ্রথম 'অপারেশন গঙ্গোত্রী' নামে অভিযান চালায় এ্যান্টার্কটিকাতে। পরের বছর ১৯৮২ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম ভারতীয় পতাকা প্রোথিত হয়ে চিরতুষারের দেশে। তারা এ্যান্টার্কটিকাতে দক্ষিণ গঙ্গোত্রীনামে স্থাপন করে একটি স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র। এই গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৮২-৮৩ সালে, দ্বিতীয় অভিযানের সময়।

ভারত এ্যান্টার্কটিকাতে তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করে ১৯৮৩ সালে, এই অভিযানটি স্থায়ী হয়েছিলো ১৯৮৩ সলের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৪ সালের ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। এই অভিযানের দলনেতা ছিলেন ডঃ হর্ষ কুমার গুপ্ত।



www.nagorikpathagar.org

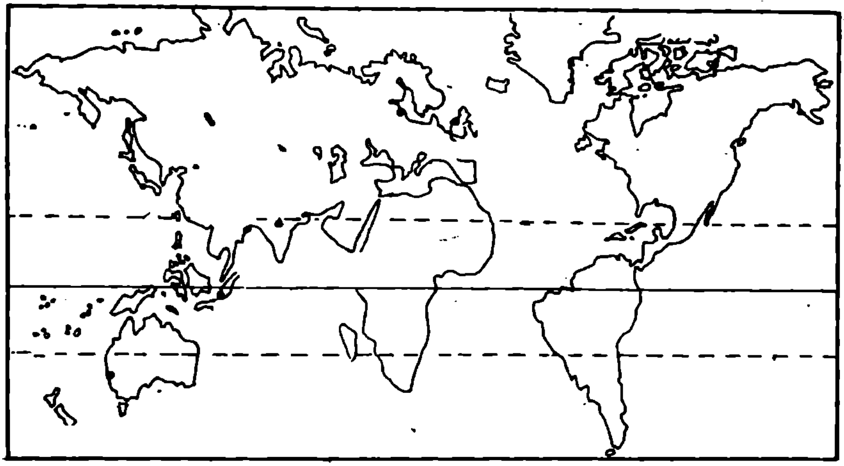

## এক নজরে ভৌগোলিক অভিযান

### আফ্রিকা

১। সিয়েরানিয়ন ভ্রমণ—কার্থেজিয়ান নাবিক হ্যানো খৃষ্টপূর্ব ৫২০ সালে।

২। কঙ্গোনদের মোহনা আবিষ্কার— পর্তুগীজ অভিযাত্রী ডিয়াগো কাও (Diago Cao). ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ।

৩। প্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত গমন—পর্তুগীজ নাবিক বার্তুলোমিউ ডায়াজ (Bartolomiu Diaz). ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ।

৪। গাম্বিয়া নদী আবিষ্কার—স্কটল্যাণ্ডের অভিযাত্রী মাঙ্গোপার্ক (Mungo Park). ১৭৯৫সালে।

৫। প্রথম সাহারা মরুভূমি অতিক্রম—বৃটিশ অভিযাত্রী ডিক্সন দেনহাম ও হুগ ক্লিপার্টন। ১৮২২ -২৩ সালে।

৬। জাম্বেসী নদী আবিষ্কার—স্কটল্যাণ্ডের অভিযাত্রী ডেভিড লিভিং ষ্টোন। ১৮৫১ সালে।

৭। সুদান অবিষ্কার— জার্মান অভিযাত্রী হেনরিচ বার্থ। ১৮৫২-৫৫ সালে।

৮। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার—ডেভিড লিভিংষ্টোন। ১৮৫৫ সালে।

৯। টাংগানিকা হ্রদ আবিষ্কার—বৃটিশ অভিযাত্রী রিচার্ড বার্টন ও জনস্পেক। ১৮৫৮ সালে।

১০। কঙ্গোনদীর উৎস আবিষ্কার—বৃটিশ অভিযাত্রী স্যার হেনরী মর্টন ষ্ট্যানলী। ১৮৭৭ সালে।

### এশিয়া

১১। প্রথম ভারতের পাঞ্জাব আগমন— মহাবীর আলেকজাণ্ডার। খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।



www.nagorikpathagar.org

১২। প্রথম চীন ভ্রমণ— ইণ্ডিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো। ১২৭২ সালে।
১৩। প্রথম তিব্বত ভ্রমণ— ইটালীয়ান ধর্মযাজক অডরিক অব পোরডেনোন (Odoric of Pordenone), ১৩২৫ সালে।
১৪। দক্ষিণ চীন আবিষ্কার—ভেনোটিয়ান পর্যটক নিকোলো ডাই কন্টি (Niccolo dei Conti), ১৪৪০ সালে।
১৫। প্রথম ভারত আগমন—ভাস্কো-ডা-গামা। ১৪৯৮ সালে।
১৬। প্রথম জাপান ভ্রমণ—স্পেনের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। ১৫৪৯ সালে।
১৭। আরব আবিষ্কার—জার্মান অভিযাত্রী কারষ্টেন নেইবার (Carsten Niebuhr), ১৭৬২ সালে।
১৮। চীন আবিষ্কার— জার্মান বিজ্ঞানী ফার্ডিনাণ্ড রিচথফেন (Ferdinand Richthofen) ১৮৬৮ সালে।
১৯। মঙ্গোলিয়া আবিষ্কার—রাশিয়ান অভিযাত্রী নিকোলাই এম প্রিজেভস্কি (Nikolai M. Przhevalsky)। ১৮৭০-৭৩ সালে।
২০। মধ্য এশিয়া আবিষ্কার—সুইডিশ বিজ্ঞানী সেভেন হেডিন (Seven Hedin)। ১৮৯০-১৯০৮।

## ইউরোপ

২১। প্রথম সেটল্যাণ্ড দ্বীপ (Shetland Island) ভ্রমণ— ম্যাসিলার পাইথান। খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে।
২২। আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার— নরওয়ের নাবিকগণ ৮৯০ থেকে ৯০০ সালের মধ্যে।

## উত্তর আমেরিকা

২৩। গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার— নরওয়ের ইরিকসন দি রেড। ৯৮৫ সালে।
২৪। ল্যাব্রাডর, নোভাস্কটিয়া আবিষ্কার— নরওয়ের নাবিক লীফ ইরিকশন। ১০০০ সালে।
২৫। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার—ইটালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ১৪৯২ সাল।
২৬। উত্তর আমেরিকা উপকূল আবিষ্কার— বৃটিশ অভিযাত্রী জনচ্যাবক ১৪৯৭ সাল।
২৭। প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী ভাস্কো নুনেস ডি বালবোয়া (Vasco Nunez de Bolbow) ১৫১৩ সালে।
২৮। ফ্লোরিডা আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী পন্স ডি লেয়ন (Ponce de Leon) ১৫১৩ সাল।
২৯। মেক্সিকো অধিকার— স্পেন সেনাপতি হার্নাডো কর্টেশ (Hernado Cortes) ১৫১৯-২১ সাল।
৩০। সেন্ট লরেন্স নদী আবিষ্কার— ফ্রান্সের নাবিক ম্যাসেজ কাটিয়ার। ১৫৩৪ সাল।
৩১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী ফ্রান্সিস্কো



www.nagorikpathagar.org

করোনাডো (Francisco Coronado) ১৫৪০-৪২ সালে।
৩২। কলরাডো নদী অবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী হার্নাণ্ডো ডি এ্যালারকন (Hernando de Alarcon)। ১৫৪০ সাল।
৩৩। মিসিসিপি নদী আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী হার্নাণ্ডো ডি সোটো (Hernando de Soto). ১৫৪১ সাল।
৩৪। ফ্রবিশার উপসাগার আবিষ্কার—ইংরেজ নাবিক মার্টিন ফ্রবিশার। ১৫৭৬ সাল।
৩৫ জেমসটাউনের পত্তন—ইংরেজ উপনিবেশক জন স্মিথ (John Smith) ১৬০৭ সাল।
৩৬। হাডসন নদী আবিষ্কার—হেনরি হাডসন (Henri Hudson) ১৬০৯ সাল।
৩৭। হাডসন উপসাগর আবিষ্কার—হেনরী হাডসন। ১৬১০ সাল।
৩৮। ব্যাফিন সাগর আবিষ্কার—ইংরেজ নাবিক উইলিয়াম ব্যাফিন। ১৬১৬ সাল।
৩৯। মিসিগান হ্রদ আবিষ্কার—ফ্রান্সের অভিযাত্রী জীন নিকোলেট (Jean Nicolet)। ১৬৩৪ সাল।
৪০। আরকানাস নদী আবিষ্কার—ফ্রান্সের অভিযাত্রী জ্যাকোস মারকুয়েট (Jacques Marquette) এবং লুই জলিয়েট (Louis Jolliet) ১৬৭৩ সালে।
৪১। বেরিং প্রণালী আবিষ্কার—ডেনমার্কের অভিযাত্রী ভাইটাস বেরিং (Vitus Bering)। ১৭২৮ সাল।
৪২। আলস্কা আবিষ্কার— ভাইটাজ বেরিং। ১৭৪১ সাল।
৪৩। কানাডার ম্যাকাঞ্জি নদী আবিষ্কার—বৃটিশ ক্যানাডিয়ান অভিযাত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকাঞ্জি (Sir Alexander Mackenzie)। ১৭৮৯ সাল।
৪৪। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব উপকূলভাগ আবিষ্কার—ম্যারিওয়েদার লেউইশ (Meriwether Leue's) এবং উইলিয়াম ক্লার্ক (William Clark)। ১৮০৮ সাল।
৪৫। আর্কটিক সাগরের উত্তর পূর্ব পথ আবিষ্কার—সুইডেনের অভিযাত্রী নিলস নর্ডেন স্কল্ড (Nils Nordenskold) ১৮১৯ সাল।
৪৬। উত্তর সাগরের উত্তর পথ আবিষ্কার—নরওয়ের অভিযাত্রী বোয়াণ্ড অ্যামুণ্ডসেন। ১৯০৬সাল।

## দক্ষিণ আমেরিকা

৪৭। প্রথম দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ—স্পেনের অভিযাত্রী কলম্বাস। ১৪৯৮ সাল।
৪৮। ব্রাজিল আবিষ্কার—পর্তুগীজ অভিযাত্রী পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রেল (Pedro Alvarez Cabral) ১৫৭০ সাল।
৪৯। পেরু আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro). ১৫৩২-৩৩ সাল।
৫০। আমাজান নদী আবিষ্কার—স্পেনের অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো ওরেল্লানা



www.nagorikpathagar.org

(Francisco Orellana) ১৫৪১ সাল।

৫১। কেপহর্ন আবিষ্কার—পর্তুগীজ নাবিক উইলিয়াম সি স্কটেন (Willem C. Schouten) ১৬১৫ সাল।

ওসেনিয়া

৫২। পপুয়া নিউগিনি আবিষ্কার—পর্তুগীজ অভিযাত্রী জর্জ ডি মেনেসেস (Jorge de Menezes) ১৫২৬ সাল।

৫৩। তাসমেনিয়া আবিষ্কার—পর্তুগীজ নাবিক আবেল জানসজোন তাসম্যান (Abel Janszoon Tasman) ১৬৪২ সাল।

৫৪। নিউজিল্যাণ্ড প্রথম দর্শন করেন এবং নামকরণ করেন আবেল তাসম্যান। ১৬৪২ সালে। এবং প্রথম নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে অবতরণ করেন ক্যাপ্টেন কুক। ১৭৬৯ সালে।

অন্যান্য আবিষ্কার

৫৫। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ আবিষ্কার—মার্কিন তিমি শিকারী নাথানিয়াল পালমার (Nathaniel Palmer) ১৮২০-২১ সাল।

৫৬। উত্তর মেরু বিজয়—আমেরিকান অভিযাত্রী রবার্ট পিয়েরী। ১৯০৯ সাল।

৫৭। দক্ষিণ মেরু বিজয়—নরওয়ের অভিযাত্রী রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন। ১৯১১ সালে।



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# মহাকাশ অভিযান

www.nagorikpathagar.org

## পাখির মতো উড়াল দিতে

মাথার উপরেই আকাশ। এই সীমাহীন আকাশ নিয়ে মানুষের কতো স্বপ্ন। পাখিরা নীল আকাশের বুকে নিজের দুটো পাখা মেলে দিয়ে উড়ে যায় আপন মনে। পাখিদের পাখার সাথে সেই আদিযুগ থেকেই মানুষের মনের পাখনাও মেলতে শুরু করেছিলো।

মানুষ চেষ্টা করেছিলো তারাও পাখির মতো আকাশে উড়তে পারে কিনা। অবশেষে সেই সাধ পূর্ণ হয়েছে। মানুষের সাধ যেমন অনেক, তেমনি সাধ্যও অসীম। ঈশ্বরপ্রদত্ত পাখা নেই বটে, কিন্তু মস্তিষ্কতো আছে। মানুষ সেই মাথার জোরেই পাখনার অভাব পূরণ করেছে। বনের পাখিকে হার মানিয়ে উড়াল দিয়েছে নীল আকাশের বুকে। সেই উড়াল দেয়ার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি রোমাঞ্চকর।

আগেই বললাম, মানুষের সাধ অনেক। তার আকাংক্ষারও শেষ নেই। আকাশে উড়াল দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি। পাখিকে হার মানিয়ে তার তৃপ্তি হয়নি।

তার দৃষ্টি এবার আরো অনেক দূরে। অনেক উপরে। আকাশ ছাড়িয়ে আকাশের বুকে।

ওই যে নীল আকাশ। ধূ ধূ নীল। কোথায় এর শেষ? সেই শেষকে জানবার আকাংক্ষা আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে খুব বেশি করে। আকাশকে জয় করার আকাংক্ষা মানুষকে অস্থির করে তুলেছে।

তাই মানুষ আবারো শান দিতে শুরু করলো তার মস্তিষ্কের ফলায়।

আদিকালের বেলুন জাহাজ কিংবা পরে রাইট ব্রাদার্সের আবিষ্কৃত এরোপ্লেনই হোক এগুলোতো আকাশে ওড়ে বাতাসে ভর করে।

কিন্তু মহাকাশেতো বাতাস নেই। তা হলে সেখানে কিসের উপর ভর করা যাবে? সেখানে তো এরোপ্লেন নিয়ে গেলে চলবে না, এমনকি সর্বাধুনিক কালের কনকর্ড বিমানও যদি হয়—তাও নয়।

তাই মহাকাশে পাড়ি জমাতে হলে আরো দ্রুতগামী যান চাই।

মহাকাশের জন্য বিশেষ মহাকাশ যান দরকার।

## মহাকাশ যাত্রার সমস্যা

মহাকাশে যাত্রার সমস্যা অনেক। উড়োজাহাজ নিয়ে সামান্য উপরের আকাশে উড়ে বেড়াতে পারলেও আরো উপরে উড়ে যাওয়াটা সহজ নয়।

মাটি থেকে যতোই উপরে ওঠা যাবে ততই বাতাস হালকা হতে থাকবে। বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব আছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ মাইল (১৬০ কিলোমিটার) পর্যন্ত। এর পরেই শুরু হয়েছে সীমাহীন অন্ধকার জগৎ।

অবশ্য এই অন্ধকার রাজ্যও একেবারে বায়ুশূন্য নয়। তবে সেখানে যে বায়ু (গ্যাসীয় পদার্থ) আছে, তার অস্তিত্ব খুবই নগণ্য।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে বাতাসের অস্তিত্ব খুবই নগণ্য। যেমন আমাদের সৌরজগতের মধ্যেও ছড়িয়ে আসে গ্যাসীয় পদার্থ—বিশেষ করে হাইড্রোজেন। কিন্তু তার ঘনত্বও খুব কম। যেমন—সৌর জগতের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় রয়েছে মাত্র ১০০০টি হাইড্রোজেন অণু। আর সৌরজগতের বাইরের মহাকাশের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় হাইড্রোজেন অণুর সংখ্যা মাত্র ১০টি।

কিন্তু এই পরিমাণ বায়ুতেতো আর মানুষ টিকে থাকতে পারবে না। তাই মহাকাশের পথে পা বাড়ানোর আগে এই বায়ু শূন্যতার কথাটা ভেবে দেখতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

মহাকাশে ওঠার আরেকটি বড় সমস্যা হলো—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হলো পৃথিবী তার বুকের সমস্ত কিছুকে স্নেহ কোমল মায়ের মতো আঁকড়ে ধরে আছে। কিছুকেই তার বুক থেকে ছেড়ে দিতে চায় না। শুধু বুকের দিকে টানে। আকর্ষণ করে। এ হলো পৃথিবীর একটি প্রাকৃতিক ধর্ম ও শক্তি।

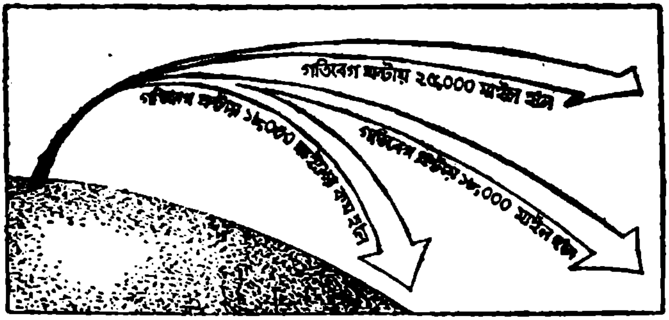


রকেটের গতি ও মাধ্যাকর্ষণ

এই শক্তির বলেই কোনো বস্তুকে উপর দিকে উঠতে পৃথিবী বাধা দেয়। অবাধ্য ছেলেকে মা যেমন করে শাসন করে, যেখানে খুশী যেতে মানা করে—এও যেনো তেমনি।

আমরা লাফ দিয়ে যেমন খুশী অনেক উপরে উঠতে পারি না, তার কারণ পৃথিবী আমাদেরকে টেনে নামিয়ে দেয়। যখন ঢিল ছুঁড়ি তখন ঢিলটি অনেক উপরে গিয়েও আবার মাটিতে নেমে আসে। আসলে কিছুই আপনা থেকে নামে না। পৃথিবী নিজেই ওটাকে টেনে নামায়।

এই যে পৃথিবীর অদৃশ্য শক্তি—এই শক্তির নামই অভিকর্ষ শক্তি। এই শক্তির অস্তিত্বের কথা প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী নিউটন।

মহাকাশে যাওয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে ওঠার সমস্যা।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন — যে কোনো যান ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল (৪০,০০০০ কিলোমিটার) গতিবেগ সম্পন্ন না হলে সেটা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে মহাকাশে উড়তে পারবে না।

## রকেট আবিষ্কার

অবশেষে ভাবতে ভাবতে মানুষ সেই মহাসমস্যারও সমাধান করে ফেললো। দেখা গেলো রকেট এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। রকেটের পক্ষেই সম্ভব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে মহাশূন্যে উঠে যাওয়া।

রকেট হলো আসলে হাওয়াই বাজী। আমরা উৎসব অনুষ্ঠানে মজা করে যে হাওয়াই বাজী ওড়াই ওটাই আসলে রকেট।

কিন্তু এই হাওয়াই কি করে আকাশে ওড়ে এটাই হলো আসল ব্যাপার। হাওয়াই এর আকাশে ওড়ার মূল সূত্রটিও আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী নিউটন। এই সূত্রটির নাম হলো



www.nagorikpathagar.org

Laws of motion.

এই সূত্রের মূল কথা হলো—প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই একটি উল্টো প্রতিক্রিয়া আছে, প্রতিক্রিয়াটি ঐ মূল ক্রিয়ারই সমান। নিউটন তাঁর সূত্রের ব্যাখ্যা করেও বুঝিয়ে গেছেন বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সূত্রটি সমান ও সুশৃংখলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেখা যায় বন্দুকের গুলী ছোঁড়ার সময় যখন গুলীটা বন্দুকের নল থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যায় তখন পেছনের দিকে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কা দেয়ার প্রক্রিয়ার ফলেই গুলী সামনে ছুটে যায়।

আরো একটা পরীক্ষা করে দেখা যায়। একটি বাতাস ভর্তি বেলুনের মুখটা সহসা খুলে দিয়ে শূন্যে ছেড়ে দিলে ওটা বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে ছুটে যাবে। অর্থাৎ বেলুনের মধ্যকার বাতাসের ধাক্কা খেয়েই পেছন দিকে সরে যাচ্ছে।

হাউয়াই যে ছুটে যায় তার বেলাতেও একই পদ্ধতি। হাউয়াইয়ে থাকে বারুদ। এই বারুদে যখন আগুন দেয়া হয় তখন বারুদ জ্বলে ওঠে এবং পেছনের ছিদ্র পথ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয় আগুনের ফুলকি।

আগুনের ফুলকি প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় বাতাসকে আর তার ফলেই হাউয়াই এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এটা নিউটনের সূত্র অনুসারেই হয়।

তবে মজার ব্যাপার হলো—বিজ্ঞানী নিউটন কিন্তু হাওয়াই আবিষ্কার করেননি। হাওয়াই আবিষ্কৃত হয়েছিলো নিউটনেরও অনেক আগে। যারা হাওয়াই আবিষ্কার করেছিলো তারা Laws of motion এর নামও শোনেনি।

হাওয়াই আগে কে আবিষ্কার করেছিলেন তাও কেউ জানে না। তবে অনেকে বলে চীন দেশের লোকেরাই প্রথম হাওয়াই বা রকেট ব্যবহার করতো। রকেট যখন আবিষ্কৃত হয়েছিলো তখন ছিলো কিন্তু খেলনা। উৎসব অনুষ্ঠানে মজা করে রকেট ছোঁড়া হতো।

শত্রুর বিরুদ্ধে চীনারা রকেট ছুড়ছে।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু পরে রকেটের কাজ আরো বেড়ে গেলো। সে খেলার আসর থেকে নেমে এলো যুদ্ধের ময়দানে। চীনারাই প্রথম একাদশ শতাব্দিতে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু তাড়ানোর জন্য রকেটের ব্যবহার শুরু করলো।

১২৩২ সালে মোঙ্গলদের আক্রমন ঠেকানোর জন্য চীনারা এই রকেটাস্ত্র ব্যবহার করে। তারা রকেটের মাথায় আগুন দিয়ে তা ছেঁড়ে দিতো মোঙ্গল বাহিনীর দিকে। আর রকেট প্রচণ্ড বেগে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে সোঁ সোঁ করে গিয়ে পড়তো মোঙ্গল সৈন্যদের মাঝে। কারো গায়ে যেতো আগুন ধরে। কারো বা গা পুড়ে যেতো। ব্যাপার দেখে সৈন্যরা যেতোঘাবড়ে।

এই বিচিত্র অস্ত্রের মুখে পড়ে মোঙ্গলরা প্রথমে হকচকিয়ে গেলো। পরে এই রকেট যন্ত্রের ব্যবহার চীন থেকে ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষেও এর ব্যবহার শুরু হয় সেই বহুযুগ আগে থেকেই।

ভারতের মহিশূরের সুলতান মহাবীর টিপু সুলতানের সাথে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ হয়, তখন টিপু সুলতানের সৈন্যরাও রকেট ব্যবহার করেছিলো। ১৮১৪ সালে আমেরিকার ফোর্ট ম্যাক হেন্‌রী দূর্গ দখল করার সময়ও এই রকেট ব্যবহার করেছিলো বলে জানা যায়।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যখন ইংরেজ এবং অন্যান্য শক্তি একযোগে যুদ্ধে নামলো তখন তারাও এই রকেট অস্ত্র ব্যবহার করেছিলো।

রকেটের আরো মারাত্মক ব্যবহার শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান্ সৈন্যরা বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করার জন্য বিশাল বিশাল আকারের রকেট ব্যবহার করতো। যার এক একটির ওজন ছিলো ১২ টনের মতো আর দৈর্ঘ্য ছিলো ৫০ ফুটেরও বেশী।

এই বিশাল আকৃতির আগ্নেয় অস্ত্রটি যখন প্রায় ২০০ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে শত্রুসৈন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো তখন সত্যি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতো। জার্মানদের এই রকেটের একটি অফিসিয়াল নামও ছিলো। এর নাম ছিলো ভি-২ (V—2),

ভি-২ ছিলো আসলে আধুনিককালের আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রেরই আদি রূপ।

## রকেট হলো মহাকাশ যান

রকেটকে খেলার আসর থেকে নামানো হয়েছিলো যুদ্ধের ময়দানে। এবার আবার শুরু হলো নতুন করে ভাবনা চিন্তা। একে কোনো কল্যাণমূলক কাজে এবং আরো বৃহৎ কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা।

বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো —রকেটের চলার গতি যখন বায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়, তখন একে বায়ুশূন্য মহাকাশেও চালানো যেতে পারে। রকেটকে তাহলে মহাকাশযান হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা দেখা যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেট বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট গডার্ড এবং জার্মানীর গণিত শাস্ত্রবিদ মিঃ হেরম্যান ওবেথ দু'জনেই রকেটের উন্নতি সাধন করা নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছিলেন—রকেটকে মহাকাশে পাঠানো যায় কিনা বা সম্ভব হলে তাকে চাঁদেও পাঠাতে হবে।

গডার্ড সাহেব এ নিয়ে প্রচুর পড়াশোনাও করতে লাগলেন। গডার্ডের পড়াশোনার পথিকৃৎ ছিলেন রাশিয়ার জনৈক শিক্ষা ও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক মিঃ সায়লক ভস্কি (১৮৫৬-১৯৩৫)। গডার্ডেরও অনেক আগে থেকে মহাকাশ যান নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

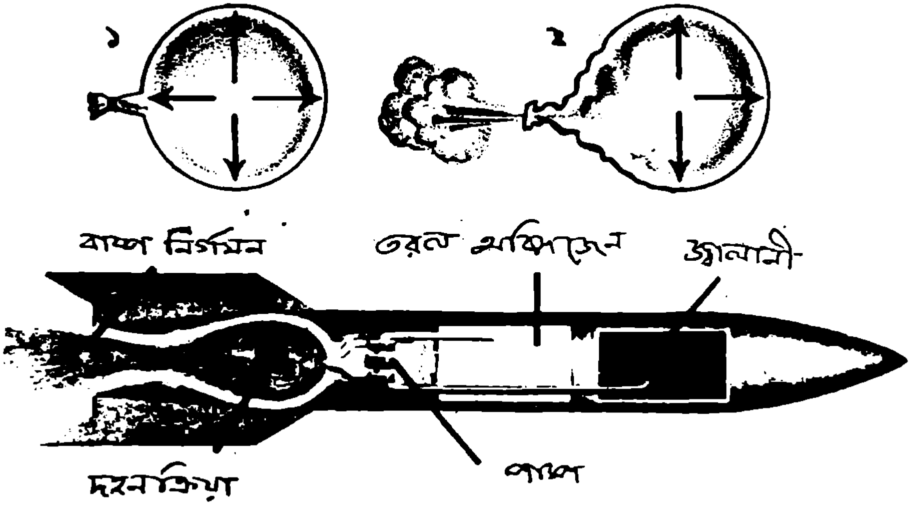


তিনিই প্রথম রকেটের জেট ইঞ্জিন এবং তরল জ্বালানীর বিষয় চিন্তা ভাবনা করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে, তরল জ্বালানী থেকে সবচেয়ে বেশী শক্তি পাওয়া যায়। অক্সিজেন এবং কেরোসিন থেকেও তরল জ্বালানী তৈরি করা সম্ভব।

শুধু জ্বালানী তৈরি নয়। তিনি মহাকাশে উড্ডয়নের উপরেও অনেকগুলো কল্পকাহিনী রচনা করতে থাকেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কল্পকাহিনীগুলোর মধ্যে আছে 'স্বর্গমর্ত্যের ফ্যানটাসী', 'পৃথিবীর বাইরে' ইত্যাদি। এই বইগুলোতে তিনি রকেটে চড়ে পৃথিবীর মানুষের মহাকাশে যাত্রার কথা, এমনকি মহাকাশে মনুষ্য বসতি স্থাপনের কথাও বলেছেন।

গডার্ড সাহেব সায়লক ভক্তির দুটো বই এবং জুল ভার্নের জনপ্রিয় বই 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়লেন।

তিনি বইগুলো পড়ে এতোখানি অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন যে, একদিন তিনি বাড়ির পাশে এক চেরিগাছের মাথায় উঠে শূন্যে তাকিয়ে চিন্তা করতেছিলেন যে কোনো উপায়ে আকাশে উঠে যাওয়া যায় কিনা।

এই অনুপ্রেরণা এবং পড়াশোনা থেকেই গডার্ড প্রমাণ করলেন যে, শূন্যে রকেটের ধাক্কা অনেক বেশী কার্যকর। তিনি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে রকেটের জ্বালানী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি আরো দাবী করেন– তরল অবস্থায় অক্সিজেন ও গ্যাসোলিন আরো বেশী শক্তিশালী। রকেটের পরিচালনা এবং এর গঠন বৈশিষ্ট্যের উপরেও তিনি গবেষণা করেন।

অবশ্য তাঁর এই গবেষণা সহজে কেউ মেনে নেননি। কারণ —আগে একটি ধারণা প্রচলিত ছিলো যে, মহাশূন্যে ইঞ্জিন কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে না। গডার্ডের চিন্তাধারা সঠিক নয়। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় তাকে সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তিনি দমলেন না। তার প্রবল আস্থা ছিলো নিজের গবেষণার উপর। অবশেষে সত্যি সত্যি তিনি সফলকাম হলেন।

সে ঘটনা ১৯২৬ সালের ১৬ই মার্চের ঘটনা। গডার্ড ম্যাসাসুসেটস-এর আবার্ণ নামক স্থানে সর্ব প্রথম তরল জ্বালানীর রকেট পরীক্ষা করে দেখালেন।

গডার্ডের এই রকেট অবশ্য বেশী দূর উঠতে সক্ষম হয়নি। আড়াই মিনিটে মাত্র ১৮৪ ফুট উঠেছিলো। তবু পৃথিবীর মানুষের মহাকাশ যাত্রার ইতিহাসের ওটাই ছিলো শুরু। প্রথম প্রচেষ্টা।

এই ঘটনার পর গডার্ডের লেখা এবং তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় চারদিকে দারুণভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। গডার্ডের চিন্তাধারা নিয়ে রুমানিয়ার অধ্যাপক হেরম্যান ওবার্থও গবেষণা শুরু করেন। তারপর ওবার্থের গবেষণা থেকে অনুপ্রাণিত হয় জার্মানরা।

জার্মানরা রকেটকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করে। জার্মানদের রকেট ১৯৩৫ সালেই মাটি থেকে ৭০০০ ফুট উপরে উঠতে সক্ষম হয়। এর গতিবেগ ছিলো ঘন্টায় ৭০০ মাইল। জার্মানদের এই প্রযুক্তি অবশেষে হাত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানরা মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের সময় জার্মানদের রকেট ভি–২ এর প্রযুক্তিজ্ঞানও হস্তগত করে মিত্র-শক্তির সদস্য অনেক দেশ। যেমন – যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এই ভি–২ তৈরির প্রযুক্তি হস্তগত করে।

যুক্তরাষ্ট্র তখন আরো একটি কাজ করতে সক্ষম হয়। নাৎসী বাহিনীর যেসব লোক যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জার্মানের ভি–২ মিসাইল তৈরির প্রধান প্রকল্প পরিচালক মিঃ ওয়ার্নার ভন ব্রাউন (Wernher van Braeen)

গডার্ড



www.nagorikpathagar.org

যুক্তরাষ্ট্র এই ব্রাউনকেই পরবর্তী সময়ে কাজে লাগিয়েছিলো।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জার্মান ভি-২ এর সাথে নিজেদের প্রযুক্তিরও কিছুটা সংযোজন করলেন। তারা জার্মান ভি-২ এর সাথে যোগ করলেন নিজেদের তৈরি অতিরিক্ত একটি রকেট। (W. A.C Corporal)

ভি-২ এর সাথে করপোরাল ভরে পরীক্ষামূলকভাবে ছেড়ে দেয়া হলো আকাশে।

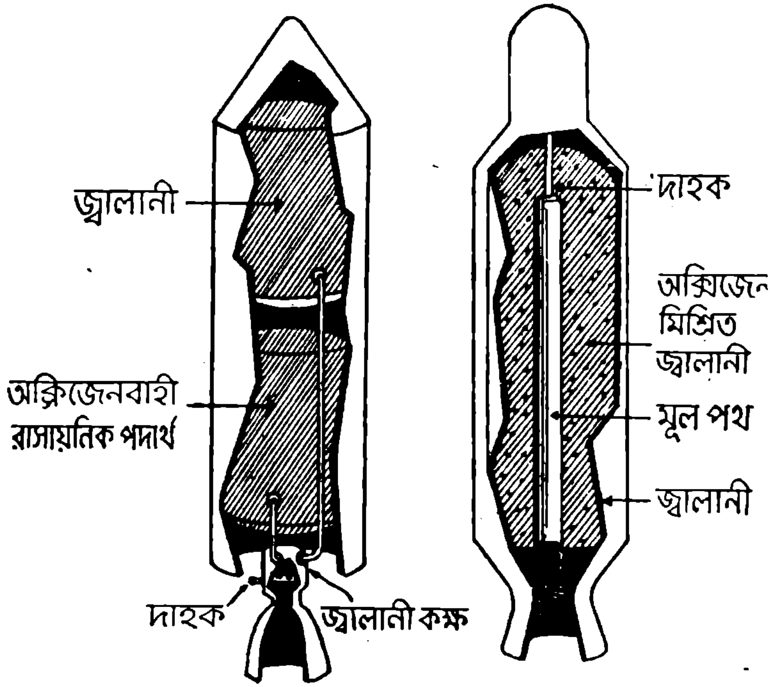


তরল ও কঠিন জ্বালানীর রকেটের তুলনামূলক চিত্র

এই পরীক্ষার পেছনে যুক্তি ছিলো—একটা রকেট যতোই শক্তিশালী হোক, তারওতো একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তারপরতো অনিবার্যভাবে তার গতিবেগ কমে আসবে। এবং এক সময় একেবারেই থেমে যাবে।

তাই ক্রমাগত চলার জন্য একটা রকেট সম্ভব নয়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগলেন—যদি একটা রকেটের সাথে আরেকটা বা তারো বেশী রকেট জুড়ে দেয়া যায় তাহলে একটা যখন শেষ হয়ে আসবে তখন আরেকটা চলতে থাকবে।

উপযুক্ত জ্বালানীর সাহায্যে প্রথম রকেটটি ছোঁড়া হবে – ওটার মধ্যেই ভরা থাকবে আরো কয়েকটি রকেট। যখন প্রথম রকেটটির গতিবেগ কমে আসবে তখন আপনা থেকেই ওটা খসে পড়বে। আর তখনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসবে ভেতরের দ্বিতীয় রকেটটি। নতুন জ্বালানীশক্তি নিয়ে ওটা আবার চলতে শুরু করবে।

আবার যখন দ্বিতীয় রকেটটি শেষ হবে তখন চালু হবে তৃতীয়টি। অনেকটা খেলার



www.nagorikpathagar.org

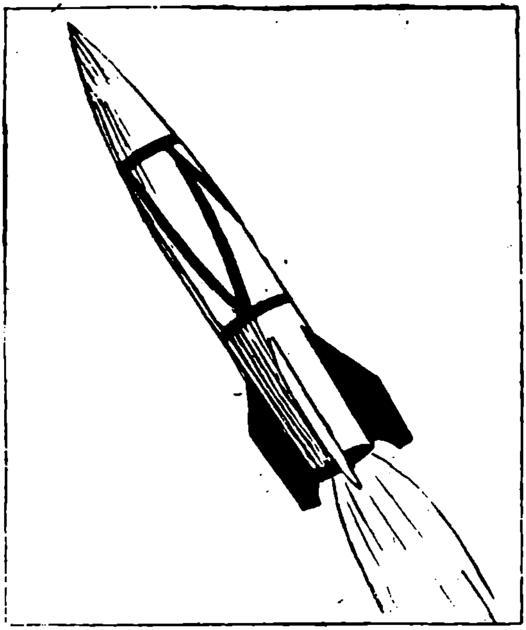

ভি–২

মাঠের রিলে রেসের মতো। এমনি করেই হয়তো রকেটকে পাঠানো যেতে পারে মহাকাশে।

এ নিয়ে প্রথম পরীক্ষা চালালেন মার্কিন বিজ্ঞানীরাই। তারা প্রাথমিক পরীক্ষায় সফলকামও হলেন।

যখন ভি–২ কে আকাশে ছেড়ে দেয়া হলো, দেখা গেলো ভি–২ তখন উপরে উঠে প্রচণ্ড গতি লাভ করলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার জ্বালানী শেষ হয়ে গেলো। ওটার গতিবেগ কমতে লাগলো। ঠিক তখনি কাজ শুরু করলো করপোরাল। করপোরাল রকেটটিকে আবার ঠেলে উপরে ওঠাতে লাগলো।

এভাবে রকেট মাটি থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠলো।

## স্পুটনিক সিরিজ

মার্কিন বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যের পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরাও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন রকেট নিয়ে।

অবশ্য তাদের মহাকাশ গবেষণার কথাটি বাইরে তখনো জানাজানি হয়নি। তারা খুব গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা গোপনে গোপনে এতোখানি সাফল্য অর্জন করেছে যা বাইরের বিশ্ব জানতেই পারেনি।

বিশ্ববাসী প্রথম তাদের সাফল্যের কথা জানতে পারলো ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে।

এই তারিখেই সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিশ্বের প্রথম রকেট 'স্পুটনিক' ছাড়া হলো।



বিশ্ব–১৯

www.nagorikpathagar.org

স্পুটনিক হলো পৃথিবীর মানুষের তৈরি প্রথম রকেট। এর ওজন ছিলো ১৮৫৭ পাউণ্ড। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ছিলো মহাকাশ যাত্রার ইতিহাসে সবচাইতে স্মরণীয় দিন।

স্পুটনিক সেদিন মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভীমবেগে উঠে গেলো আকাশে।

তারপর চাঁদের মতোই পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগলো। তাই বিজ্ঞানীরা তাদের রকেটের নাম দিয়েছিলেন শিশু চাঁদ অর্থাৎ স্পুটনিক। শিশুচাঁদ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পুটনিক নামে আরো বেশ কয়েকটি রকেট নিক্ষেপ করেছিলো। তাই এগুলোর নামকরণ করা হয়েছিলো ক্রমিক নম্বর দিয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম যে রকেট ছেড়েছিলো তার নাম রাখা হয়েছিলো তাই স্পুটনিক-১। এর একমাস পরে ১৯৫৭ সালের ৩রা নবেম্বর ছাড়া হয় এই সিরিজের দ্বিতীয় রকেট —স্পুটনিক-২।

সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় স্পুটনিকটিও তেমনি আকাশে উঠে গিয়ে চক্কর দিতে থাকে পৃথিবীকে।

স্পুটনিক -২ আরো একটি কারণের জন্য ইতিহাসের পাতায় বিখ্যাত হয়ে আছে। এই স্পুটনিক -২ তেই প্রথম একটি জীবন্ত প্রাণীকে পাঠানো হয়। স্পুটনিক-২ আকারেও ছিল বড় এবং ওজন ছিলো ১২২০ পাউণ্ড। স্পুটনিক -১ ছিলো প্রাণীবিহীন।

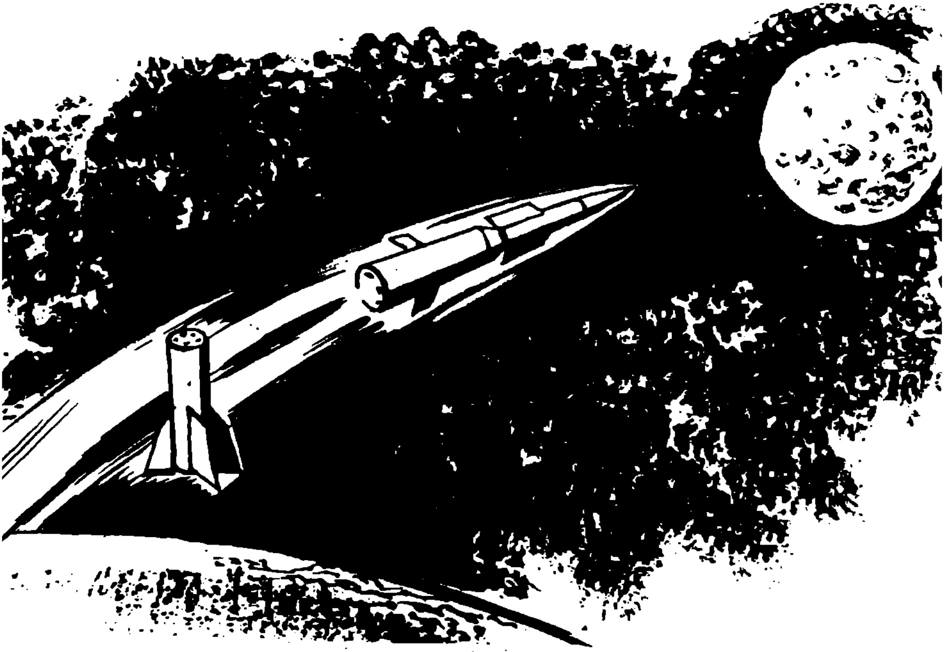

রকেট ছুটে চলেছে আর একটি করে অংশ তার খসে পড়ছে।



www.nagorikpathagar.org

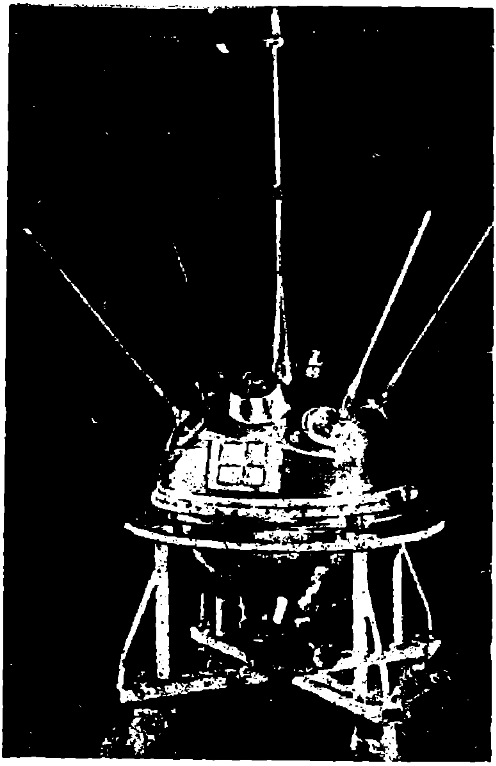

প্রথম মহাকাশ উপগ্রহ স্পুটনিক-১।

স্পুটনিক-২ তে 'লাইকা' নামে একটি কুকুরকে পাঠানো হয়। মহাশূণ্যের বায়ুহীন পরিবেশে পৃথিবীর প্রাণীদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা, এটা পরীক্ষা করার জন্যই একটি জীবন্ত প্রাণীকে পাঠানো হয়েছিলো।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই প্রথম গবেষণা সফল হয়নি। 'লাইকা' নামের কুকুরটি জীবন্ত ফিরে আসতে পারেনি। কুকুরটি মহাকাশে বায়ুশূন্যতায় বাঁচেনি।

বিজ্ঞানীদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও এটা ছিলো পরবর্তীকালের সফলতারই ভিত্তিপ্রস্তর।

সোভিয়েট ইউনিয়নের তৃতীয় স্পুটনিকটি প্রেরণ করা হয়েছিলো এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে তারিখে। এটা ছিলো আরো বড় আকারের। এর ওজন ছিলো ২৯২৬ পাউণ্ড।]

স্পুটনিক -৩ ছিলো আসলে একটি গবেষণা মহাকাশ যান। মহাকাশ বিষয়ের উপর পরীক্ষা,যেমন- বায়ুর চাপের পরিমাপ, মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে এটি ছিলো সজ্জিত। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৩৩ - ১১৭৮ মাইল দূরত্বে থেকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলো। এরপরও সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো দুটো স্পুটনিক নিক্ষেপ করেছিলো পরে। এগুলো ছিলো স্পুটনিক - ৫। এটি ছাড়া হয় ১৯৬১



www.nagorikpathagar.org

সালের ১৯ শে আগষ্ট তারিখে। এর ওজন ছিলো – ১০,১৪৩ পাউণ্ড। এটিও ছিলো জীবন্ত প্রাণীবাহী। এর মধ্যে ছিলো দুটো কুকুর এবং ৬ টি ইঁদুর।

স্পুটনিক –৮ পাঠানো হয় ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। এর ওজন ছিলো ১৪২০ পাউণ্ড।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম দুটো রকেটই ছিলো চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট এবং তরল অক্সিজেন এবং কেরোসিন চালিত।

## ভস্টক সিরিজঃ মহাকাশে প্রথম মানুষ

মহাকাশে প্রথম জীবন্ত প্রাণী প্রেরণ করেছিলো রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা। এরপর গত তিন বছরের মাথাতেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অমন আরো একটি কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হলেন।

মহাকাশে প্রথম মানুষ প্রেরণের কৃতিত্বের দাবীদারও সোভিয়েট ইউনিয়নই। তারা এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল।

এই তারিখেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম মহাকাশে মনুষ্যবাহী মহাকাশ যান ভস্টক–১ (Vostok-1) প্রেরণ করেন। আর যে অসীম সাহসী অভিযাত্রী এই কৃতিত্বের অধিকারী তিনি হলেন বিশিষ্ট বৈমানিক ইউরি গ্যাগারিন ( Y. A. Gagarin)

তিনিই মহাশূন্যযান ভস্টক চড়ে পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সর্ব প্রথম এক ঘন্টা ৪৮ মিনিট মহাকাশে কাটিয়ে আসেন এবং তাই মহাকাশ যাত্রার ইতিহাসে ইউরি গ্যাগারিনের নাম চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

তবে দুঃখের কথা এই যে অবিস্মরণীয় রেকর্ড সৃষ্টিকারী মানুষটি পরবর্তী সময়ে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। গত ১৯৬৮ সালের ২৭ শে মার্চ তারিখে গ্যাগারিন এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এই সিরিজের দ্বিতীয় উপগ্রহ ভস্টক–২ প্রেরণ করা হয় ১৯৬১ সালের ৬ই আগষ্ট। এটিও ছিলো একটি মনুষ্যবাহী মহাকাশযান। অভিযাত্রী ছিলেন—জি, এম, টিটভ (G. S. Titov)। টিটভ মহাকাশে ছিলেন ২৪ ঘন্টা।

মহাকাশে পৃথিবীর প্রথম প্রাণী লাইকা।



www.nagorikpathagar.org

ভস্টকের-তৃতীয় মহাকাশ যান পাঠানো হয় এর মাত্র পাঁচদিন পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সনের ১১ই আগষ্ট। মহাকাশচারী ছিলেন দু'জন। পাভেল পপোভিচ (P. R. Popovich) এবং আর্দ্রে নিকোলায়েভ (A. G. Nikolyayev)

প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন

ভষ্টক-৪ ও ৫কে পাঠানো হয় আরো অনেক পরে যথাক্রমে ১১ই ও ১২ই (১৯৬৩ সাল) আগষ্ট তারিখ এবং এতে অভিযাত্রী ছিলেন যথাক্রমে প্যাভেল পপোভি এবং ভ্যালেরী বাইকোভস্কি (V. F. By Kovsky). সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাস্টক সিরিজের উল্লেখযোগ্য এর ৬ নম্বর মহাকাশ যানটি। কারণ এই ভস্টকেই প্রথম একজন মহিলাকে প্রেরণ করা হয় মহাকাশে। এই অভিযাত্রীর নামই ছিলো ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা (Volentina Tereshkova).

তিনিই বিশ্বের সর্বপ্রথম মহিলা যিনি মহাকাশ যানে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন।

## ভস্খদ সিরিজ

ভস্টক - ৬ পর্যন্ত পাঠানোর পর সোভিয়েট ইউনিয়ন আবার তার সিরিজের নাম পরিবর্তন করেন।



www.nagorikpathagar.org

ভ্যালেন্তিনাকে পদক দেয়া হচ্ছে

এবার থেকে পাঠানো শুরু হয় ভস্‌খদ সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম উপগ্রহ ভসখদ-১ (Voskhod—1). এটি পাঠানো হয় ১৯৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে। এটিও ছিলো একটি মনুষ্যবাহী উপগ্রহ।

এতে নভোচারী ছিলেন তিন জন। এরা হলেন দলনেতা ভ্লাদিমির কমারভ (V. M . Komarov) মহাকাশ গবেষক কে. পি. ফিক্লিস্টভ (K. P. Feoklistov) এবং পদার্থ বিজ্ঞানী বরিস ইয়েগারভ (B. G. Yegarov).

এই সিরিজের ২ নং যানটি পাঠানো হয় এরও পাঁচ ছয় মাস পরে ১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ। এতে মহাকাশচারী ছিলেন দু'জন। এ, এ, লিওনভ (A. A. Leonov) এবং পি, আই, বেলিয়ায়েভ (P. I. Belyayev).

রাশিয়ার ভসখদ সিরিজের মহাকাশযান ছিলো এই দুটোই।

## মহাকাশ অভিযান ও যুক্তরাষ্ট্র এক্সপ্লোরার

এদিকে সোভিয়েট অগ্রগতি দেখে মার্কিন বিজ্ঞানীরাও শুরু করেছিলো প্রচণ্ড তোড়জোড়। গবেষণা চলছিলো পুরোদমে।



www.nagorikpathagar.org

তারা হয়তো সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মতো মহাকাশে প্রথম সফল কৃত্তিম উপগ্রহ প্রেরণের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যেই তারাও প্রমাণ করলেন যে মহাকাশ গবেষণায় তারাও পিছিয়ে নেই।

স্পুটনিক -১ নিক্ষিপ্ত হবার বছর খানেকের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ৩১ শে জানুয়ারী তারিখে যুক্তরাষ্ট্র নিক্ষেপ করে একটি সফল কৃত্রিম উপগ্রহ।

অবশ্য এ ছিলো একেবারেই একটি ক্ষুদ্র নভোযান। ওজন ছিলো মাত্র ১৮ পাউণ্ড। নাম ছিলো এক্সপ্লোরার - ১(Explorar-1) এবং এর মাত্র তিনমাস পরে ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভেনগার্ড-১ (Vanguard -1) নামে আরো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করেন।

ভেনগ্রার্ড-১ দুটো কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিলো সর্বকালের ক্ষুদ্রতম কৃত্রিম উপগ্রহ। ওজন ছিলো মাত্র ৩ পাউণ্ড। তবে এর আরেক বৈশিষ্ট ছিলো —এই ভেনগার্ডেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম সৌরশক্তির ব্যবহার করেন। ভেনগার্ড ছিলো আংশিক সৌরশক্তিপরিচালিত।

ভেনগার্ড -২ ছাড়া হয় এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। এটিও ছিলো একটি ছোটো সাইজের উপগ্রহ। মাত্র ২২ পাউণ্ড ওজন। তবে এরও একটি বিশেষত্ব ছিলো এই ভেনগার্ড-২ থেকেই সর্বপ্রথম মহাকাশ থেকে মেঘের উল্টোদিকের ছবি পাঠানো হয়। এই ভেনগার্ড-২ই হলো পরবর্তীকালের আবহাওয়া উপগ্রহের আদি পূর্বপুরুষ।

মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষ করে প্রতিপক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে যাতে হেরে যেতে না হয়, তার জন্যই এবার মার্কিন সরকার নিজেও উদ্যোগী হলো।

মার্কিন সরকার মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে স্থাপন করলো একটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। এটিই হলো নাসা (National Aeronautics and space Administration—NASA).

## মার্কারী সিরিজ

সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করেছিলো ভস্টক সিরিজে। আর যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করে মার্কারী সিরিজে।

যুক্তরাষ্ট্রের মার্কারী -১ (রেডষ্টোন) নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৬১ সালের ৫ই মে তারিখে। সোভিয়েট ভসটক-১ এর মাত্র একমাস পরে মার্কিন নভোচারী এলেন শেপার্ড (A. B. Shepard) মহাকাশ যাত্রা করেন।

মার্কারী-৪ পাঠানো হয় ১৯৬১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে। এতে নভোচারী ছিলেন ভার্জিল গ্রিসম (Varsil Grissonm).

মার্কারী-৫ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬১ সালের নভেম্বরে। এতে কোনো মানুষ ছিলো না। ছিলো 'ইনো' নামে একটি সিম্পাঞ্জী। মার্কারী-৬ এ ছিলেন বিখ্যাত অভিযাত্রী জে. এইচ. গ্লেন জুনিয়ার (J. H. Glenn. Jr). গ্লেনই প্রথম মহাকাশ যাত্রী যিনি বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। গ্লেন মাত্র পাঁচ ঘন্টা সময় মহাকাশে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি তিনবার ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। মার্কারী-৬ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলো ১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী।

যুক্তরাষ্ট্রের এই মার্কারী সিরিজের আরো কয়েকটি মহাকাশযান ছিলো। এগুলো হলো



www.nagorikpathagar.org

মার্কারী-৭ (এ্যাটলাস)। এটি আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ১৯৬২ সালের ২৪ শে। নভোচারী ছিলেন এম, এস, কার্পেনটার (M.S.Carpenter). মার্কারী-৮ (এ্যাটলাস) নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ১৯৬২ সালের ৩রা অক্টোবর। নভোচারী ছিলেন ডব্লিউ এম, স্কিরা (W. M . Schirra). মার্কারী-৯ (এ্যাটলাস) প্রেরণ করা হয় ১৯৬৩ সালের ১৫ই মে তারিখে। এই মহাকাশযানে নভোচারী ছিলেন এল. গর্ডনিক্স, কূপার জুনিয়র (L. C. Cooper Jr). মার্কারী -৯ মহাকাশযানে গর্ড কূপারের অভিযানটি কিন্তু ছিলো খুবই চমকপ্রদ। মহাকাশে তাঁর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিলো।

মার্কারী-৯ এর কলকবজা সহসা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। পৃথিবী থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে মহাকাশের বুকে এমন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া যে সত্যি কি ভয়াবহ ব্যাপার

মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো



www.nagorikpathagar.org

তা কল্পনাও করা যায় না।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু ধু-ধু শূন্যতা আর শূন্যতা। স্বয়ং পৃথিবীকেই দেখা যাচ্ছে বহুদূরের আকাশের একটি সন্ধ্যা তারার মতো।

তাহলে বাঁচবার কি উপায় হবে?

কিন্তু এমন বিপদের মুখোমুখি হয়েও সহজে হারেননি গর্ডন কুপার।

গর্ডনকুপার যখন পৃথিবীকে চক্কর দিচ্ছিলেন এমনি সময় দেখলেন তার মহাকাশ যানের যন্ত্রপাতি সব বিকল হয়ে গেছে।

এমনকি পৃথিবীর সাথেও সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বিপদের কথা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষকেও জানাতে পারছেন না।

এই অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সহজে হারলেন না তিনি। অন্তত মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে হবে।

তিনি সেই বিকল হয়ে যাওয়া যানটিকেই নিজের হাতে অত্যন্ত দক্ষতায় নামিয়ে আনলেন পৃথিবীতে। তিনি এসে নামলেন সমুদ্রে। তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এইবারের মহাকাশ যাত্রার সময় তাঁর কিছু কিছু মজার ঘটা ও ঘটেছিলো।

মহাশূন্যেতো ওজন বলে কিছু নেই। সে আস্ত একটা মানুষই হোক আর একফোটা জলই হোক, সবই শূন্যে ভাসতে থাকবে।

মহাকাশ যান চালাতে চালাতেই এক সময় গর্ডন কুপার দেখলেন তার ফ্লাস্কে রাখা জল আর শরীর থেকে বের হয়ে আসা ঘাম সবকিছু শূন্যে উড়ে গিয়ে তার চোখের সামনে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। এই জলের কণা লেগে তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসার জোগাড়।

তখন তার মাথায় খেলে গেলো নতুন বুদ্ধি। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে যেমন করে ফড়িং ধরে তেমনি ভাসমান জল কণাগুলোকে ধরতে লাগলেন।

গর্ডন কুপার তার এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজে বলেছেন,—ভাগ্য ভালো যে আমি রুমাল দিয়ে চোখের সামনে ভাসমান জলকণাগুলোকে সরাতে পেরেছিলাম, নইলে মহাকাশ যানটি যে বিকল হয়ে গেছে তা বুঝতেই পারতাম না। তিনি তাই হেসে বলেছিলেন,—'মহাকাশে গেলে আর যাই সঙ্গে নাও না কেনো রুমাল একখানা অবশ্যই থাকতে হবে।'

## জেমিনি সিরিজ

যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য মহাকাশ যান সিরিজ হলো জেমিনি সিরিজ। এই সিরিজে তারা এর প্রায় ৯টির মতো মহাকাশ যান প্রেরণ করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জেমিনি সিরিজের প্রথম যান জেমিনি-১ নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে এবং এই সিরিজের সর্বশেষ জেমিনি-১০ মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে।

জেমিনি-১ ছিলো মনুষ্যবিহীন মহাকাশ যান।

এই সিরিজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা হলো জেমিনি -৩ এর আকাশ যাত্রা। এটি পাঠানো হয়েছিলো ১৯৬৫ সালের ২৩ শে মার্চ তারিখে।

এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র একই যানে দুজন নভোচারী প্রেরণ করেন। এতে যে দু'জন নভোচারী ছিলেন তাঁরা হলেন - ভি. আই. গ্রিসম ( V. I. Grissopm) এবং জে. ডব্লিউ ইয়ং (J, W. Young).

কিন্তু এর মূল বৈশিষ্ট এটা নয়। সেটা হলো নভোচারী গ্রিসম এর কৃতিত্ব । এই



www.nagorikpathagar.org

গ্রিসমই সর্বপ্রথম মহাশূন্যে পরিভ্রমণ কালে মহাকাশ যান থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন এবং মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ান। মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ানোর প্রথম গৌরবের অধিকারী মার্কিন নভোচারীগ্রিসমই।

তিনি অসীম সাহসে ভর করে মহাকাশ যানের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এটা ঠিক হেঁটে বেড়ানো নয়—ভেসে বেড়ানো বলা যায়। কেননা সেই সীমাহীন মহাশূন্যে থেকেতো আর নিচে পড়ে যাবার ভয় নেই। কারণ পৃথিবী আর তার কেন্দ্রের দিকে টানতে পারছে না।

তাই স্পেসস্যুট পরে বেরিয়ে আসা যায়। মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মারাত্মক একটি দুঃসাহসের কাজ।

মহাকাশের শূন্যতায় প্রথম হেঁটে বেড়ান গ্রিসম এবং এরপর যিনি মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ানোর ক্ষেত্রে আরো কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন তিনি হলেন জেমিনি – ৯ক (৩রা জুন ১৯৬৬প্রেরিত) এর অভিযাত্রী এ. কারনান (F. A . Cernan).

শুধু আমেরিকানরা নয়, মহাকাশে হেঁটে বেড়ানোর এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন সোভিয়েটঅভিযাত্রীরাও।

ভসখদ–২ (১৮ই মার্চ/ ১৯৬৫ তারিখের প্রেরিত) এর অভিযাত্রী মি. এ. এ. লিওনভ (A. A . Leonov). তিনিও মহাকাশ যান থেকে বেরিয়ে এসে হেঁটে বেড়িয়েছিলেন বাইরে। তারপর আবার ফিরে গিয়ে গাড়ি বদলের মতো চড়েছিলেন নিজের মহাকাশ যানে।

## চন্দ্রাভিযান : সোভিয়েট ইউনিয়ন

এ পর্যন্ত মহাকাশ যাত্রার যে আয়োজন কিংবা সাফল্য লাভ হয়েছিলো তা ছিলো একান্তই প্রাথমিক পর্ব। প্রস্তুতি পর্ব। অগ্রসর তেমন একটা কিছু হয়নি। এখনো মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেই কাটাতে পারেনি। এ পর্যন্ত যেসব মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিলো তার সবগুলোই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় থেকেই পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছিলো।

চন্দ্রলোক নিয়ে মানুষের কল্পনার শেষ নেই। সেই কোন্ আদিযুগ থেকেই মানুষ চাঁদকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। চাঁদকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কতো শিল্পসাহিত্য। সেই শিল্প সাহিত্যে চাঁদে গিয়ে বসবাসের কথাও বলা হয়েছে।

তাহলে কি সত্যি সত্যি চাঁদের বুকে পা রাখতে পারবে মাটির মানুষ?

শিল্প সাহিত্যের কল্পনা কি কখনো বাস্তবে রূপ নেবে? হয়তো নেবে। মানুষ আকাশকে জয় করবেই।

কিন্তু সেতো খুব সহজ নয়। কঠিন হলেও তা একদিন হয়তো সম্ভব হবে। যে মহাকাশযান নিয়ে তারা পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, তার গতিই যদি আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহলেই আরো দূরে যাওয়া সম্ভব। এমনকি চাঁদে গিয়েও পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন—একটি আকাশযানের গতিবেগ যদি কমপক্ষে ঘন্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার (২৫ হাজার মাইল) হয়, তবেই সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে পারবে। অর্থাৎ চাঁদে যেতে হলে এই গতিবেগটি প্রয়োজন।

অতএব রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য চললো ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড আয়োজন।

শুরু হলো সোভিয়েট ইউনিয়নের লুনা সিরিজের অভিযান।



www.nagorikpathagar.org

## লুনা সিরিজ (Luna Series)

চন্দ্র বিজয়ের লক্ষ্যে সর্ব প্রথম মহাকাশ যান প্রেরণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে চন্দ্রবিজয়ের লক্ষ্যে প্রেরণ করেন একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান লুনা-১। লুনা -১ ৪ঠা জানুয়ারী তরিখে চন্দ্র পরিবেশে প্রবেশ করে এবং ৫ থেকে ৬ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে চন্দ্রকে অতিক্রম করে।

লুনা সিরিজের দ্বিতীয় মহাকাশযানটি ছাড়া হয় এর মাত্র কয়েক মাস পরে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। এটি উৎক্ষেপণের দুদিন পরে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত করে।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর উৎক্ষিপ্ত লুনা-৩ থেকে সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়।

রাশিয়ার লুনা সিরিজের যে মহাকাশ যানটি সর্বপ্রথম সরাসরি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হয় সেটি হলো লুনা-৯। এটি ছাড়া . হয়েছিলো ১৯৬৫ সালের ৩'রা ফেব্রুয়ারীতারিখে।

এরপর সোভিয়েট ইউনিয়নের লুনা সিরিজের লুনা -১৫ মহাকাশ যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাপোলো -১১ এর মাত্র ১২দিন আগে।

অর্থাৎ এর মাত্র বারোদিন পরেই পৃথিবীর মানুষ চন্দ্র বিজয় চূড়ান্ত করে।

এ্যাপোলো-১১ চন্দ্রপৃষ্ঠের যেখানে নেমেছিলো লুনা -১৫ অবতরণ করেছিলো তার থেকে মাত্র ৮,০০০ কিলোমিটার দূরে এক সমতল ক্ষেত্রে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চন্দ্রবিজয়ের পরও সোভিয়েট ইউনিয়নের মনুষ্যবিহীন চন্দ্রাভিযান অব্যাহত ছিলো।

লুনা -১৫ এর এক বছর পর প্রেরিত লুনা-১৬। লুনা -১৬ উৎক্ষিপ্ত হয় ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ এবং চন্দ্রে অবতরণ করে ২১ শে সেপ্টেম্বর।

লুনা-১৬ চাঁদের বুকে যে স্থানে অবতরণ করেছিলো সে স্থানটির নাম হলো সী অব ফার্টিলিটি (Sea of Fertility).

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযাত্রী নিজে গিয়ে চাঁদের বুকে থেকে মাটি নিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীর বুকে। রাশিয়ার আরো বিশেষ কৃতিত্ব যে তারা কোনো মানুষ না পাঠিয়েও শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চন্দ্রমৃত্তিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। লুনা-১৬ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাঁদের বুক থেকে ১০১ গ্রাম মাটি তুলে নিয়ে আসে পৃথিবীতে। লুনা-১৬ এই মাটি সংগ্রহ করে চন্দ্র পৃষ্ঠের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে থেকে। লুনা-১৬ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ২৪শে সেপ্টেম্বর। এর দু'মাস পরে ১০ই নবেম্বর, ১৯৭০ প্রেরিত লুনা -১৭ আরো কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মনুষ্যবিহীন মহাকাশ যান লুনা-১৭ নিজেই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে স্থাপন করে একটি গবেষণাযান লুনাখোদ-১।

লুনা-১৭ কর্তক স্থাপিত লুনা খোদ-১ ছিলো স্বয়ংচালিত আট চাকা বিশিষ্ট একটি মোটরগাড়ি বিশেষ। লুনা খোদ-১ সৌরকোষ শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর মানুষের নির্দেশে রিমোট কনট্রোল পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো।

চাঁদে যখন পনেরো দিনব্যাপী রাত নেমে আসতো তখন সূর্যালোকের অভাবে অচল থাকতো। রাতে চাঁদে নেমে আসতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা নামতো মাইনাস ১৩০ থেকে মাইনাস ১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও যানটির কলকবজা ঠিক ছিলো। তারপর পনেরো দিন পরে আবার যখন চাঁদে দিন শুরু হতো, সূর্য দেখা দিতো, আকাশে তখন মোটর যানটিও আবার চালু হতো, এবং চাঁদের ছবি পাঠাতে থাকতো



www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে। তবে লুনা সিরিজের ১৮ নং মহাকাশ যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে দুর্ঘটনায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে চন্দ্রে এক পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ২০ নং লুনা (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে প্রেরিত) নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করে এবং চাঁদের মাটি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসতে সক্ষম নয়।

২১ নং লুনাও (৮ ই জানুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে প্রেরিত) চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করে আরেকটি চন্দ্রযান (লুনা খোদ-২)। এই লুনা খোদ-২ এর ওজন ছিলো ৮৪০ কিলোগ্রাম। এটিও লুনাখোদ-১ এর মতোই পরীক্ষানিরীক্ষা চালায় এবং চাঁদের ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

লুনা -২২ নিক্ষিপ্ত হয় ২৯শে ১৯৭৪ তারিখে। কিন্তু লুনা -২৩ মহাকাশ যানটি (২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে প্রেরিত চন্দ্র পৃষ্ঠে অকেজো হয়ে পড়ে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের লুনা সিরিজের সর্বশেষ মহাকাশযান ছিলো লুনা-২৪। এটি প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৭৬ সালের ৯ ই আগষ্ট তারিখে। ১৮ই আগষ্ট লুনা-২৪ চাঁদে অবতরণ করে এবং যথারীতি চন্দ্রমৃত্তিকা নিয়ে ২২শে আগষ্ট প্রত্যাবর্তন করে পৃথিবীর মাটিতে।

## চন্দ্রাভিযান ঃ যুক্তরাষ্ট্র
## এ্যাপোলো সিরিজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চন্দ্রাভিযানের জন্য যে রকেট সিরিজটি প্রেরণ করে সেটি হলো এ্যাপোলোসিরিজ।

এ্যাপোলো সিরিজের অভিযান শুরু হয় ১৯৬৮ সাল থেকে। এই বছরেরই ২১শে ডিসেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্র স্যাটার্ন -৫ (Saturn-5) নামে একটি রকেটের সাথে জুড়ে দিয়ে প্রেরণ করে এ্যাপোলো -৮।

স্যাটার্ন -৫ ছিলো একটি বিশাল আকৃতির রকেট । এই বিশাল রকেটটির মাথাতেই বসানো ছিলো এ্যাপোলো -৮ ।

স্যাটার্ন -৫ এর আকৃতি ছিলো অবিশ্বাস্য রকমের বড়। দৈর্ঘ্যে ছিলো প্রায় তিরিশ তলা ভবনের সমান। ওজন ছিলো ৪৫০০০কেজি (১লাখ পাউন্ড)। জ্বালানী হিসাবে এই রকেটের মধ্যে ছিলো পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি । আরো ছিলো কয়েকশো টন তরল অক্সিজেন এবং তাকে জ্বালাবার মতো প্রচুর তরল হাইড্রোজেন।

অক্সিজেনকে তরল রাখতে হলে তার উত্তাপ কমিয়ে আনতে হবে মাইনাস ১৮৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (সেলসিয়াস) এবং হাইড্রোজেনকে তরল অবস্থায় আনতে হলে তার উত্তাপ কমিয়ে আনতে হবে মাইনাস ২৫৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস মাত্রায় ।

স্যাটার্নকে এই অবস্থাতেই রাখা হয়েছিলো । রকেটটি ছাড়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডী উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। উড্ডয়নের সময়েই এর গতিবেগ ছিলো ঘন্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার (১৮,০০০ মাইল)।

উড্ডয়নের পর স্যাটার্ন দুবার পৃথিবীকে চক্কর দেয়। তারপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে ওঠার পর এর গতি আরো বৃদ্ধি পায়। গতিবেগ দাঁড়ায় ৪০,০০০ কিলোমিটার (২৫,০০০ মাইল) ঘন্টায়।

এই প্রচন্ড বেগেই স্যাটার্ন ছুটে চললো মহাকাশের দিকে। এর মাথায় বসে আছে মহাকাশযান এ্যাপোলো-৮।

রকেটের খোলসগুলো একে একে তাদের কাজ শেষ করে খসে পড়ছে। আর মূল



www.nagorikpathagar.org

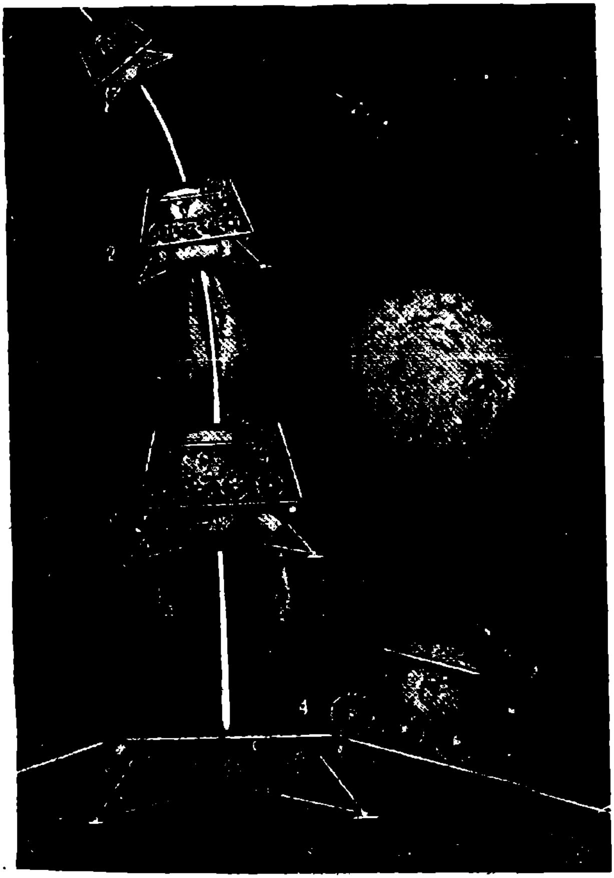


'লুনা-21' স্টেশনের অবতরণের নকশা

1 — চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগের সন্নিকটবর্তী হওয়া; 2 — ব্রেক-ইঞ্জিন চালু করা; 3 — সফ্‌ট-ল্যান্ডিং-এর ইঞ্জিনগুলি চালু করা; 4 — 'লুনাখোদ-2' স্টেশন ত্যাগ করছে

যানটি আরো প্রচন্ড বেগে ছুটে চলেছে সামনের দিকে । ছুটতে ছুটতে মহাকাশ যানটি একসময় এসে পড়ে পৃথিবী ছেড়ে প্রায় ৩,৪৫,৬০০ কিলোমিটার (২ লাখ ১৬ হাজার মাইল) দূরে। তখনই সে পুরাপুরি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলো। এর পর সে এসে পড়েছে সম্পূর্ণ মহাশূন্যতার মাঝে।

এখন অবশ্য তাকে এতো প্রচন্ড বেগে না ছুটলেও চলবে। তাই তার গতিবেগ কমিয়ে আনা হলো। ৪০ হাজার কিলোমিটার থেকে গতিবেগ এবার নেমে এলো ৪হাজার ৮০০ কিলোমিটারে। (৩ হাজার মাইল) । এই গতিবেগেই স্যাটার্ন -৫ ছুটে চললো চাঁদের দিকে।



www.nagorikpathagar.org

তারপর একসময় সে ঢুকে পড়লো চাঁদের রাজ্যে অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার মধ্যে। চাঁদের আওতার মধ্যে প্রবেশ করার পরই চাঁদ তাকে টানতে শুরু করলো। যতোই সামনের দিকে এগুচ্ছে ততোই চাঁদের আকর্ষণ বাড়ছে। এটা আরো বাড়তে থাকবে।

ঠিক তখনি মহাকাশ যাত্রীরা হুঁশিয়ার হলেন। এ্যাপেলো -৮ মহাকাশযানে অভিযাত্রী তিনজন ছিলেন এফ বোরম্যান (F Borman), জে, এ, লোভেল জুনিয়ার ( J, A, Lovell Jr) এবং উব্লিউ, এ, এ্যান্ডার্স (W. A, Anders). এরা তিনজনই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তিনজনই ছিলেন মহাকাশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বৈমানিক।

তারা জানতেন, যেভাবে চাঁদ তার প্রচন্ড শক্তি দিয়ে তাদের ক্ষুদ্র যানটিকে আকর্ষণ করছে, যদি এই মুহূর্তে এর গতি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে এটি প্রচন্ড বেগে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়বে চাঁদের বুকে। একেবারে যাবে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে অর্থাৎ তখন অনিবার্য মৃত্যু।

তাই তারা তখনি দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রণ করলেন মহাকাশ যানটিকে। তারপর চলে এলেন চাঁদের একান্ত কাছাকাছি। চন্দ্রপৃষ্ঠে থেকে মাত্র ১১২ থেকে ৩১৪ কিলোমিটার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলেন। এমনি করে প্রতি দুঘন্টায় একবার করে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

তারপর আরো কাছাকাছি নেমে এলেন চাঁদের। মহাকাশ যানটি চন্দ্র পৃষ্ঠে থেকে মাত্র ৯৬ কিলোমিটার মধ্যে নামিয়ে আনা হলো।

এতো কাছ থেকেই তারা চন্দ্র পৃষ্টের উপর চালাতে লাগলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিস দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

সে সত্যি এক অপূর্ব দৃশ্য। তারা লক্ষ্য করতে লাগলেন চাঁদের পিঠের কোথাও আছে ফাটল, কোথাও আছে পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরি, বিশাল গহ্বর, তারা এসবই সবিস্ময়ে স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন।

শুধু দেখা নয়, এই সংগে তারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠাতে লাগলেন চন্দ্র পৃষ্ঠের ছবি। প্রতিটি কাজ করছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সামান্য ভুল হলেই হবে সর্বনাশ।

সবিস্ময়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকেই পৃথিবীর কক্ষকে বলতে লাগলেন,—চাঁদকে দেখছি যেনো একটি অন্তহীন ধুসর রঙের রাজ্য। এখানে ধুসর রঙ ছাড়া আর কিছুই নেই।

বোরম্যান বললেন—'কিন্তু আকাশ যেনো মিশমিশে কালো।'

এমনি সময়ে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সকৌতুকে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো,— আচ্ছা, চাঁদের দেশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাচ্ছে?'

তার উত্তরে ক্যাপ্টেন বোরমান বললেন,—পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদকে যেমন দেখি, প্রায় তেমনি দেখাচ্ছে। তবে অনেক বড় দেখাচ্ছে। পৃথিবী চাঁদের প্রায় চার গুণ বড়। এখান থেকে আমরা পৃথিবীর শুধু অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি।

বোরম্যান এই সাথে ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিনের শুভেচ্ছা বাণীও পাঠালেন পৃথিবীর বুকে।

এবার ফেরার পালা। কিন্তু এটাই হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার। পৃথিবীর বুক থেকে উঠে যাওয়া যতোখানি শক্ত, তার চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক ও শক্ত কাজ ফিরে আসা।

সামান্য ভুল হলে আর রক্ষে নেই। বিশেষ করে এ প্রত্যাবর্তনের সময় মহাকাশ যানটি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে তখনি সবচেয়ে বেশী ভয়।

বিশেষ একটি গতিতে এবং বিশেষ একটি দিক নির্দেশনায় বায়ুমন্ডলে ঢুকতে না পারলে হয় মহাকাশ যানটি কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, আর না হয় জ্বলেপুড়ে ছারখার



www.nagorikpathagar.org

হয়েযাবে।

কিন্তু এই চরম অগ্নিপরীক্ষায়ও সাফল্যজনক ভাবে উতরে গেলেন অভিযাত্রীরা। তারা নিপুণভাবে মহাকাশ যানটি প্রবেশ করালেন বায়ুমন্ডলে। প্রবেশ করার পর বাতাসের সাথে ঘর্ষণে এ্যাপোলো-৮ এর বাইরের দিকের উত্তাপ বেড়ে গিয়েছিলো ৩৩০০ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই প্রচন্ড তাপমাত্রায় সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়ার কথা ।

কিন্তু এ্যাপোলো-৮ এর বহির্দেশ তৈরি করা হয়েছিলো প্রচন্ড তাপমাত্রা সহ্য করার উপযোগী করেই। বাইরের আবরণটি প্রচন্ড গরমে লাল টকটকে হয়ে গেলেও এর ভিতরে সে তাপমাত্রা পৌছেনি। কারণ ভেতরটা ছিলো উত্তমরূপে ইনস্যুলেশন করা। যাতে বাইরের তাপ ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে। তাই মহাকাশ যাত্রীরা কিন্তু বাইরের এই ভয়াবহ তাপের কথা বুঝতেও পারেন নি। ক্যাবিনের ভিতরের উত্তাপ মোটেই বাড়েনি। সেটা ছিলো মাত্র ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। মহাকাশের যাত্রীরা যথাসময়ে প্যারাসুট নিয়ে নেমে পড়লেন সাগরের বুকে নির্দিষ্ট স্থানে। এখানে আগে থেকেই জাহাজ ও হেলিকপটার নিয়ে অপেক্ষা করছিলো উদ্ধারকারী দল।

মহাকাশ যাত্রীরা প্রথমে উঠে এলেন রবারের ভেলায়, তারপর সেখান থেকে জাহাজে।

## এ্যাপোলো-১০

এ্যাপেলো-৮ এর অভিযান সফল হলেও চাঁদের বুকে নামা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ চাঁদের বুকে সরাসরি রকেট নিয়ে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়।

সাগরের বড় বড় জাহাজ যেমন সরাসরি ডাঙ্গার তীরে ভিড়তে পারেনা। বেশ কিছু দুরে নোঙর ফেলে। তারপর সেখানে থেকে ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে বা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ডাঙ্গায় আসা যাওয়া করতে হয়। এখানেও তেমনি করতে হবে।

মহাকাশযান থেকে চাঁদে নামতে হলে তৈরি করতে হবে তেমনি ডিঙ্গি নৌকা। মহাকাশের এই ডিঙ্গি নৌকার নাম হলো চন্দ্রযান বা লুনার মডিউল। এই চন্দ্রযানে করেই নামতে হবে চাঁদের মাটিতে।

তাই চন্দ্রযান কেমন হবে, কেমন করে তাকে বহন করে নিতে হবে, কেমন করে তাকে নামাতে হবে চাঁদের বুকে—এ সম্পর্কে আগে চালাতে হবে পুরীক্ষা । তবেই না নামা যাবে চাঁদে।

এই লক্ষ্যেই একটি লুনার মডিউল তৈরি করে পাঠানো হলো আকাশে। প্রথম পরীক্ষামূলক চন্দ্রযান বহন করে নিয়ে গেলো এ্যাপোলো -৯। এতেও তিনজন অভিযাত্রী ছিলেন। যেমন-জেমস, ম্যাকডভিট (J. A. M.cdivit), রাসেল স্কোয়েকটি (R L Schweickart) এবং ডেভিট-স্কট (D R Scott). এ্যাপোলো -৯ মহাকাশ যানেই প্রথম লুনার মডিউল বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা পরীক্ষামূলকভাবে দুজন পরিচালনা করেও দেখেছিলেন এবং তৃতীয় জন ছিলেন এ্যাপোলো ক্যাপসুলে । এ্যাপোলো -৯ প্রেরিত হয়েছিলেন ১৯৬৯ সালের ৩রা মার্চ তারিখে ।

পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা মূলক অভিযান চালানো হয় ১৯৬৯ সালের ১৯শে মে তারিখে। এই তারিখেই প্রেরণ করা হয় মহাকাশযানের সর্বশেষ পরীক্ষামূলক মহাকাশ যান এ্যাপোলো-১০।

এ্যাপোলো -১০ ছিলো আরো বিশাল আকৃতির। ওজন ছিলো ৩১,০৮,০০০ কেজি। এ্যাপোলো-১০ এ যারা অভিযাত্রী ছিলেন তাঁরা হলেন টি , পি, ষ্ট্যাফোর্ড (T. P. Stafford), জে, ডব্লিউ, ইয়ং (J. W Young) এবং ই,এ কারনান ( E. A. CERNAN). এ্যাপেলো-১০ এর সাথেও ছিলো লুনার মডিউল।



www.nagorikpathagar.org

উৎক্ষেপণের পর থেকেই এ্যাপোলো -১০ এর অভিযাত্রীরা শুরু করেন তাদের গবেষণার কাজ। প্রথিবী ছাড়িয়ে মাত্র ৩২.০০০ কিলোমিটার (২০,০০০ মাইল) দূরে গিয়েই তারা দূর থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায় তার অলৌকিক সব ছবি পাঠাতে শুরু করলেন।

এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো—চন্দ্রাভিযানের চূড়ান্ত পরীক্ষা চালানো। চাঁদের বুকে নামতে হলে কিভাবে নামতে হবে, কোথায় নামতে হবে, কিভাবে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে, তার সম্পর্কে একটি অগ্রীম সমীক্ষা চালানো।

পরিকল্পনা ছিলো এই এ্যাপোলো-১০ এর অভিযানে লুনার মডিউল নিয়ে নামতে হবে চাঁদের একান্ত কাছাকাছি।

এই মোতাবেক মূল যানে থাকবেন ইয়ং এবং বাকী দু'জন মডিউলে চড়ে চলে যাবে চাঁদের খুব কাছাকাছি। কিন্তু তারা চাঁদে নামবেন না। মাত্র ১৫ কিলোমিটার (দশ মাইল) দূর থেকে চাঁদকে দেখবেন খুব নিখুঁতভাবে।

তাই হলো। মহাকাশ যানের মূলযান থেকে তারা চলে এলেন চাঁদের ভেলা বা লুনার মডিউলে।

এই মুহূর্তেই কিন্তু তাদের একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। তারা দেখলেন—চাঁদের ভেলাটিকে মূলযান থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। সংযোজনকারী সুড়ঙ্গপথ থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বের করা যাচ্ছেনা। কিন্তু এটা না করা গেলে নির্ঘাৎ বিপদ হবে। চাঁদের ভেলাটি শূন্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে এবং এক সময়ে আছড়ে পড়বে চাঁদের মাটিতে। তারপর যাবে সব চুরমার হয়ে।

এ ব্যাপারেও অভিজ্ঞ ছিলেন অভিযাত্রীরা। তারা বিপদ আঁচ করতে পেরেই সংগে সংগে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পাঠালেন বিপদ সংকেত। কি করে এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তার পরামর্শ চাইলেন।

আমেরিকার হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরাও বিপদের সংকেত পেয়ে তক্ষুনি কম্পিউটারে পাঠালেন ফিরতি সংকেত। বেতার সংকেতে বলে দেয়া হলো—কেমন করে বিকল যানটিকে ঠিক করা যাবে, একেবারে নির্ভুল সংকেত।

সংকেত পেয়ে তারাও সংগে সংগে ঠিক করে ফেললেন মহাকাশ যানের ত্রুটি। এই যে মহাকাশযান থেকে পৃথিবীতে খবর পাঠানো, পৃথিবী থেকে সংকেত দান এবং মহাকাশ যানের মেরামত—এই গোটা প্রক্রিয়াটা ছিলো মাত্র পনেরো মিনিটের ব্যাপার।

চাঁদের ভেলা ত্রুটি মুক্ত হতেই তারা মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেমে এলেন চাঁদের কাছাকাছি। মাত্র পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে।

তারা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখলেন চাঁদের বুকে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য পাথর। তার কোনোটা চওড়ায় প্রায় একশো ফুটের মতোও হতে পারে।

চাঁদের বুকে ছড়ানো ছিটানো পাথরের সংখ্যা এতো বেশী যে তা দিয়ে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা হ্রদ কিংবা উপসাগর পর্যন্ত ভরাট করে ফেলা যাবে।

চাঁদের বুকে সমতল অঞ্চল নেই বললেই চলে। সর্বত্র এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো খানাখন্দক আর এলোমেলো পাথরে পরিপূর্ণ।

কিন্তু চাঁদে নামার জন্য একটা সমতল অঞ্চলতো চাই। যেখানে আগামী অভিযানের যাত্রীরা নামাবেন তাদের চাঁদের ভেলা। তারপর একসময় পাওয়া গেলো একটি অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। অতঃপর ঠিক হলো এখানেই নামবেন এ্যাপোলো-১১ এর অভিযাত্রীরা। স্থান নির্ধারণ হয়ে গেলে আবার তারা উঠে এলেন মূল যানে। তারপর ফিরে এলেন পৃথিবীর বুকে।



www.nagorikpathagar.org

# এ্যাপোলো –১১

## প্রশিক্ষণ

এবার থেকে শুধু হলো চূড়ান্ত বিজয় অভিযান। সরাসরি চাঁদের মাটিতে নেমে যাবার পালা। এ্যাপোলো- ১০ এর অভিযাত্রীরা স্থান নির্ণয় করে এসেছেন। এবার সেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অবতরণ করবেন এ্যাপোলো-১১ এর অভিযাত্রীরা। নামবেন চাঁদের মাটিতে।

কিন্তু এই চাঁদের মাটিতে নামাও সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্যও চাই প্রচুর অভিজ্ঞতা। প্রচণ্ড সাহস এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণ। শুরু হলো এ্যাপোলো-১১ এর অভিযাত্রীদের চাঁদে নামার প্রশিক্ষণের পালা—ট্রেনিং।

পৃথিবীর মাটিতেই তৈরি হলো চাঁদের বুকের অনুরূপ পরিবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা টেক্সাসের বিস্তৃত প্রান্তরে নিজেরাই তৈরি করে ফেললেন একটি নকল চন্দ্র পৃষ্ঠ। তৈরি হলো নকল মৃত আগ্নেয়গিরি। ছড়িয়ে দেয়া হলো চারদিকে অসংখ্য পাথর। যেমনটা আছে চাঁদের বুকে। তৈরি হলো হুবহু চাঁদের নকল পৃষ্ঠ দেশ।

কিন্তু শুধু জমি হলেই তো হবেনা। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ছয়ভাগের এক ভাগ। অতঃপর কৃত্রিমভাবে তাও তৈরি হলো। যাতে অভিযাত্রীরা চাঁদের মতো হাল্কা ওজন অনুভব করতে পারে সেখানে।

সবরকম যন্ত্রপাতি, স্পেসস্যুট ইত্যাদি নিয়ে যার গায়ের ওজন প্রায় দেড় কুইন্টাল হবার কথা— চাঁদের বুকে তার ওজন হবে বড় জোর মাত্র ২৫ কেজির মতো। কাজেই এভাবে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে যাতে উল্টে পড়ে না যায়।

এভাবেই দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে চললো মহড়া। অভিযাত্রীদের শেখানো হলো কেমন করে তারা নামাবেন চাঁদের ভেলা, কেমন করে ভেলা থেকে নেমে চাঁদের বুকে চলাফেরা করবেন। সব তাঁরা শিখে নিলেন। চাঁদের ভেলা কেমন করে উড়বে তাও দেখানো হলো।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ। এবার যাত্রার পালা।

## এ্যাপোলো–১১ এর পরিচয়

এ্যাপোলো –১১ প্রেরণ ছিলো সত্যি সত্যি এক এলাহী কাণ্ড কারখানা। এই নভোযানটি প্রেরণ করার জন্য পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রায় তিনলাখ লোক নিয়োজিত ছিলো দীর্ঘদিন ধরে। নভোযানটিও ছিলো এক বিশাল যন্ত্রদানব। সবমিলিয়ে এর ওজন ছিলো প্রায় ৩,০০০ টন। উচ্চতা ছিলো ৩৬ তলা ভবনের সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার উৎক্ষেপণ মঞ্চে যারা এটিকে প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা এর আকৃতি দেখেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

এ্যাপোলো –১১ নভোযানটি ছিলো আসলে দুটো পৃথক নভোযানের সমন্বয়। এর প্রথম অংশ হলো পুরো নিয়ন্ত্রণযান আর দ্বিতীয় অংশ ছিলো চাঁদের ভেলা বা লুনার মডিউল (Lunar Module).

তবে যান্ত্রিক দিক দিয়ে এ্যাপোলো-১১ ছিলো চারভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলোর নাম ছিলো-উৎক্ষেপণ স্তম্ভ (Launch escape tower). নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Command Module), কার্যকরণ কক্ষ (Service Module) এবং চাঁদের ভেলা (Adapter with Lunar Module).

চাঁদের দেশে পৌঁছোনোর পর এ্যাপোলো-১১ এর যে অংশটি মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছিলো তারই নাম ছিলো চাঁদের ভেলা বা



www.nagorikpathagar.org

Lumar Module. এর নিচের অংশে ছিলো নল বিশিষ্ট রকেট ইঞ্জিন। এতে ছিলো ১৬০০ কিলোয়াট শক্তি ক্ষেপণক্ষম রকেট ইঞ্জিন। এটি ব্যবহার করা হয়েছিলো চাঁদে নামার এবং ওঠার সময়।

লুনার মডিউলের উচ্চতা ছিলো ৭ মিটার। ওজন ছিলো ১৫,১১০ কেজি।

লুনার মডিউলটিই ছিলো বলতে গেলে সমগ্র যানটির প্রাণকেন্দ্র। এই অংশ ছিলো যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ।

মডিউলের নির্মাণ কৌশলও ছিলো ভারী চমৎকার। বাইরে এবং ভেতরে বিশেষ ধরনের এ্যালোমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। এটা একাধারে শক্ত অপর দিকে খুব হালকা। তদোপরি এটি উত্তম ইনস্যুলেটর (Insulator).

মডিউলের বাইরের অংশটি ছিলো ষ্টেইনলেস ষ্টীলের তৈরি। এর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিলো ১৫০ থেকে ৬০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

এ্যাপোলো-১১ ছিলো তিনকক্ষ বিশিষ্ট নভোযান। এর প্রথম কক্ষ উপরে, অপরটি নিচে এবং তৃতীয়টি মধ্যে। এর মধ্যে অভিযাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমোতে পারতেন।

এ্যাপোলো-১১এর অভিযাত্রীরা যে সব খাবার দাবার সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো হলো-যব, রুটি, পুডিং, গরুর মাংস, মাংসের স্যুপ, ভাত, ফল এবং বুনো আপেল।

## এ্যাপোলো –১১ এর অভিযাত্রীগণ

এ্যাপোলো –১১ এর তিনজন অভিযাত্রী ছিলেন অর্থাৎ নীল আর্মষ্ট্রং, এডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স। যাদের পাঠানো হয়েছিলো এদের কিন্তু হঠ্যাৎ করে ডেকে এনেই অমনি মনোনয়ন দান করা হয়নি।

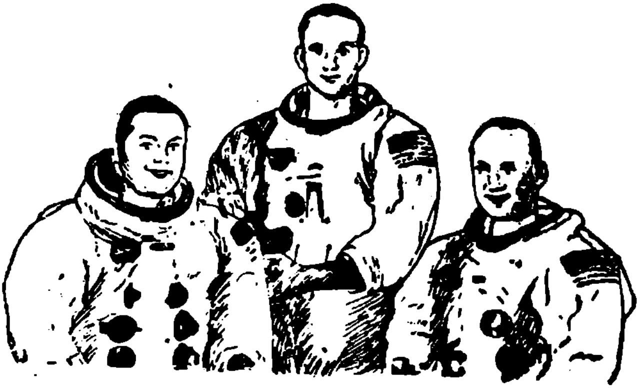

প্রথম চন্দ্র বিজয়ী মহাকাশযাত্রীত্রয়।



www.nagorikpathagar.org

অভিযানের সব কিছুই ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত। এই জন্য মহাকাশ যাত্রীদেরকেও আগে থেকেই নিতে হয়েছিলা প্রশিক্ষণ। চাঁদে যাওয়ার জন্য একটি লোককে তৈরি করতে সময় লাগে কম করে হলেও তিন বছর। প্রত্যেক মহাকাশচারীকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে।

এছাড়া প্রত্যেক নভোচারীকে অবশ্যই জেট প্লেন চালানোর কৌশল জানতে হবে। কারণ জেট প্লেনের ইঞ্জিন অনেকটা নভোযানের ইঞ্জিনের মতো। তারপর কম্পিউটারে কেমন করে তথ্য সংগ্রহ সরবারহ এবং সংরক্ষণ করে—এ সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে।

এ্যাপোলো -১১ এর নভোচারীত্রয়কেও এসব জানতে হয়েছিলো।

অভিযাত্রীদের মধ্যে নীল এ আর্মষ্টং ছিলেন অধিনায়ক। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ওয়াপা জোনেটা শহরের লোক। জন্ম ১৯৩০ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে। তিনি Purde বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এ্যারনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী নিয়েছিলেন। তিনি এফ -১০০ এফ -১০১, এফ -১০২ এবং এফ -১০৪ বিমান চালাতে পারতেন।

একবার তিনি বিমান চালানোর দেখিয়েছিলেন অপূর্ব দক্ষতা। এক্স- ১৫ নামে একটি অতি ক্ষুদ্রকায় বিমান পরিচালনা করেছিলেন ঘন্টায় ৪০০০ মাইল বেগে। যা চাঁদের বুকে নামার সময় চন্দ্র তরীর বেগের চেয়ে বেশী ছিলো।

শুধু বিমান নয়, মহাকাশ যান পরিচালনায়ও তার ছিলো পূর্ব অভিজ্ঞতা। তিনি নভোচারী হিসেবে আসলে মনোনয়ন লাভ করেছিলেন ১৯৬২ সালে। ইতিপূর্বে প্রেরিত নভোযান জেমিনি-৫ এবং জেমিনি-৮ এর উড্ডয়নের সাথেও জড়িত ছিলেন।

এ্যাপোলো-১১ এর দ্বিতীয় অভিযাত্রী ছিলেন এডউইন অলড্রিন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির মন্ট ফ্লেয়ার এর অধিবাসী। জন্ম ১৯৩০ সালের ২০ শে জানুয়ারী।

তিনি নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট পয়েন্টের সামরিক একাডেমী থেকে বি এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৬১ সালে এবং ১৯৬৩ সালে এস্টোনটিকস্ এ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন ম্যাসাচুসেট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী থেকে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ জেট বিমানের বৈমানিক। এই অভিযানে যাওয়ার আগে তাঁর বিমান চালনার রেকর্ড ছিলো সাড়ে তিনহাজার ঘন্টা। যার মধ্যে জেট বিমানই চালিয়েছিলেন ২,৮৫৩ ঘন্টা। তাঁর আরো একটি অভিজ্ঞতার রেকর্ড ছিলো। এ্যাপোলো-১১ই তার প্রথম মহাকাশ যাত্রা নয়। এর আগেও তিনি গিয়েছিলেন মহাকাশ যাত্রায়। ১৯৬৩ সালে জেমিনি-১২ তেও তিনি ছিলেন অন্যতম অভিযাত্রী। তিনি তখন দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা মহাকাশে পদচারণাও করেছিলেন। এছাড়া মহাশূন্য থেকে যিনি সর্বপ্রথম চাঁদের ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করেন—তিনিও ছিলেন এই অলড্রিন।

এ্যাপোলো-১১ অভিযানের তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মাইকেল কলিন্স (Michel colince)। তাঁরও জন্ম ১৯৩০ সালের ৩১ শে অক্টোবর। তিনিও ১৯৫২ সালে সামরিক একাডেমী থেকে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল। এ্যাপোলো-১১ এ অভিযানে যাওয়ার আগে তাঁর বিমান চালনার রেকর্ড ছিলো ৪,০০০ ঘন্টা। এর মধ্যে জেট বিমান চালনার রেকর্ড ৩,২০০ ঘন্টা।

অলড্রিনের মতো তারও মহাকাশ যাত্রার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো। তিনিও ১৯৬০ সালে জেমিনি -১০ এর অন্যতম অভিযাত্রী ছিলেন।

এ্যাপোলো -১১ এর অভিযানের সময় নীল আর্মষ্টং এবং অলড্রিন যখন চাঁদের ভেলা নিয়ে চাঁদে নেমে গিয়েছিলেন তখন তিনি একাই মূল যান নিয়ে চাঁদের কক্ষপথ পরিক্রমণ করছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

## এ্যাপোলো–১১ এর যাত্রার মুহূর্ত

এ্যাপোলো-১১ যাত্রা করেছিলো ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার জন এফ কেনেডী মহাশূন্য কেন্দ্র থেকে।

যাত্রার দিন অভিযাত্রীরা যথারীতি পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক উৎক্ষেপণ মঞ্চের পাশে ম্যাও স্পেস ক্র্যাপ্ট অপারেশন ভবনের একটি সুসজ্জিত কক্ষে যথারীতি সকালে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলেন। শেষবারের মতো ডাক্তার এসে তাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা

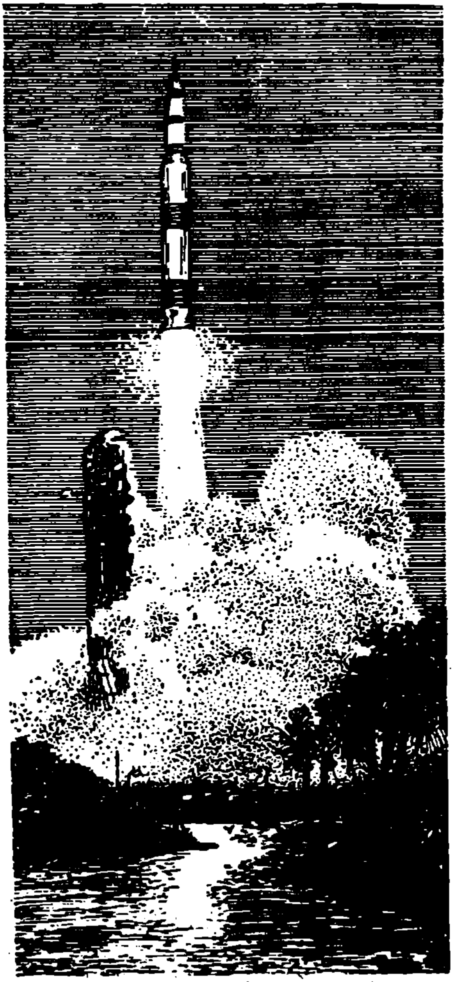

রকেট উঠে যাচ্ছে আকাশে



www.nagorikpathagar.org

করলেন। তারপর অভিযাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সাদা পোশাক পরে এলেন মহাকাশ যানের কাছে।

এ ঘটনা মহাকাশ যাত্রা শুরু করার মাত্র আড়াই ঘন্টা আগের কথা। তারপর প্রবেশ করলেন মহাকাশ যানের ভিতরে তাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে।

যে সতি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লাখো লাখো দর্শক সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে বিশাল মহাকাশ যানের দিকে। দর্শকদেরকে অবশ্য রাখা হয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। কোনো দর্শককেই মহাকাশ যানের উৎক্ষেপণের মঞ্চের সাড়ে চার কিলোমিটার মধ্যে আসতে দেয়া হচ্ছে না। এই সব হাজার হাজার দর্শক এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র তথা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে।

কিন্তু ঘটনা যখন ঘটলো তখন প্রায় চোখের পলকেই ঘটে গেলো।

রকেটের জ্বালানীতে যখন অগ্নি সংযোজন করা হলো তখন মুহূর্তের মধ্যে হলো একটি বিকট শব্দ। সংগে সংগে কমলা ও সাদা রঙের ধোঁয়ায় রকেটের নিচের অংশটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একেবারে চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। তারপর লাখো লাখো দর্শক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখলেন সেই ধোঁয়ার অদৃশ্য স্থান থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে এসেছে এ্যাপোলো -১১। তারপর সামান্য পূর্ব দিকে হেলে পরে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে ঝুঁকে চোখের পলকে উঠে গেলো আকাশে এবং মাত্র কয়েক মুহূর্তে মধ্যেই চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

উৎক্ষেপণের পর মাত্র বারো মিনিটের মধ্যে চলে গেলো দেড়শো কিলোমিটার

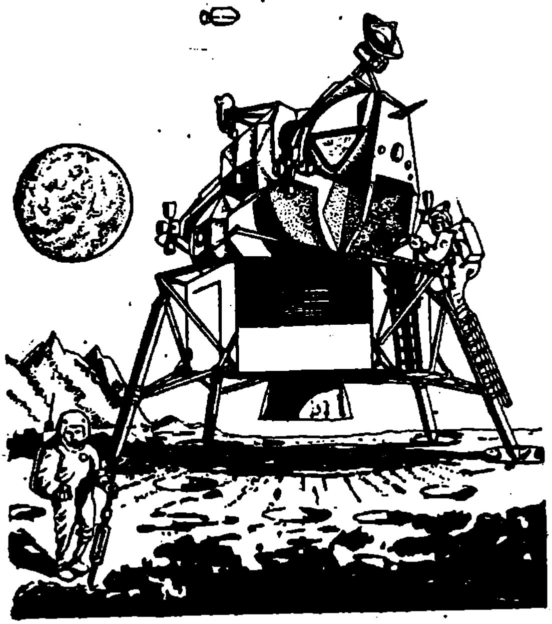

চন্দ্রতরী ইগল থেকে নামছেন মহাকাশচারীরা



www.nagorikpathagar.org

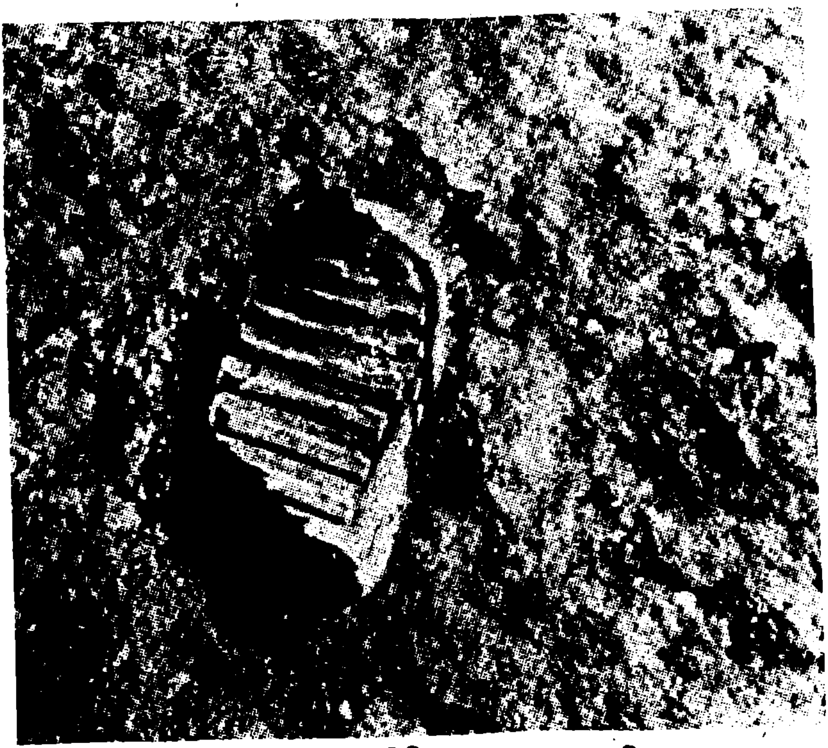

চাঁদের বুকে পৃথিবীর মানুষের প্রথম পদচিহ্ন

উপরে। তারপর প্রবেশ করলো পৃথিবীর কক্ষ পথে। এ সময়ে গতি বেগ ছিলো ঘন্টায় ২৮০০০ কিলোমিটার (১৭,৫০০ মাইল)।

প্রথম রকেটটি তখন পুড়ে ছারখার হয়ে খসে পড়েছে, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় রকেটটির কাজ।

কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হবার ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় রকেটটিও শেষ হয়ে গেলো। শুরু হলো তৃতীয় রকেটের কাজ।

এই সময় এ্যাপোলো-১১ পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে যেতে শুরু করেছে চাঁদের দিকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য তখন তার গতি বেগ দাঁড়িয়েছে ঘন্টায় ৩৮,৮০০ কিলোমিটার (২৪,২৫০ মাইল)।

এরপরেই চারদিকে শুধু শূন্যতা আর শূন্যতা। এমনকি এক ভয়ংকর মহাশূন্যতার মধ্য দিয়েই নিরালোক দিগন্তের সন্ধানে এগিয়ে যেতে লাগলো এ্যাপোলো-১১।

এমনি করেই কেটে গেলো একদিন, দুদিন করে পুরু তিন তিনটি দিন।

অবশ্য তারা যে এই তিনদিন শুধু বসে কাটিয়েছিলেন তা নয়। সর্বক্ষণই ছিলেন নানা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছিলেন পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে। তারা মহাশূন্যে কি দেখছিলেন, প্রতিমুহূর্তে কি ঘটছিলো তার নিখুঁত বর্ণনা পাঠাচ্ছিলেন পৃথিবীতে।



www.nagorikpathagar.org

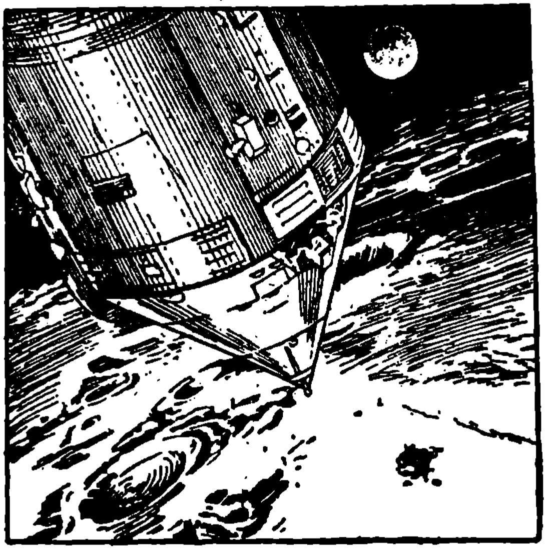

মূলযান নিয়ে কলিন্স চাঁদের চারদিকে চক্কর দিচ্ছেন।

তারপর আছে চাঁদে নামার পূর্ব প্রস্তুতির ব্যাপার। তারা একে একে সব কিছু গুটিয়ে নিলেন। চন্দ্রযানটিকে তার আধার থেকেও বের করে আনলেন।

তখন পৃথিবী থেকে বহু দূরে। বায়ুমন্ডল-এর সাথে ঘর্ষণের আর কোনো আশংকা নেই। তারপর তারা মহাকাশ যানের তৃতীয় রকেটটিকে পরিত্যাগ করলেন।

তারপরই তারা চলে এলেন চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার মধ্যে। যখন চাঁদের আওতার মধ্যে পৌঁছালেন তখন মহাকাশযানের গতিবেগও কমে এসেছে অনেকখানি। কারণ তৃতীয় রকেট বিস্ফোরণের ফলে যে গতি বেগের সৃষ্টি হয়েছিলো তার বেশ কিছু পরিমাণ ব্যয় হয়ে গেছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছাড়িয়ে আসতেই। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে তাদের মহাকাশ যানের গতিবেগ দাঁড়িয়েছিলো ঘন্টায় ৩,৫২০ কিলোমিটার (২২০০ মাইল)।

এরপরই তারা সাফল্যজনকভাবে নভোযানটিকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করলেন। এই ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সামান্য পরিমাণে ভুল হলে আর রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ বিপর্যয়।

চাঁদের টানে এ্যাপোলো -১১ এবার চাঁদের আরো কাছাকাছি চলে এলো। তারা চাঁদের মাত্র ১২০-৩১২ কিলোমিটার (৭৫-১৯৫ মাইল) দূর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

তারপর নামলেন আরো কাছে। এবার চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাত্র ৯৯-১২০ কিলোমিটার (৬২-৭৫ মাইল) দূর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলেন। তারপর আরো নীচু দিয়ে। মাত্র ৬৩ কিলোমিটার (৩৯ মাইল)। এবারই শুরু হলো আসল কাজ।

চন্দ্রে অবতরণের পালা। এবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নীল আর্মষ্ট্রং এবং অলড্রিন মূলযান থেকে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে পড়লেন চাঁদের ভেলায়। ভেলার কক্ষটির সুন্দর একটি



www.nagorikpathagar.org

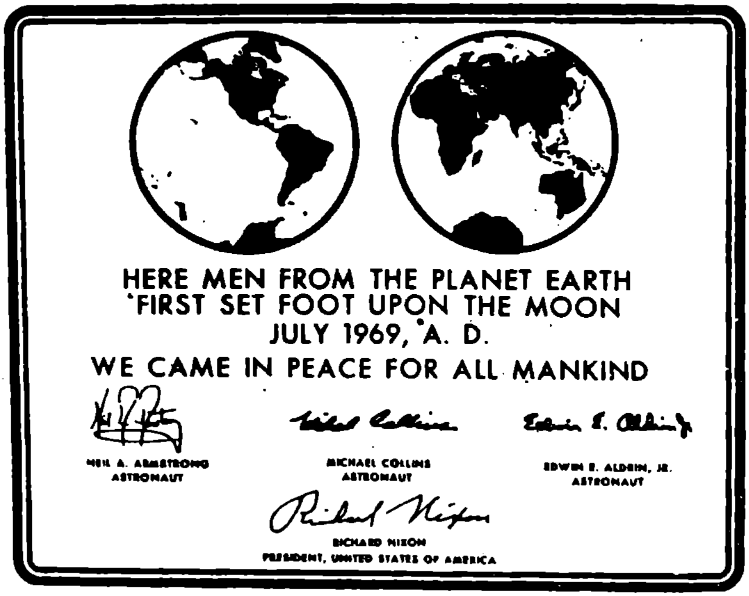


চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত স্মৃতিফলক।

কাব্যিক নামও ছিলো এবং অদূরে ছিলো 'ঈগল'।

নীল আর্মষ্ট্রং আর অলড্রিন ঈগলে প্রবেশ করলেও মাইকেল কলিন্স রয়ে গেলেন মূল যানে। তিনি এই মূলযান নিয়েই চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবেন। তারপর ওরা চাঁদের নেমে কাজ শেষ করে আবার ফিরে এসে মিলিত হবেন তার সাথে।

ঈগল মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রচন্ড গতিতে নামতে লাগলো নিচের দিকে। কিন্তু তখনি সাবধান হলেন নভোচারীরা। এতো প্রচণ্ড গতিতে নামা যাবে না চাঁদের বুকে। তাহলে গোটা যানটিই প্রচন্ড বেগে ভেঙে চুরে আছড়ে পড়বে। তাই এর গতিবেগ হ্রাস করার জন্য ঘটানো হলো বিপরীত মুখী বিস্ফোরণ। কারণ তাদের নামতে হবে ধীরে ধীরে, অনেকটা গাছের পাতা খসে পড়ার মতো বাতাসে ভেসে ভেসে।

কিন্তু তারা এই যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করে চাঁদের একান্ত কাছাকাছি এসেই ঘটলো আরেক বিপদ। এ্যাপোলো -১০ এসে শান্তি সাগর বলে যে স্থানটি এই যানের অবতরণের সম্ভাব্য স্থান বলে নির্ধারণ করে গিয়েছিলো এখন নামতে গিয়ে দেখা গেলো জায়গাটি আসলে ততোটা মসৃণ নয়।

ওখানে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। যে পাথরে আঘাত লাগলে যানের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। তাই তারা সরাসরি নামতে পারলেন না পূর্ব নির্ধারিত স্থানে।

তারা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে শুরু করলেন খোঁজাখুঁজি। আরো অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান পাওয়া যায় কিনা। অবশেষে নির্ধারিত স্থান থেকে আট কিলোমিটার ( পাঁচ মাইল) দূরে পাওয়া গেলো ২০০ ফুট চওড়া একটি সমতল জায়গা। এখানে বড় কোনো পাথরের চাঁই নেই। আছে ছোট ছোট নুড়ি পাথর।

এর চেয়ে আর ভালো জায়গা পাওয়া যাবে না। অতএব এখানেই অবতরণ করলো



www.nagorikpathagar.org

ঈগল ৷ ঈগলের মাকড়সার মতো পাগুলো স্পর্শ করলো চাঁদের মাটি। ঈগল অবতরণ করার সময় কিছু ধূলি উড়ে গেলো। কিন্তু তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এলো।

চাঁদের বুকে তারা অবতরণ করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমের সাথে। জানালেন তাদের এই ঐতিহাসিক বিজয়। তারা সুন্দরভাবে অবতরণ করতে পেরেছেন চাঁদের বুকে।

এবার নিচ্ছে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ। চাঁদের বুকে পৃথিবীর মানুষের প্রথম পদ সঞ্চালনের পদক্ষেপ।

ঈগল নেমে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করলেন। তারপর সর্ব প্রথম বিশেষ দরোজা খুলে ঈগল থেকে বের হয়ে এলেন অধিনায়ক নীল আর্মষ্টং।

তারপর ধীরে ধীরে মই বেয়ে নেমে এলেন নিচে। কয়েক ধাপ নামার পরই তিনি এই ঐতিহাসিক দৃশ্য তুলে রাখার জন্য চালু করে দিলেন স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরা।

তারপর ধীরে ধীরে ও সাবধানে নেমে এলেন মইয়ের সর্বশেষ নিচের ধাপে। খুব সাবধানে পা দিলেন চাঁদের মাটিতে। পরীক্ষা করে দেখলেন নরম না শক্ত। যখন নিশ্চিত হলেন যে চাঁদের মাটিতে তার পা বসে যাবে না, তখনি তিনি লাফ দিয়ে পড়লেন মাটিতে। চাঁদের মাটিতে পড়লো পৃথিবীর মানুষের এই প্রথম পদক্ষেপ।

চাঁদের মাটিতে পা দিয়েই নীল আর্মষ্টং আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে ছিলেন। চাঁদের মাটিতে পা রাখার সংগে সংগে তিনি যে কথাটি বলে উঠেছিলেন তা চিরকাল ঐতিহাসিক বাণী হয়ে লেখা থাকবে পৃথিবীর মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে।

তিনি বলেছিলেন -One small step for man, a giant leap for mankind.

নীল আর্মষ্টং সর্ব প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ১৭মিনিটের সময়। নীল আর্মষ্টং এর ২০ মিনিট পরে ঈগল থেকে নেমে আসেন সহকারী এডউইন অলড্রিন। তিনিও চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে বিস্ময়ে আর আবেগে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। চাঁদের পরিবেশের অলৌকিক দৃশ্য দেখে তিনি অজান্তেই অভিভূতের মতো বলে উঠেছিলেন-Beautiful, beautiful, beautiful. What a wonderful silence!

চাঁদের মাটিতে নেমেই তারা সংগ্রহ করলেন চাঁদের মাটির নমুনা। বেলচার মতো একটি যন্ত্র দিয়ে চাঁদের বুকের অনেকগুলো নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে রেখে দিলেন স্পেস সুটেরপকেটে।

বলা বাহুল্য মহাকাশ যাত্রীদের এই স্পেশ স্যুটগুলো ছিলো একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। মহাকাশে যা যা দরকার তার সবই ছিলো এই স্পেস স্যুটে।

নিজেদের নিঃশ্বাস নেওয়ার সাজ সরজাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমের সাথে ও আলাপ করার যাবতীয় জিনিস ছিলো এর মধ্যেই।

অলড্রিন নেমে আসার পর এবার দুজনেই হেঁটে বেড়াতে লাগলেন চাঁদের বুকে। যেদিকে তাকান সেদিকে যেনো এক অলৌলিক দৃশ্য।

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্যা নুড়ি পাথর। এর উপর দিয়ে তারা হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে গিয়ে কিন্তু তাঁরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন, তাদের শরীরের ওজন কমে গেছে অনেক খানি। হাঁটতে গিয়েও শরীর বারবার লাফ দিয়ে উঠতে চাইছে।

৭০/৮০ কেজি ওজনের একজন মানুষের শরীরের ওজন কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র



www.nagorikpathagar.org

১২/১৪ কেজিতে। লাফ দেবার ক্ষমতা বেড়ে গেছে ৬ গুণ। চাঁদের বুকে একটা মানুষ অনায়াসে লাফ দিয়ে প্রায় ২০/২২ফুট পর্যন্ত উঠতে পারবে। কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে ৬/৭ ফুট উঠতেই হিমশিম খেয়ে যাবে। তার মানে পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষমতা ৬ গুণ কম।

ব্যাপারটি অবশ্য তাঁরা আগেই জানতেন। এই ওজনহীনতার পরিবেশে কেমন করে হাঁটতে হবে তার প্রশিক্ষণও তাঁদের আগেই ছিলো। সুতরাং তাঁরা সেভাবেই চলাফেরা করছিলেন।

শুধু হেঁটে বেড়ানো নয়। তারা কাজও করছিলেন। চাঁদের বুকে নেমে অধিনায়ক নীল আর্মষ্টং যুক্তরাষ্ট্রের এবং পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির পক্ষ থেকে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করলেন। স্থাপন করলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা।

নীল আর্মষ্টং স্থাপিত স্মৃতি ফলকে লেখা ছিলো—''আমরা পৃথিবী থেকে এসেছি শান্তির বারতা নিয়ে।''

তারপর তারা পৃথিবীর সাথে কথাও বললো। তিনি চাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন,–'কি অপূর্ব আলোর খেলা এখানে!

প্রতিমুহূর্তে যেন রঙের পরিবর্তন ঘটছে। চাঁদের মাটি শুধু নুড়ি পাথরে ভরা। তবে কিছুটা ধুলোময় এবং পিছল। চারদিকে রয়েছে অসংখ্য ছোটো ছোটো গর্ত।'

তারা পৃথিবীর বুকে হোয়াইট হাউসে অবস্থানরত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রবার্ট নিক্সনের সাথেও কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন উৎফুল্ল হৃদয়ে চাঁদের বুকে অবস্থানরত অভিযাত্রীদের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন,—নেইল, আমি হোয়াইট হাউস থেকে তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমার মনে হয় এর আগে আর কখনো হোয়াইট হাউস থেকে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন করা হয়নি।'

'আমি অবশ্যই তোমাদের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। গোটা আমেরিকার জন্য এদিনটি অবশ্যই গৌরবের।''

সেদিন সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাদের এই চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য অবলোকন করেছিলো টেলিভিশনের পর্দায়। নীল আর্মষ্টংকে ১৫ মিঃ এবং এলড্রিনকে ১৩ মিঃ অতিরিক্ত সময় দেয়া হয়েছিল চাঁদের দেশে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

নীল আর্মষ্টং এবং অলড্রিন দুঘন্টা ১৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড বিচরণ করেছিলেন চাঁদের মাটিতে। তারপর কাজ শেষ করে ফিরে এলেন ঈগলে।

## চাঁদ থেকে ফেরা

চাঁদের বুকে নেমে নভোচারীরা চন্দ্রযান ঈগলে কাটিয়েছিলেন মোট বাইশ ঘন্টা। তারপর আবার চন্দ্রতরীতে ফিরে এলেন। তখন ইঞ্জিন চালু করা হলো।

এবার ফেরার পালা। প্রথমে তাদের গিয়ে মিশতে হবে মহাকাশে চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমণরত মূল যানের সাথে। সেটা চালাচ্ছে তাদের অপর সাথী মাইকেল কলিন্স।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো ঈগলকে উঠে আসতে দেখেই মাইকেল কলিন্স যানটিকে আরো কাছাকাছি নামিয়ে আনলেন।

এদিকে উড্ডয়নের মাত্র সাড়ে সাত মিনিটের মধ্যেই ঈগল পৌঁছে গেলো তার কক্ষ পথে। এবার চেষ্টা চললো মিলিত হবার। একে অপরকে অনুসরণ করে ছুটতে লাগলো মহাকাশে।

এভাবে তিন ঘন্টা ছোটাছুটির পর ঈগল গিয়ে মিলিত হলো মূলযানের সাথে। এ্যাপোলো –১১ ওদের তুলে নিলো আপন কক্ষে।



www.nagorikpathagar.org

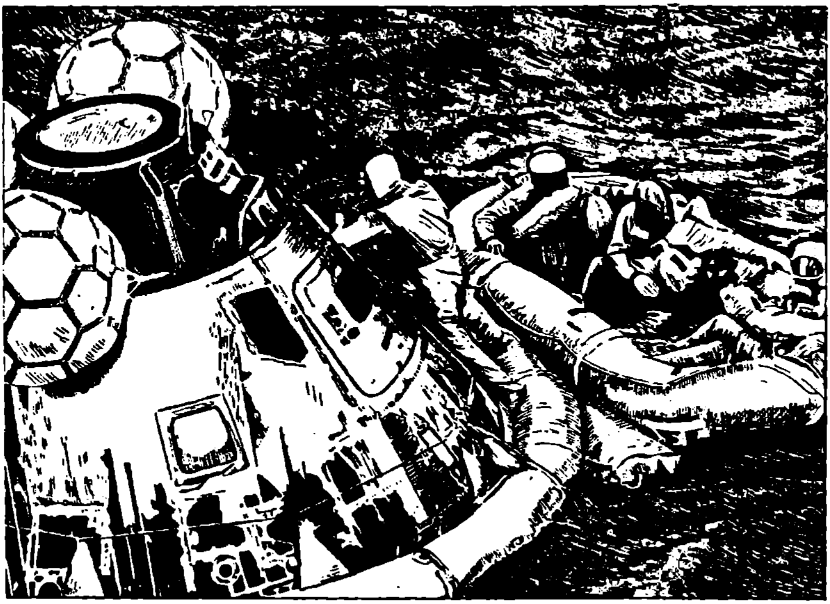

মহাকাশ অভিযান শেষে মর্ত্যের সাগরে অবতরণ

মূলযানের সাথে মিলিত হয়েই আর্মষ্ট্রং এবং অলড্রিন ঈগল থেকে সুড়ঙ্গ পথে চলে এলেন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। কলিন্সের কাছে।

এবার তারা করলেন আর একটি কাজ। চাঁদের বুকের কাজ তো শেষ। এই চাঁদের বুকে নামার জন্যই তারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন ঈগলকে। সে কাজতো শেষ। তাই ঈগলের প্রয়োজনীয়তাও শেষ। তাই আর এটাকে রেখে কি লাভ? এবার তাদের ফিরতে হবে। ফিরতি পথে বোঝা যতো হালকা হয় ততই ভালো।

তাই তারা ঈগলকে এবার মহাশূন্যে দিলেন আলগা করে। ঈগল চিরতরে হারিয়ে গেলো মহাশূন্যে।

এবার তারা ভারশূন্য হয়ে এবং সোজা নামতে লাগলেন পৃথিবীর দিকে। এই ফেরাও ছিলো খুব বিপজ্জনক কাজ। মহাশূন্যের বায়ুহীন পরিবেশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা খুবই বিপজ্জনক। বায়ুর সাথে ঘর্ষণে মহাকাশ যানটি যেকোনো মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে।

কিন্তু এবারেও সফল হলেন মহাকাশচারীরা। ২৪শে জুলাই তারিখের রাত ১০টা ৪৯ মিনিটের সময় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবতরণ করলেন চন্দ্র বিজয়ীরা।

অবতরণের এ স্থানটিও ছিলো পূর্বনির্ধারিত। সেখানে আগে থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ, হর্নেট, অপেক্ষা করছিলো। জাহাজে ছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রবার্ট নিক্সন। তিনিই চন্দ্রবিজয়ীদের জানালেন অভ্যর্থনা।

চাঁদ থেকে ফিরে আসার পরও তাদেরকে ঘরে ফিরতে দেয়া হলোনা। একুশ দিন বন্দী করে রাখা হয়েছিলো একটি পরীক্ষাগারে। তাদের সাথে যারা সাক্ষাৎ করতে



www.nagorikpathagar.org

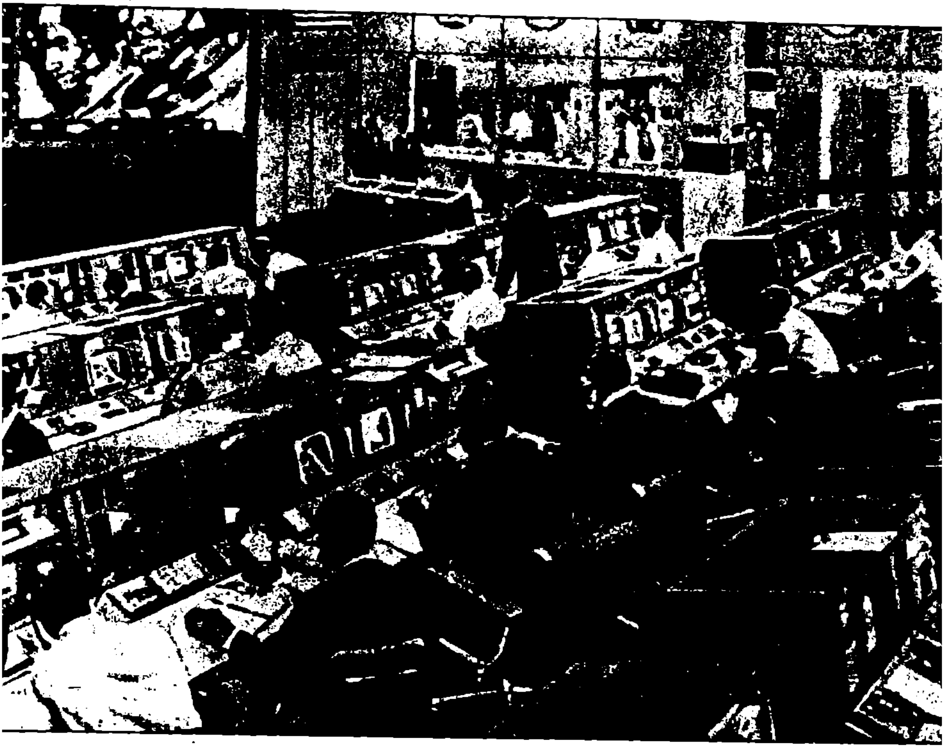

নাসার উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

আসছিলেন তারা কাঁচের আবরণের বাইরে থেকেই কথা বলছিলেন। কারণ তাদেরকে এই একুশ দিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছিলো।

ওরা চাঁদে গিয়ে কিছু নিয়ে এসেছে কিনা, চাঁদের বায়ুহীন পরিবেশে ওদের দেহের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখলেন বিজ্ঞানীরা। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই তাদেরকে ছাড়া হলো পৃথিবীর মুক্ত বায়ুতে'।

## এ্যাপোলো-১২

এ্যাপোলো-১১ এর অভিযাত্রীরা যে চন্দ্র বিজয় করে ফিরে এলেন এখানেই কিন্তু শেষ হলো না। জয় করে আসাটা শেষ নয়, বলতে গেলে হলো শুরু।

চন্দ্রা বিজয়ের পরও যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাপোলো সিরিজের অভিযান চলতেই থাকলো অব্যাহতগতিতে।

এ্যাপোলো-১১ এর মাত্র চারমাস পরেই আবার চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো এ্যাপালো -১২। এ্যাপোলো প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৬৯ সালের ১৪ই নভেম্বর। এই মহাকাশ যানেরও অভিযাত্রী ছিলেন তিনজন। এরা হলেন চালর্স কনরাড (Charlse Conrad) ২ রিচাড গর্ডন (Rechard gordon) এবং এ্যালন বীন।



www.nagorikpathagar.org

এ্যাপোলো-১২ পরিরচালনার ব্যাপারটিও ঠিক এ্যাপোলো-১১এর মতোই ছিলো। ঠিক করা হলো কনরাড এবং এ্যালান বীন চাঁদে নামবেন এবং মূলযান পরিচালনা করবেন রিচার্ড গর্ডন। পৃথিবী থেকে তারা ছয় দিন পরে গিয়ে চাঁদে অবতরণ করবেন।

এবারকার অভিযানটি কিন্তু আগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। প্রথমবারে একমাত্র লক্ষ্য ছিলো চাঁদের মাটিতে অবতরণ। কিন্তু সে কাজতো শেষ হয়েছে। এবার শুধু অবতরণ করলে চলবে না। এবারকার কাজ ছিলো গবেষণা চালানো।

এ্যাপোলো -১১ অবতরণ করে ছিলো চাঁদের 'শান্ত সমুদ্র' অঞ্চলে। কিন্তু এ্যাপোলো-১২ অবতরণ করলো চাঁদের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চল 'ঝঞ্জা সমূদ্রে'।

প্রথমবারের অভিযাত্রীরা চাঁদের বুকে ছিলেন ২২ ঘন্টা। এর মধ্যে চাঁদে বিচরণ করেছিলেন ২ ঘন্টা ১৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড। এ্যাপোলো-১২ এর অভিযাত্রীরা এই রেকর্ড ভঙ্গ করে চাঁদের বুকে অবস্থান করলেন ৩১ ঘন্টা। আর চাঁদে বিচরণ করলেন তিন ঘন্টা।

আগের অভিযাত্রীরা চাঁদের বুক থেকে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ৪৯ পাউণ্ড। এবার তারা আনলেন এর দ্বিগুণেরও বেশী, ১২৮ পাউণ্ড।

এর আগের অভিযাত্রীরা চাঁদের বুকে স্থাপন করেছিলেন তিনটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা যন্ত্র। এবার বসানো হলো ৬ টি যন্ত্র।

এ ছাড়া এবার তারা চাঁদের বুকের রঙিন ছবিও তুলে পাঠালেন পৃথিবীতে। এমনি নানা কাজ সেরে এ্যাপোলো -১২ এর অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন ২৫শে নবেম্বর তারিখে।

পর পর দু'টো অভিযান সফল হবার পর এ্যাপোলো-১৩ এর অভিযানটি কিন্তু ব্যর্থ হয়। এ্যাপোলো -১৩ পাঠানো হয়েছিলো ১৯৭০ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে। এই মহাকাশ যানের অভিযাত্রীরা ছিলেন ফ্রেড হেইশ (F. w. haise jr) জেমস লোভেল (J. A. Lovell Jr) এবং জন, এল সুইগার্ট (J. L swigert Jr).

কিন্তু প্রবাদে যে আছে আন্‌লাকী থারটিন। হতভাগা তেরো। এ্যাপোলো-১৩ অভিযাত্রীদের ভাগ্যেও যে এমনি করে হতভাগ্য ১৩-এর প্রভাব পড়বে তা কে জানতো।

তারা পৃথিবী ছেড়েছিলেন ভালোভাবেই। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় পৌছোতেও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু গোলযোগ দেখা দিলো চন্দ্রযান নিয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণের বেলায়। দেখা দিলো যান্ত্রিক গোলযোগ। সার্ভিস মডিউলে ঘটলো বিস্ফোরণ।

কিছুতেই তারা মূলযান থেকে লুনার মডিউলকে আলাদা করতে পারলেন না। সংগে সংগে তারা পৃথিবীর কন্‌ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগও করলেন। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে প্রেরিত নির্দেশ মোতাবেক তারা আর মেরামত করতে পারলেন না যানটিকে।

তবু যে মারাত্মক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায়নি এটাই ভাগ্য। অবশেষে তাদের নির্দেশ দান করা হলো ফিরে আসতে। শেষে তাই হলো। চাঁদে অবতরণের আশা পরিত্যাগ করে তারা ফিরে চললেন পৃথিবীর বুকে।

তারপর এ্যাপোলো-১৪ প্রেরিত হয়েছিলো এর প্রায় বছর খানেক পরে। ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে। তারা চাঁদে অবতরণ করেছিলেন ৫ই এপ্রিল। এরা চাঁদের যে স্থানটিতে অবতরণ করেছিলেন সে জায়গাটির নাম ছিলো ফ্রা মউরো।

এই যাত্রায়ও অভিযাত্রী ছিলেন যথারীতি তিনজন। অধিনায়ক এ, বি, শেফার্ড জুনিয়র (A . B Shepard jr), এস, এ রোসা (S. A. Roosa). এবং ই. ডি. মিচেল (E. D. Mitechell). তাদের মধ্যে চন্দ্রে অবতরণ করেছিলেন মিচেল এবং শেপার্ড।



www.nagorikpathagar.org

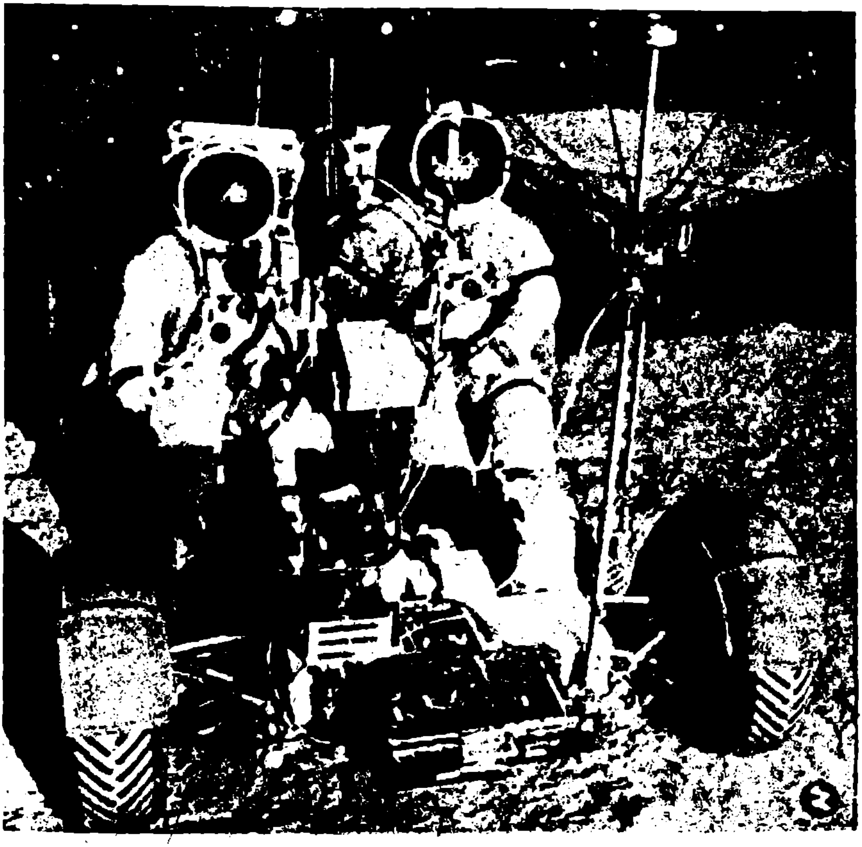

চাদের মাটিতে গাড়ি চালাচ্ছেন এ্যাপোলো-১২ অভিযাত্রীরা

এ্যাপোলো -১৫ তেও ছিলেন তিনজন অভিযাত্রী। এরা হলেন ডি. আর স্কট (D. R. Scott), এ, এম, ওয়ার্ডন (A wordon) এবং জে, বি, ইরউইন (J. B. Iruein). এদের মধ্যে চাঁদে অবতরণ করেছিলো ইরউইন এবং স্কট। এ্যাপোলো -১৫ নভোযানটি প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ২৬ শে জুলাই এবং চাঁদে অবতরণ করে ৩১ শে জুলাই (১৯৭১)।

চাঁদে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চমতম মনুষ্য অবতরণ অভিযান ছিলো এ্যাপোলো -১৬। এটি প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের ১৬ই এপ্রিল এবং অভিযাত্রীরা চাঁদে অবতরণ করেন ২১ শে এপ্রিল (১৯৭১) তারিখে।

অভিযাত্রীরা ছিলেন- জে ডব্লিউ ইয়ং (J, W, young). সি. এম. ডিউক জুনিয়র (C. M. Duke Jr) এবং টমাস কে মাটিংলি দ্বিতীয় (Tomas k.



www.nagorikpathagar.org

Mattingly-II)

এই এ্যাপোলো -১৬ এর গুরুত্ব ছিলো আরো একটু বেশী। এটি আসলে ছিলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা অভিযান। চাঁদের মাটিতে প্রাণী বাস করা সম্ভব কিনা তারই বিস্তারিত গবেষণা চালানোর জন্য পাঠানো হয়েছিলো নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এছাড়াও পাঠানো হয়েছিলো ৬,০০,০০,০০০টি ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক। এই জীবগুলোর উপর চাঁদের আবহাওয়া কি রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এটা দেখানো ছিলো এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

অবশ্য তারা এই অভিযানে গিয়ে চন্দ্রশীলাও সংগ্রহ করেছিলেন।

এ্যাপোলো সিরিজের সর্বশেষে নভোযান ছিলো এ্যাপোলো -১৭। যুক্তরাষ্ট্রের মনুষ্যবাহী এ্যাপোলো অভিযান শুরু হয়েছিলো ১৯৬৮ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে এ্যাপোলো-৭ এর মধ্য দিয়ে আর শেষ হলো ১৯৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রেরিত এ্যাপোলো -১৭ এর মধ্য দিয়ে।

এ্যাপোলো-১৭ এর অভিযাত্রীরা ছিলেন-. ইউজিন কারনান (E. A Cernan) ড ঃ এইচ, এইচ স্মীথ (H. H. Schmith). এবং আর, ই, ইভান্স (R. E. Evans).

এটি ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠতম ও শেষতম মনুষ্যবাহী এ্যাপোলো চন্দ্রাভিযান।

## সোভিয়েট ইউনিয়নের মঙ্গল গ্রহ অভিযান

এটা হলো মহাকাশ অভিযানের তৃতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব ছিলো পৃথিবীর কক্ষ পথে ভ্রমণ এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করার চেষ্টা। সে চেষ্টায় মানুষ সফলতা লাভ করেছে অল্প দিনের মধ্যে। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের অভিযান। চন্দ্রাভিযান। তাও সফল হলো।

এবার পৃথিবীর মানুষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো আরো দূরে। তাদের যাত্রা শুরু হলো গ্রহান্তরেরপথে।

চাঁদের পরেই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হলো মঙ্গল এবং শুক্র। এর মধ্যে শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ। কিন্তু পৃথিবীতে বসেই শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখে শুক্রগ্রহের উপরিভাগের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে এখানে মানুষ অবতরণ করার কথা কল্পনা করা যায় না। শুক্রের পৃষ্ঠদেশে সর্বক্ষণ বয়ে যাচ্ছে ঝড় ঝঞ্ঝা।

এরপর আছে মঙ্গলের কথা। মঙ্গল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসে তখন এর দূরত্ব দাঁড়ায় ৬,৪৪,০০০ কিলোমিটার (৩,৪০,০০০ মাইল)।

মঙ্গলে অভিযান চালানোর মধ্যেও আছে অনেক সমস্যা। চাঁদের বুকে অভিযান চালানো যতো সহজ, মঙ্গলে ততো সহজ নয়। এর প্রধান কারণ দূরত্ব। বর্তমানেও মহাকাশযানের যে গতিবেগ তাতে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে গিয়ে পৌঁছোতে সময় লাগবে প্রায় একবছর।

এছাড়া চাঁদের তুলনায় মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বহুগুণে বেশি। যেমন করে অনায়াসে চাঁদে নামা গেছে, এতো অনায়াসে মঙ্গল পৃষ্ঠদেশে অবতরণ করা সম্ভব নয়।

তাই প্রথমেই মঙ্গলে মনুষ্যবাহী নভোযান পাঠানো যাবে না। পাঠাতে হবে মনুষ্যবিহীননভোযান।



www.nagorikpathagar.org

## মারস সিরিজ

সোভিয়েট ইউনিয়ন মঙ্গল গ্রহ অভিযানের জন্য যে সিরিজের রকেট প্রথমে প্রেরণ করেছিলো সে ছিলো মারস সিরিজ। মারস (Mars) শব্দের অর্থও মঙ্গল। তাই মঙ্গলের জন্য মঙ্গল নামেই নভোযান তৈরি করা হলো।

সোভিয়েট ইউনিয়ন মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে এই মারস অভিযান কিন্তু শুরু করেছিলো অনেক আগে থেকেই। তখনো চাঁদে মানুষ নামার কথা হয়নি। চাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অভিযানই ছিলো তখন প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে। সেই সময়েই সোভিয়েট ইউনিয়ন মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন এই মারস সিরিজের প্রথম নভোযান মারস-১। মারস-১ প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৬২ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে।

তারপর অবশ্য দীর্ঘদিন স্থগিত ছিলো মারস সিরিজের অভিযান। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র দুপক্ষই ব্যস্ত ছিলো চন্দ্রাভিযান নিয়ে।

চন্দ্রাভিযান শেষ হবার পর আবার নতুন করে শুরু হলো মঙ্গল গ্রহ অভিযান। মনুষ্যবিহীন মারস-২ প্রেরিত হয় ১৯৭১ সালের ২০ শে মে এবং এটি মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি পৌঁছে এই বছরেরই নভেম্বর মাস নাগাদ।

মারস সিরিজের তিন নম্বর নভোযান প্রেরিত হয় ২ নং এর মাত্র সাতদিন পরে। অর্থাৎ ২৮ শে মে (১৯৭১) তারিখে। মারস-৩ও মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে নভেম্বর মাসেই। কিন্তু অভিযানটি পুরোপুরি সফল হয়নি। এটি ধ্বংস হয়ে যায় মিশন শেষ করার আগেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আংশিকভাবে যে তথ্য প্রেরণ করে তা থেকেই প্রথম জানা যায় মঙ্গল গ্রহে অক্সিজেন আছে।

মারস-৪ প্রেরিত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ শে জুলাই। দীর্ঘ ছয় মাস একটানা চলে মারস-৪ অতিক্রম করে ৪৬ কোটি কিলোমিটার পথ।

মারস-৫ পাঠানো হয় মারস-৪ এর মাত্র চারদিন পরে। ২৬ শে জুলাই (১৯৭৩) তারিখে। মারস-৫ মঙ্গলের কক্ষ পথে প্রবেশ করে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

১৯৭৩ সালের ৫ই আগষ্ট উৎক্ষিপ্ত হয় মারস-৬। উৎক্ষেপণের মাত্র ১৪৭ সেকেণ্ড পরেই যদিও এর একটি ক্যাপসুল নষ্ট হয়ে যায়, তবু এর গতি থাকে অব্যাহত। ১৯৭৪ সালের ১২ই মার্চ এটি মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং এর অন্য একটি ক্যাপসুল অবতরণ করানো হয়।

মারস-৬ মঙ্গলের অনেক মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। তারপরেও মারস-৭ নামে অপর একটি নভোযান প্রেরণ করা হয়েছিলো সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। কিন্তু এটি মঙ্গলের কক্ষ পথে প্রবেশ করার পরই ধ্বংস হয়ে যায় এবং পুনরায় মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে।

## সোভিয়েট ইউনিয়নের শুক্রগ্রহ অভিযান

শুধু মঙ্গল গ্রহ নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ গ্রহ শুক্রের রহস্য সন্ধানেও নভোযান প্রেরণ করে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন শুক্রগ্রহে নভোযান প্রেরণ করে মঙ্গল গ্রহেরও আগে। শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে যে নভোযান সিরিজটি পাঠানো হয় তার নাম ছিলো ভেনাস সিরিজ।



www.nagorikpathagar.org

## ।াস সিরিজ

.গ্রহের ইংরেজী নাম হলো ভেনাস্ (Venus). তাই তার উদ্দেশ্যে প্রেরিত নরও নাম রাখা হয়েছে ভেনাস।

ক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম ভেনাস (Venus-1) প্রেরিত হয় ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী তারিখে। এটি ১,০০,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে শুক্রকে অতিক্রম

ভনাস -২ প্রেরিত হয় ১৯৬৫ সালের ১২ই নবেম্বর। ভেনাস-৩ প্রেরিত হয় এর রদিন পরে অর্থাৎ ১৬ই নবেম্বর (১৯৬৫ সাল)। ভেনাস-৩ ই প্রথম শুক্র গ্রহের বিক্ষুব্ধ বুকে অবতরণ করে। এটি শুক্রপৃষ্ঠে মাত্র ঘন্টা কয়েক সচল ছিলো। পরই শুক্রের প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবে বিকল হয়ে পড়ে।

ভেনাস-৪ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই জুন। এটিও নিরাপদে শুক্রের বুকে অবতরণ করে এবং শুক্রের আবহাওয়া বিশেষ করে অতিবেগুনী রশ্মি, ম্যাগনেটিক ফেল্ড এবং অন্যান্য বিষয়ে মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করে। কিন্তু এটি শুক্রের প্রতিকূল আবহাওয়ায় বেশিক্ষণ সক্রিয় থাকতে পারেনি। কিছুক্ষণ তথ্য প্রেরণ করেই নির্জীব হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় তথ্য প্রেরণ।

ভেনাস-৫ প্রেরিত হয় ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী। ভেনাস-৬ প্রেরিত হয় ১০ই জানুয়ারী (১৯৬৯ সাল)।

ভেনাস -৭ প্রেতি হয় ১৯৭০ সালের ১৭ই আগষ্ট এবং এটি শুক্রগ্রহের বুকে অবতরণ করে এই বছরেরই ১৭ ই ডিসেম্বর মাসে। এটিও দীর্ঘসময় সক্রিয় থাকতে পারেনি শুক্রের বুকে। মাত্র ৩৫ মিনিট কাল সচল ছিলো। এর মধ্যেই অনেক মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করে সে পৃথিবীর বুকে।

ভেনাস-৮ প্রেরিত হয়-১৯৭২ সালের ২৮ শে মার্চ তারিখে এবং এটি শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে এই বছরের ২২ শে জুলাই তারিখে।

ভেনাস-৯ প্রেরিত হয় ১৯৭৫ সালের ৮ই জুন তারিখে এবং এটি শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে ২২শে অক্টোবর।

ভেনাস-১০ উৎক্ষিপ্ত হয় -১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন তারিখে এবং শুক্র পৃষ্ঠ অবতরণ করে ১৯৭৫ সালের ২৫ শে অক্টোবর।

এই সিরিজের সর্বশেষ নভোযান ভেনাস-১১ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরতারিখে।

## সোভিয়েটের
## সয়ুজ-স্যালুট সিরিজ

সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুধাবন করতে পেরেছিলো -যদি মহাকাশ গবেষণাকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করতে হয় তবে তা শুধু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সম্ভব নয়।

এর জন্য মহাকাশের বুকেই অবস্থান করতে হবে। স্থাপন করতে হবে মহাকাশ ষ্টেশন। অবশ্য তার জন্য চাই প্রচুর অভিজ্ঞতা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশে ষ্টেশন তৈরির প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। এবছরই সোভিয়েট সয়ুজ সিরিজের মহাকাশযান প্রথম কক্ষপথে সংযুক্ত হয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক ষ্টেশন তৈরি করে।

সোভিয়েট ইউনিয়েন যে মহাকাশ ষ্টেশন সিরিজ স্থাপন করে তার নাম ছিলো স্যালুট সিরিজ।



www.nagorikpathagar.org

১৯৭১ সালের ১৯ শে এপ্রিল তারিখেই মস্কো বেতার থেকে ঘোষণা করা পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশ ষ্টেশন স্যালুট চলমান রয়েছে। এই মহাকাশ স্যালুটের সাথে মিলিত হবার জন্যই ১৯৭১ সালের ৬ই জুন তারিখে মহাকাশে করা হয় নভোযান সয়ুজ-১১।

অবশ্য সয়ুজ সিরিজের নভোযানও প্রেরণ এই প্রথম নয়। এর আগেও এ সি দশটি নভোযান আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো।

সয়ুজ সিরিজের প্রথম নভোযান সয়ুজ-১ প্রেরিত হয় ১৯৬৭ সালের ২৩ শে তারিখে। এতে একমাত্র নভোচারী ছিলেন ভি, এম, কোমারভ (V. M. Komar কিন্তু তিনি মহাকাশযাত্রা শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান।

সয়ুজ সিরিজের দ্বিতীয় নভোযান সয়ুজ-২ উৎক্ষিপ্ত হয় মনুষ্য বিহীন হিসেবে সয়ুজ-৩ নভোযানটি ১৯৬৮ সালের ২৬ শে অক্টোবর তারিখে। এতেও নভোচারী ছিলে মাত্র একজন। জি, বেরেগোভয় (G. Beregovoy).

সয়ুজ-৪ এবং সয়ুজ -৫ মহাকাশযান দুটি ছাড়া হয় ১৯৬৯ সালের যথাক্রমে ১৪ই এবং ১৫ই জানুয়ারী তারিখে। তাতে মহাকাশযাত্রী ছিলেন যথাক্রমে ভি, স্যাটল (V. Shatalov) এবং বি, ভোলিনভ (B. Volynov). এরা মহাকাশে পরস্পরে সাথে মিলিত হন এবং বার্তা বিনিময় করতে সক্ষম হন।

এরপর সয়ুজ সিরিজের ৬, ৭ এবং ৮ নং নভোযানগুলোও পাঠানো হয়েছিলো এক সাথে। এগুলো পাঠানো হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে যথাক্রমে ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই অক্টোবর তারিখে।

এই নভোযান গুলোর প্রত্যেকটিতে নভোচারী ছিলেন দু'জন করে। সয়ুজ-৬ ছিলেন জি, শোনিন (G. Shonin) এবং ভি-কুবাসভ (V. Kubasov). সয়ুজ-৭ তে ছিলেন এ. ফিলিপচেংকু (A. Philipchenko) ভি. ভলকভ (V. Volkov). এবং সয়ুজ -৮ তে ছিলেন ভি, স্যাটালভ (V. Shatalov). এবং এ. ইয়েলিসেয়েভ (A. Yeliseyev).

এই মহাকাশ তিনটি যৌথভাবেই কক্ষপথ অতিক্রম করেছিলো এবং একযোগে গবেষণা পরিচালনা করেছিলো। নভোচারীরা একে অপরের সাথে করেছিলেন তথ্য বিনিময়।

এ সিরিজের ৯ নং মহাকাশ যানটি প্রেরণ করা হয়েছিলো ১৯৭০ সালের ১লা জুন তারিখে। এতেও ছিলেন দু'জন মহাকাশচারী। এরা হলেন-এ, জি, নিকোলভ (A. G. Nikolayev) এবং ভি, আই, সেবাষ্টেইনভ (V. I. Sevastianov).

এ সিরিজের ১০ নং সয়ুজ নভোযানটিই সর্ব প্রথম স্যালুট মহাকাশ ষ্টেশন সিরিজের সাথে মিলিত হয়। এতে নভোচারী ছিলেন ভি, স্যাটলভ, এবং এ, ইলেসিয়েভ। এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭১ সালের ২২ শে এপ্রিল তারিখে।

এর পরই আসে মহাকাশ যান সয়ুজ-১১ এর কথা। সয়ুজ -১১ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭১ সালের ৬ই তারিখে। এতে নভোচারী ছিলেন তিন জন। এরা হলেন-জি, টি, দব্রোভয়স্কি (G.T. Dobrovolsky) ভি, এন, ভলকভ (V. N. Volkov). এবং ভি, আই প্যাটসায়েভ (v. i. Patsayev).

এরা মহাকাশে কক্ষপথ পরিক্রমণরত মহাকাশ ষ্টেশন স্যালুট-১ এর সাথে মিলিত হন। তারা সয়ুজকে স্যালুটের সাথে সংযুক্ত করে মহাকাশযান থেকে চলে আসেন



www.nagorikpathagar.org

মহাকাশ স্টেশন স্যালুটে।

এবার স্যালুটও হলো মনুষ্যচালিত মহাকাশযান। স্যালুট মহাকাশ স্টেশনটির আকৃতি ছিলো বিশাল। মালবাহী রকেটসহ দৈর্ঘ্য ছিলো ২৩ মিটার। ওজন ছিলো প্রায় ... টন এবং প্রেসার মডিউল গুলোর আয়তন ছিলো ১০০ ঘন মিটার।

নভোযান থেকে নভোচারীরা প্রবেশ করেন স্যালুটের দূরবীন 'ওরিয়ন' নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখান থেকে তারা এলেন স্টেশনের মূল কর্মস্থল ওয়ার্কিং মডিউলে।

স্যালুট স্টেশনে নভোচারীরা বড় আকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করেন। নভোযানটিতে দূরের নক্ষত্র সমূহের বর্ণছটা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম এমন ধরনের যন্ত্রপাতি বসানো ছিলো। পৃথিবীর বাইরে এই সর্বপ্রথম এ ধরনের জ্যোতির্ষীয় মানমন্দির কাজ করেছিলো। তাঁরা পৃথিবীবক্ষের ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রগতি, বরফের আচ্ছাদন এবং কৃষি খামারের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, বায়ু ও জলের পরিচ্ছন্নতার মান নির্ণয়, খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের কাজকে সহজতর করার জন্য ভূতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র গ্রহণ প্রভৃতির উপর বহু সংখ্যক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। তারা জীববিজ্ঞানের উপরেও গবেষণা চালান।

তাদের এ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিলো সত্যি এক বিশাল কর্মকাণ্ড। মহাকাশ স্টেশন স্যালুট দীর্ঘ ২৪ দিন অবস্থানের পর তারা ফিরে যান সয়ুজ -১১ নভোযানে।

সয়ুজ-১১ প্রত্যাবর্তন করে ২৯ শে জুন তারিখে। কিন্তু নভোযানটি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনকালে মহাশূন্য যানের ভিতরে সহসা চাপ হ্রাস পেয়ে যাওয়ার ফলে নভোচারীরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যান।

মৃতদেহ নিয়ে সয়ুজ-১১ ৩০শে জুন তারিখে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটি ছিলো সোভিয়েট মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে সর্বচাইতে মর্মান্তিক দূর্ঘটনা।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা স্যালুটকে আরো উন্নত ও নিখুঁত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। কক্ষপথে স্টেশনের নতুন নতুন ধরনের নানা প্রকার প্রকৌশল দক্ষতা প্রয়োগ করতে থাকেন।

এরপর প্রেরিত হয় এই মহাকাশ স্টেশন সিরিজ স্যালুট-এর আরো নতুন উপগ্রহ। স্যালুট -৩ এবং-৪ এর যানগুলোকে আরো উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজ্জিত করা হয়।

যেমন আগে সৌর ব্যাটারীর প্যানেলগুলো স্টেশনের গায় লেগে থাকতো এবং সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়ার জন্য স্টেশন ও নভোযান উভয়কেই অনেকক্ষণ ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখতে হতো। ঘূর্ণনের সাহায্যে এ অবস্থান রক্ষা করা হতো। নতুন ধরনের স্যালুটের সৌর ব্যাটারীর প্যানেল গুলো কিছুটা স্বাধীন ছিলো। এবার এগুলো প্রয়োজনমতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরতে পারতো।

এছাড়া মহাকাশ স্টেশনের ভিতরে অনেক নতুন যন্ত্রপাতিও সংযোজন করা হলো। যেমন-স্যালুট -৪ এর নভোচারীরা যাতে তাদের প্রতিদিনের জঞ্জাল ধাতব পাত্রে সংগ্রহ করে বিশেষ দরোজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পারে তার ব্যবস্থা ছিলো।

আভ্যন্তরীণ বাতাস থেকে যে আর্দ্রতার জন্ম নিতো স্যালুট -৪ এ তারও সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিলো।

স্যালুট-৪ তার পূর্ববর্তী নভোযান গুলোর তুলনায় বেশ উঁচু দিয়ে উড়তে পারতো। তারপর যখন স্যালুটে কোনো নভোচারী থাকতো না তখনো সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে পারতো মহাশূন্যে। স্যালুট-৪ এ এই প্রথম স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। নভোযানেই প্রয়োজনীয় ডাটা প্রসেসিং এর পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে নভোচারীদের প্রতিদিন পৃথিবী থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহের ঝামেলা পোহাতে হয় না।



www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী ষ্টেশন স্যালুট-৫ এরও পূর্ববর্তী ষ্টেশনগুলোর তুলনায় বেশ কিছু ন ছিলো। এদের একটি হলো ষ্ট্যাবিলাইজেন পদ্ধতি। এখানে শুধুমাত্র জেট ইঞ্জিনই ব্য হয়নি, এখানে চুম্বক ক্ষেত্রে বল-ফ্লাইট হুইলও ছিলো।

যখন নভোযান কোনো কারণে অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতো, তখন এই হু তাকে সঠিক স্থানে ফিরিয়ে আনতো।

১৯৭৭ সালের ২৯ শে মে তারিখে মহাকাশে স্থাপন করা হয় স্যালুট -৬। এ কক্ষ ষ্টেশনটি নির্ভর যোগ্য মহাকাশ ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

এর আগে কখনো মহাকাশ জেটিতে একসাথে দুটো নভোযান নোঙর করতে পারেনি। স্যালুট-৬ এ তারও ব্যবস্থা করা হলো।

এছাড়া এই প্রথমবারের মতো নভোচারীরা কক্ষপথ পরিক্রমণ কালেই শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ তথ্য পাঠাননি, তারা পৃথিবী পৃষ্ঠে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত ফলাফলও ফেরত পান।

সপ্তাহ, মাস, বছর গড়িয়ে গেলো নভোচারীদের দল পরিবর্তন হলো, কিন্তু ষ্টেশনটি আগের মতোই নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে যেতে লাগলো। স্যালুট -৬ কক্ষপথ ষ্টেশনটি সত্যিকার অর্থেই প্রযুক্তিশত গবেষণাগারের সাথে তুলনীয় ছিলো। এটি দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে মহাকাশে অবস্থান করে একের পর এক পরিক্রমণ চক্র অণুসরণ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। ষ্টেশনটি ২০টি যাত্রীবাহী সয়ুজ নভোযানকে স্বাগত জানিয়েছে।

১৯৮২ সালের মাঝামাঝির দিকে তার উড্ডয়ন কার্যকক্রম শেষ করলে তার স্থান দখল করে স্যালুট -৭ ষ্টেশনটি। এটি ছিলো আরো উন্নত প্রযুক্তিতে পরিপূর্ণ।

স্যালুট-৭ এ স্হাপিত এক্সরে টেলিস্কোপের সাহায্যে নভোচারীরা জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তুর রশ্মি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেন। মহাকাশ ষ্টেশন স্যালুটের সাথে মিলিত হবার জন্যই একের পর এক পৃথিবী থেকে প্রেরিত হয় সয়ুজ সিরিজের নভোযান গুলো।

সয়ুজ-১২ প্রেরিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। নভোচারী ছিলেন ভি, ল্যাজারেভ (V. Lazarev) এবং ও, মাকারভ (O. Makarov).

সয়ুজ -১৩ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর। এতে নভোচারী ছিলেন পি. ক্লিমুক (P, Klimuk) এবং ভি. লেবেডেভ (V. Lebedev). এটি শুধু স্যালুটের সাথে মিলিতই হয়নি এটি জ্যোর্তিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের সম্পদ সগ্রহের বিষয়েও গবেষণা চালিয়ে ছিলো।

সয়ুজ-১৪ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৪ সালের ৩রা জুলাই তারিখে। এটি স্যালুট-৩ এর সাথে মিলিত হয়। তাতে নভোচারী ছিলেন পি, পপভিচ (P, Popovich) এবং ওয়াই, আটিওখিন (Y. Yatyankhin)।

সুয়ুজ-১৫ পাঠানো হয় ১৯৭৪ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে। এতে নভোচারী ছিলেন জি, সারাফানভ (G, sarafanov) এবং এল, ডেমিন (L. Demin)। এটি মহাকাশ ষ্টেশন স্যালুট -৩ এর সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং কোনো রকম গবেষণাকর্ম পরিচালনা না করেই ফিরে আসে পৃথিবীতে। এটি ছিলো একটি ব্যর্থ মিশন।

সয়ুজ -১৬ প্রেরিত হয় ১৯৭৪ সালের ২রা ডিসেমর তারিখে। এতে নভোচারী ছিলেন -ফিলিপচেংকু এবং এন, রুকাভিসনকভ ( N. Rukavishnkov) এটিও ছিলো একটি পরীক্ষামূলক মহাকাশ অভিযান।

স্যালুট -৪ এর সাথে মিলিত হবার জন্য সয়ুজ -১৭ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৫ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে। এতে নভোচারী ছিলেন- এ,গুবারেভ (A Gubarev) এবং



www.nagorikpathagar.org

গ্রিস্‌কো (g. grechko)।

সয়ুজ-১৮ নভোযানটিও স্যালুট-৪ এর সাথে মিলিত হবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। এতে নভোচারী ছিলেন পি, ক্লিমুখ (P. Klimuk) এবং ভি, কুবাসভ (V. Kubasov). নভোযানটি প্রেরণ করা হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২৪ মে তারিখে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রেরিত হয় এ সিরিজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নভোযান সুয়জ-১৮। এতে নভোচারী ছিলেন ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ভ্যালেরী কুবাসভ এবং কর্নেল আলেক্সি এলিয়নভ। এর ঐতিহাসিক ঘটনা হলো- তারা ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই মার্কিন নভোযান এ্যাপোলো -১৮ এর সাথে মহাশূন্যে মিলিত হন। তারপর ২১শে জুলাই পৃথিবীতে প্রত্যবর্তন করেন।

সয়ুজ-২১ মহাকশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে। নভোচারী ছিলেন বি, ভলিনভ (B. Volynov) এবং ভি. ঝুলুবভ (V. Zholobov), তারা ২০শে জুন তারিখে স্যালুট-৫ এর সাথে মিলিত হন এবং ৫০ দিন মহাশূন্যে অবস্থান করার পর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

সয়ুজ -২২ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এবং এতে নভোচারী ছিলেন ভি, বাইকোভস্কি (V. Bykovsky) এবং ভি. এক্‌ সেনভ (V. Aksenov)।

সয়ুজ -২৩ মহাকাশে প্রেরিত হয় ১৯৭৬ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে এবং এতে নভোচারীদ্বয় ছিলেন ভি. জুডভ (V. Zudov) এবং ভি, রসডেস্টভেনস্কি (V. Rozhdestvensky). এরা স্যালুট-৫ এর সাথে মিলিত হতে যেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

সয়ুজ-২৪ প্রেরিত হয় ১৯৭৭ সালের ৭ ই ফেব্রুয়ারী এবং এতে নভোচারী ছিলেন ভি. ভি গোরবাটকো (V. V. Gorbatko) এবং ওয়াই গ্ল্যাসকভ (Y. Glazkov). এরা স্যালুট -৫ এর সাথে মিলিত হন।

সয়ুজ-২৫ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৭ সালের ৯ই অক্টোবর এবং এতে নভোচারী ছিলেন ভি কভালেন্ক ( V. Kovalenok) এবং ভি. রাইয়োমিন (V. Ryumin), এরা স্যালুট -৬ এর সাথে মিলিত হতে গিয়ে ব্যর্থ হন।

সয়ুজ-২৬. মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর এবং ১১ই ডিসেম্বর স্যালুট-৬ এর সাথে মিলিত হয়। এতে নভোচারী ছিলেন ইউরি রোমানেনকো (Y. Romanenko) এবং জি. গ্রেস্কো (G. Grechko). এরা মোট ৯৬ দিন স্যালুট -৬ এ অবস্থান করেন। অতঃপর সয়ুজ- ২৭ এর মাধ্যমে ১৯৭৮ এর ১৬ই মার্চ - তারিখে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সয়ুজ-২৭ মহাকাশে প্রেরিত হয় ১৯৭৮ সালের ১০ই জানুয়ারি এবং ১৬ই মার্চ (১৯৭৮) সয়ুজ-২৬ এর নভোচারীদ্বয়কে নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সয়ুজ -২৮ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৮ সালের ২রা মার্চ এবং ৩রা মার্চ স্যালুট -৬ এর সাথে মিলিত হয়। এতে নভোচারী ছিলেন আলেক্সি গুবারেভ (A. A. Gubarev). এই সয়ুজ ২৮-এর একটি বিশেষত্ব হলো এই প্রথম একজন বিদেশীকে মহাকাশে প্রেরণ করলো রাশিয়া। ভি. রেমেক এর দেশ হলো চেকোস্লোভাকিয়ায়।

সয়ুজ-২৯ প্রেরিত হয় ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুন তারিখে এবং ১৭ ই জুন স্যালুট-৬



www.nagorikpathagar.org

এর সাথে মিলিত হয়। এতে নভোচারী ছিলেন ভি. কোভালিওনক (V. Kovalionok) এবং এ, ইভানচেনকভ (A. Evanchenkov). এরা ২৪০ দি· মহাশূন্যে অবস্থানের পর ১৯৭৮ সালের ২রা নবেম্বর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সয়ুজ -৩০ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭৮ সালের ২৭ শে জুন তারিখে। নভোচারী ছিলেন পি, ক্লিমাক (Klimuk) এবং মিরেশ্লে হারমাসজেসিক (Mirushlu Hermussik)। তারা স্যালুট -৬ অবস্হানরত সয়ুজ -১৯ এর নভোচারীদ্বয়ের সাথে মিলিত হন। সয়ুজ ৩০ এর নভোচারীদ্বয় স্যালুট -৬৩ এ ৭দিন অবস্হান করে পৃথিবীতে প্রত্যাবতনকরেন।

সয়ুজ -৩২ প্রেরিত হয় ১৯৭৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং এতে নভোচারী ছিলেন ভি. বাইয়ুমিন এবং ভি. লিয়াকভ। এরা ১৭৫ দিন মহাশূন্যে অবস্হান করার পর ১৯শে আগষ্ট (১৯৭৯) তারিখে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। সয়ুজ -৩৩ প্ররিত হয় ১৯৭৯ সালের ২রা এপ্রিল তারিখ এবং তাতে নভোচারী ছিলেন এন, রিস্কা ভিসনিকভ (N, Riskavisnikov) এবং বুলগেরিয়ান নাগরিক জর্জ ইনভোনভ (G. Invonov) এরা যানটিকে স্যালুট -৬ এর সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন পৃথিবীতে।

সয়ুজ-৩৫ প্রেরিত হয় ১৯৮০ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে। নভোচারী ছিলেন ভি রাইয়ুমিন এবং এল পোপভ তারা ১০ই এপ্রিল স্যালুট -৬ এর সাথে মিলিত হন। নভোচারীদ্বয় ১৮৫ দিন মহাশূন্যে অবস্থানের করার পর পৃথিবীতে ফিরে আসেন ১১ই অকটোবর ১৯৮০ তারিখে।

সয়ুজ-৩৬ মহাকাশ যানটি উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৮০ সালের ২৬শে মে তারিখে। নভোচারী ছিলেন ভি কুভাসভ (V. Kovasov) এবং হাঙ্গেরী নাগরিক বারটানাল দার কুসদ্ (Bartarlan Darkusd)। এরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন ৩রা জুন ১৯৮০ তারিখে।

সয়ুজ -৩৭ যানটি মহাকাশ প্রেরিত হয় ১৯৮০সালের ২৩শে জুলাই এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন এক সপ্তাহ পরে। তাতে নভোচারী ছিলেন ভি গারবাট কো (V. Garbatoko) এবং ফামটুয়ান ছিলেন সয়ুজ ৩৭ এর নভোচারী। ফামটুয়ান কিন্তু একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে একটি বি -৫২ মার্কিন বোমারু বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করার কৃতিত্বের জন্য 'অর্ডার অব লেনিন' এবং 'হিরো অব সোভিয়েত ইউয়িন' উপাধিতে ভূষিত হন।

সয়ুজ-৩৮ নভোযানটি মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয় ১৯৮০ সালের ৬ই জুলাই। এতে নভোচারী ছিলেন ইউরি মালিয়েভ এবং ভি আবাশোনভ। নভোচারীরা পৃথিবীর সাথে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নতুন যন্তপাতির সাহায্যে নিজস্ব প্রচেষ্টায় সলূট -৬ এর সাথে মিলিত হন।

সয়ুজ -৩৯ মহাকাশ যানটি ছিলো সয়ুজ মহাকাশযানটি সিরিজের সর্বশেষ যান। এই সর্বশেষ যানের নভোচারী ছিলেন ভি দানিনিকভ (V Daninikov) এবং মঙ্গোলীয় নাগরিক যুদগার দেখিনি গারাবা। এরা স্যালুট-৬ এবং ৪এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য সিরিজ

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ যান সিরিজের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ



www.nagorikpathagar.org

্যা কস্‌মস্‌ সিরিজ। কসমস সিরিজের প্রথম মহাকাশযানটি কসমস-১ মহাকাশে ক্ষিত হয় ১৯৬৯ সালের ১৬ই মার্চ। এর উদ্দেশ্য ছিলো মহাশূন্য অভিযান পরিকল্পনার য়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

আজ পর্যন্ত এই সিরিজের ৩০০ এরও বেশী যান মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। র মধ্যে কসমস ২৮ এবং তার পরের কতকগুলো উপগ্রহ আবহাওয়া উপগ্রহ হিসেবে জ করে।

এ ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানের জন্য 'মিটিরিয়র' সিরিজ নামে আরো একটি মহাকাশ যান প্রেরণ করে।

## সয়ুজ—এ্যাপোলো সংযোগ

মহাকাশে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয় প্রধান সহযোগীও বটে।

যেহেতু মহাকাশে এদুটো দেশই সবচেয়ে অগ্রগামী, তাই তাদের কার্যক্রমের মধ্যেও একটি পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা দরকার। এ সত্যটি অবশেষে দুটি দেশই উপলব্ধি করতে শুরু করে। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কাজ করার চেয়ে সহযোগিতা করা অনেক লাভের।

মহাকাশের অসীম শূন্যতায় বিপদ আপদেরতো শেষ নেই। তাই সেখানে একের বিপদে অপরে এগিয়ে আসতে পারে। একজনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে অন্যজন।

মহাকাশে গবেষণার এই পারস্পরিক সহযোগিতা লাভের লক্ষ্যেই মহকাশে প্রথম মিলন এ্যাপোলো-সয়ুজের।

এ অভিযানটির পুরো নাম ছিলো 'এ্যাপোলো-সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান।'

এই অভিযানটি পরিচালিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে। এতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ যান সয়ুজ-১৯ এর মহাকাশচারী ছিলেন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ভ্যালেরী কুবাসভ এবং কর্নেল আলেক্সি এলিওনেভ।

অপরদিকে মার্কিন নভোযান এ্যাপোলো-১৮ এর অভিযাত্রী ছিলেন টমাস ষ্টাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রাণ্ড এবং ডলান্ড স্লেইটন।

সোভিয়েট মহাকাশ যানটি উৎক্ষিপ্ত হয় ১৫ই জুলাই বিকেল ৩ টা ২০ মিনিটের সময় (মস্কোর সময়) বাইকোনুর মহাকাশ ঘাঁটি থেকে। এর সাত ঘন্টা পরে রাত ১০ টা ৫০ মিনিটের সময় (মস্কোর সময়) এ্যাপোলো -১৮ উৎক্ষিপ্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের কানাভেরাল অন্তরীপে অবস্থিত কেন্দ্র থেকে।

মহাকাশ যান দুটি মহাকাশে মিলিত হয় এর দুদিন পরে ১৭ই জুলাই দুপুর ১২টার (মস্কো সময়) দিকে।

সংযোজনের আগে সয়ুজ পৃথিবীর চারদিকে মোট তিরিশ বার চক্কর দেয়। এর মধ্যে তেরোটিই সংযোজনিক কক্ষে। সংযোজনের মুহূর্তে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এ্যাপোলোর ডকিং এসেমব্লিতে একটি নিশানা তৈরি করে প্রথমে। যাতে উভয়ে কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারটি সহজতর হয়। সয়ুজের খোলা সৌর ব্যাটারিগুলো অনেকটা আলোর সংকেতের কাজ করে এবং এ্যাপোলোর কাছাকাছি হওয়ার সময় জ্বেলে দেয়া হয় অবস্থান নির্ণয়ক আলো। এই আলোর সংকেতের সাহায্যে কয়েকশো কিলোমিটার দূর থেকেও এ্যাপোলোর নভোচারীরা তা দেখতে পান। এভাবেই অতি সাবধানে এবং ধীরে ধীরে তারা অগ্রসর হয় পরস্পরের দিকে। অবশ্য সয়ুজ এবং এ্যাপোলোর সন্ধানে ও মিলনে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি এড়ানোর জন্য পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আগে থেকেই



www.nagorikpathagar.org

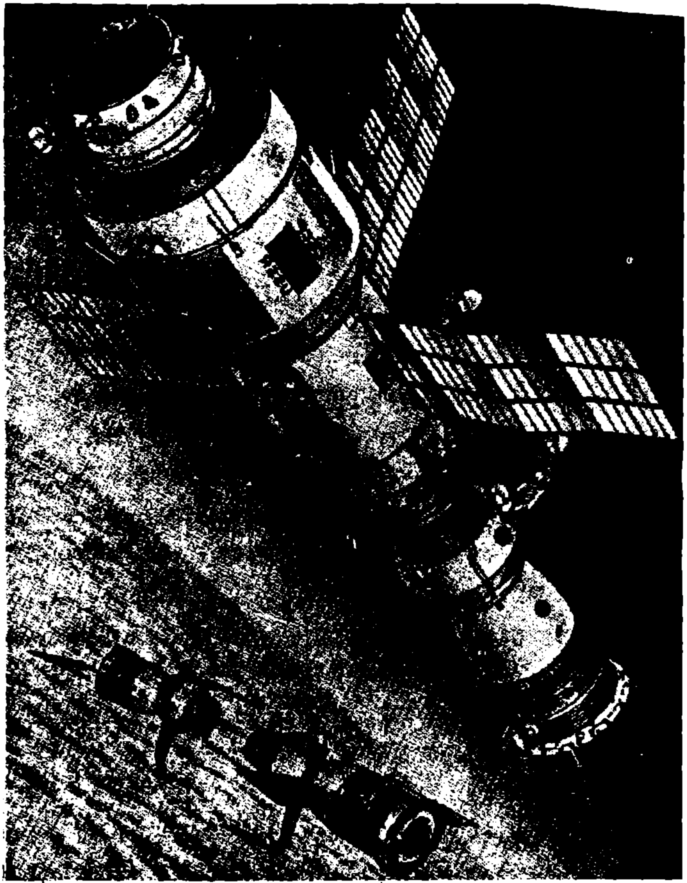

উড্ডয়নকালে কক্ষপথ-কম্‌প্লেক্‌স 'সাল্যূত-সায়ূজ' এবং সায়ূজ সিরিজের দু'টি নভযান ডকিং-এর উদ্দেশ্যে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে।

নেয়া ছিলো বিশদ কর্মসূচী।

যেমন– খারাপ আবহাওয়ার জন্য এ্যাপোলো উড়তে পারলোনা। তখন কর্মসূচী অনুযায়ী কমপক্ষে সয়ুজ তার জন্য অপেক্ষা করবে অতিরিক্ত সময়।

অথবা কোনো একটি মহাকাশ যান সংযোগ সংস্থাপনে ব্যর্থ হলো, এ অবস্থায় কি করা হবে তারও আগাম ব্যবস্থা করা ছিলো।

১৭ই জুলাই সকাল সোয়া দশটায় পৃথিবীর সাথে শুরু হয় প্রথম বেতার যোগাযোগ।

সয়ুজ ও এ্যাপোলোর মধ্যকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসতে থাকে। পরস্পরের সাথে হচ্ছে বেতার যোগাযোগও। তারপর ঠিক সন্ধ্যে ৭টা বেজে ৪ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডের সময় এ্যাপোলোর ডকিং এসেমব্লি বা সংযোগ গ্রন্থির তিনটি খোলা পাপড়ি চলে যায় সয়ুজের ডকিং এসেমব্লির পাপড়িগুলোর মধ্যে। সামান্য একটু ঝাকানি। তারপরই সব ঠিকঠাক। সয়ুজ আর এ্যাপোলো মিলে গঠিত হলো নতুন ও মজবুত একটি ২০টনী মহাজাগতিকউপগ্রহ।

তারপর সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে এ্যাপোলো থেকে সয়ুজে চলে এলেন টমাস ষ্ট্যাফোর্ড এবং



www.nagorikpathagar.org

লান্ড স্লেইটন। নিজ নিজ দেশের পতাকা বিনিময় করলেন।

তারপর সেই মহাকাশ যানে বসেই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মহাকাশে প্রথম স্বাক্ষরিত হয় আন্তর্জাতিক সংযোজন সম্পর্কিত দলিল এবং বিনিময় করা হয় প্রতিটি চালকদ্বয় কর্তৃক নিয়ে আশা স্মৃতিচিহ্ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক খচিত দুটো স্মৃতি।

১৮ই জুলাই সয়ুজের নভোচারীরা আসেন এ্যাপোলোতে।

সয়ুজ-এ্যাপোলো যৌথ মিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মহাকাশে কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটানো।

পৃথিবী থেকে যে সূর্য গ্রহণ দেখা যায় তা থেকে সবসময় পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। সূর্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পেতে বাধা দেয় পৃথিবীতে অহরহ ঘটমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন।

কিন্তু মহাকাশের ব্যাপার আলাদা। ওখানে সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষণ করতে কিছুই বাধা দেয় না।

চন্দ্র যেমন সূর্যকে আড়াল করে দিয়ে সূর্য গ্রহণ ঘটায়, তেমনি সয়ুজও সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়ালে আর এ্যাপোলো থেকে সেই কৃত্রিম সূর্যগ্রহণের ছবি রাখা হলো তুলে।

এর জন্য অবশ্য দুটি মহাকাশ যানকেই আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো। এই ছবিই পরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। গবেষণা করেছেন সূর্য সম্পর্কে। কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ গবেষণা শেষ হবার পর আবার পরস্পর সংযোজিত হয় মহাকাশ যান দুটি।

এই সংযোজন ঘটে বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে। কিন্তু এই সংযোজন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

তারপর সন্ধ্যে ৬টা ২৬ মিনিটের সময়ই আবার তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। একে অপরকে জানায় বিদায়।

এ্যাপোলোর সাথে বিচ্ছিন্ন হবার পরও সয়ুজ একাই মহাকাশে গবেষণা চালাতে থাকে মহাকাশে বায়ুশূন্য পরিবেশে জীববিজ্ঞান নিয়ে চলতে থাকে। এই গবেষণা।

মহাকাশে ঐতিহাসিক সংযোজনের পর সয়ুজ পৃথিবীতে ফিরে আসে ২১শে জুলাই এবং এরও চারদিন পরে ২৫শে জুলাই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন মার্কিন মহাশূন্যচারীরা।

## যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল, বুধ ও শুক্র গ্রহ অভিযান

চন্দ্রবিজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র এবার তার মহাকাশ অভিযানকে আরো দূরে সম্প্রসারিত করে। এবার তাদের লক্ষ্য মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রগ্রহ।

এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাকাশ যান সিরিজের নাম ছিলো ম্যারিনার-৮। এটি প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭১ সালের মে মাসে। কিন্তু উড্ডয়নের পরপরই এটি বিধ্বস্ত হয়।

এই সিরিজের দ্বিতীয় যান ম্যারিনার-৯ প্রেরিত হয় বুধ ও শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে। তারিখ ছিলো ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর। এটি ম্যারিনার -৯। একটানা ৫ মাস চলার পর ১৯৭৪ সালের ২৯ শে মার্চ প্রবেশ করে শুক্র গ্রহের কক্ষপথে এবং তারও প্রায় এক বছর পরে ১৯৭৫ সালে ১৭ই মার্চ প্রবেশ করে বুধের কক্ষ পথে। মহাকাশ যানটি বুধ গ্রহ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করে পৃথিবীতে। এই তথ্য থেকেই



www.nagorikpathagar.org

জানা যায় বুধের একটি চুম্বক ক্ষেত্র আছে এবং আছে একটি বায়ুমণ্ডল। যদিও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বলতে যা বোঝায় বুধের বায়ুমণ্ডল তেমন নয়। বুধের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তুলনায় হাজার গুণ হাল্কা।

এছাড়া জানা গেছে বুধের গোটা পৃষ্ঠদেশটাই হাজারো গিরিখাত এবং আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ভর্তি। গ্রহের মাটিতে লোহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। বিজ্ঞানীরা বলেন–বুধের মোট ভারের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হলো লোহা।

## ভাইকিং সিরিজ

তবে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহাকাশযান সিরিজটির নাম হলো ভাইকিং সিরিজ। মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভাইকিং–১ এবং ভাইকিং–২ নামে দুটো মহাকাশযান প্রেরণ করেন। এর দুটোই ছিলো মনুষ্যবিহীন যান।

ভাইকিং শব্দের অর্থ হলো দুঃসাহসী অভিযাত্রী। সেকালে নরওয়ের দুঃসাহসী লোকেরা তাদের বিচিত্র দর্শন পালতোলা জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতো সীমাহীন সাগর মহাসাগর। অসীম ছিলো তাদের মনের বল এবং সাহস।

তবে দুঃসাহসিকতার কথা স্মরণ করেই মহাকাশের এই অভিযানের নামও রাখা হলো ভাইকিং। ৫১২৫ পাউণ্ড ওজন বিশিষ্ট ভাইকিং–১ প্রেরিত হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২০শে আগষ্ট এবং ভাইকিং–২ প্রেরিত হয় এর মাত্র দিন কয়েক পরে ৯ই সেপ্টেম্বর(১৯৭৫)।

এটিও ছিলো আসলে এ্যাপোলো –১১ এর মতোই অভিযান। এ্যাপোলো–১১ যেমন চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে তার মূলযান থেকে লুনার মডিউলকে নামিয়ে দিয়েছিলো চাঁদের মাটিতে, ঠিক ভাইকিং –১ এবং ২ তেও তেমনি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হলো।

এই মহাকাশ যান দুটোরও ছিলো দুটো করে পৃথক অংশ। একটির নাম অর্বিটার (Orbiter) এবং অপরটি ল্যাণ্ডার (Lander). অর্বিটার হলো মূল মহাকাশ যান– যেটি মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে এবং মঙ্গল পৃষ্ঠে নামিয়ে দেবে ল্যাণ্ডারকে।

ভাইকিং –১ এবং ২ এদের মঙ্গলে পৌঁছোতে সময় লেগেছিলো প্রায় পুরো এক বছর। ভাইকিং–১ এর ল্যাণ্ডার মঙ্গল পৃষ্ঠে অবতরণ করে ১৯৭৬ সালের ২০ শে জুলাই এবং ভাইকিং–২ এর ল্যাণ্ডার অবতরণ করে ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৭৬).

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইকিং মাত্র এক বছর আগে রওনা দিলেও এর পূর্ব প্রস্তুতি চলছিলো বহু কাল আগে থেকে। ভাইকিং সিরিজের মূল পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীর নাম ছিলো ডঃ জেরাল্ড সরেন (Dr. Jerald Saren)।

মিঃ সরেন গত প্রায় পনেরো বছর ধরেই মেতে ছিলেন মঙ্গল গ্রহের অভিযান নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করা।

পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিলো দীর্ঘদিন থেকে। এখানে প্রাণের অস্থিত্ব নিয়ে প্রচলিত ছিলো নানারকম আজগুবি গল্পকাহিনীও।

তাই তিনি ভাবছিলেন–ভাইকিং এর সাহায্যে হয়তো এমন কিছু সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে যা থেকে পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও অনেক নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে। অবসান হতে পারে দীর্ঘদিনের জল্পনা কল্পনার।

ডঃ সরেনের সাথে এই ভাইকিং প্রকল্পে জড়িয়ে ছিলেন আরো ৭৫ জন সহযোগী বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন জীববিজ্ঞানী, কেউ ভূ–তত্ত্ববিজ্ঞানী, কেউ পদার্থ বিজ্ঞানী, কেউ রসায়ন শাস্ত্রবিদ এবং কেউ ছিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী।



www.nagorikpathagar.org

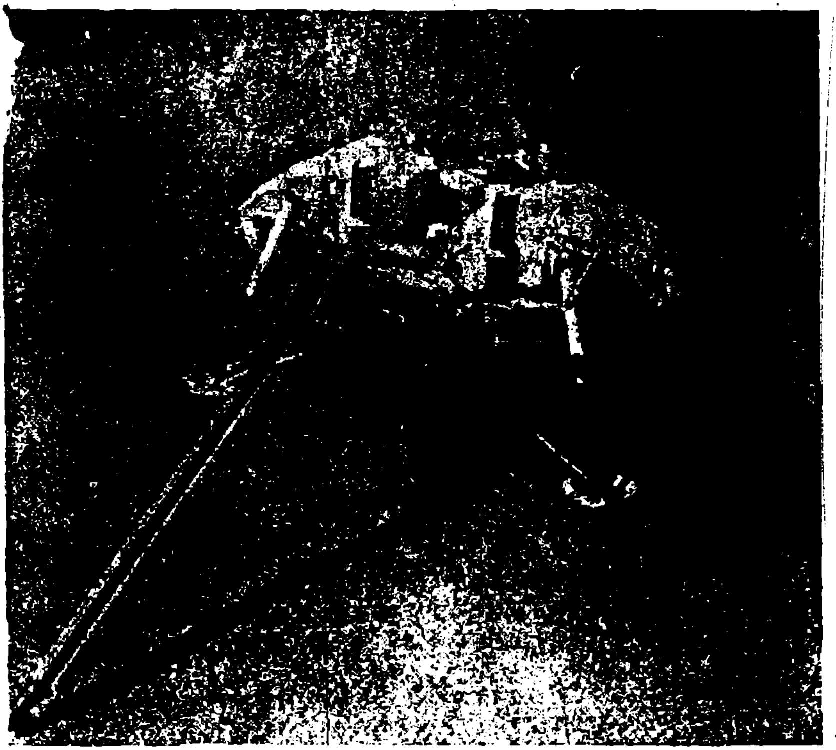

মঙ্গল পৃষ্ঠে ভাইকিং

মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে যতোই আজগুবি গল্প প্রচলিত হোক এই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের আগে থেকেই ধারণা ছিলো মঙ্গলের মাটিতে মানুষের মতো প্রাণী থাকার সম্ভাবনা নেই। তবে হয়তো সেখানে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

ভাইকিং-১ এবং ২ অত্যন্ত সফলভাবেই মঙ্গলের মাটিতে তাদের ল্যাণ্ডারদেরকে অবতরণ করাতে সক্ষম হয়। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন ভাইকিং এর মূল যান ১৫২০ কিলোমিটার (৯৫০ মাইল) উপরে ছিলো এমনি সময় তার ল্যাণ্ডার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে। তারপর নিজস্ব রকেট চালিয়ে তার গতিকে করা হয় মন্থর। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় যদি বাতাসের সাথে ঘর্ষণ লেগে ল্যাণ্ডারের ক্ষতি হয়, তাই তার গায়ে পরানো ছিলো একটি আবরণ।

তারপর যখন ল্যাণ্ডার মঙ্গল পৃষ্ঠের মাত্র ২৫০০ ফুট দূরত্বে নেমে এলো তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেলো আবরণটি এবং তার নিচ থেকে বের হয়ে এলো ৫০ ফুট ব্যাসের একটি প্যারাসুট।

এই প্যারাসুটের জন্য ল্যাণ্ডারের গতি আরো কমে এলো। ওটা যখন মাটিতে



www.nagorikpathagar.org

নামছিলো তখন তার গতি বেগ ছিলো ঘন্টায় মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। ল্যাণ্ডার যখন মঙ্গল পৃষ্ঠে অবতরণ করছিলো তখন আপনা থেকেই তার ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছিলো তিনটি বিশাল পা। যার উপর দাঁড়াবে ল্যাণ্ডার।

কে জানে মঙ্গলের বুকে যদি প্রচুর ধূলোর স্তর থাকে তাই ল্যাণ্ডার যাতে ধূলোর মাঝে ডুবে না যায় তার জন্যও ববস্থা করা ছিলো।

অবশ্য ভাইকিং কোথায় অবতরণ করবে তার স্থানও আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো। তবু নামার পূর্ব মুহূর্তেই অধিকতর সুবিধাজনক স্থানের খোঁজে যানটি নিজে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার কিছুটা দিক পরিবর্তন করে।

অবশেষে ল্যাণ্ডার যে স্থানে অবতরণ করে সে স্থানটি ছিলো বেশ সমতল। ভাইকিং -১ এর ল্যাণ্ডার যে স্থানে নামে সে জায়গাটির নাম দেয়া হয়েছে ক্রাইসি প্ল্যানিসিয়া (Cryci Planicia). এর অবস্থান হলো ২২-২৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪৭ -৯০ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মিলনস্থল।

ভাইকিং-২ তার ল্যাণ্ডার নামিয়েছিলো ভাইকিং-১ এর বেশ কয়েকদিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৭৬)। এটি নেমেছিলো মঙ্গলের ইউটোপিয়া প্ল্যানসিয়া (Utupia Plancia) নামক স্থানে। এর অবস্থা ছিলো ৪৭.৬৭ উত্তর অক্ষাংশের ও ২২৫.৭৪ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মিলন স্থলে।

ল্যাণ্ডার-যেখানে নেমেছিলো সে জায়গাটি ছিলো একটি আগ্নেয়গিরি এলাকা। এর চারদিকে ছড়িয়ে ছিলো অনেক ছোট বড় পাথর। মাটি ছিলো স্যাঁতস্যাঁতে। হয়তো তলায় জমে আছে বরফ।

মাটির রঙ ছিলো লালচে। মরচে ধরা লোহার মতো। আকাশের রঙ গোলাপী। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন হয়তো মঙ্গলের হালকা বায়ুমণ্ডলে ঘূরে বেড়াচ্ছে প্রচুর ধূলিকণা। লালবর্ণের এই ধূলো কণা সূর্যের আলো পড়েই এই গোলাপী রঙ ধারণ করেছে।

ল্যাণ্ডার মঙ্গলের মাটিতে নেমেই পৃথিবীতে পাঠাতে লাগলো বেতার সংকেত। মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে বেতার সংকেত পৌঁছোতে সময় লাগে ১৯ মিনিট।

কিন্তু দেখা গেলো ল্যাণ্ডার কয়েক মিনিট ধরে বেতার সংকেত পাঠিয়েই আবার চুপ মেরে গেলো। পৃথিবী থেকে ধারণা করা হয়েছিলো হয়তো কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। ব্যপার হয়েছিলো কিছুক্ষণ সংকেত পাঠাবার পরই মঙ্গলে নেমে এসেছিলো রাত। তাই রাতের অন্ধকারে আর সংকেত পাঠানো সম্ভব হয়নি। সংকেত পাঠানো আবার শুরু হয় ১৯ঘন্টা পরে। পরের দিন। আবার টেলিভিশনে আশা শুরু করলো ছবি।

ল্যাণ্ডারের পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেলো সূর্যোদয়ের সময় এই জায়গাটির উষ্ণতা থাকে মাইনাস ৮৬ ডিগ্রী এবং দুপুরে সামান্য বেড়ে হয় মাইনাস ৩০ ডিগ্রী।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের বাতাস অসম্ভব রকমের হালকা। মঙ্গল পৃষ্ঠের বাতাসের চাপ পৃথিবীর তুলনায় মাত্র ২০০ ভাগের একভাগ।

ভাইকিং -১ এর ল্যাণ্ডার যেখানে নেমেছিলো তার পাশেই ছিলো অলিম্পাস মন্স (Alimpus Mons) নামে একটি পর্বত। অসম্ভব রকমের উঁচু। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃংগ এভারেষ্ট। প্রায় ৮ কিলোমিটার উঁচু। কিন্তু অলিম্পাস মন্ড এরও তিন গুণ উঁচু অর্থাৎ এর উচ্চতা ২৫ কিলোমিটার।

এ ছাড়া মঙ্গলের গায়ে আছে অনেক বড় বড় ফাটল। এক একটা ৯ থেকে ১৮কিলোমিটারগভীর।



www.nagorikpathagar.org

ভাইকিং -১ এর ল্যাণ্ডারে দেখা দিয়েছিলো যান্ত্রিক গোলযোগ। কথা ছিলো উপরে নামার পর পরই এর দুদিক থেকে দুটো যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে আসবে। যে হাত দুটো মঙ্গলের মাটি তুলে এনে ল্যান্ডারের ভিতরের গবেষণা গায়ে তুলে রাখবে। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হাত আর বের হলো না।

অবশেষে পৃথিবীর বুকে অবস্থিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকেই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সংকেত প্রেরণ করে ঠিক করে দেয়া হলো গোলযোগ। হাত আবার বের হয়ে এলো যথারীতি। তুলে আনলো মঙ্গলের মাটি। তারপর হলো পরীক্ষা। মঙ্গলের মাটিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা।

## মঙ্গলের ভবিষ্যত অভিযান

মঙ্গলের বুকে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে আগামীতে নিয়েছেন আরো ব্যাপক পরিকল্পনা।

সোভিয়েত উইনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করছে দীর্ঘ মেয়াদী পরিলম্পনা। এই পরিকল্পনায় আছে প্রথমে মঙ্গলের মাটি তুলে আনা হবে পৃথিবীতে। করা হবে তার সুক্ষ্ম পরীক্ষা।

এই পরিকলম্পনা অনুসারে ১৯৯০ সাল নাগাদ সোভিয়েত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশ থেকেই মঙ্গলের উদ্দেশ্য পাঠানো হবে মহাকাশ যান।

মহাকাশ যানের সাহায্যে মঙ্গলের সমস্ত যোগযোগ পর্যবেক্ষণ করা হবে। তৈরি করা হবে এর উপরিভাগের মানচিত্র। তখনি জানা যাবে মঙ্গলের অভিযান ভবিষ্যতে কিভাবে চালানো হবে। এর জন্য তৈরি করা হবে মঙ্গলের কক্ষ পথে স্থায়ী মহাকাশ ষ্টেশন। প্রেরণ করা হবে মনুষ্যবাহী মহাকাশ যান। তারা মহাকাশ যানে বসেই চালাবেন পরীক্ষা।

১৯৯০ সালের পরে মঙ্গল গ্রহ অভিযানই হবে মহাকাশ গবেষণার সবচাইতে উল্লেখ্যযোগ্যঘটনা।

## পাইনিয়ার সিরিজ

পাইনিয়ার সিরিজ যুক্তরাষ্ট্রের একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশ যান সিরিজ। এই সিরিজের লক্ষ্য ছিলো সৌরজগতের পৃথিবী থেকে বহু দুরবর্তী গ্রহগুলো সম্পর্কে গবেষণা চালানো।

এই উদ্দেশ্যে পাইনিয়ার -১০ প্রেরিত হয় ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ। তখনি এর গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এটি ১৯৭৩ সালে বৃহস্পতি, ১৯৭৭ সালের শনিগ্রহ, ১৯৮০ সালে ইউরেনাস কক্ষে পরিভ্রমণ করছে। তারপর ১৯৮৭ সালে পৌছে প্লুটোর কাছে। তারপর এ যানটি চলে যায় সৌরজগতের বাইরে। যাত্রা করে টেরাস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। যানটি তার প্রথম পর্বের কাজ যথারীতি যথাসময়ে শেষ করে। বর্তমানে টেরাস নক্ষত্রপুঞ্জের সীমাহীন পথে পাড়ি দিচ্ছে।

পাইনিয়ার -১১ মনুষ্যবিহীন একটি মহাকাশ যান। এটি উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৭২ সালের ৫ই এপ্রিল। শনির কাছে পৌছে ১৯৭৯ সালের দিকে। এটিও বর্তমানে রয়েছে মহাকাশের মহাযাত্রাপথে।

পাইনিয়ার -১২ পাঠানো হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে এবং বৃহস্পতি কক্ষে প্রবেশ করে ১৯৭৫ সালের দিকে। যাত্রা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

পাইনিয়ার -১০ই প্রথম মহাকাশ যান যেটি সৌরজগতের বাইরে গেছে। এর যাত্রা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

## ভয়েজার সিরিজ

সৌর জগতের দূরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর উদ্দে প্রেরিত হয়েছিলো আরো একটি মার্কিন দূরপাল্লার মহাকাশ যান—ভয়েজার। অবিকং একই আকৃতির দুটো পৃথক মহাকাশ যান ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২। শুধু আকৃ নয় ওজনও ছিলো সমান। ৮০০ কেজি করে।

পরবর্তী সময়ে এদুটো নেপচুন ও প্লুটো পর্যন্ত কিংবা সৌরজগতের বাইরে চলে গেলেও প্রথমে তৈরি হয়েছিলো বৃহস্পতি ও শনির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য।

দুটো মহাকাশ যানই ছিলো মনুষ্যবিহীন এবং নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ছিলো ১১ রকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এছাড়া মহাকাশের তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলোকে বাছাই করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য ছিলো দুটো শক্তিশালী কম্পিউটার।

পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার সংকেত গ্রহণ এবং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সেই সংকেত পাঠানোর জন্য ছিলো ৩ ফুট (৭০ সেন্টিমিটার) চওড়া গামলা আকৃতির একটি শক্তিশালী এ্যান্টেনা। মহাকাশযান দুটোর গতিবেগ ছিলো দৈনিক ১· ৬০ মিলিয়নং কিলোমিটার। যা রাইফেলের বুলেটের গতিরও দশগুণ বেশি।

ভয়েজার -১ প্রেরিত হলো ১৯৭৭ সালের ২০ শে আগস্ট এবং ভয়েজার-২ প্রেরিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর।

ভয়েজার-১ কিছুটা সোজা পথে গিয়ে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস নাগাদ বৃহস্পতির ...ে পৌঁছে এবং সে শনির কক্ষে প্রবেশ করে ১২ই নবেম্বর (১৯৮০)। এর পর শনিকে পাশে রেখে এর উপগ্রহ টাইটানে পৌঁছে।

এরপর তার গন্তব্যস্থল আরো দূরে। ভয়েজার-২ এর গতিপথ কিছুটা দীর্ঘ এবং বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে পৌঁছে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে। এটি শনির কক্ষে প্রবেশ করেছিলো ১৯৮১ সালের ২৭শে আগস্ট।

শনির পরিমণ্ডলে আসার পরই বিজ্ঞানীরা মহাকাশযান দুটোকে আরো দূরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। উপগ্রহ দুটো যখন শনির আকর্ষণের মধ্যে এসে পড়ে তখনি তারা শনির আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে ভয়েজার-২ কে ঠেলে পাঠাতে লাগলেন আরো দূরে, ইউরেনাসের দিকে। তারপর আবার যখন ইউরেনাসের পরিমণ্ডলে পৌঁছায় তখন তার আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে পাঠানো হলো নেপচুনের দিকে।

এদিকে ভয়েজার-১ শনিকে ছাড়িয়ে সোজা পাড়ি জমিয়েছে সৌরজগতের বাইরে। এরপর তার যাত্রা শুরু হয়েছে অনন্ত মহাকাশের দিকে—সীমাহীন নক্ষত্রলোকের দিকে।

ভয়েজার-২ শনি গ্রহের প্রবল আকর্ষণে দিক পরিবর্তন করে ছুটে যায় ইউরেনাসের দিকে এবং এটি ইউরেনাসে পৌঁছে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে।

ইউরেনাস গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৩০০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে সূর্যের আলোও পড়ে খুব কম। পৃথিবীতে আমরা সূর্যের যে আলো পাই ইউরেনাসে পড়ে তার চেয়েও ৪০০ গুণ কম।

পৃথিবী থেকে অত দূরে বেতার সংকেত পাঠানো বা সেখান থেকে বেতার সংকেত পৃথিবীতে আসতেও সময় লাগে অনেক। প্রায় ৩ ঘন্টার কাছাকাছি সক্ষম।

ভয়েজার -২ এরপর এটি নেপচুনের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে ১৯৮৯ সালের ২৪ শে আগস্ট তারিখে। নেপচুনের মাত্র কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যাওয়ার সময়েই ভয়েজার পৃথিবীতে প্রেরণ করে চাঞ্চল্যকর অজস্র ছবি ও তথ্য। ৪৪,৩০,০০,০০০ মাইল (৭০,৮৮,০০,০০০ কিলোমিটার) পথ পার হয়ে নেপচুনের



www.nagorikpathagar.org

যে সব ছবি পৃথিবীতে ভেসে এসেছে সেগুলো দেখে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে বরং আনন্দ লাভ করছেন।

কারণ তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এটা এমন এক আবিষ্কার বা এমন এক স্বতঃসিদ্ধ প্রযুক্তিগত জ্ঞান যা তাদের সকলেরই বোধগম্য।

পৃথিবীতে বসানো কোনো দূরবীণে চোখ লাগিয়ে দেখলে নেপচুনকে মনে হবে রহস্যময় একটি নীল ধূলির গোলক।

কিন্তু দৈনিক ১.৬০ মিলিয়ন কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলা ভয়েজার-২ এর ক্যামেরা থেকে প্রেরিত ছবিতে গ্রহটিতে দেখা গেছে সাদা মেঘ, তুমুল ঝঞ্জা বিক্ষুদ্ধ আবহমণ্ডল। অদ্ভুদ ফাটা ফাটা বলয়। আরো দেখা গেছে এর চারটি নতুন চাঁদ।

গ্রহটির পুরো উপরিভাগটাই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসে আবৃত। এখানে প্রতিনিয়ত বাতাস প্রবাহিত হয় ৬৪০ কিলোমিটার বেগে। এই বাতাস সর্বক্ষণ হিমায়িত মিথেনের মেঘকে ধাক্কা মারে।

নেপচুনের গায়ে আছে শনির আর বৃহস্পতির মতো গভীর কালো কালো দাগ। তবে একটি ব্যাপার রহস্যময়, তা'হলো নেপচুনের শক্তির মূল উৎস কোথায়? এ ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। পৃথিবীতে শক্তি আসে সূর্য থেকে। কিন্তু এতো দূরের গ্রহ নেপচুনে সূর্যের আলো পৌঁছে খুবই সামান্য পরিমাণে। নেপচুনের বুকে দাঁড়িয়ে ( যদিও তা সম্ভব নয়) সূর্যের দিকে তাকালে সূর্যকে দেখা যাবে সন্ধ্যা তারার মতো। তাই সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে খুবই ক্ষীণ মাত্রায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, নেপচুনে শক্তির উৎস হলো সৌর বিকীরণ। এছাড়া আছে তার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ।

নেপচুনের চারপাশের বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এবং সামান্য মাত্রায় আছে মিথেন ও ইথেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো নেপচুনের মধ্যভাগের কঠিন চাপ এবং উষ্ণ তাপমাত্রায় মিথেন কার্বনে পরিণত হয়। এই কার্বন শেষে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে রূপান্তরিত হয় খাঁটি হীরায়।

এটা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে নেপচুনের উত্তাপ আসে মহাজাগতিক কোনো রহস্যময় উৎস থেকে।।

ভয়েজার-২ প্রেরিত তথ্য থেকে আরো জানা যায়, নেপচুনের অন্যতম উপগ্রহ ট্রাইটনের ব্যসার্ধ আমাদের চাঁদের তুলনা অনেক কম। মাত্র ৬৪০ কিলোমিটার। চাঁদটি দেখতেও খুব সুন্দর। গোলাপী ও গভীর নীল বর্ণ। বিজ্ঞানীরা বলেন, মিথেন বরফের স্ফটিকের উপর সূর্যের আলো পড়েই এই অদ্ভুত সুন্দর নীল বর্ণ ধারণ করেছে।

এ পর্যন্ত ভয়েজার-২ যে সব তথ্য প্রেরণ করেছে তার সংখ্যা ৫ ট্রিলিয়ন হবে। অবশ্য তার তথ্য প্রেরণ এখনো শেষ হয়নি। সৌর জগতের বাইরে চলে গেলেও আরো দীর্ঘদিন পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সাথে তার যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ পর্যন্ত ভয়েজারের ক্যামেরা, ইনফ্রারেড ডিটেক্টর এবং ছবির পোলোরিমিটার যন্ত্র কাজ করবে। তারপরই নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়বে। এরপর তার প্লুটোনিয়াম শক্তিতে চালিত যন্ত্রে এর ভিতরে বিদ্যুৎ প্রবাহের ব্যবস্থা করা হবে। এ থেকে যে শক্তির সৃষ্টি হবে, তা দিয়েই ভয়েজার-২ তার অনন্ত যাত্রার পথের সন্ধান ও মহাজগতের অণুকণিকা সমূহের পরিমাপ করতে পারবে।

এই অবস্থা চলবে আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ। এর পরই ভয়েজার-২ তার সর্বশেষ নিজস্ব শক্তির উৎসটুকুও হারিয়ে ফেলবে এবং একেবারে নীরব হয়ে যাবে। পৃথিবীর সাথে তার সকল রকম যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

তবু তার গতি অব্যাহত থাকবে। মহাজাগতিক আকর্ষণেই সে চলতে থাকবে মহাকাশের অন্ধকারময় পথে।

এরপর যদি সবকিছু ঠিক হিসেব অনুযায়ী চলে, তবে আগামী ৪২,০০০ সাল



www.nagorikpathagar.org

নাগাদ ভয়েজার-২ নক্ষত্র রস-২৪৮ (Ros—২৪৮) এর ১.৭ আলোক বর্ষ দূরত্বে গিয়ে পৌঁছোবে। এই রস-২৪৮ হলো আমাদের সূর্যের চেয়েও মাত্র এক পঞ্চমাংশ আকৃতির এবং শীতল গ্যাসীয় রক্তিম বর্ণ বিশিষ্ট একটি নক্ষত্র।

এরপর ভয়েজার-২ আগামী ২,৯৬,০০০ সালে নক্ষত্র সিরাপ সাইরাস (Serius) বা ডগষ্টার (Dog Star) এর ৪.৩ আলোক বর্ষ দূর দিয়ে অতিক্রম করবে।

এ সমস্ত সূর্যের বা নক্ষত্রের যদি কারো না কারো সৌরজগত থাকে এবং সেই সৌরজগতের কোনো না কোনো গ্রহে যদি প্রাণের অস্তিত্ব থাকে এবং সেই প্রাণীরা যদি আমাদের মতো কিংবা আমাদের চেয়েও অনেক গুণে বুদ্ধিমান হয়, তবে তারা এই ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তুটিকে (ভয়েজার-২) উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

যদি তারা এটাকে ধরতে পারে তবে দেখতে পাবে এতে আছে একটি মস্ত বড় তামার ডিস্‌ক। ভেতরে নানা রকম উপকরণাদি। এছাড়া রয়েছে এর পরিচালনা ও নির্দেশাবলী।

বিজ্ঞানীদের আজকের আশা—অনাগত কোনো কালে যদি সত্যি সত্যি ভয়েজার মহাজগতের কোনো প্রাণীর সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন তারা এই বস্তুটিকে দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে বলবে—এটা আবার কি?

তখন যদি সেই বুদ্ধিমান প্রাণীরা ভয়েজারের ডিস্‌ক থেকে শব্দ বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়, তবে তারা পৃথিবীর ৫৫টি ভাষায় রচিত অভিনন্দন বাণী শুনতে পাবে। এর সাথে তারা আরো শুনতে পাবে পৃথিবীর জীব জগতের প্রচলিত ও পরিচিত কিছু শব্দাবলী। যেমন-তুমুল করতালির শব্দ, ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ এবং নবজাত শিশুর কান্না।

এই সাথে তারা আরো একটি মজার জিনিস শুনতে পাবে। সেটি হলো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বাণী। কারণ ভয়েজার-২ যখন ১৯৭৭ সালে প্রেরিত হয় তখন জিমি কার্টারই ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাঁর বাণীতে বলেছেন-'সুন্দর এবং ছোট্ট পৃথিবী থেকে এটি আপনাদের জন্য একটি উপহার। আপনাদের মাঝে যাতে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা বেঁচে থাকতে পারি তার জন্যই আমাদের পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা।'

আর যদি এই মহা অনন্তের পথে ভয়েজার-২ এর সাথে এমন কোনো প্রাণীর সাক্ষাৎ না ঘটে, তা হলেও আজকে যারা তাকে মহাকাশে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের স্মৃতি নিয়েই সে চলতে থাকবে অনন্তের পথে সীমাহীন যাত্রায়।

## মহাকাশ ষ্টেশন 'স্কাইল্যাব'

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো মহাকাশে ষ্টেশন স্থাপন।

মহাকাশে দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করে মহাশূন্য সম্পর্কে গবেষণা চালানোর জন্য মার্কিন বিজ্ঞানীরা ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে তারিখে একটি প্রচণ্ড মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেন। এটারই নাম দেয়া হয়েছিলো স্কাইল্যাব (Skylab)। এটি একটি মহাকাশ পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি। স্কাই (আকাশ) যোগ ল্যাব (পরীক্ষাগার) মিলে স্কাইল্যাব।

এটি ছিলো মস্তবড় একটি ল্যাবরেটরি বিশেষ। ২৫ মিটার লম্বা, চওড়া গড়পড়তা ছয় মিটার। তিন কামরা বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট বাড়ির মতো। এতে ছিলো তিনজন মহাকাশচারীর থাকার মতো তিনটি পৃথক পৃথক শোবার ঘর, রান্না ঘর, স্নানের ঘর সহ যাবতীয় ব্যবস্থা। আরো ছিলো অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। নভোচারীদের



www.nagorikpathagar.org

চিত্তবিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার, খেলাধুলার সরঞ্জাম, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি।

কয়েকশত টন ওজনের এই গবেষণাগারটিকে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয় স্যাটার্ন-৫ নামে একটি শক্তিশালী রকেট যোগে। স্যাটার্ন-৫ ষ্টেশনটিকে পৃথিবীর ৪৩৪ কিলোমিটার (২৭১ মাইল) উপরে কক্ষপথে পৌঁছে দেয়।

স্কাইল্যাবের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো-সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা করা এবং দীর্ঘ সময় মহাশূন্যে অবস্থানকারী মানবদেহে ভারহীনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। ৯ মাস ব্যাপী অভিযানে দফায় দফায় অভিযাত্রীদল প্রেরিত হয় স্কাইল্যাবে।

স্কাইল্যাব পৃথিবীর ৪৩৫ কিলোমিটার উপর থেকে প্রতি ৯৩ মিনিটে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতো। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিলো ২,৫০,০০, ০০, ০০০ মার্কিন ডলার।

তিন দলে মোট নয়জন নভোচারী এই স্কাইল্যাবে মহাকাশ ভ্রমণ করেছিলেন।

প্রথম দলে ছিলেন -চালর্স কনরাড, জোসেফ পি, কারউইন এবং পল জে উইটজ। ২৫ শে মে ১৯৭৩ এ্যাপোলো যানে স্কাইল্যাব অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৮ দিন স্কাইল্যাবে সফল অবস্থানের পর ২২শে জুন, ১৯৭৩ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় দলে ছিলেন- ওয়েন কে, গ্যারিয়ট, এলান এল. বীন এবং জ্যাক আর লুজমা। ২৮শে জুলাই ১৯৭৩ স্কাইল্যাব অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ২৯ শে জুলাই স্কাইল্যাবে প্রবেশ করে ৫৯ দিন ১১ ঘন্টা অবস্থানের পর ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

অভিযাত্রীগণ দুটি মাছ ও দুটি মাকড়সা পরীক্ষার জন্য সাথে নিয়ে যান। কিন্তু মাছ দুটি ও একটি মাকড়সা মহাশূন্যে মারা যায়।

তৃতীয় দলে ছিলেন লেঃ কর্নেল জেরাল্ড পি, কার, কর্নেল উইলিয়াম আর পোগ এবং ডঃ এডওয়ার্ড জি গিয়ে বসল। ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৩ স্কাইল্যাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সাফল্যজনক ভাবে ৮৪ দিন স্কাইল্যাবে অবস্থানের পর ১৯৭৪ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই অভিযাত্রীদল ১২১৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন এবং ৫৫,১০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রমণ করেন।

যদিও স্কাইল্যাব ছিলো মার্কিন মহাকাশ গবেষণার একটি বৃহত্তম কার্যক্রম তবু এর শুরু থেকেই ছিলো ত্রুটি। প্রথম যখন একে মহাকাশে পাঠানো হয় তখনই দেখা দিয়েছিলোগোলযোগ।

মহাকাশে উঠতেই দেখা গেলো স্কাইল্যাবের ভেতরটা এতো গরম হয়ে গেছে যে, এর মধ্যে মানুষ বাস করাই অসাধ্য। এর কারণ হলো মহাকাশের প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণ। এছাড়া মহাকাশে অনবরত ছুটে আসা ছোট বড় উল্কার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে তাপরোধক ঢাকনা দেয়া ছিলো প্রথম চোটেই তা খুলে আলগা হয়ে গেছে।

সূর্য থেকে তাপ নিয়েইতো স্কাইল্যাবে বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি করতে হবে। সেই তাপ সংগ্রহ করার জন্য স্কাইল্যাবের দুপাশে যে দুটো প্যানেল ছিলো তারও একটি গেলো ভেঙে।

কিন্তু এই বিপর্যয় থেকেও উদ্ধার করলেন নভোচারীরা নিজেরাই। অন্য মহাকাশ যান নিয়ে তারা গেলেন স্কাইল্যাবের কাছে। ঠিক যেমন করে বড় সামুদ্রিক জাহাজের কাছে ছোট্ট ডিঙ্গি নাও গিয়ে ভেড়ে তেমনি, তারপর তারাই প্রচণ্ড সাহস আর কৌশল খাটিয়ে স্কাইল্যাবের ভাঙা যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক করলেন। স্কাইল্যাব আবার চলতে লাগলো সুষ্ঠুভাবে। ভেতরের তাপমাত্রাও ফিরে আসে স্বাভাবিকের মাত্রায়। শুধু একবারই নয়, স্কাইল্যাবে এরকম কাণ্ড বেশ কয়েকবার হয়েছে। মেরামত করতেই সময় লেগেছিলো



www.nagorikpathagar.org

মোট ৫২ দিন। তারপর থেকে যেতে শুরু করে মহাকাশযাত্রীরা।

স্কাইল্যাবে যে মহাকাশ যাত্রীরা ছিলেন তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন সময়ে নানা রকম সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো। এর মধ্যে শারীরিক অসুবিধা ছিলো অন্যতম।

দীর্ঘদিন সাগরে থাকলে যেমন অনেকে সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তেমনি দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকলেও আক্রান্ত হয় গতির পীড়া (Motion Sickness)

প্রত্যেক দলের সদস্যকেই কমবেশী এরকম জটিলতায় ভুগতে হয়েছিলো। মহাশূন্যে গেলে শরীরে অনেক রকম পরিবর্তন ঘটে। যেমন–আমরা পৃথিবীতে যতক্ষণ থাকি তখন থাকি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে। মহাকাশে সে মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় মানুষ তার শরীরের ওজন হারিয়ে ফেলে। ফলে শরীরের পেশীকে কম কাজ করতে হয়। যার ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাইরে থাকায় হৃদপিণ্ডকেও অনেক কম শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে হৃদপিণ্ডও শিথিল হয়ে আসে। এর প্রভাব দেখা দেয় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের উপর।

মোট কথা মহাকাশে বেশি দিন কাটিয়ে এলে পৃথিবীর স্বাভাবিক গতির সাথে তাল মেলাতে বেশ বেগ পেতে হয়।

স্কাইল্যাবের নভোচারীরা মহাকাশে চালিয়ে ছিলেন নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা। তারা সূর্যের ছবিই তুলেছেন প্রায় তিনলাখ! এছাড়া ধূমকেতু বিশেষ করে কোহেতুক-ধূমকেতু–সেটা তখন সূর্যের খুব কাছে এসে পড়েছিলো তারও ছবি তুলেছিলেন অজস্র।

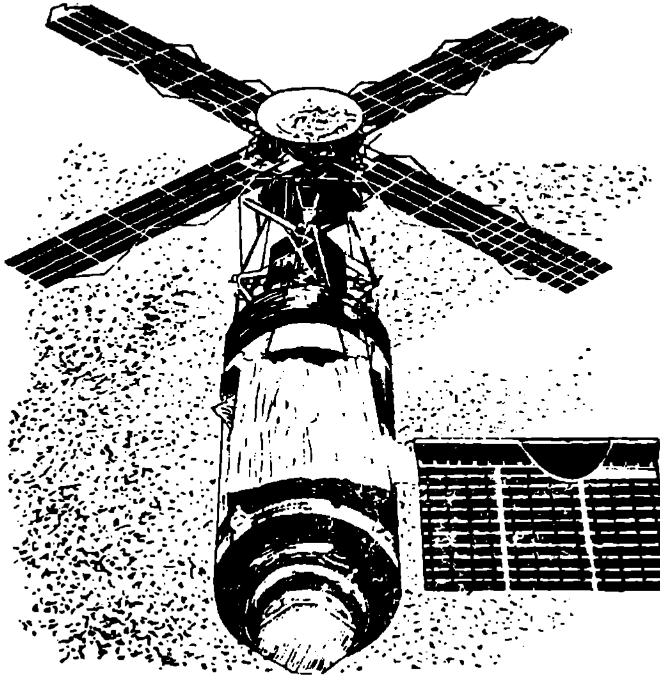

স্কাইল্যাব



www.nagorikpathagar.org

এই সময় অনেক নভোচারী স্কাইল্যাব থেকে বাইরেও বেরিয়ে এসেছেন। তারা মহাশূন্যে ভেসে বেড়িয়েছেন এবং ছবি তুলেছেন। স্কাইল্যাব থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায় তার ছবিও তোলা হয়েছে। একমাত্র পৃথিবীরই ছবি তোলা হয়েছে প্রায় ৪০,০০০ -এর মতো। একটা নেগেটিভেই পৃথিবীর প্রায় ১৬৩ বর্গকিলোমিটার স্থানের ছবি উঠেছে।

তারা নিজেরা নিজেদের উপরেও পরীক্ষা চালিয়েছেন নানা রকম। যেমন—তারা নিজেদের শরীরের রক্ত বের করে এনে জমিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে এসে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এছাড়াও তারা মহাকাশে বসে নানা রকম কীট, পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, এতে অবশ্য ভাল ফলও পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে স্কাইল্যাবে বসেই মাকড়সা যথারীতি তার জাল বুনে গেছে। মাছগুলো দিয়েছে ডিম, ডিম ফুটে বের হয়েছে বাচ্চা। বীজ থেকে গজিয়েছে গাছের চারা।

বিশাল আর চোখ ধাঁধানো কিছু একটা হলেও স্কাইল্যাব পরিকল্পনাটি ছিলো অলক্ষুণে। পরপর দুর্যোগ এর পেছনে লেগেই ছিলো।

শুরুতে যেমন ছিলো, তেমনি শেষ সময়েও এলো দুর্যোগ। এবং সর্বনাশ ঘটলো।

স্কাইল্যাবের শেষ দলটি যখন ফিরে এলো তখন বিজ্ঞানীরা এই বিশাল মহাকাশ যানটিকে কক্ষপথের আরো একটু উঁচু স্তরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা আরো হিসেব করে দেখলেন, স্কাইল্যাব যেভাবে অবস্থান করছে তাতে আরো ১৯৮৩ সাল নাগাদ যে অবিকল ভাবে মহাকাশে ঘুরতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত যদি ঘোরে তো ঘুরুক, তারপর সুযোগ সুবিধা মতো পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেই হবে।

কিন্তু এর মধ্যেই ঘটলো দুর্ঘটনা। বিপর্যয়। বিজ্ঞানীরা যা কল্পনাও করতে পারেননি তাই ঘটলো অবশেষে।

দেখা গেলো—মহাকাশের এক অদৃশ্য শক্তি এসে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলো ভাসমান স্কাইল্যাবকে। ফলে সে কক্ষচ্যুত হয়ে নামতে লাগলো পৃথিবীর দিকে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় দু'কিলোমিটার করে।

এই প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার কারণ কি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। অবশেষে কারণ খুঁজেও পাওয়া গেলো।

জানা গেলো এই আকস্মিক ও প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার মূলে আছে সূর্য। সূর্যই এর জন্য দায়ী।

মাঝে মাঝে সূর্যের দেহে কালো ছাপ পড়ে–তাকে বলে সৌর কলঙ্ক। সূর্যের দেহে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলেই সৃষ্টি হয় সৌর কলংকের।

বিস্ফোরণ স্থান থেকে বেরিয়ে আসে বড় বড় বুদবুদ। এর একটি বুদ বুদ আকৃতিতে পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড়। এসব বুদ বুদ বেরিয়ে আসার সময় সাথে বেরিয়ে আসে প্রচুর বিদ্যুৎ কণিকা।

বিদ্যুৎ কণিকা মহাকাশের লাখো লাখো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অনেক সময় পৃথিবীতেও নেমে আসে।

অবশ্য পৃথিবীতে নেমে আসার একটি কারণও আছে। পৃথিবীতো নিজেই একটি বিশাল প্রাকৃতিক চুম্বক। তাই সে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়া এসব বিদ্যুৎ কণাকেও নিজের মেরুর দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করে। যার ফলে মেরু অঞ্চলে দেখা দেয় আলোর ঝালর। যাকে বলা হয় মেরু জ্যোতি।

সৌরকলঙ্কের সময় শুধু আকাশে বিদ্যুৎ কণাই নেমে আসেনা, শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়ও; যাকে বলা হয় সৌরঝড়।



www.nagorikpathagar.org

ঝড় মহাকাশেও ছড়িয়ে পড়ে। এই ঝড়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও গরম হয়ে ওঠে। ফলে পৃথিবীর বায়ুস্তর কিছুটা ফুলে ওঠে।

এসব ঘটনা অবশ্য বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানতেন। তবু তাদের ধারণা ছিলো আগামী কয়েক বছরে সূর্যের গায়ে কোনো রকম উপদ্রব হবার কথা নয়।

কিন্তু অকস্মাৎ শুরু হলো এই বিপর্যয়। শুরু হলো সৌরঝড়। আর তারই ধাক্কা এসে লাগলো স্কাইল্যাবের গায়।

এই আকস্মিক ব্যাপারটির জন্য বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত ছিলেন না। যখন বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন আর স্কাইল্যাবকে রক্ষা করা গেলো না।

সৌরঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় স্কাইল্যাব নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নেমে এলো পৃথিবীর আকাশে। আর পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে জ্বলে উঠলো উল্কাপিণ্ডের মতো। তারপর জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে ভেঙে পড়লো।

অবশ্য এতে পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। ঘটতো—যদি কোনো লোকালয়ের উপর ভেঙে পড়তো জ্বলন্ত স্কাইল্যাব। কিন্তু তা পড়েনি। প্রায় আড়াই হাজার মণ ওজন বিশিষ্ট মহাকাশযানটি সারা পৃথিবীর মানুষের মনে আতংক সৃষ্টি করে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে পড়লো ভারত মহাসাগরের উপর।

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি জায়গায়। কতক কতক অংশ পড়েছিলো অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বিজন প্রান্তে।

এটি ধ্বংস হয়ে পৃথিবীতে পড়েছিলো ১৯৭৯ সালের ১১ই জুলাই তারিখে।

## স্পেস্ স্যাটল ঃ নভোখেয়াযান

স্পেস্ স্যাটল দিয়েই শুরু হয় নতুনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা অভিযান। এটা বলতে গেলে মহাকাশ গবেষণারও একটি নতুন যুগের সূচনা।

ইতিপূর্বে যে মহাকাশ যানগুলো তৈরি হয়েছিলো তার সাথে সর্বাধুনিক স্পেস্ স্যাটল মহাকাশযানের প্রযুক্তিগত বেশ পার্থক্য আছে।

ইতিপূর্বের মহাকাশযানগুলো শুধু একবারই ব্যবহার করা যেতো। একবার উড়লেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আধুনিক স্পেস্ স্যাটলকে ব্যবহার করা যায় বারংবার। এটি তৈরি করাও হয়েছে তেমনি কৌশলে।

আধুনিক কনকর্ড বিমান এবং প্রাচীন রকেট এদুটো নভোযানের কারিগরি কৌশলকে একত্র মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে স্পেস্ স্যাটল। স্পেস্ স্যাটল রকেটের মতোই মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মহাকাশের কার্যক্রম সমাধান করবে, কিন্তু যখন পৃথিবীতে নেমে আসবে তখন অবিকল বিমানের মতো সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে অবতরণ করবে রানওয়েতে। বিমান যেভাবে নামে, ঠিক তেমনি।

ইতিপূর্বের কোনো মহাকাশযান অক্ষত শরীরে স্থল ভাগে নামতে পারতো না। তারা নামতো সাগর জলে। উপর থেকে এসে আছড়ে পড়তো এরা। ভেঙে হতো চুরমার।

স্পেস্ স্যাটল ভেঙে যায় না বলে এটাকে বারবার পাঠানো যায়, এতে খরচও কম পড়ে। প্রত্যেক বারের জন্য একটি করে নতুন মহাকাশযান তৈরি করার ঝামেলা পোহাতে হয় না।

স্পেস্ স্যাটল তৈরি করার পেছনে ছিলো আরেকটি উদ্দেশ্য। মহাকাশে স্থাপন করা হবে অতিকায় মহাকাশ স্টেশন।

স্পেস্ স্যাটলের কাজ হবে পৃথিবী থেকে মহাকাশে ভাসমান ষ্টেশনে যাতায়াত করা। মালামাল, নভোযাত্রী ও যন্ত্রপাতি আনানেয়ার জন্য খেয়াতরীর ভূমিকা পালন করা। এই জন্যই এর আরেক নাম নভো খেয়াযান।

নভো খেয়াযানটি দেখতেও অবিকল উড়োজাহাজের মতো। কনকর্ড বিমানের মতোই



www.nagorikpathagar.org

দুপাশে আছে পাখা। তবে মাথাটা কনকর্ডের মতো অমন সুচালো নয়।

এর ককপিটের নাম ক্রু-মডিউল (Crew Module). এখানে তিনজন অভিযাত্রী এবং চারজন বিজ্ঞানীর বসার ও কাজ করার জায়গা আছে।

স্পেস শ্যাটেল

কনকর্ড বিমান যেখানে যাত্রীবহন করে নভোখেয়াযান সেখানে রাখে মালামাল। আসলেই তো এটি একটি মালবাহী বিমান। এর আছে মালগুদাম (Stroe Room) চওড়া ১৫ ফুট এবং লম্বায় ৬০ ফুট।

এই পরিসরে স্পস স্যাটল এক একবারে মোট ৬৫,০০০ পাউণ্ড মালামাল বহন করতে পারে। এছাড়াও সে বহন করে একটি মহাকাশ টেলিস্কোপ, উপগ্রহ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মহাকাশে ষ্টেশন তৈরির যাবতীয় মালমশলা।

নভোখেয়াযানের উড্ডয়নের প্রক্রিয়াটিও একটু ভিন্ন প্রকৃতির। প্রয়োজন হয় দুটো বোষ্টার রকেটের। এতে থাকে কঠিন জ্বালানী। ২.২ মিলিয়ন পাউণ্ডের এ্যালোমিনিয়াম পাউডার এবং এ্যামোনিয়াম পার ক্লোরেন্ট। এছাড়া সামনে মূল যানের বুকের সাথে ...কানো বিশাল ট্যাংকটি পূর্ণ থাকে তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের জ্বালানীতে। এতে থাকে মোট ১,৩৯,০০০ গ্যালন (১,৩ মিলিয়ন পাউণ্ড) তরল অক্সিজেন এবং ৩,৭০,০০০ গ্যালন (২,২৪,০০০ পাউণ্ড) তরল হাইড্রোজেন।

উৎক্ষেপণ মঞ্চে প্রথমে নভোযানটি নিজস্ব তিনটি ইঞ্জিনের তরল জ্বালানী বিস্ফোরিত হয়। তারা চার সেকেণ্ডে পূর্ণক্ষমতা লাভ করে। তারপরই কঠিন জ্বালানী ভর্তি দুটি মিনার সদৃশ্য বুষ্টার গর্জে ওঠে এবং নভোযানটিকে উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে মহাকাশের দিকে ঠেলে দেয়।

যাত্রার দুমিনিট দশ সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে যায় ১৩০০ কিলোমিটার উপরে। তারপরই বুষ্টার রকেট দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় নিচে। এই বুষ্টার রকেট দুটোও কিন্তু বারবার



www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার করা যায়। তাই এদুটো মূলযানকে উপরে ঠেলে দিয়েই প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসে নিচে সাগরের জলে।

কঠিন জ্বালনীর ব্যবহার কলম্বিয়া নভোখেয়াযানের ক্ষেত্রেই প্রথম।

দুটো বুষ্টার রকেট খসে পড়ার পর কলম্বিয়া ফুয়েল ট্যাংকের জ্বালানীর সাহায্যে চলতে থাকে। বিশাল এই ট্যাংকারের বিপুল পরিমাণ জ্বালানী ধ্বংস করেই নভোযানটি উঠে যায় কক্ষ পথে। তারপর শূন্য ট্যাংকটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মূল যান থেকে।

এই খালি ট্যাংকটি অবশ্য অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারেনা। বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে পড়ে পৃথিবীতে। ইতিমধ্যে নভোযান তার পরবর্তী যাত্রার জন্য নিজস্ব তিনটি রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে। তখন তার গতিবেগ দাঁড়ায় ঘন্টায় ২৭,২০০ কিলোমীর (১৭,০০০) মাইল।

স্পেস স্যাটল কলম্বিয়া প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৮১ সালের ১২ই এপ্রিল। যদিও এর ছিলো আরো দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। এর পরিকল্পনা শুরু হয় আরো অনেক আগে থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নভোযান সিরিজ ছিলো এ্যাপোলো সিরিজ। এই এ্যাপোলো সিরিজের পূর্ব পর্যন্ত মহাকাশ যাত্রায় সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিলো প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য। তারাই ছিলো অগ্রণী ভূমিকা।

তারপর এ্যাপোলো সিরিজের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রায় সমান-সমান পর্যায় চলে আসে। দুপক্ষই ছিলো সমকক্ষ।

কিন্তু এরপর থেকে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুটা পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হয়তো অনুৎপাদন খাতে বিপুল অর্থের বিনিয়োগ করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর রাজী ছিলো না। এ কারণেই তাদের মহাকাশ অভিযান কার্যক্রম অনেকখানি স্থিমিত হয়ে আসে।

১৯৭২ সালেই প্রেসিডেন্ট নিক্সন মহাকাশে স্পেস্ স্যাটল জাতীয় নভোযান উৎক্ষেপণের বিষয়টি অনুমোদন করেন এবং এর খরচ নির্বাহের জন্য ৫.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বাজেট পাশ করেন। তখন থেকেই কলম্বিয়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

নভোযানটি তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয় নর্থ আমেরিকান রকওয়েল (North American Rockwell) নামে একটি কোম্পানীর উপর। দীর্ঘ আট বছর ধরে চলে এর নির্মাণ কাজ।

কিন্তু শুরুতে এর যে নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিলো সে বাজেটে দেখা দেয় ঘাটতি। তাই বাজেট উন্নিত করা হয় ৮.৮ বিলিয়ন ডলারে।

নির্মাণের শুরু থেকে কলম্বিয়া সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাগিয়ে তুলেছিলো বিপুল সাড়া। সবাই জানতে পেরেছিলো মহাকাশ যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের একটি মহাকাশ যান।

তাই সেই সময় জনগণের কাছে কলম্বিয়ার একটি নতুন নামকরণও হয়েছিলো সবার মুখে মুখে। নাম ছিলো 'আমেরিকার মহাকাশ লেবু' (Americans Space Lemon). এটি ছিলো আমেরিকার সত্যি একটি বৃহত্তর লেবু।

আমেরিকার এই মহাকাশ লেবুর পরিচালনার জন্য যে নভোচারী বাছাই করা হয়েছিলো সেও ছিলো এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। যাত্রা শুরুর তিনবছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো নভোচারী বাছাইয়ের পালা। মোট ১১,০০০ জন আবেদনকারীর মধ্যে থেকে বাছাই করা হয় ৮০ জনকে। এই ৮০ জনের মধ্যে ৪৭ জন মনোনীত হলো পাইলট এবং বাকীরা মনোনীত হন বিজ্ঞানী। মিশন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এদের কাজ হলো স্যাটলের যন্ত্রপাতি সঠিক ও সক্রিয় রাখা।



www.nagorikpathagar.org

কলাম্বিয়াকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো যাতে এটি শতবার মহাকাশে উড্ডয়ন করতে পারে এবং এর জন্য ক্রমান্বয়ে ৪৭ টি যাত্রাকে পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিলো। এর কোন যাত্রায় কে কে নভোচারী হবেন তাও পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিলো।

এর মধ্যে প্রথম যাত্রায় যে দু'জন মনোনয়ন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তারা হলেন আই জন ইয়ং (John Young) এবং তার সহযোগ রবার্ট ক্রীপন (Robert Crippen).

ইয়ং ছিলেন নৌবাহিনীর একজন সুদক্ষ জেটবিমানের ক্যাপ্টেন। এছাড়া তিনি ইতি পূর্বেও বেশ কয়েকবার নভোযাত্রা করেছেন। তিনি এ্যাপোলো-সিরিজের-এর একজন নভোচাত্রী হিসেবে ১৯৭২ সালে চাঁদেও গিয়েছিলেন। নেমে ছিলেন চাঁদের মাটিতে।

তার সহযোগী রবার্ট ক্রীপনও ছিলেন সুদক্ষ বৈমানিক। তিনিও ছিলেন নৌবাহিনীর একজন সুদক্ষ জেট বিমানের ক্যাপ্টেন। তার রয়েছে ১২,০০০ ঘন্টা জেট বিমান ওড়ানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা।

অতঃপর এই যোগ্যতম প্রার্থীদ্বয়কেই মনোনীত করা হয় প্রথম যাত্রার জন্য। শুধু পূর্ব অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতা থাকলেই হবে না।

মনোনয়ন পাওয়ার পরও আবার শুরু হলো প্রশিক্ষণ। হোষ্টনের লিণ্ডন বি জনসন মহাকাশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হলো ট্রেনিং। প্রশিক্ষক ছিলেন থমাস কাইসার (Thomas Kaiser).

প্রতি সপ্তাহে ২৫ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ নিতে হতো তাদের। তারপর ১২০০ ঘন্টা এক নাগাড়ে কাটাতে হলো কলম্বিয়ার ককপিটে। তারা এই দীর্ঘ সময় ককপিটে থাকতে পারবেন কিনা তেমন ধৈর্যশীল করে গড়ে তোলার জন্যই এই বিচিত্র প্রশিক্ষণ।

অবশেষে এলো সেই দিন। ১৯৮১ সালের ১০ই এপ্রিল শুক্রবার। আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিমে ফ্লোরিডা রাজ্যের ছোট্ট শহর ক্যানভেরাল। এই শহরটির উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকেই প্রেরিত হবে স্পেস্ স্যাটল মহাকাশ যান কলম্বিয়া।

এই ঐতিহাসিক দৃশ্য অবলোকন করার জন্যই উৎক্ষপণ কেন্দ্রে সেদিন লোকে লোকারণ্য। সবাই উৎসুক হয়ে আছে কখন ঘটবে এই আলৌকিক দৃশ্য। কলম্বিয়া পাড়ি দেবে মহাকাশে।

কিন্তু সহসাই ঘটে গেলো গোলযোগ। যান্ত্রিক গোলযোগ। কম্পিউটার গোলযোগের কারণে কলম্বিয়া মহাকাশে পাড়ি দেবে না।

গোলযোগ মেরামতের জন্য সময় দিতে হবে আরো দুদিন। অতপর সময় নির্ধারণ করা হলো আগামী ১২ই এপ্রিল রোববার। এই বারই তারিখেই ঘটলো সেই অপূর্ব দৃশ্য। গত শুক্রবারের মতোই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে লাখো লাখো উৎসুক মানুষ। চোখে মুখে বিস্ময় কৌতূলহল আর উৎকণ্ঠার ছবি।

সব কিছু ছাপিয়ে অবশেষে নাসার অফিস থেকে মাইকে ঘোষণা করা হলো উৎক্ষেপণেরক্ষণ।

তারপরই চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক। আলো আর ধোঁয়ার বন্যা। বিকট গর্জনের মধ্য দিয়ে আকাশের বুকে ছুটে চললো কলম্বিয়া। প্রথম যাত্রা শুরু হলো স্পেস্ স্যাটল কলম্বিয়ার।

এরপর শুরু হলো তার পৃথিবী পরিক্রমণের পালা। ভূ-পৃষ্ট থেকে ২৪০ কিলোমিটার দূরে থেকে কলম্বিয়া সাড়ে চুয়ান্ন ঘন্টায় ৩৬০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। এই সময়ে প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর অন্তর সূর্যাদয় ও সূর্যোস্ত দেখা যাচ্ছিলো।

কলম্বিয়া মহাকাশে ছুটে যায় রকেটের মতো। পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে মালবাহী



www.nagorikpathagar.org

ট্রাকের মতো আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে সাধারণ বিমানের মতো।

পৃথিবীতে ফেরার সময় কলম্বিয়ার গতি বেগ ছিলো ঘন্টায় ২৭,২০০ কিলোমিটার। যখন এটি পৃথিবীতে নামার জন্য মহাকাশ থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিলো তখন বায়ুর সাথে ঘর্ষণে এর বাইরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিলো ২৭০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এতো প্রচণ্ড তাপে তার সবকিছু জ্বলে পুড়ে যাবার কথা।

কিন্তু তা যায়নি। কারণ কলম্বিয়ার বহিরারণ দেয়া ছিলো তাপ নিরোধক এক বিশেষ ধরনের কাঁচের টালি। তাই ভেতরে নভোচারীদের কিছু হয়নি। তারা বাইরের এই তাপমাত্রার কথা অনুভবও করতে পারেন নি।

কলম্বিয়া ১২ই এপ্রিল যাত্রা করে প্রত্যাবর্তন করে ১৪ই তারিখে (১৯৮১)। নেমে আসে ক্যালিফোর্নিয়ার মোহাভি মরুভূমির এডওয়ার্ডস বিমান বাহিনীর কেন্দ্রে।

এই অবতরণ ছিলো এক বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ বায়ুর এ্যাটমোস্ফিয়ার অঞ্চলে ঢোকার পর কলম্বিয়ার ইঞ্জিনের কোনো শক্তি থাকবে না। হাওয়ার জোরে গ্লাইডারের মতো নিচের দিকে এগোতে থাকবে যানটি। চালকের কাজ হবে দিক নির্ণয় করা। ভুল হলে কলম্বিয়াকে ঠিক জায়গায় নামানো সম্ভব হবে না। এর সফল অবতরণের দায়িত্ব ছিলো ইয়ং-এর উপর।

কলম্বিয়া অবতরণের সময় যখন মোহাভি মরুভূমির উপরে তখন তার গতিবেগ ছিলো ঘন্টায় ৩২০০ কিলোমিটারেরও বেশি।

অবতরণের ১৯ সেকেণ্ড আগে ইয়ং চাকাগুলো মাটিতে নামিয়ে দিলেন। পেছনের চাকাগুলো মাটি স্পর্শ করে এর ৯ সেকেণ্ডের মধ্যে।

কলম্বিয়া সফল মিশনে আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠলো গৌরবান্বিত। শুরু হলো মহাকাশ অভিযানের নতন যুগের।

এরপরও পরপর ২৫টি সফল অভিযান করেছিলো কলম্বিয়া। কিন্তু তারপরই নেমে এলো এক মহাদুর্যোগ। ১৯৮৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে অভিযান শুরুর অব্যাবহিত পরেই এক মহাবিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় স্পেস্ স্যাটল কলম্বিয়া। এই সাথে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে ৭ জন অভিযাত্রীর।

এরপর আড়াই বছর অভিযান বন্ধ ছিলো। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। আবার নতুন করে তৈরি হয় আর একটি কলম্বিয়া।

দ্বিতীয় পর্যায় স্পেস স্যাটল তার অভিযান শুরু করেছে ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসথেকে।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পেস স্যাটল সামরিক কাজেও ব্যবহার করা শুরু করেছে।

যেমন গত ১৯৮৯ সালের আগষ্ট মাসের যে কলম্বিয়ার ৫মতম অভিযান হয় এতে নভোচারীরা পৃথিবীর কক্ষপথে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন গোয়েন্দা উপগ্রহ স্থাপন করে এসেছে। যে উপগ্রহের দ্বারা পৃথিবীর এক ব্যাপক এলাকার সৈন্য ও জাহাজ চলাচল, সামরিক স্থাপনা এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লক্ষস্থলের উচ্চমানের বিস্তারিত ছবি প্রেরণে সক্ষমহবে।

এছাড়াও মহাশূন্যে সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে মানুষের ভূমিকার ব্যাপারে নভোচারীরা কয়েকটি পরীক্ষা চালান। এ পরীক্ষা ছিলো পৃথিবীতে গোপন সেনা ও নৌ মহড়া এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

---
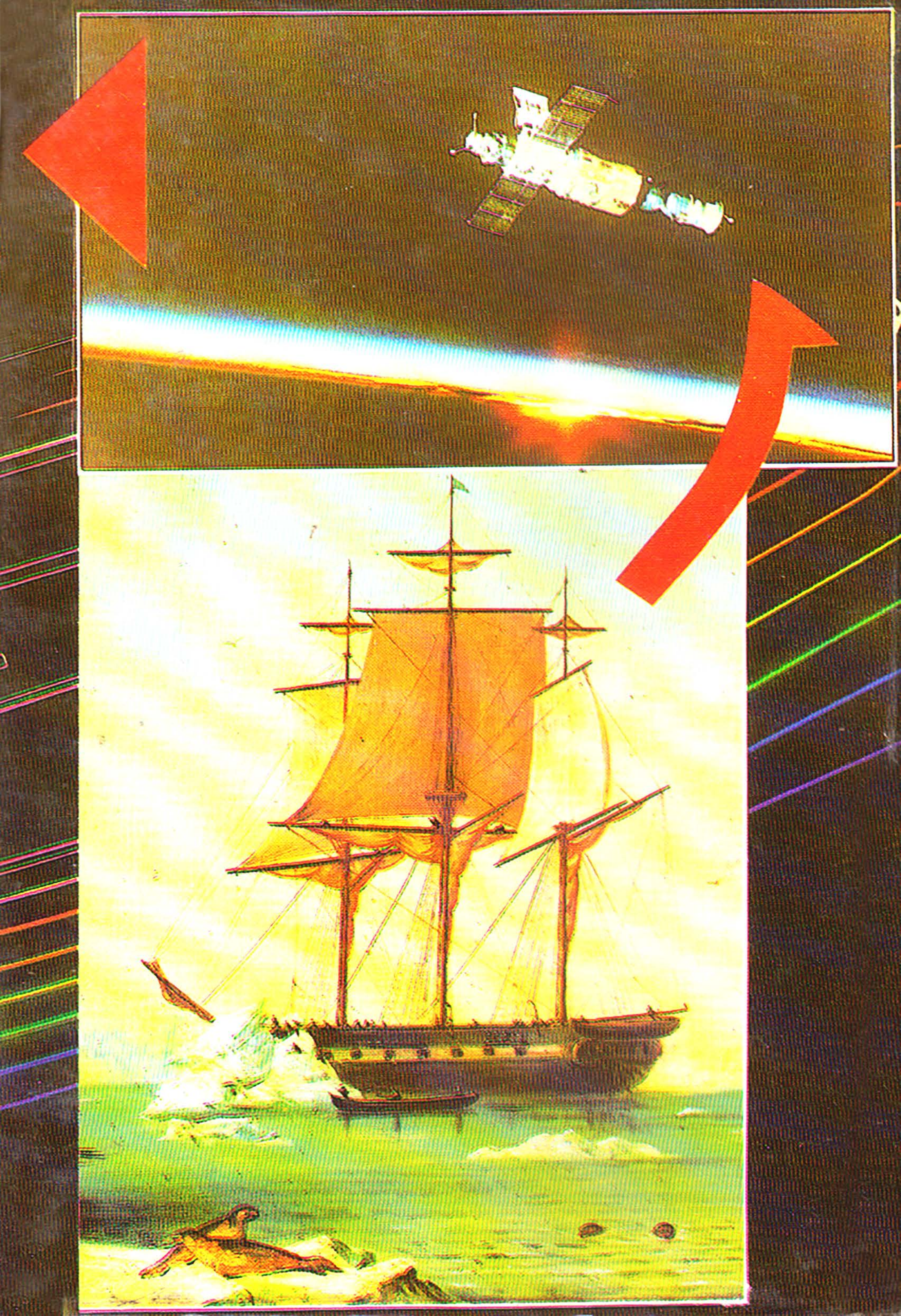
www.nagorikpathagar.org